সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য

সম্পাদনা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

SERA GOENDA SERA RAHASYA

A Collection of Detective Stories

Edited By

Arun Chattopadhyay

First Published

January, 1959

Price

Rs. 120.00 Only

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সন্দীপ নায়ক

পুনশ্চ

১১৪ এন ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড

কলকাতা-৭০০ ০১০

মুদ্রক

ডটলাইন প্রিন্ট অ্যাণ্ড প্রসেস

১১৪ এন ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড

কলকাতা-৭০০ ০১০

ISBN 81-7332-066-7

দাম

১২০ টাকা

প্রসঙ্গ ঃ কিশোর গোয়েন্দা-গল্প সংকলন

'বাংলায় ভাল ডিটেকটিভের গল্প নাই, একথা বোধ করি আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না। চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই পুস্তকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।' ১৯০১ সালে প্রকাশিত পাঁচটি গোয়েন্দা-গল্পের সংকলন 'পট'-এ লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় 'দুই একটা কথা'য় এভাবেই গোয়েন্দা-গল্পের সমকালীন চিত্র তুলে ধরেছেন। সেকালে গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠক-সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। একের পর এক গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয়েছে নানাজনের কলমে, যার শুরু কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের কর্মচারী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' দিয়ে, ১৮৯২ সালে। পাঠকরা আরও পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('বাঁকাউল্লার দপ্তর') প্রমুখ লেখকদের। বিদেশে যখন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর শার্লক হোমস ও ওয়াটসনকে দিয়ে পাঠকদের মধ্যে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলছেন (প্রথম উপন্যাস · 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট', ১৮৮৭), তখন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের ক্রাইম-কাহিনীর তৃষ্ণা মিটেছে পুলিশী-বিবরণমূলক নানা কাহিনীতে। সেই সব কাহিনী সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ছিল, গোয়েন্দা-গল্পের কূট-কৌশল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকাও ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এরই মাঝে সেকালের জনপ্রিয়তম লেখক পাঁচকড়ি দে শার্লক হোমসকে বাংলা-সাহিত্যে হাজির করলেন 'হরতনের নওলা'র মারফত। ১৯০৪ সালে বেরুল 'দি হাউন্ড অফ বাসকারভিল'-এর অনুবাদ 'নীলবসনা সুন্দরী'। তখন অনেকেই গোয়েন্দা-কাহিনী লেখার তাগিদে কলম ধরলেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শরৎচন্দ্র সরকার, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যসেবীদের লেখায় পাঠকরা পেয়েছেন কিছু মৌলিক গোয়েন্দা-রহস্য গল্পের স্বাদ।

এই হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের একজন বহুপঠিত লেখক। তাঁর 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড' প্রথম কিশোর গোয়েন্দা-গল্প রূপে চিহ্নিত। প্রকাশিত হয়েছিল 'সখা ও সাথী' মাসিক পত্রিকায়, ধরাবাহিক তিনটি সংখ্যায়। ১৮৯৪ সালে। এ কারণে বলা যায়, কিশোর গোয়েন্দা-গল্পের প্রকাশকাল একশো বছরের পুরনো। এই একশো বছরে লেখা অসংখ্য গল্প থেকে চয়ন করে ৩০টি গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। গোয়েন্দা-গল্পের পরম্পরা তুলে ধরতে হয়তো সেই আমাদের জনপ্রিয় লেখকদের গল্পও সংকলনভুক্ত করা যেত। কিন্তু এসব গল্পের বিষয় ও ভাষা কিশোর পাঠকদের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে 'সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য'তে সংকলিত হয়নি। এই বই মূলত ছোটদের কথা ভেবেই সম্পাদিত। মনে রাখতে হবে যে, রবার্ট ব্লেকের অমর স্রষ্টা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনী এখনকার কিশোর পাঠকরা সেকালের পাঠকদের মতো একইভাবে রুদ্ধশ্বাসে পড়বেন এমন ভাবার কারণ নেই। অথচ পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে পাঁচকড়ি দে যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, বিদেশী ডিটেকটিভদের আড়ালে রেখে তাঁর দুই ডিটেকটিভ অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় যখন বাঙালি-পাঠকদের নয়নের মণি, সেই সময় বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যের আসরে এসেছেন দীনেন্দ্রকুমার, প্রথমে 'নন্দন কানন' (প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন ১৩০৭) ও পরে 'রহস্য লহরী' সিরিজের মাধ্যমে। এসেই তিনি বাঙালি পাঠকের মন জয় করে নিলেন। প্রথমে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় কিছু মৌলিক গোয়েন্দা-গল্প লিখেছেন। 'পট' -এর মুখবন্ধে তিনি নিজেই লিখছেন : 'এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন কোন গল্পের উপাদান ইংরাজি

হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।' 'রহস্য লহরী' সিরিজে তিনি লিখেছেন ২১৭টি ডিটেকটিভ কাহি
'গোয়েন্দা কাহিনী' নিবন্ধে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন; 'সেযুগে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না।... এক বিলিতি পাক্ষিক থেকে দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করতে শেষের দিকে কোন কোন বইয়ে অনুবাদ কি রকম ভাল হয়েছে বোঝাবার জন্য ইংরেজির

থাকত।.... রবার্ট ব্লেকের সব গল্পগুলি সেক্সটন ব্লেক থেকে নেওয়া হয়, অন্য বিদেশি লেখকদেরও দীনেন্দ্রকুমার রায় ব্যবহার করেছেন। গ্রে প্যান্থারের শব্দে ও দস্যুদলের মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজের ফলে বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের কণ্ঠস্বর প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। অল্প বয়সে যাঁরা মেহেরপুর বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মুদ্রিত 'রহস্য লহরী' গ্রন্থমালা পড়েছিলে তাঁদের এখন এইসব বই পড়ে তত ভাল হয়তো লাগবে না। মনে হতে পারে কি মন্ত্রে এই স বই একদিন হৃদয় জয় করেছিল এখন ভেবে পাওয়া কঠিন। একথা হয়তো কি যে রবার্ট ব্লে ও স্মিথ প্রায় বাংলাদেশের ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যে বালক বিদেশের আর কোনো খবর জানে না, দস্যুদল অধ্যুষিত লন্ডনের উপকণ্ঠ, পিকাডেলি পাড়া বা টেমস্ এম্‌ব্যাঙ্কমেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।' (বিভাব, বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৩৫৪)

কিশোর গোয়েন্দা-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'পদ্মরাগ'-এ জাপানি ডিটেকটিভ হুকাকাশিকে এনে আসর মাত করে দিলেন সেই ১৯২৮ সালে, 'রামধনু' পত্রিকা সহায়তায়। ছোটদের জন্য নির্ভেজাল গোয়েন্দা-কাহিনী আমরা পেলাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্বল্পকালীন সাহিত্যজীবনে। মৌলিক গোয়েন্দা গল্প না লিখলেও কুলদারঞ্জন রায়ও চমৎকার অনুবাদ করেছেন শার্লক হোমসের গল্প। ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদ তাঁর লেখায় পাঠকরা পে 'বাসকারভিলের কুকুর' ও 'শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তি'! মৌচাক পত্রিকায় বাসকারভিলের কুকুর হয়ে গেল 'জলার পেত্নী'। লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তারপর 'কুলদারঞ্জনের খেই ধরে নিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৫৩)। হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন চৌকস সাহিত্যিক।....তিনি ফিরে এলেন ডিটেকটিভ গল্পে এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত রসের কাহিনীতে। এবার তাঁর আবির্ভাব হল ছেলেদের মৌচাক পত্রিকায় (১৩৩০)। এ সবেরই বিষয় বা বস্তু ছিল বিলিতি তবে হেমেন্দ্রকুমারের লেখনীতে বিদেশি বস্তু যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে দেশি রূপ ও রস প্রাপ্ত হয়েছিল। বিদেশি বস্তুকে আত্মসাৎ করার কৃতিত্বেই আলোচ্যকাল মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনী রচয়িতা। কৈশোরক সাহিত্যকে তিনি বয়স্কের উপভোগ্য করে পেরেছিলেন' (ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, সুকুমার সেন)। বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীতে হেমেন্দ্রকুমারই প্রথম বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করলেন। অপরাধ সম্পাদন ও অপরাধী নির্ণি নৈপুণ্য দেখালেন, আনলেন একজন ডিটেকটিভ জয়ন্ত, আর তাঁর দুই সহযোগী অ্যাসিসটেন্ট মানিক ও পুলিশ ইনসপেকটর সুন্দরবাবুকে।

বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাসের আর এক মাইলস্টোন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বসুমতী পত্রিকায় তিনি ১৩৩৯ সালে 'পথের কাঁটা' দিয়ে শুরু করেন তাঁর অভিযান। ১৩৪ সাল পর্যন্ত ৯টি গোয়েন্দা-গল্প লিখে, সাময়িক বিরতির পর আবার ১৩৫৮ থেকে ১৩৭ পর্যন্ত গল্প-উপন্যাসের ফুলঝুরি ফুটিয়ে বাংলা ভাষায় গোয়ন্দা-কাহিনীকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এর মাঝে দেবসাহিত্য কুটির আমাদের উপহার দিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিশ্বচক্র, পিরামিড, প্রহেলিকা ও কৃষ্ণা সিরিজের মাধ্যমে হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এই

পূজাবার্ষিকীগুলোতেও হাজির করেছেন বহু দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা-
না। সুধীন্দ্রনাথ রাহা, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ ভড়,
কুমার দাশগুপ্তরাও ভালো গোয়েন্দা-কাহিনী লেখেন দেবসাহিত্য কুটিরে।
ন অপ্রতিরোধ্য দস্যুমোহন (শশধর দত্ত), দীপক চ্যাটার্জী (স্বপনকুমার), কিরীটী রায়
রঞ্জন গুপ্ত)। বড়দের জন্য গোয়েন্দা-কাহিনী লেখার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে যার
আমরা পেতে পারি আচার্য সুকুমার সেনের 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' গ্রন্থে বা
ন্দা তার গোয়েন্দা' সংকলনের রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পাদকদ্বয়ের
ামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। একসময় বড়দের জন্য প্রকাশিত 'রোমাঞ্চ (১৯৩২),
পত্রিকা' 'গোয়েন্দা, 'তদন্ত' প্রভৃতি পত্রিকা ঘিরে সেরা সাহিত্যিকদের গোয়েন্দা-কাহিনী
র উৎসাহ বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ছোটদের জন্য গোয়েন্দা-
নী পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে 'মৌচাক', 'শুকতারা', 'আনন্দমেলা', 'সন্দেশ',
শারভারতী', এবং কিছুদিনের জন্য 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' পত্রিকাগুলোকে। ষাটের দশকে
ছোটদের জন্য গোয়েন্দা-গল্পে হাত দিলেন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র শিল্পী সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ'
কা সম্পাদনার সূত্রে। ফেলুদা, তপসে এবং জটায়ু বাংলার কিশোর-কিশোরীদের তো বটেই
স্কদেরও চমৎকৃত করল। সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-কাহিনীর অসম্ভব জনপ্রিয়তা অনেক নবীন
খককেই অনুপ্রাণিত করেছে। আশির দশক তাই হয়ে উঠেছে কিশোর গোয়েন্দা-কাহিনী লেখার
ক।

গোয়েন্দা-কাহিনী বিষয়ে এক সময় বাংলা-সাহিত্যে কিছুটা বিরূপতা ছিল সন্দেহ নেই। অনেক
কে সাহিত্যভুক্ত করায় আপত্তি জানাতেন। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মনেও কিছু দ্বিধা ছিল।
রদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা-কাহিনীকে সাহিত্যের আঙিনায় বিশিষ্ট মর্যাদা দিলেন। সেজনাই
বাধহয় আমরা সত্যজিৎ রায়কে পেয়েছি। পেয়েছি অন্যদের সঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকেও।
ই শক্তিমান সাহিত্যিকদের লেখনীর যাদুস্পর্শে গোয়েন্দা-কাহিনী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে
কুসুমিত হল নানাভাবে।

কিশোর-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল, গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে
ছোটরা অপরাধপ্রবণ হয়ে যেতে পারে, খুন-জখম ও বীভৎস-রস তাদের মনে অশুভ প্রভাব
ফেলে হয়তো। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'আডভেঞ্চার চাইলেও তাদের নিচু ধরনের
খুন-খারাপির গল্প বলা অন্যায়।' একথা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। তবু বলব, টিভি-
কালচারের এই যুগে ছোটরা আর সেই অর্থে ছোট নেই। তারা এখন অনেক পরিণত। তারা
এখন নীহাররঞ্জন পড়ে। শরদিন্দু তাদের কাছে খুবই প্রিয়। খুন নেই, ছমছম্ রহস্য নেই,
শ্বাসবন্ধ হয়ে-ওয়া ভৌতিক পরিবেশ নেই এমন কাহিনী অনেক সময় তারা ছুঁয়ে দেখতে চায়
না। তাহলেই কি আমরা মনে করব, এই সব গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে
উঠবে? খুন করার কৌশল শিখবে? বিমল কর লিখেছেন : 'গোয়েন্দা বই পড়ে কেউ খুন শেখে
না।' আমাদের ধারণাও তাই। প্রতিটি গোয়েন্দা-কাহিনীতেই অপরাধ যেমন আছে, তেমনি আছে
অপরাধীর শাস্তিও। যত কূটকৌশলেই অপরাধী তার কাজ করুক না কেন, সে
ডিটেকটিভরূপী লেখকের হাত থেকে রেহাই পায় না শেষপর্যন্ত। শাস্তি তাকে ভোগ করতেই
হয়। এই শিক্ষা তো পায় নবীন পাঠকরা। ফলে অপরাধ সম্পর্কে তাদের ভয় জন্মে নিশ্চয়ই।
... পাঠকদের চিন্তাশক্তির বিকাশও হয়। নারায়ণ সান্যালের কথায় বলা যায় : 'বাজে
গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো ডিটেকটিভ গল্পে বুদ্ধি ভীষণ

হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে।
খুন-জখম নয়, গোয়েন্দা গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা ... টেকটিভ কা আগে পাঠককে সমাধানে পৌঁছতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের ... সামনে ... নজর পড়বে না!'

গোয়েন্দা-কাহিনী এখন শুধু খুন-খারাপির মধ্যে নেই। কত বিচিত্র বিষয় এসেছে। রোবট-গোয়েন্দা বানিয়েছেন। পরিমল গোস্বামী গোয়েন্দাদের নিয়ে রসিকতা করেছেন, পেয়েও অপরাধী ডিটেকটিভকে মারে না। মেরে ফেললে আর গল্প হবে কি করে?' ... মিত্রের গোয়েন্দা পরাশর বর্মা কবিতা লেখেন। হুকা-কাশির কথা মনে রেখে শিবরাম 'কল্কে-কাশি'কে দিয়ে নানা কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টিটো-পাপান, মুখোপাধ্যায়ের ফটিক, আশাপূর্ণা দেবীর বটকেষ্ট সর্দার ও যোগা মণ্ডলও গোয়েন্দা তো 'গোয়েন্দা ও চোর একই শ্রেণীর, দুজনেরই প্রয়োজন একটি শাগরেদ। চোরেরও গো (আশাপূর্ণা দেবী)। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন অনেক হবু-গোয়েন্দা। তা নিয়ে সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, লীলা মজুমদার ও অজিতকৃষ্ণ বসু কি হাস্যরসই করেছেন! আর ক্ষুদে গোয়েন্দারা কেমন পাকা মাথায় কাজ করেছে তার পরিচয় ছড়িয়ে নানা গল্পে।

এই সংকলনে ৬০ জন বিশিষ্ট লেখকের গল্প প্রকাশ করা হয়েছে। তার মানে এই না যে কিশোরদের জন্য আর কেউ ভালো গোয়েন্দা-গল্প লেখেননি। আরও অনেকেই ছোটদের জ দেশী-বিদেশি গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার গল্প লিখেছেন। এই সংকলনের কলেবর বৃদ্ধি হতে থা ইচ্ছে থাকলেও সবার লেখা সংকলিত করা যায়নি বলে সম্পাদক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা ভাষায় বানান নিয়ে এখন রীতিমত গবেষণা চলছে। কিশোর পাঠকরা যাতে বানানের গোলকধাঁধায় না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রেখে সব গল্পের বানান একরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রথম গল্প 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড'-এর বানান আগের মতোই রাখা হয়েছে একশো বছর আগের ভাষা এবং বানান এই দুইয়ের সঙ্গে কিশোর পাঠকদের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

এই সংকলন প্রকাশে নানাজনের সহায়তা পেয়েছি। প্রথমেই নাম করব 'পুনশ্চ'-র তরুণ কর্ণধ সন্দীপ নায়কের। ... চাইলেই যে-সংকলন প্রকাশের প্রসঙ্গ উঠেছিল তা রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য যে-কোন ...নু-গোয়েন্দাপ্রবরের সঙ্গে তুলনীয়। সহায়তা পেয়েছি কমলকুমার নিয়োগী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ...মীন্দ্র ভৌমিক, সুকান্ত বিশ্বাস, সুধীন্দ্র সরকার, অশোককুমার মি... সহ অনেকের কাছ থেকেই। ...থম কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা-গল্পটি সংগ্রহ করে দিয়ে ...লকুমার পাল। পাঠকদেরও ধন্যবাদের প... হবেন আশা করি।

সবশেষে জানাই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যাঁরা গল্পগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। কয়েকজনের গল্প প্রকাশের অনুমতি নানা ...ণে সংগ্রহ করতে পারিনি। সেজন্য তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কিশোরদের জন্য এই গল্প-সংক... তাঁদের কথা মনে রেখে এঁরা আমাদের মার্জনা করবেন— এই প্রত্যাশা।

অরুণ চট্টোপাধ্যায়



সূচি

আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

(আমার কথা)

(১)

কাল হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। ভাদ্রের ভরা বর্ষা, রাস্তা ঘাট কাদায় পরিপূর্ণ হইয়াগিয়াছে। খাল বিল কুলে কুলে ভরিয়া উঠিযাছে। সন্ধ্যার পর একটু বৃষ্টি কম পড়ে, কিন্তুআকাশে মেঘের ঘটার সেই রূপ আড়ম্বরই ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরই পাড়ায় বাহি হই, কিন্তু সেই দিন সেই অন্ধকারে, কাদা পিছলের মধ্যে লণ্ঠন হাতে করিয়া বর্ষাপথ হাঁটা বড় সুবিধাজনক বোধ হইল না। কাজেই সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ছিল।

নেক ক্ষণ একখানা বই লইয়া একটু পড়িলাম। বর্ষার সঙ্গে যেন বিষন্নতার একটা ঘনি সম্বন্ধ। যে দিন রোদ হয়, গাছ পালা, নদ নদী—সমগ্র প্রকৃতির ছবি খানি রোদে হাতি থাকে, সে দিন কেমন মনে একটা স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আপনিই জাগিয়া উঠে। কিমেঘ ঝড়ের দিন কি যেন একটি বিষণ্ণ ভাব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভাসাইয়া তুলে, আ হাজার চেষ্টা করিয়া তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে পারি না।

উক, এই বর্ষায কাজেই আমার বই ভাল লাগিল না। আমি বইখানি তুলিয়া রাখিয়া ছেদের পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলাম, তাহাদের পড়াশুনাও একটু দেখিলাম, কিন্তু তাহাতেও যেআমার প্রাণের তৃপ্তি হইল না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সকাল সকাল আহারাদি শেকরিয়া, বিছানায় গিয়া পড়িলাম।

শ সে দিন শীত পড়িয়াছিল, বিছানায় শুইতেই একটু তন্দ্রা আসিল। তার পর কা ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, কিন্তু সেই গভীর রাত্রে, সহসা কে যেন আমার ঘরের দে দুই তিন বার জোরে জোরে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেবটে, কিন্তু ঘুমের ঘোর তখনও যায নাই। আঘাতের উপর আঘাত, তার পর যেন কাতর কণ্ঠে ডাকিল "আঘোর বাবু—অঘোর বাবু"। আমি কার আওয়াজ ঠিকরিতে পারিলাম না, কিন্তু বোধ হইল তাহা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর, আবার তাহা যেন ভাওয়ার মত।

চ রাত্রে কোন প্রতিবেশিনী হয়ত বিপদগ্রস্ত হইয়া আমার বাড়ী আসিয়াছে, এই ভা আলো জ্বালিবার উদ্যোগ করিলাম। মাথার নীচে দেশলাই রাখা অভ্যাস ছিল,

বিছানার ভিতর হইতেই হাত বাড়াইয়া আলো জ্বালিলাম। এবার বাহিরের দ্বারে আবার উপরি উপরি দুই তিন বার আঘাত হইল, বাহিরের ব্যক্তি বলিল—"ন বাবু শীঘ্র দোর খুলুন সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

আমি তাড়াতাড়ি দোর খুলিয়া ফেলিলাম। আমি ভাবিয়া ছিলাম, আমার বাসার পার্শ্বে একটি হিন্দুস্থানীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংকটাপন্ন পীড়া, তাহার বাটীর হয়ত কেহ হইবে; কেন না বাহিরের স্ত্রীলোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতেছিল।

কিন্তু দোর খুলিয়া দেখিলাম, সে সেই হিন্দুস্থানীর দাসী নয়, আমার এক খুড়তুত ভাই এর পরিবারভুক্তা দাসী। আমার বাসা হইতে তাঁহার বাড়ী চার রশি দূরে।

আমার নিজের একটু পরিচয় দিই। আমি তখন দেওঘরে গিধোড়ের রাজার অধী চাকরী করিতাম। আমার বাসার সন্নিকটে অর্থাৎ এক মহল্লার সীমায় আমার এক জ্ঞাতি ভাই থাকিতেন। তিনি মোটা মাহিনা পাইতেন। এখন চাকরিতে ইস্তফা দিয়া, পীড়ার জন্য অনেক দিন ধরিয়া বৈদ্যনাথে বাস করিতেছিলেন।

দাদার বাড়ীর দাসী নুরীকে সেই রাত্রে দেখিয়া আমি বলিলাম, "নুরী কি হইয়াছে বল্ দেখি! কিসের সর্ব্বনাশ! দাদা ভাল আছেন ত?

নুরী কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা চাপড়াইয়া বলিল, "ন বাবু গো! তিনি থাকিলে ... সর্ব্বনাশ কিসের? আজ রাত্রে কে তাঁহাকে খুন করিয়া গিয়াছে!"

খুন!! বলিস্ কি—খুন!! কে এমন সর্ব্বনাশ করিল—হা ভগবান—"

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না। নুরীকে বলিলাম, —"আমার চাকর খোদাই তোর সঙ্গে যাইতেছে, তুই থানায় গিয়া খবর দে, আমি বাড়ীর দিকে যাই!"

নুরী চলিয়া গেল। আমি তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। তখন আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে ছিল। আমি অন্য এক চাকরকে জাগাইয়া হুঁসিয়ার থাকিতে, বলিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম।

(২)

রাস্তা ঘাট কাদায় পরিপূর্ণ বলিয়া সেখানে পৌঁছিতে আমার পাঁচ সাত মিনিট অ বিলম্ব হইল। আমি একেবারে বাড়ীর ভিতরে গেলাম।

প্রথমেই সম্মুখে আমার ভ্রাতৃজায়া—তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁ দুই কন্যা; একটি ১০ বৎসরের, অপরটি ৭ বৎসরের, তাঁহার মুখের উপর পড়ি "মা" "মা"—"কথা কও" বলিয়া কাঁদিতেছে। দুই তিনটা দাসী পাখার বাতাস জলের ছিটা দিতেছে; কিছুতেই চেতনা হইতেছে না।

সে বাড়ীর ঘর দোর আমার সবই জানা ছিল, আমি একটি ঘরে ঢুকিয়া কোন ঔষধ লইয়া তাঁহার নাসিকার কাছে ধরিলাম। ক্রমে তাঁহার চেতনা হইল, তিনি আম চিনিতে পারিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া কাঁদি লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিলাম এবং ধরাধরি করিয়া লইয়া নিকটের একটি ঘরে শোয়াইলাম! বলিলাম, "আপনি চীৎকার করিয়া কান্নাহাটি করিবেন না, পুলিশের লোক এখনি আসিবে।

গৃহিণী প্রথমেই দাসীর মুখে এই সংবাদ পান, এবং ঘরের বাহিরে আসিতে আসিতে দালানে মূর্চ্ছিতা হন। তাঁহার চীৎকারে দুই চারিটি প্রতিবেশিনী, সেই গভীর অন্ধ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাদিগকে গৃহিণীর ঘরে পাঠা

দিলাম।

নুরী এখনই ফিরিবে—কারণ আমার বাড়ী হইতে থানা অর্দ্ধঘণ্টার পথ। আমি দাদার খানসামা, রামফলকে বলিলাম, "দেখ রামফল, দাদার ঘরে এখন কেহ যেন না যায়, পুলিস যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ কাহারও ঐ গৃহে প্রবেশ করা উচিত না। তুমি এই দ্বারের কাছে বসিয়া থাক।"

রামফল সাহসী ও প্রভুভক্ত। সে অত্যন্ত কাঁদিতেছিল, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"যো হুকুম খোদাবন্দ।"

আমি দালানের আলোটা জ্বালিয়া দিলাম। ঘড়ীতে দেখিলাম রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে। এমন সময় নুরী আসিয়া শশব্যস্তে বলিল, "ন বাবু, পুলিশের লোক বাহিরে আসিয়াছে, আপনি বাহিরে যান।

(৩)

পুলিশ আসিয়াছে শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। দারোগা সাহেব আমাদের বাহিরের ঘরের চাতালে বসিয়া ছিলেন, আমি বাটীর ভিতর হইতে আলো আনাইলাম। দেখিলাম দারোগা স্বয়ং ও দুই জন কনষ্টেবল সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত।

থানার পূর্ব্ব দারোগার সহিত আমার আলাপ ছিল। যিনি তদারকে আসিয়াছেন, তিনি নূতন লোক। সম্প্রতি বদলী হইয়া দেবঘরে আসিয়াছেন। আমাদের অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন হইয়া গেল। দারোগা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় যিনি খুন হইয়াছেন, তিনি আপনার কে হন?"

আমি বলিলাম—"আমার জ্যেঠা মহাশয়ের পুত্র।"

দারোগা বলিলেন—"মেয়ে ছেলেদের সরাইয়া দিন; আমি অকুস্থল নিজে গিয়া একবার দেখিব।"

দারোগা বাড়ির ভিতর গিয়া হুকুম দিলেন,—কেহ যেন বাড়ীর বাহিরে না যায়। সদর ও খিড়কী দ্বারে, সেই দুইজন কনষ্টেবল পাহারা দিতে লাগিল।

দারোগা রামফলকে আলো লইতে বলিলেন। যে ঘরটিতে খুন হইয়াছে সেটি দক্ষিণ-দ্বারী ঘর। দারোগা সাহেব নিজ হাতে আলো লইয়া মৃতদেহের উপর ধরিলেন। অহো! সে ভয়ানক দৃশ্য আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম, আজও তাহা আমার মনে জাগিতেছে! মৃতদেহের গলা কাটা, তাহা হইতে অজস্র ধারে রক্ত পড়িয়া বিছানা ভাসিয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির ডান ও বাঁ দিকের বিছানার চাদরের অংশ রক্তস্রোতে লাল হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুটি মুদ্রিত, মুখ হাঁ করা, মুখে কি যেন একটা যাতনার চিহ্ন। মৃত ব্যক্তির গায়ে একটি মেরজাই ও একটি পিরাণ ছিল। মেরজাইয়ের বাঁ দিকের পকেটটির জেব উলটান। তাঁহার ডান হাতের মুঠার ভিতর একখানি ক্ষুর। ক্ষুর খানি তিনি ডান হাতে ধরিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা মুষ্টিবদ্ধ নহে।

দারোগা বিশেষ করিয়া আহত ব্যক্তির মুখের দিকে আলো ধরিয়া, খুব সাবধানতার সহিত তিন চারবার দেখিলেন। তার পর ঘরের জিনিস পত্রের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। সেই ঘরের আসবাবের মধ্যে একটি কাপড়ের দেরাজ, একটি কাচের আলমারি ও দুটি সিন্দুক। ঘরের জিনিস পত্র যেরূপ ভাবে যেখানে ছিল ঠিক সেইরূপই আছে। একটি টেবিলের উপর নানারূপ ঔষধের শিশি, মেঝের উপর একটি অর্দ্ধভাগ জলে পরিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গ্লাস ও ভুক্তাবশেষ দুগ্ধ-বিশিষ্ট একটি দুধের বাটী।

একটু মনোযোগের সহিত তদারকে দেরাজগুলি বিশেষ পরীক্ষা করায়, তাহার অন্য সকলগুলিই বন্ধ আছে দেখা গেল, কেবল বাঁ ধারের সকলের নীচের টানাটির চাবি খোলা। অপর গুলির চাবির জন্য অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, চাবি কর্ত্তার কাছেই থাকিত, তিনি বালিসের নীচে বা কোমরে রাখিতেন। বালিসের নীচে বা কোমরের ঘুন্‌সী দেখা হইল, চাবি পাওয়া গেল না।

চাবি না পাওয়াতে দারোগার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি সেই খোলা টানাটি একবার খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া সেইখানে বসিলেন।

ঘরের পশ্চিমদিকে একটি পাশ-দোয়ার ছিল। এই দরজাটিতে সর্ব্বদা ভিতর হইতে খিল ও বাহির হইতে চাবি দেওয়া থাকিত। কখনও এ দ্বার খোলা হইত না। দারোগা সাহেব তালাটি বিশেষ করিয়া দেখিলেন। তাহাতে চাবি ঘুরানোর কোন দাগ নেই, দোরের খিলের উপর, কেবল স্থানে স্থানে ধুলা ময়লা ঝরিয়া পড়িয়াছে।

ঘর দোর বেশ করিয়া দেখা হইলে দারোগা বলিলেন—"বাবু, আমি ডাক্তার সাহেবকে খবর দিয়া আসিয়াছি। তিনি এখনই আসিবেন। মৃতদেহ পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি অন্য তদারক করিতে পারিতেছি না।"

তখন প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ ধীরে ধীরে জানালার পাশে উকি মারিতেছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে কি কাল রজনীই প্রভাত হইল! জীবনে মানুষের সুদিন কুদিন দুই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এমন কুদিন যেন অতি শত্রুরও না ঘটে।

দারোগা বাহিরে গিয়া তাঁহার ডায়ারি পুস্তকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া লইলেন। মধুপুরে সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একজন ইংরাজ সিবিল ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে আনিতে ভোরের গাড়িতেই দারোগা এক জনকে রওয়ানা করিয়া দিয়াছিলেন। সকালে আটটার সময় কলিকাতা হইতে যে গাড়ি আসে, তাহাতেই সাহেবের আসিবার সম্ভাবনা ছিল।

আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি আসিয়া হুকুম দিলে তবে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা হইবে; ঘরে বাসি মৃতদেহ রাখিতে নাই, তাঁহাতে এ আবার একটি শোচনীয় মৃত্যু।

ডাক্তার সাহেব আটটার গাড়িতেই আসিলেন। প্রায় এক ঘণ্টার উপর তাঁহার শবদেহ পরীক্ষা করিতে গেল। তিনি পকেট বুকে কতকগুলি আবশ্যকীয় ঘটনা তুলিয়া লইয়া, লাস দগ্ধ করিবার হুকুম দিলেন। দারোগাকে পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিয়া, তার পর চলিয়া গেলেন।

শবদেহের সৎকারের আয়োজন হইতে লাগিল : এদিকে দারোগা বাড়ীর সকলের জোবানবন্দী লইতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে রামফল খানসামার সাক্ষী লওয়া হইল। রামফল যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মকথা এই, —যে বাবু খুন হইয়াছেন, তাঁহার নাম রামকালী চট্টোপাধ্যায়, তিনি আমার মনিব। বাবুর নিবাস বাঙ্গলা দেশে, কোন গ্রামে বা জেলায় তাহা জানি না। তিনি পীড়ার চিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বৈদ্যনাথে তিনি তিন বৎসর আছেন। একথাও শুনিয়াছি যে, এর আগে তিনি মধুপুরে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট এক বৎসরের উপর চাকরি করিতেছি। বাবু আমায় বড় ভাল বাসিতেন। শ্রাবণ মাস হইতে আমার দুই টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দেন। এখন আমি আট টাকা মাহিনা পাই। গত রাত্রে আমি তাঁহাকে এগারটার সময় জীবিত দেখিয়াছি। আমি তাঁহার বিছানা করিয়া দিই। রাত্রি আন্দাজ এগারটার সময় তিনি গরম দুধ খান। প্রতিদিনই রাত্রে গরম

দুধ খাইয়া শুইয়া থাকেন। অন্য কিছু খান না, তবে নিতান্ত ক্ষুধা হইলে দুই একখানা লুচী, একটু তরকারি ও মিছরীর গুঁড়া খান। আমি যতদিন আসিয়াছি ততদিন বাবুকে পীড়িত দেখিতেছি। তাঁহার শূল বেদনার মত কি একটা বেদনা মাঝে মাঝে ধরিত, তাহাতে তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িতেন। মাসে একবার দুইবার এই বেদনা ধরিত। ঔষধ বার মাসই চলে। বাবু কোনরূপ নেশা করিতেন না। তামাক পর্য্যন্ত সব সময়ে খাইতেন না। যখন শূল বেদনা বাড়িত, তখন সেই সঙ্গে মাথাঘোরা ব্যারাম হইত। পীড়ার যন্ত্রণায় বাবু এক একদিন বলিতেন, ''রামফল, আত্মহত্যা করিতে নাই, কিন্তু আমার আর যাতনা সহ্য হয় না।'' সে অনেক দিনের অর্থাৎ দুই মাসের কথা। তারপর আর দুইবার সেই রূপ বেদনা ধরে। প্রায় মাসাবধি আর সেই বেদনা ধরে নাই। বাবুর টাকাকড়ি কোথায় থাকে আমি জানি না। তিনি চাকরদের সে সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন না। গিন্নী মা হয়ত জানেন, তাঁহার চাবি ও টাকাকড়ি কোথায় থাকে। মাসে মাসে কলিকাতা হইতে তাঁহার ডাকে দুই তিন শত টাকা আসে। কখন কখন বা বাবুর এক ভাগ্নে দেশ হইতে টাকা আনিয়া দিয়া যান। সেই টাকায় শুনিয়াছি সংসার খরচ, চাকর বাকরের মাহিনা প্রভৃতি দেওয়া হয়। টাকাকড়ি বাঁচে কি না তা আমি জানি না। নিজ সম্পত্তি উইল করিয়াছেন কি না, সে খবর আমি রাখি না। চাকর বাকরের সে খবরে কোন দরকার নাই। মাঝে একদিন একজন উকীল বাবু আসিয়াছিলেন। তিনি এক দিন এখানে ছিলেন। তাহাতে উইলেব কথা শুনিয়াছি। আমার পর, বাবুর ঘরে কাল রাত্রে গিন্নী মা গিয়াছিলেন। তারপর নুরী দাসী বাবুর মশারি ফেলিতে গিয়াছিল। নুরী ও আমি এক দালানেই শুই। সেই দালান বাবুর কামরার খুব নিকটে। রাত্রে ডাক পড়িলেই আমাদের উঠিতে হয়।''

তার পর নুরী দাসীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল। নুরী বলিল, —''আমি বাবুর পশ্চিমে আসা হইতে তাঁর কাছে চাকরী করিতেছি। গৃহিণী ও বাবু আমায় সকল চাকরদের অপেক্ষা স্নেহ করেন। আমি সামান্যা দাসী হইলেও আমার মনিবেরা আমায় সকল চাকরের চেয়ে মাইনে বেশী দেন। গৃহিণীর শরীর সব সময়ে ভাল থাকে না। কাজেই সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম আমার হাতে। এত দিন আমি এখানে চাকরি কচ্ছি, কিন্তু মনে হয় না মনিব কখন আমায় তিরস্কার করেছেন কি না! কাল এগারো রাত্রি পর্য্যন্ত আমি তাঁর ঘরে ছিলাম। বাবু রাত্রে কিছু খেতেন না, একটু খানি দুধ তাঁর জন্য ঢাকা দেওয়া থাকৃত; সেই দুধটা যখন খাবার দরকার হত, তখন গরম করে দেওয়া যেত। কোন দিন গিন্নী মা দিতেন, কোন দিন আমিও দিতেম। কোন দিন বা বাবু দুধ নিয়ে যাওয়া মাত্রই খেতেন। কাল রাত্রে তাই করেছিলেন। চাকরদের মধ্যে আমার উপর তাঁর বেশী বিশ্বাস ছিল; আমায় মাঝে মাঝে সিন্দুকের চাবি খুলতে দিতেন, তবে নিজে বসে থাকতেন। গতরাত্রে আমি সদর ও খিড়কী দরজা পরীক্ষা করে শুয়ে ছিলেম; প্রতিদিনই এরূপ করি। কোন দিন বা আমি করি, কোন দিন বা রামফল করে। কাল আমি শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। রাত্রে কোন শব্দ শুনি নাই। বাইরের লোকেই অবশ্য খুন করেছে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে কি করে সে লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকলো তা জানিনা।''—ইহার পর নুরী আর কিছু বলিতে পারিল না। চ'খে বস্ত্র দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নুরীর পর কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জবানবন্দী হইল। তিনি তখনও ভারি অসুস্থ ও শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। এই খানেই জবানবন্দী শেষ হইল; দারোগা সাহেব বিদায় হইলেন।

খুনের তদারক করিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু খটকা ভাঙ্গিল না। এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না যাহাতে খুনীর কিনারা হয়। সদরে রিপোর্ট করিলাম। হুকুম আসিল, যে রূপেই হউক অপরাধীকে হাজীর করান চাই। আমার ত দিন আর কাটেনা; মনে বড়ই দুর্ভাবনা হইল।

কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর—যিনি অপরাধীর গুপ্ত অপরাধের সকল কার্য্যই দেখিতে পান, এক দিন তাঁহার করুণা অদ্ভুত উপায়ে দেখিতে পাইলাম। যে খুনের কিনারা করিতে আমি কেন, আমা অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মচারিও সফল হইতে পারিতেন না, আশ্চর্য্য উপায়ে আমি তাহার গূঢ় রহস্য ভেদ করিলাম।

বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গ দেশে চলিয়া গিয়াছেন। চাকর বাকরদের জবাব হইয়াছে, একথাও শুনিয়াছি। একদিন একটু কাজ পড়াতে আমায় দানাপুরে যাইতে হইয়াছিল। কাজ সারিয়া আমি কাশীর গাড়ির অপেক্ষায় ষ্টেসনে আসিলাম।

ষ্টেসনের টিকিট ঘরের কাছে অনেক লোক ভিড় করিতেছে। কেহবা টিকিট কিনিতেছে, কেহবা পয়সা গুনিতেছে, কেহ বা গাঁটরী বাঁধিতেছে, কেহবা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা খালি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি লাগাইয়াছে।

আমি সেই জনতার পাশ কাটাইয়া যাইবার সময় দেখিলাম, নুরী দাসী একটা জোয়ান বদ্‌খত্ চেহারার হিন্দুস্থানীর সহিত টিকিটঘরের পাশের একটা কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ফিস্ ফিস্ করিতেছে। কোন লোককে সেই দিকে আসিতে দেখিলেই সে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিতেছে। বলিতে পারিনা কি কারণে তাহার উপর আমার বড় সন্দেহ জন্মিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, কলিকাতায় যাইবার জন্য তাহারা গাড়ির অপেক্ষা করিতেছে। আমি আর তাহাদের দেখা না দিয়া অলক্ষ্যে সঙ্গ লইলাম।

গাড়ি আসিল—গাড়ি ছাড়িল। সময় ও রেলের গাড়ি কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। আমরা গাড়িতে উঠিয়াছিলাম প্রায় ৫।টা বেলার সময়ে। গাড়ি যখন মোকামা ছাড়াইল, তখন মধ্য রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি যে কামরায় ছিলাম, তাহার পাশের বেঞ্চিতেই নুরী ও তাহার সঙ্গীটি বসিয়াছিল।

ঘটনাক্রমে তাহাদের গাড়ি খালি হইয়া পড়িল, কেবল তাহারা দুইজনেই সেখানে বসিয়া। আমার চখে একটা নীল রঙ্গের চসমা ছিল। কৃত্রিম দাড়িও সঙ্গে ছিল, তাহাও পরিয়া লইলাম। তখন আমাকে কোন প্রকারে চিনিতে পারা তাহাদের কথা দূরে থাক্, যাঁহারা অষ্ট প্রহর আমার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদেরও অসাধ্য হইত।

আমি বেঞ্চের উপর বিছানা করিয়া শুইলাম। আমার গাড়িও জনশূন্য। তাহাদের গাড়িও তাই। নুরী একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিল, একবার আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া আবার বেঞ্চের উপর বসিল। আমি ঘুমাইতেছি কিনা তাহাও একবার রেলিং এর মধ্যে মুখ দিয়া দেখিল।

আমি কপট নিদ্রায় অভিভূত। না জানি আজ কাহার মুখ দেখিয়া বাটীর বাহির হইয়াছি। যে ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য এত করিয়া মাথা ঘামাইতেছি, এত জোগাড়যন্ত্র করিয়াছি, কতদিন রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই, আজ হয়ত তাহার কোন সুরাহা হইবে, এই ভাবিয়া আমি কপট নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিলাম।

নুরী প্রথম কথা কহিল। কথাবার্ত্তা হিন্দিতে হইতেছে। নুরী বলিল, ''দেখ্ শিউরাজ! আমার মনে ভাই বড় ভয় হইতেছে। আমি তোর কথায় কলিকাতায় যাইতেছি বটে, কিন্তু

আমার মনে যেন কি একটা সন্দেহ ঘুরিতেছে। তোর মন্ত্রণায় ভুলিয়া আমি না করিয়াছি কি? কতদিন ধরিয়া তুই আমায় এই দুষ্কর্ম্মের জন্য ফুস্‌লাইতেছিস্‌, কিন্তু আমি কিছুতেই গা দিই নাই। তখনও আমার ধর্ম্মভয় ছিল। যাই হ'ক, আমি বলি, কলিকাতায় গিয়া কাজ নাই। আজ চল্‌ বৈদ্যনাথে নামিয়া পড়ি, কাল দুজনে দেশে ফিরিয়া যাইব। যাহা হইয়াছে, তাহাতে বেশ দুজনের চলিবে। দেশে চাষ বাস করিলে কেহ কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না।''

সেই দুরন্ত চেহারা হিন্দুস্থানীটা বলিল—''দেখ্‌ নুরী তুই বড় বোকা। তোর ও রাম ফলের পেছনে এখনও পুলিশ লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যাস্‌না কেন তুই, তোর নিস্তার নাই। তোর হৃদয় দিন দিন সাহস হারাইতেছে। কোন দিন তুই কি করিবি কিছুই জানিনা। আমার কথা শোন্‌, রামফল দেশে চলিয়া গিয়াছে, তুই আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল্‌। সেখানে বড়বাজারে আমার আয়ি থাকে, সেখানে দুজনে বেশ্‌ থাকিব।''

নুরী কিছুক্ষণ ভাবিল, পরে ধীরে উত্তর করিল, ''আচ্ছা! যখন তোর কথা শুনিয়া এত দূর করিয়াছি তখন শেষও তোর কথা মতে চলিব। যা থাকে অদৃষ্টে! কিন্তু দেখ শিউরাজ, টাকাগুলি কিন্তু আমার কাছে থাকিবে। তোকে আমার অধীন হইয়া চলিতে হইবে।''

শিউরাজ বলিল—''টাকা তোর কাছে থাকিয়া কি হইবে? মেয়ে মানুষের কাছে অত টাকা থাকিলে লোকে সন্দেহ করিবে। টাকা এখনও আমার কাছে, তখনও আমার কাছে। যা বলি নুরী, কেবল তোর ভালর জন্যে। আমার কথা শুনিস, আমার কথায় অমত করিলেই তুই টুস্‌ করিয়া মারা পড়িবি।''

টাকার বন্দোবস্তে নুরী কিছু বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল—''না-না-তা হইবেনা। আমি এত কষ্ট করিলাম, অতবড় একটা দুষ্কর্ম করিলাম, কিন্তু তার ফলভোগী তুই কেন হইবি? আমি যদি টাকা জোগাড় করিতে পারি, তবে তাহা কি রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই? টাকা কড়ি আমার আমার কাছে দে। তোর উপর আমার সন্দেহ হইতেছে।''

''মর পাজি মাগি? তোর কি কিছু বুদ্ধি নাই? যদি অমনতর ব্যবহার করিস, তবে এখনই তোকে পুলিসে ধরাইয়া দিব।''—

''পুলিশে ধরাইয়া দিব'' কথাটায় নুরী বড় জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু স্বর উঁচু করিয়া বলিল, ''বটে! বটে! বুঝি সেই মতলব আঁটিয়া টাকা গুলি হাত করিয়া বসিয়াছ! খুনে! দাগাবাজ! তোমায় ধরাইয়া দিতে কতক্ষণ! পুলিসের চক্ষে ত আমি খালাস। তোর সেই জুতা এখনও আমার হাতে, সেই বাড়ীর সেই আলমারির নীচে লুকান আছে। পাজি বেইমান্‌ যদি কিছু বাড়াবাড়ি করিস, আমার টাকা না দিস্‌, তবে এখনি তোকে ধরাইয়া দিব।''

এমন সময়ে আমি কপট নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মনে মনে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। এত দিন যাহার জন্য ঘুরিয়াছি, আজ তাহার অনুসন্ধান হইল, এই ভাবিয়া আমার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। কিন্তু তখন আনন্দ করিবার সময় নহে। কি করিলে ইহাদের আয়ত্ত করা যায় তাহার উপায় ভাবিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া তাহারা দুজনেই কথা বন্ধ করিল। একেবারে চুপ—একেবারে মুখের আশ্চর্য্য ভাব পরিবর্ত্তন, যেন কোন কিছুই ঘটে নাই। আমি তাহাদের এই চাতুরী দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম।

গাড়ি গিধোড় ছাড়াইল। নওয়াদিতে আসিল। নওয়াদিতে নামিয়া বৈদ্যনাথে একখানা টেলিগ্রাম করিলাম—''যেন ষ্টেসনে—প্লাটফরমে—চারিজন পুলিস প্রহরী প্রস্তুত থাকে''।

কিন্তু গাড়িতে উঠিয়া দেখি সর্ব্বনাশ! তাহারা দুইজনেই নামিয়া গিয়াছে। আমার সকল আনন্দ তখনই ঘোর নিরানন্দে পরিণত হইল। কেন টেলিগ্রাম করিতে নামিয়াছিলাম ভাবিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। নিজের বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করিলাম ভাবিয়া বড়ই আপশোষ হইল।

আমি বিদ্যুৎ গতিতে সকল গাড়িগুলি দেখিলাম। শেষ দেখি, এক খানি মেয়ে গাড়িতে নুরী উঠিয়া বসিয়াছে, ও তাহার পাশের গাড়িতে সেই শিউরাজ! এবারে আমি খুব সাবধানে তাহাদের সঙ্গ লইলাম। তাহারা আমায় আর দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি তাহাদের সব দেখিতে লাগিলাম।

গাড়ি যখন বৈদ্যনাথে আসিল, তখন সকাল হইয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস বড়ই মধুর ভাবে বহিতেছে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছি, প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ বায়ু কাজেই বড় ভাল লাগিল।

প্লাটফরমে নামিয়াই দেখি, হেড কনষ্টেবল ৪ জন পাহারাওয়ালা লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি ষ্টেসন মাষ্টারের ঘরে গেলাম, তাহাকে আমার পুলিসের চিহ্ন দেখাইয়া বলিলাম, ''যতক্ষণ না আমার আসামী গ্রেপ্তার হয়, ততক্ষণ যেন গাড়ি না ছাড়ে।''

ষ্টেসন মাষ্টার, ষ্টেসনের পুলিশ ও আমার নিজের চারি জন পাহারাওয়ালা লইয়া, আমি সেই জানানা গাড়ির নিকটে গেলাম। নুরীকে বলিলাম, ''তুমি বাহিরে আইস?''

শিউরাজ ও নুরী সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিল। আমার তখন আর দাড়িও নাই সে চস্‌মাও নাই। নুরী আমায় চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল।

দেখিলাম—শিউরাজ এই অবসরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি বলিলাম—''খবরদার''—সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কনষ্টেবলদের বলিলাম, ''ইহাদেব হাতকড়ি লাগাও'' তাহা হইল।

ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য। সকলেই হাঁ করিয়া এই দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি তাহাদিগকে গাড়ি করিয়া পুলিস ষ্টেসনে পাঠাইয়া দিলাম।

শেষ

আদালতে মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গ হয়ত তাহার কি ফল হইল তাহা জানিতে উৎসুক। নুরী ও শিউরাজ উভয়ের মধ্যে কে দোষী তাহাও জানিতে তাঁহারা কৌতূহলী। আমি নীচে নুরীর আদালতের জবানবন্দীর খানিকটা তুলিয়া দিলাম।

''আমি স্বীকার করিতেছি, আমি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রভুকে হত্যা করিবার পাপে লিপ্ত। শিউরাজ আমার দেশের লোক, সম্বন্ধে ভগিনী পতি। তাহার প্রলোভনে পড়িয়া আমি আমার প্রভুকে হত্যা করিবার জন্য সহায়তা করিয়াছি। শিউরাজ প্রথম বারে নিজের হাতে তাঁহাকে হত্যা করিতে যায়, আমি দিই নাই; তারপর দ্বিতীয় বারে তাহার উত্তেজনাতে আমি নিজ হস্তে প্রভুহত্যা করিয়া তাঁহার আলমারির চোরা কুঠরী হইতে নগদ সাতশত টাকা অপহরণ করিয়াছি। আদালতের বিচারে আমার ফাঁসী হয়, এই প্রার্থনা।''

নুরী ও শিউরাজের ফাঁসী হইলনা বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইল।

জাল ডিটেকটিভ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চাকরির উপর আজীবনকাল আমার ঘৃণা। বাবা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া আমায় কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; অনেক টাকা মূল্যে কয়েকখানা মূল্যহীন সার্টিফিকেট ক্রয় করা গিয়াছিল; আমি বি.এ.। বাবার ইচ্ছা আমি ডিপুটি ম্যাজিস্টরি পরীক্ষা দিয়া মফস্বলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসি। ডেপুটিগিরির সুখ আমার জানা ছিল; এক দিকে জেলার ম্যাজিস্ট্রর, অন্যদিকে সেসন জজ, এই দুই নৌকায় পা দিয়া অনেক ডেপুটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে; শ্যাম ও কুল এ উভয়ই মধ্যে মধ্যে অরক্ষণীয় হয়। বি. এল. পাশ করিয়া মুনসেফি লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার ততদূর উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল না।...ওকালতির ঝঞ্ঝাট অনেক। আমি স্থির করিলাম, যাহাতে স্বাধীনতা আছে, সেই বকম কোন কাজে লিপ্ত হইব; ''বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—'' আমি লক্ষ্মী লাভের আশায় বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিলাম।

বাবা তখন খাণ্ডোয়ায় তুলার কারবার করিতেন। কারবারে বেশ লাভ ছিল। আমি খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম: বোম্বের প্রসিদ্ধ গুজরাটি বণিক মানিকচাঁদ রতনচাঁদের সঙ্গে ভাগে সেখানে একটা 'এজেন্সি' খুলিবার সংকল্প ছিল।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। রাত্রি নটার পর মেলট্রেনে আমি একটা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ধূম্র উদ্‌গীরণ করিতে করিতে শত দীপ দীপ্ত বক্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটিয়া চলিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে আমি গ্ল্যাড়স্টোন ব্যাগটায় ঠেস দিয়া সেই প্রভাতের একখানি প্রয়াগী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের নেটিভদের প্রতি যে একটু ঘৃণা মিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা উপেক্ষনীয় হইলেও, তাহার সহিত পরিচয় রাখা অকর্তব্য নহে।

দেখিলাম, গাড়িতে আর দুইজন আরোহী রহিয়াছেন, দুইজনই মারাঠা যুবক; একজনের পাগড়িটা গদির উপর পড়িয়া আছে; মাথার চারিদিকে সমান করিয়া কামানো, টিকিটা গোছা করা মস্ত লম্বা, চীনেদের মতো বেনী পাকানো নয়; বৃহৎ চন্দন চিহ্ন তখনও কপাল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; গায়ে একটা লম্বা কোট। যুবক একবার মুখ তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন; নীল চশমার সোনার ফ্রেম উজ্জ্বল গ্যাসালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি পূর্ববৎ বাহিরের 'চন্দ্রমাশালিনী যা মধু যামিনীর' দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর একজন যুবক সাহেবি পোশাক পরা; তিনি নিবিষ্টচিত্তে

একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো মোটা একটা বিকটাকার চুরুট জ্বলিয়া জ্বলিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণপূর্বক সাহেবের সংবাদপত্রে মনঃসংযোগের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

লোক দুইজন আমার সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। আমি বাঙালি মানুষ; গাড়িতে নতুন লোক দেখিলেই ফস করিয়া বলিয়া ফেলি, ''মশায়ের কোথায় যাওয়া হইবে?'' নিবাস এবং বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অনেক দিন 'আউট অব ফ্যাশন' হইয়া গিয়াছে; 'এটিকেট্' আইন জারি হইয়া নিবাস ও বাপের নাম প্রভৃতি অনেক শ্লীল জিনিস অশ্লীলের মতো পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপে, যাহাদের গৃহ এবং পিতার নাম উভয়েরই অভাব আছে, তাহাদের কাছে এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্লীল কৌতূহল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সাহেব হইয়াছি!

সুতরাং আমি চুপ করিয়া কাগজই পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে, যে যুবকটি কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি তাঁহার কাগজখানা হাতে লইয়া উঠিয়া আসিলেন; ইংরাজিতে বলিলেন, ''মশায় আমায় এস্‌কিউজ করিবেন; আপনার কাগজখানা বোধ করি পড়া হইয়াছে; আমরা পরস্পর কাগজ বদলাইতে পারি কি?''

আমি হাসিয়া বলিলাম ''অনায়াসে''—মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার Bombay Herald নামক সংবাদপত্র আমার হাতে আসিল, আমার প্রয়াগী কাগজ লইয়া তিনি স্বস্থানে গিয়া বসিলেন।

কাগজখানা হাতে লইয়াই দেখিলাম এক কোণে একটা নীল পেনসিল দিয়া ইংরাজিতে লেখা আছে, আমি বোম্বের একজন ডিটেকটিভ; আমাদের অন্য সহযাত্রীটি বিট্টলরাও খারে। আপনি জানেন খারে কে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বোম্বে ওয়ারেন্ট রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার পূর্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে; বরহাউপুরের 'রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে' এ সকল কথা হইবে।''

বিট্টলরাও খারে। বোম্বের প্রসিদ্ধ জহরত ব্যবসায়ী সাপুরজি জাহাঙ্গীরজির দোকান হইতে বিশ হাজার টাকা দামের একখানি হীরক যে চুরি করিয়াছে? চুরি, বাটপাড়িতে বোম্বে অঞ্চলে সে সময় কেহই বিট্টলরাওর সমকক্ষ ছিল না। আমার সঙ্গেও কিছু টাকাকড়ি ছিল; ভাবিলাম আচ্ছা বদমাইশের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠা গিয়াছে। মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইল, কাগজে মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না।

দুই একবার বক্রদৃষ্টিতে বিট্টলরাওর দিকে চাহিলাম। প্রায় একমাস হইতে সে সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ডিটেকটিভ ঘুরিতেছে, হয় তো সে তাহার কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার চক্ষে চশমা, মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে তাহার কথা লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল; এমন কি আমি যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিনও Bombay Herald-এ তাহার সম্বন্ধে একটা প্যারা দেখিলাম; পুলিশের কর্তব্য কার্যে শিথিলতা দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ট্রেন্ স্টেশনে পঁহুছিল; পাঁচ মিনিট এখানে গাড়ি থামিবে। এখানে রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে না জানি কি দায়িত্বভার ঘাড়ে পড়িবে! আমি ভারি চঞ্চল হইলাম। গাড়ি প্লাটফর্মে দাঁড়াইতেই সেই Bombay Herald-খানা পকেটে ফেলিয়া আমি ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম; অনতিবিলম্বে ডিটেকটিভ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ডিটেকটিভ যুবক অতি নিম্নস্বরে বলিলেন, ''খুব সাবধান। যাহাতে আসামির সন্দেহ হয়, এমন কোন ব্যবহার করিবেন না। এখন পলাইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে।

ভুসাওয়াল স্টেশনে বোধ হয় তাহার কোন বন্ধু আসিয়া জুটিবে; সে জব্বলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে খবর পাইয়াছি।''

''তাহা হইলে এখন কি করা কর্তব্য?'' আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

''বদমাইশের দল বৃদ্ধি হইবার আগেই তাহাকে আটক করা দরকার; ট্রেনে উঠিয়াই ইহাকে বাঁধিয়া বেঞ্চির নীচে ফেলিয়া রাখা যাইবে। তাহার পর ভুসাওয়ালে যদি তাহার কোন বন্ধু আসে, তাহার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক হইলে তাহাকেও 'এরেস্ট' করিবার ব্যবস্থা করিব। আমি জানিনা, বামাল কাহার কাছে আছে। এই বামালের জন্যই আমাদের অধিক চেষ্টা।'' আমি বললাম ''যদি এ গাড়িতে অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে, তাহা হইলে তো আমাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।''

ডিটেকটিভ উত্তর দিলেন, ''এ গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর সময় নাই, আমি চামড়ার একটা স্ট্র্যাপ কিনিয়া লই, বাঁধিতে দরকার হইবে; লোকটা ভারি জওয়ান। দরকার হইলে সাহায্য করিবেন।''

আমি হাসিয়া বলিলাম ''অবশ্য''। ব্যাপারটা ক্রমে রোমান্টিক হইয়া উঠিতেছিল; এ যে আস্ত একখানা উপন্যাস!

ট্রেন ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল। আমরা প্লাটফর্মে বাহির হইয়া আসিলাম; গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম ''ট্রেন ভুসাওয়ালে ক'টার সময় পৌঁছিবে?''

গার্ড বলিল, ''বারোটা পাঁচ মিনিট।'' বুঝিলাম নিশীথ রাত্রে, এই দ্রুতগামী মেল ট্রেনের মধ্যে উপন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

বিট্ঠলরাও প্লাটফর্মে পদচারণা করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার সময় গাড়িতে লাফাইয়া উঠিল। ডিটেকটিভ ও আমি উভয়ে তাড়াতাড়ি একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। আমার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল; এখনি একটা ছোটখাট যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। আমি ভালো করিয়া বিট্ঠলরাওর সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম; জোয়ানটি বড় কম নয়। ডিটেকটিভ লোকটা ক্ষীণকায়, আমিও তথৈবচ, দুজনে তাহাকে পারিয়া উঠা দুষ্কর।

ট্রেন ছোট ছোট গোটা দুই তিন স্টেশন পার হইয়া গেল। ডিটেকটিভ একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর জানালার কাছে আসিয়া এক লাফে বিট্ঠলরাওর উপর পড়িলেন; তাঁহার দুই হস্ত বিট্ঠলরাওর উভয় স্কন্ধে এবং তাঁহার জানুদ্বয় বিট্ঠলরাওর বক্ষের উপর চাপাইয়া দিলেন। বিট্ঠলরাও তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটে ফেলিবে, এমন সময় ডিটেকটিভ আমাকে বলিলেন—

''শিগ্‌গির আসুন, রাসকেলের হাত দুখানা আটকাইয়া ফেলুন।''

আমি মুহূর্ত মধ্যে দৃঢ়বলে তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে ডিটেকটিভ মহাশয় পকেট হইতে আর একখানা রুমাল বাহির করিয়া বিট্ঠলরাওর মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন, রুমালে অত্যন্ত উগ্র ক্লোরোফর্মের গন্ধ। বিট্ঠলরাও প্রায় এক মিনিট কাল আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল; তাহার পর ক্লোরোফর্মে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডিটেকটিভ বলিলেন, ''নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইয়াছে। আপনি ঠিক সময়ে আমাকে সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই ও পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত। জানালা খুলুন, শীঘ্র খুলুন, নতুবা ক্লোরোফর্মের গন্ধে আমরা আবার এখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িব।''

তাই তো; আমার মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিয়াছিল; উৎসাহ ও উত্তেজনায় এতক্ষণ এ কথা মনেই ছিল না। আমি এক লাফে গাড়ির জানালা দরজা খুলিয়া দিলাম। গাড়ির

মধ্যে নৈশ বায়ুর অবাধ প্রবাহ আরম্ভ হইল।

ডিটেকটিভ বলিলেন, ''আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, চিরদিন তাহা মনে থাকিবে; আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার উর্ধতন কর্মচারির নিকট আপনার এই সহায়তার উল্লেখ করিতে পারি।''

আমি আমার নাম বলিয়া বলিলাম, ''যদি আপনার কিছু কাজ করিয়া থাকি, সে কথা লইয়া আন্দোলন না করাই আমার কাছে ভালো বোধ হয়।''

ডিটেকটিভ অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন; বলিলেন, ''আমাদের তস্কর বন্ধুকে আর এ ভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সম্ভব নয়; আসুন ধরাধরি করিয়া ইহাকে বেঞ্চির পাশে নামাইয়া রাখা যাক।''

বিট্টলরাও তখনও অজ্ঞান; তাহাকে নীচে নামাইয়া ফেলিলাম; ডিটেকটিভ তাঁহার কালো ব্যাগটা তাহার মাথার নীচে বালিশের মতো স্থাপন করিলেন। গাড়ির বাহির হইতে যাহাতে সহসা কাহারও তাহার প্রতি নজর না পড়ে, এজন্য একখানা কম্বল টাঙ্গাইয়া তাহাকে আমরা আড়াল করিয়া রাখিলাম।

আমি বলিলাম, ''চেতনা পাইলেই রাসকেল চেঁচাইতে আরম্ভ করিবে।'' ডিটেকটিভ হাসিয়া বলিলেন, ''তাহারও ব্যবস্থা হইবে, আমি উহার মুখ বাঁধিয়া দিতেছি। আপনার কোন ভয় নাই।''

রাত্রি বারোটার পর ট্রেন ভুসাওয়াল স্টেশনে পৌঁছিল। দেখিলাম প্লাটফর্মে সকলের আগে একজন মধ্যবয়স্ক মারাঠা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে; ভারি জোয়ান, গালপাট্টা, চোখ দুটো গোলাকার, দুটি ভাঁটার মতো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, সোনালি আঁচলাটা স্টেশনের তীব্র আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

চক্ষুর নিমিষে আমার দিকে চাহিয়া ডিটেকটিভ মহাশয় বলিলেন, ''এ সেই, বিট্টলরাও যাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। আপনি গাড়ির মধ্যে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এ কামরা গার্ডকে বলিয়া রিজার্ভ করিয়া লইতেছি; এ লোকটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।''

ডিটেকটিভ নামিয়া গেলেন। চোরের সঙ্গে একাকী গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। তাহার মুখটি বাঁধা বটে, কিন্তু যে রকম টানিয়া টানিয়া সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাতে তাহার শীঘ্রই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রথম ঘন্টা পড়িল; আমি ডিটেকটিভকে দেখিবার জন্য প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম; গার্ডের গাড়ির কাছে গিয়া তাঁহাকে পাইলাম না; এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিলাম, লোকটার কোন খোঁজ পাইলাম না। ঠং ঠং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল, গার্ড বাঁশিতে ফুঁ দিল; আমি দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ দেখি নাই, সেই জমকালো পাগড়িওয়ালা জোয়ান লোকটা এই গাড়িতেই উঠিয়াছিল। কি সর্বনাশ! সে এক লাফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; আমার মুখের উপর একটা পাঁচনলা পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, ''স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।''

আমার ডিটেকটিভ বন্ধু গাড়িতে নাই; আমি নিরস্ত্র একা, সম্মুখে এই দুর্জয় জোয়ান সশস্ত্র, পাশে অর্ধচেতন বিট্টলরাও। মেলট্রেন নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম আর রক্ষা নাই; সমস্ত গাড়িখানা আমার চক্ষুর উপর ঘুরিতে লাগিল; নত মস্তকে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া কেহ

এ পর্যন্ত বোধ করি এমন বিপদে পড়ে নাই। বিধাতার বিড়ম্বনা।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আগন্তুক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, ''বৃথা চিন্তা; নিজে যে ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহারই মধ্যে পা পড়িয়াছে। এখন আমি যাহা বলি শুন, অন্যথা করিলে মাথার খুলি এক গুলিতে উড়াইয়া দিব। আমার বন্ধুর মাথার দিকটা ধর, তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। পলায়নের চেষ্টা করিও না।''

আমি জড়ের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিলাম। বিট্ঠলরাওর চৈতন্যোদয় হইল; সে শুইয়া শুইয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, ''কেমন আপাজি, বেশ সুস্থ হইয়াছ তো?''

আপাজি কি বিট্ঠলরাওর আর এক নাম? আপাজি উত্তর করিল, ''কে ভাস্কর? তুমি আসিয়াছ, বদ্মায়েসেরা কি ভাগিয়াছে?''

''না একজন জালে পড়িয়াছে, আর একজন সরিয়াছে।''

আপাজি উঠিয়া বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, ''কিরূপে পলাইল? পলাইবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে অনেক আগে লোকজন সঙ্গে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম।''

ভাস্কর বলিল, ''আমি প্রথমে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াছিলাম; সহজেই বুঝিয়াছিলাম, বদ্মাশ বিট্ঠলরাও তোমার উপর কোন রকম কৌশল খাটাইয়াছে! শেষে আমি যখন এই গাড়িতে তোমার অবস্থা দেখিলাম, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আসামি কিরূপ সরিয়া পড়িল বুঝিলাম না; তাহার সঙ্গী গাড়ি ছাড়িবার সময় আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে।''

আমার কপালে ঘর্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। আপাজি কি বিট্ঠলরাও নহে? ইহাদের কথার কোন মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম; বুঝিলাম ভিতরে একটা ভয়ানক রহস্য লুকানো রহিয়াছে।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। আমি আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, ''মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, আমি কি একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছি। আপনারা কে?''

ভাস্কর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, ''আমরা যে কেই, সে খোঁজে আবশ্যক? তোমার ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তোমার নাম কি?''

অন্য সময় হইলে হয় তো এরূপ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। কিন্তু তখন এ অপমানও পকেটস্থ করাই সঙ্গত বোধ হইল। আমি নাম ও নিজের ব্যবসায়ের পরিচয় দিলাম।

ভাস্কর বলিল, ''ও তো গেল নকল পরিচয়, আসল পরিচয় দাও। দেখিতেছি তো বাঙালি, বিট্ঠলরাওর সঙ্গে কতদিন জুটিয়াছ? অনেক বাঙালি আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া কেবল নিজের মুখে কালি লেপিয়া বেড়ায়, তুমিও তাহাদের একজন। চোরা মাল কোথায়?''

এবার আমার বড় রাগ হইল; বলিলাম, ''তোমাদের এই রকম অভদ্র আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে জুতা মারিয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের কাছে চোরা মালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই লজ্জা হইয়া থাকে।''

আপাজি বলিল, ''ভদ্রলোককে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয় না?''— আপাজির স্বর গম্ভীর।

আমি বলিলাম, ''সে ক্লোরোফর্ম আমি দিই নাই, ডিটেকটিভ দিয়াছিল। বদমাশকে বাঁধিবার জন্য আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র; আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেই এরূপ কাজ করিতেন।''

''ডিটেকটিভ? কোন্ ডিটেকটিভ?''

''আমার সহযাত্রী বন্ধু, যিনি জব্বলপুর হইতে আসিতেছিলেন।''

আমি বলিলাম, ''হাঁ, তুমি যাহাকে আপাজি বলিতেছ, ডিটেকটিভ আমাকে বলিয়াছে সে স্বয়ং বিট্ঠলরাও; তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডিটেকটিভ আমার সাহায্য লইয়াছিল; এখন তাহাকে পলাইতে দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে।''

আপাজি বলিল, ''জাল ডিটেকটিভ! সে নিজেই বিট্ঠলরাও। আমি তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার সঙ্গ লইয়াছি; চোরা মাল তাহার সঙ্গে আছে জানি। পথের মধ্যে একা গোলযোগ করিলে তাহা হাতছাড়া হইতে পারে বলিয়া আমি ভাস্করকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে তোমার প্রিয় বন্ধু বোধকরি তাহা বুঝিয়া এই রকম করিয়া আমাদের চোখে ধুলা দিয়া পলাইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে তুমি প্রকৃত ব্যবসায়ী, জাল ডিটেকটিভ সহচর নও।''

জাল ডিটেকটিভের স্বহস্তে নোট করা সেই Bombay Herald তখনও আমার পকেটে ছিল; আমি তাহা বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সেই নোট দেখাইলাম।

আপাজি বলিল, ''এ যথেষ্ট প্রমাণ নহে; তোমার নির্দোষিতার সন্তোষজনক প্রমাণ না দেখাইলে অব্যাহতি লাভের আশা নাই। তোমার ব্যাগ খোল।''

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিতে গেলাম। উঠিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া তুলিয়াই তাহা নীচে ফেলিয়া দিলাম—আমি বসিয়া পড়িলাম!

আমার সর্বনাশ হইয়াছে! আমার ব্যাগটা জাল ডিটেকটিভ হাতে করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল!

আপাজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, ''একবার প্রতারণা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমাদের চোখে ধূলি দেওয়া অসম্ভব।''

আমি বলিলাম, ''এ ব্যাগ আমার নহে, জাল ডিটেকটিভের। আমার ব্যাগটা সে কখন লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে দেখি নাই; আমার পাঁচ হাজার টাকা গিয়াছে।''

আপাজি বলিল, ''এ বিট্ঠলরাওর ব্যাগ! —দেখি'' —সে তৎক্ষণাৎ একটা রিং সন্নিবদ্ধ এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া তাহার একটা দিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি কাগজপত্র উলটাইতেই সেই চোরা হীরকখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গ্যাসালোকরশ্মি নিপতিত হইয়া আমার ভীতিবিস্ময়সমাকুল চক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

ব্যাগ বদলানোটা বিট্ঠলরাওর জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বে আসিলে আমাকে লইয়া পুলিশে একবার টানাটানি করিয়াছিল। সহজেই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হইল; বিচারক আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অশেষ দোষারোপ করিয়া আমায় মুক্তিদান করিলেন।

তাহার পর বিট্ঠলরাওর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাসময়ে সাপুরজি জাহাঙ্গীরজি তাঁহার হীরক ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ হাজার টাকা খোয়াইয়া আমার কেবল কাদা মাখাই সার হইল।

বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিকেলবেলা দল বেঁধে সবাই বেড়াতে বেরিয়েছিল। ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।

চওড়া দরদালানে পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, তারই আলোয় বসে শৌখিন কাঁথায় পদ্মফুল তুলছেন বিন্দিপিসি। এ তাঁর একটা শখ। জীবনের একমাত্র শখই বলা চলে। একবছর দু'বছর ধরে একখানা কাঁথা সেলাই করেন, তারপর সেখানা দিয়ে দেন কোনও আপনারজনকে। যে পায়, সে ভাগ্য বলে মানে। কাঁথা তো কাঁথা, কাশ্মিরি শাল হার মেনে যায়।

আপনারজনের ভিতর এই ভাইপো-ভাইঝি ক'টি। ওঁর তিনটি ভাই—ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের শহরে বাস। বিন্দিপিসিরও ছেলেবেলা শহরে কেটেছে। লেখাপড়া সেখানেই শিখেছিলেন, তারপর বয়স একটু বাড়তেই, কী যে তাঁর হল, শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ের এই পৈতৃক বাড়িতে এসে আস্তানা গাড়লেন।

বে' থা' আর করেননি বিন্দিপিসি। গাঁয়ের লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে খুব সহজভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বয়স তাঁর পঞ্চাশ পেরোয়নি, জীবনের হয়তো অনেকটাই বাকি এখনও। স্বাস্থ্য তাঁর অটুট, সহসা মরবার সম্ভাবনা কম।

এ-বাড়িতে বিন্দিপিসি বাস করেন দু'টো চাকর আর দু'টো ঝি নিয়ে। একটি ঝিকে ঝি বলা ঠিক হবে না হয় তো। ভদ্রঘরের মেয়ে, দু'বেলা রান্না করা ছাড়া আর একটি মাত্র কাজ তাকে করতে হয়; সেটি হচ্ছে—রোজ সন্ধেবেলায় সারা গাঁয়ের নতুন খবরগুলো বিন্দিপিসিকে সবিস্তারে শোনানো।

খবর শোনবার জন্য অসীম আগ্রহ বিন্দিপিসির। খাবার সময় তরকারি এক ভাগ কম হলে তিনি তেমন ক্ষুণ্ণ হন না, কিন্তু কোনও দিন সুহাস যদি এসে বলে—''আজ তো আর তেমন কিছু শুনতে পেলুম না পিসিমা—তাহলে তাঁর মন মেজাজ সব বিগড়ে যায়, খেতে-শুতে কিছুতেই আর সোয়াস্তি পান না।

কাঁথাসেলাই যেমন তাঁর একমাত্র শখ, খবর শোনা তেমনি তাঁর একমাত্র কাজ।

আর এক মজা—যা শোনেন তা তিনি কখনও ভোলেন না।

এবারকার এই পুজোর মরশুমে ভাইপো-ভাইঝিরা সবাই এসে জুটতে পারেনি। অনীশ কানাডা গেছে, নীলা জাপানে। দেশে থাকলে পিসিমার বাড়িতে পুজোর সময়টা দু'দিনের

জন্যও আসবে না, এমন ভাইপো-ভাইঝি বিন্দিপিসির একটিও নেই। সবাই ওরা দারুণ ভালোবাসে ওঁকে।

বেড়িয়ে এসেই একে একে ধপাস্ করে বসে পড়ল ওরা—বিন্দিপিসির সামনে। সুহাস তৈরি ছিল, এক-এক পোয়ালা গরম চা আর এক-এক প্লেট নিমকি কচুরি তখনই ধরে দিল প্রত্যেকের সামনে।

"এ তো হল! কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত এখন সময় কাটে কি করে?" —অজয় জিজ্ঞাসা করে রেবাকে।

"আমি কিন্তু আজ আর গান গাইতে পারবো না" —আগে থাকতেই সাবধান হয় রেবা—"গলা আমার ধরে আছে।"

"দু-একটা গল্প-টল্প হোক না!" —প্রস্তাব করে সমীর। সে লেখক মানুষ; যে-কেউ যে-কোনও গল্প করুক, ও তা থেকে প্লট পেয়ে যাবে একটা।

"তা বলে ভূতের গল্প নয়"—আগে থাকতে আপত্তি জানায় রেবা। সে নাম-করা অধ্যাপিকা। কিন্তু রাত্তিরে ভূতের নামে এখনও তার গা ছমছম করে।

এতক্ষণে বিন্দিপিসি কথা বলেন—"আমার বাড়িতে যখন তোরা এয়েছিস, তোদের সময় যাতে আনন্দে কাটে, আমারই তা দেখা দরকার। আমি বলি ভূতের গল্প বাদ দিয়ে অন্য গল্প হোক। সবাই তোরা দেশবিদেশে বেড়িয়েছিস, অনেক-কিছু তো দেখেছিস তোরা! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু বল কেউ—যার ভিতর চমক আছে, যা থেকে চিন্তার খোরাকও কিছু পাওয়া যায়।"

প্রস্তাবটা মনে ধরে সকলেরই।

তবে কেউই ঘাড় পাততে চায় না। অজয় বলে "শান্ত শুরু করুক," প্রশান্ত ইশারা করে রঞ্জনাকে। শেষপর্যন্ত সবাই এককাট্টা হয়ে রাঘবকেই ধরে পড়ল—"ওহে ডাক্তার, তুমিই এ-সংকটে উদ্ধার করো ভাই আমাদের।"

রাঘব একটুখানি ভেবে নিলে, তারপর বললে—"আমি রাজি আছি, কিন্তু এক শর্তে। গল্প শেষ করার আগে আমি একটা প্রশ্ন করব সবাইকে। নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রত্যেকেরই তার উত্তর দিতে হবে। সেই সব উত্তর শোনবার পরে গল্পটি শেষ করব আমি।"

অধ্যাপিকা রেবা যেন ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়ল—"জ্ঞানবুদ্ধিমতো উত্তর দিতে হবে? যার জ্ঞানবুদ্ধি কিচ্ছু নেই? যেমন আমি? সে কী করবে?"

রঞ্জনা সম্প্রতি পুলিশের ইনস্‌পেকট্রেস হয়েছে, এক ধমক লাগিয়ে দেয় রেবাকে—"জ্ঞানবুদ্ধি নেই, মানে কী? জ্ঞান যার নেই, তার অজ্ঞানতারই পরিচয় দিক সে। বুদ্ধি যার নেই, সে নির্বোধের মতোই জবাব দিক। ওগুলোও দরকার। ওতে প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যাক, মজা পাওয়া যাবে খানিকটা! রাঘবদা, শুরু করো তুমি।"

রাঘব শুরু করে—

"আমি সেবার ইন্দোনেশিয়া সরকারের চাকরি নিয়েছিলুম এক বছরের জন্য—জানি তো সবাই। আমায় দিলে মায়মানুতে। একেবারে সমুদ্রের উপরে। মহাযুদ্ধের সময় একেবারে ধ্বংস ও চুর হয়ে গিয়েছিল জাপানি বোমায়। এখন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

ছোট্ট একখানা বাড়িতে ডাক্তারখানা। ডাক্তারের থাকার জায়গা তার ভিতরে হয় না যাই কোথায়?

একটা ভালো হোটেল গড়েছে ওখানে এক চীনে কোম্পানি। আমি সেখানেই ঘর নিলুম একখানা। হোটেল অবশ্য স্থানীয় লোকদের জন্য নয়। তাদের হোটেলে থাকার দরকার নেই, পয়সাও নেই। হোটেলটা হয়েছে যারা বেড়াতে যায়, তাদের জন্য। মায়মানুর সমুদ্রতীরটি স্নানের পক্ষে আদর্শ জায়গা। মালয, জাভা, সুমাত্রা থেকেও শৌখিন লোকেরা সমুদ্রস্নানের জন্য মায়মানুতে আসে। একজন দু'মাস চার মাসও থাকে। হোটেল চলবে না কেন?

স্থায়ী বাসিন্দা আমি একাই।

বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। খাওয়ার জিনিসও বেশ মেলে। বেশ আনন্দেই আছি বলতে গেলে।

একদিন ডাক্তারখানার কাজ সেরে সবে হোটেলে আসছি। নীচের বড় হলটার এক পাশে ম্যানেজারের অফিস, আর এক পাশে উপরে ওঠবার সিঁড়ি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, হঠাৎ কানে এল—'ইয়েস, উই আর ফ্রম ক্যাল্‌কাটা।'

ক্যালকাটা? দাঁড়িয়ে পড়লুম সিঁড়িতে। স্নানার্থী যারা এখানে আসে তারা কাছাকাছি গুলোরই লোক। কলকাতা থেকে কেউ এসেছে—এমন তো এই ক'মাসে দেখিনি। স্নানের জন্যও নয়, নিছক বেড়ানোর জন্যও নয়। কলকাতার লোক তো নয়ই, আমার অত বড় ভারতবর্ষটার কোনও জায়গার কোনও লোককেই এখানে দেখিনি এ-যাবৎ।

'আমার নাম ভবতোষ রায়'—ইংরেজিতেই বলছে—ওদের একজন; চীনে-ম্যানেজার ইংরেজি বোঝে এবং বলতে পারে। না পারলে আমিও থাকতে পারতুম না এ-হোটেলে।

'আর আমার নাম রামতনু সেন'—বলছে আর একজন।

তাকিয়ে দেখলুম বই-কি! বাঙালি। কলকাতার লোক। থাকবে হয়তো কিছু দিন। বাংলা কথা বলতে পারব অনেক দিন পরে। আনন্দের কথা বই-কি!

দু'জনেই যুবক। মাথায় প্রায় সমান, রংও প্রায় একরকম শ্যামলা। সিঁড়ি থেকে মুখ একজনেরও ভালো করে দেখতে পেলুম না।

যাক—দেখব পরে। ওরা তো রইল এখন! আমার কাজ আছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুতে হবে। গাড়ি আসবে নিতে। ছ'মাইল দূরের মিলিটারি ছাউনিতে একটা কঠিন কেস আছে। ছাউনির ডাক্তার আমার পরামর্শ চান।

ছাউনি থেকে ফিরে আবার ডাক্তারখানায় বসতে হল, হোটেলে এলুম রাত্রে। নবাগত বাঙালিদের সঙ্গে আর তখন দেখা হল না। তবে ম্যানেজারের মুখ থেকে ওদের কিছু খবর পেলুম বটে। ভবতোষ রায়ই পয়সা-দেনেওয়ালা। রামতনু সেন তার সঙ্গী বা কর্মচারি বা বেতনভুক্ বন্ধু বা ওইরকম অন্য কিছু। পাশাপাশি দুটো ঘরই ওরা নিয়েছে বটে। কিন্তু একটা 'এ'ক্লাস ঘর, অন্যটা 'সি' ক্লাস।

হুঁ। আমারও মনে পড়ল—সিঁড়ি থেকে দেখবার সময় ওদের পোশাকেরও মূল্যগত তফাত আমার চোখে পড়েছিল।

রাত্রেও আলাপ হল না। যাক, কাল হবে।

সকালে আমার সময় হয় না, কোনও রকমে প্রাতরাশ সেরেই ডাক্তারখানায় ছুটতে হয়। ছুটি হয় লাঞ্চের মুখোমুখি, বারোটা নাগাদ।

কিন্তু সময় করে নিলুম সেদিন। বেলা দশটায় কাজের ভিড় একটু কম দেখে উঠে পড়লুম চট্ করে—'এক ঘণ্টা পরে ঘুরে আসছি' বলে হোটেলের দিকে পা বাড়ালুম, দেখি, লোক দুটোর সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি না! মনটা টানছে ওদের দিকে।

হোটেলে ঢুকতে যাব, এমন সময় চোখ পড়ল সমুদ্রের দিকে। অনেক লোকের ভিড়। কী হচ্ছে ওখানে? পায়ে পায়ে সেদিকেই এগুলুম।

ভিড়ের লোক আমায় দেখে ব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিলে। দেশি ভাষায় বলাবলি করলে—ডাক্তার এসে গেছে! ডাক্তার এসে গেছে! ডাক্তারকে দেখতে দাও!

আমি দেখতে পেয়েছি। জলের ধারেই বালির উপরে দুটো দেহ পড়ে আছে। জলে ডোবার ব্যাপার বোধ হয়।

ছুটেই কাছে এলুম। কী সর্বনাশ! সেই বাঙালি দুটি! দুজনই সাঁতারের পোশাক পরা, একজন সটান পড়ে আছে আর একজন ওঠবার চেষ্টা করছে।

যে সটান পড়ে আছে, তাকে পরীক্ষা করে দেখলুম। নাড়ি নেই, বুকের ধুকধুকুনি নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস যদি ফিরিয়ে আনা যায় চেষ্টা করে, তবেই বাঁচবে। তবে তার আশা...

আমি চেষ্টা শুরু করলুম।

অন্য লোকটি উঠে বসে আমার দিকে একবার চায়, অজ্ঞান দেহটার দিকে একবার চায়। আমি একজন লোককে ডেকে বললুম—'ভদ্রলোককে ধরাধরি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাও। ছোট ডাক্তারকে আমার নাম করে বলো—যাতে এঁকে বলকারক ইনজেকশন একটা দেওয়া হয়। আর গরম দুধ। কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখতে বলো।'

'আমার কাপড়—' বলে ভদ্রলোক।

যেখানটায় কাপড় ছেড়ে ওরা সমুদ্রে নেমেছিল—সে অনেকটা দূরে। কাপড় নিয়ে আসছে লোকেরা।

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি—নির্জীব মানুষটার জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য। আর তার সঙ্গী বিবর্ণ মুখে একবার তাকাচ্ছে আমার দিকে, আর একবার ওর দিকে।

শেষপর্যন্ত সে বলেই ফেলল ইংরেজিতে—'বাঁচবে কী?'

আমার কানে কট্ করে বাজল প্রশ্নের সুরটা।

লোকটা বাঁচলেই প্রশ্নকর্তার বিপদ যেন!

'আপনার নাম?' —বাংলাতে জিজ্ঞাসা করলুম।

সে চমকে উঠল —যেন ভূত দেখেছে! 'আপনি—আপনি —বাঙালি?'

'হ্যাঁ—বাঙালি আমি। আপনারাও বাঙালি—সেটা শুনেছি আমি। আপনি ভবতোষ বাবু? না, রামতনু বাবু?

উত্তর দিতে গিয়ে কি ঢোঁক গিল্‌ল লোকটা?—'আমার নাম ভবতোষ রায়—আর এর এর—রামতনু সেন। আমার—আমার কর্মচারি ও।'

ওদের কাপড় জামা এল। বাঙালি পোশাকেই স্নান করতে এসেছিল, দেখছি। আশ্চর্য! ভবতোষ কম দামের জামাটাই নিচ্ছে না?

সামলে নিল। 'মাথার ঠিক নেই' —বিড় বিড় করে বলে দামি সিল্কের শার্টটাই গায়ে দিলে। তারপর অন্যসব কাপড় বগলদাবা করে বললে—'ডাক্তারখানায় আর আমার যেতে হবে না বোধ হয়। আমি ভালোই বোধ করছি। ওর—রামতনুর কী হয়—না দেখে—'

'আর দেখবার কিছু নেই—' বলে আমি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। শত চেষ্টাতেও ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে এল না আর।

'অ্যাঁ? অ্যাঁ? বলেন কী?'—কঁকিয়ে উঠল ভবতোষ। কিন্তু আমার খামোকাই কেমন যেন মনে হল—রামতনু মরে যাওয়াতে দুঃখ তো ওর হয়নি, বরং যেন ও হাঁফ ছেড়ে

বেঁচেছে।

ব্যাপারটা শুনলাম—খানিকটা ভবতোষের মুখে, খানিকটা একজন জেলের মুখে। জেলেটা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছিল ওই দিকটাতেই। সেই জেলেই শেষপর্যন্ত ওদের ডিঙিতে তুলে নেয়।

সাঁতার দিচ্ছিল ভবতোষ, রামতনু দু'জনেই। ভবতোষ যাচ্ছিল আগে, রামতনু পিছনে। দূরে —আরও দূরে চলে যাচ্ছিল তারা—কূল থেকে বেশ-খানিকটা দূরে।

ভবতোষ বলে—রামতনু পিছন থেকে ডাকতে লাগল ফিরে আসবার জন্য। ভবতোষের আরও এগিয়ে যেতে সাধ হচ্ছিল। রামতনুকে সে ফিরে যেতে বলেছিল—'তুমি যদি হাঁফিয়ে গিয়ে থাক, ফিরে যাও। আমি পরে আসছি। এক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।'

রামতনু কিন্তু সে-কথা শোনেনি। এগিয়ে গিয়েছিল ভবতোষের দিকে।

ও কাছাকাছি আসতেই ভবতোষ কিন্তু দেখলে—ও হাঁফাচ্ছে। ভবতোষ এসে ধরল ওকে। ও কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে ধরল ভবতোষকে যে দুজনেই ডুবে যাবার দাখিল! অনেক কষ্টে ভবতোষ ওর হাত ছাড়াল, তারপর ওকে নিয়ে সাঁতার দিতে লাগল কূলের দিকে। কিন্তু ওর দম তখন শেষ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়, হাত-পা আর নড়ছিল না।

জেলেডিঙিটা এসে ওদের তুলে নিলে এই সময়। রামতনু তখন নিশ্চল, নিষ্প্রাণ।

জেলে লোকটাও মোটামুটি ওইরকম বলেছিল। তবে গোপনে সে আমায় একসময় বললে—'ডাক্তারসাহেব! জলের ভিতর দুজনের জড়াজড়ি আমিও দেখেছিলুম। দূর থেকে দেখা, ঠিক বুঝতে পারিনি হয় তো, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—রামতনুকে চেপে ধরেছিল জলের ভিতর, রামতনু ভবতোষকে জড়িয়ে ধরেনি।'

তার কথা আমি উড়িয়েই দিলুম। সে দূরে ছিল। জলের ভিতর কে কাকে জড়িয়ে ধরছে, কে কাকে চেপে ধরছে, তার ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? তার ভুল নিশ্চয়।

তারপর আর কি, পুলিশ এল। দেখেশুনে রিপোর্ট দিলে দুর্ঘটনা বলে। সমুদ্রে স্নান করতে এসে এমন তো কতই ডোবে।

ভবতোষের জবানবন্দি ছিল এই রকম—

সংসারে কেউ নেই, দেদার টাকা। দেশভ্রমণের ইচ্ছে হল।

একেবারে একা যাবে না। আধা-ভৃত্য, আধা-বন্ধুগোছের অল্প লেখাপড়াজানা কোনও ভদ্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে ওই রামতনু এল।

পাকিস্তানের ফরিদপুরে বাড়ি। পাকিস্তানের লোকের উপর একটু ওর পক্ষপাত আছে, কারণ তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা হলেও আদি বাস ছিল ওদের ময়মনসিংহে। কথায় একটু টান তাই এখনও আছে, যদিও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আজ পঞ্চাশ বছর থেকে নেই।

তা রামতনুকেই নেওয়া হল। লোক ভালো বলেই মনে হয়েছিল—কারণ পাকিস্তানে আগে দু-এক জায়গায় চাকরিবাকরি করেছে—সুপারিশ চিঠিপত্র ছিল।

ওকে বহাল করার মাসখানেক পরেই এই দিকপানে বেরিয়ে পড়ে। রেঙ্গুনে এসে মায়মানু জায়গাটির সুনাম শোনে। সাঁতারের ঝোঁক বরাবর আছে, সেই সাঁতারের নাকি খুব সুবিধে

মায়মানুতে।

এখানে আসতেই প্রথম দিনেই এই বিপদ।

ভবতোষ বড়ই যেন মুষড়ে পড়ল এই দুর্ঘটনায়! প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ চায়—ঘুম হয় না বলে।

সত্যকথা বলতে কি—আমার মনে একটুখানি সন্দেহই ছিল। এই বলে সন্দেহ ছিল যে জেলের কথাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। অর্থাৎ ভবতোষ জলের ভিতর চেপেই মেরেছে রামতনুকে। আমি যখন রামতনুর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলুম সেদিন, তখন ভবতোষের ভাব-ভঙ্গি ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। বিশেষ করে 'সে বাঁচবে কী' প্রশ্নটার সুর ছিল একান্ত বেসুরো।

জেলেটার সুমুখে তার কথা আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম বটে। কিন্তু মনে মনে তা নিয়ে আমি তোলপাড় করেছি অনেক।

তাই, ভবতোষ যখন ঘুম হয় না বলে ওষুধ চাইল, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম —'ঘুম না-হওয়ার কারণ হতে পারে বিবেকের দংশন।'

ভবতোষের মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে গেল—'আমার বিবেকের দংশন হতে যাবে কিসের জন্য? কী করেছি আমি?' —এই বলে সে পিছন ফিরে চলে গেল—ওষুধ আর নিলে না।

কয়েকদিন পরেই সে কলকাতায় ফিরল।

আমার কেবলই মনে হতে লাগল—একটা খুনি পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করবার ছিল না। প্রমাণ নেই। কিছুমাত্র প্রমাণ নেই যে ও রামতনুকে খুন করেছে।

দিন যায়। প্রায় ভুলেই গেছি ও কথা। এমন সময় কলকাতার খবরের কাগজের এক কোণে একটা ছোট্ট খবর দেখলুম একদিন! তোমরা কি কেউ দেখেছিলে সে-খবর? ভবতোষ রায়ের আত্মহত্যার খবর?"

নিশ্চুপ হয়ে এতক্ষণ সবাই গল্প শুনছিল—এইবার এক-এক জন করে মাথা নাড়তে শুরু করল—"না তো!" "মনে পড়ে না তো!" ইত্যাদি।

রাঘব বলতে লাগল আবার—

"গঙ্গায় সেদিন সাঁড়াসাঁড়ির বান। সেই বানের সময় দেখা গেল একপ্রস্থ দামি জামা-জুতো কাপড় গঙ্গার ঘাটে পড়ে আছে। জামার পকেটে একখানা চিঠি"—

> "অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে মরে যাচ্ছি আমি। মায়মানুর সমুদ্রে রামতনু সেনকে ডুবিয়ে মেরেছিলুম, সেই পাপে আমি জ্যান্তেই নরকের আগুনে পুড়ছি। প্রাণ না দিলে এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, বোধ হয়। হত্যার বদলে আত্মহত্যা। তাই আমি গঙ্গার জলে ডুবে মরছি আজ।"—
>
> —ভবতোষ রায়

"উঃ"—একসঙ্গে ছটা কণ্ঠ থেকে রব উঠল।

রেবা, রঞ্জনা, অজয়, প্রশান্ত, সমীর, অভিজিৎ একসঙ্গে সবাই "উঃ!" বলে উঠল।

বিন্দিপিসি একবার চোখ তুললেন কাঁথার সেলাই থেকে। সে-চোখে দুঃখের বা আফশোশের লেশ মাত্র নেই! বরং আছে একটুখানি চাপা কৌতুক।

"বাবা রাঘব! ভবতোষের দেহটা কি পাওয়া গেল? না, বানে ভেসে মায়মানুর সমুদ্রে গিয়ে পড়ল ওটা?" জিজ্ঞাসাটা বিন্দিপিসিরই।

সবাই হতবাক।

হতবাক হওয়ার কারণ তিনটে। প্রথমত বিন্দিপিসি যে গল্পটাতে কান রেখেছেন, এ কথাই কেউ ভাবেনি। সকলেরই ধারণা—তিনি একমনে কাঁথাই সেলাই করে চলেছেন। দ্বিতীয়ত এরকম একটা সঙ্গত প্রশ্ন একমাত্র তাঁর মাথাতেই এল, এবং অন্য কারও মাথাতে এল না। তৃতীয়ত, ওঁর প্রশ্নের ধরনটাই যেন বিদ্রূপে ভরা। গোটা জিনিসটাই যেন তাঁর কাছে একেবারে একটা নিছক ধাপ্পা!

যাই হোক, উত্তর দিলে রাঘব—"না, দেহটা পাওয়া যায়নি।"

"যাবে না জানতুম। বেশ, বলো গল্প"— বলে আবার সেলাইয়ে মন দিলেন বিন্দিপিসি। রাঘব বলে যায়—

"আর বেশি কিছু নেই গল্পের। পুলিশ তদন্ত হল। মায়মানু থেকে ফিরে ভবতোষ কোন এক হোটেলে থাকত। আত্মীয় তার কেউ ছিল না, বন্ধুদেরও বর্জন করেছিল। মোটা মোটা টাকা প্রায়ই ব্যাঙ্ক থেকে তুলত। ব্যাঙ্কের টাকা শেষ করে দিয়েছিল প্রায়।

কে রামতনু সেন, এদেশের লোকের মাথাব্যথা নেই তার জন্যে। সে পাকিস্তানি—মরেছে ইন্দোনেশিয়ায়। তার জন্যে ভারতীয় পুলিশের কী করবার আছে? আর ভবতোষ তো মরেই গেছে, তার যদি অপরাধ থেকেই থাকে- মরেই তো প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার!"

এই পর্যন্ত বলে রাঘব থামল।

"কী হল? থামলে যে?" প্রশ্ন ছ'জনের কণ্ঠ থেকে।

"এইবার আমার প্রশ্ন। প্রত্যেককেই উত্তর দিতে হবে নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো।

"এই সেরেছে!" —বলে ওঠে রেবা ভয়ে ভয়ে।

"বলো প্রশ্ন, শুনি!" —বঞ্জনা বলে ওঠে নির্ভয়ে।

"প্রশ্ন এই—ভবতোষ কেন হত্যা করেছিল রামতনুকে?"

"রামতনু টাকা চুরি করত নিশ্চয় ভবতোষের পকেট থেকে"—এ উত্তর রেবার।

"রামতনু ছিল পাকিস্তানের স্পাই, আর ভবতোষ দেশপ্রেমিক ভারতীয়। কাজেই, স্পাইয়ের প্রাণদণ্ড দিতেই পারে!" —এ উত্তর রঞ্জনার।

অজয়, প্রশান্ত, অভিজিৎ, সমীর—প্রত্যেকেই এক-একটা মত প্রকাশ করল। প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটার চাইতে উদ্ভট।

অবশেষে রাঘব বিন্দিপিসিকে বললে—"এবার তুমি বলো পিসিমা!"

বিন্দিপিসি চোখ তুলে চাইলেন, সে চোখ যেন হাসছে।

"কী বলব বাবা? তোমার প্রশ্নই যে ভুল! ভবতোষ কেন রামতনুকে হত্যা করবে? আগাগোড়া ভুল। খুন করেছিল রামতনু ভবতোষকে, ভবতোষ রামতনুকে মারেনি।"

সবাই বসেছিল, এক লাফে উঠে দাঁড়াল সবাই, শুধু রাঘব বাদে। "কী?" "অদ্ভুত!" "আজগুবি!" "পাগল!" ইত্যাদি মন্তব্য।

তাদের থামাল রাঘব।

"পিসিমাই ঠিক বলেছেন! রামতনু মরেনি মায়মানুতে, মরেছিল ভবতোষ। এবং গঙ্গার বানে কেউ ঝাঁপ দেয়নি, পোশাকটা গঙ্গার ঘাটে ফেলে অল্প একটু সাঁতরে গিয়ে আগে থেকে বন্দোবস্ত করা নৌকায় চড়ে বসেছিল ভবতোষবেশী রামতনু। সে-রামতনু এখন পাকিস্তানের ফরিদপুর শহরে বহাল তবিয়তে বড়মানুষি করছে। আমি দেখে এসেছি তাকে।"

"কী করে দেখলে?" ছ'জনের প্রশ্ন একসঙ্গে।

''দৈবাৎ ঢাকা যেতে হয়েছিল সরকারি কাজে। রামতনুর বাড়ি ফরিদপুর, এটা মনে ছিল। কী করতে যাচ্ছি, সে-সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা না নিয়েই চলে গেলুম ঢাকা থেকে ফরিদপুর। সেখানে আমার সহপাঠী আজিম সিভিল সার্জন। আমার গল্পটা শুনে সে বললে—'রামতনু নয়, তবে ইয়াকুব শেখ কলকাতায় গিয়েছিল লেংটি পরে, ফিরে এসেছে লক্ষপতি হয়ে, বছর তিনেকের ভিতর। তাকে তুমি দেখতে পারো।'

আজিমই দেখবার সুযোগ করে দিলে। ইয়াকুবকে নেমন্তন্ন করল চায়ে। আমি আড়াল থেকে দেখলুম। যাকে ভবতোষ বলে জানতুম মায়মানুতে, সেই বটে!

আজিমই পরামর্শ দিলে—এ নিয়ে হই-চই করে লাভ হবে না কিছু। রামতনু যে ভবতোষকে খুন করেছে, কিংবা ইয়াকুবই যে রামতনু—এর কোনটাই প্রমাণ করা সোজা হবে না। কারণ দেশ আলাদা, পুলিশ আলাদা। কাজেই আমি ফিরে এলুম কলকাতায়।''

তখন সবাই ধরে পড়ল বিন্দিপিসিকে —''তুমি বুড়োমানুষ, জম্মো কাটালে এই অজ পাড়াগাঁয়ে, এত সহজে এই কঠিন সমস্যার সমাধান তুমি কী করে করলে?''

মুচকি হেসে জবাব দেন বিন্দিপিসি—''এ তো সাধারণ কথা! ভবতোষ মনিব, বড়লোক। রামতনু চাকর, গরিব। রামতনুকে মেরে ভবতোষের লাভ কিছু নেই। ভবতোষকে মেরে রামতনুর লাভ হতেও পারে, যদি সে ভবতোষ বলে চালিয়ে দিতে পারে নিজেকে।''

পিসিমা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন—''মানুষের চরিত্র সব জায়গাতেই এক। আমার এই রাধিকেপুর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ কখন কী করছে—খবর রাখি আমি। হাতে তো কাঁথাসেলাই ছাড়া কোনও কাজ নেই। তাই ওই খবরাখবর নিয়েই থাকি। সুহাস সারা বিকেলটা বাড়ি বাড়ি ঘোরে, আমায় খবর এনে দেবার জন্য। ওর ওইটেই বড় কাজ। কাজেই লোকচরিত্র আমি খানিকটা জানি।''

সবাই কান খাড়া করে শুনছে পিসিমার কথা।

''এখন এই রাধিকেপুর গ্রামেই বছর পাঁচেক আগে ঘটনা ঘটেছিল একটা। হরিলাল ঘোষ হঠাৎ মরে গেল। কথা উঠল—বিষ খাওয়ানো হয়েছে। পুলিশ এল। মড়া কাটল। বিষ সত্যিই পাওয়া গেল। এখন কে বিষ দিলে? শত্তুর তো তার দুনিয়ায় কেউ ছিল না!''

''তবে?'' ––প্রশ্ন করে রঞ্জনা, পুলিশের ইন্‌সপেকট্রেস।

''সারা গ্রাম ওলটপালট। শেষকালে বেরুল খবর। দোয়ারি মণ্ডল নতুন গাইয়ের দুধ পাঠিয়েছিল —মনিবের পায়েস খাওয়ার জন্য। একটুখানি দুধ, একজনের বেশি দুজনের তাতে পায়েস খাওয়া চলে না। তাই একা হরি ঘোষই মরল, আর কেউ মরেনি।''

''কিন্তু কেন? দোয়ারির স্বার্থ কী?''

''হরি ঘোষের বিস্তর জমিবর্গা চাষ করত দোয়ারি। ছেলেটা নাবালক, বউটা বোকা। হরি মরলে জমির ধানগুলো পনেরো আনাই নিজের ঘরে তুলতে পারে, এই আর কি! চাইকি, জমিদারের ঘরে ঘুষঘাষ দিয়ে মালিকানাস্বত্বও পেয়ে যেতে পারে।''

একটু থেমে আবার বললেন—''এই যে লোভ, এ-লোভ রামতনুর থাকা সম্ভব ছিল, ভবতোষের নয়! কাজেই—''

ইন্‌সপেকট্রেস রঞ্জনা গড় হয়ে প্রণাম করলে পিসিমাকে।

* ফরিদপুর তখন পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়।

ডিটেকটিভ

সুকুমার রায়

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেকটিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলেও জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কী চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কী করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে, ''আপনারা একটুও সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি জানলার গায়ে এমনভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্‌ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।'' সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। বলল, ''ওই আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক্, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দু-চার যেতে দাও না।''

দু মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ইস্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরও দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, ''কি হে ডিটেকটিভ! এই বেলা যে তোমার চোর ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি

বলো দেখি?'' জলধর বলল, ''আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর করো না।'' তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, ইস্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে। কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি! পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন-ঘরের বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চিৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুলবাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, ''আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কী করে?'' কিন্তু পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, ''আর দুদিন সবুর কর, ওই নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।'' শুনে দাশু বলল, ''তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজিকে জিগ্গেস করো তো?'' সত্যিই আমাদের তো সে খেয়াল হয়নি! ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, ''আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোবকে না ধবা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে, কোনও পাকা ডিটেকটিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।''

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশদিন আর চুবি হয়নি। তখন জলধর বললে, ''তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেযে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।'' কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিন-খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, ''কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয যে ঘুচে গেল দেখছি।''

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা এমনি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পর সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন-ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কী করা

যাবে, সেবিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এল। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ওই কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ বলে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কী? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনও দিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত! রাক্ষসের মতো খানিকটা খেলেই বুঝি ষণ্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাত বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই করো। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ সমস্ত নেহাত যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল।---এ-সব তারই কাণ্ড!"

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁদিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই সাদা মতন কী একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলোবেড়াল---তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘত উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিগ্গেস করলাম, "কেমন হে ডিটেকটিভ! ওই ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?"

বাবা মুস্তাফার দাড়ি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিমল ও কুমার হচ্ছে নিছক 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র ভক্ত, সাধারণ গোয়েন্দাগিরি নিয়ে তারা কোনদিন মাথা ঘামাত না। কিন্তু গোয়েন্দার প্রধান প্রধান গুণ, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের দুজনেরই ছিল যথেষ্ট। এই-সব কারণে তারা মাঝে মাঝে খুব সহজেই এমন সব শক্ত মামলারও কিনারা করে ফেলতে পারত বড় বড় পেশাদার গোয়েন্দারাও যাদের মধ্যে তল খুঁজে পায়নি। এই রকমেরই একটি ঘটনার কথা আজ তোমাদের কাছে বলতে চাই।

''ড্রাগনের দুঃস্বপ্নে''র গল্প যাঁরা শুনেছেন, বিমল ও কুমারের সঙ্গে কি করে ইন্‌সপেকটার সুন্দরবাবুর প্রথম পরিচয় হয়, এরই মধ্যে তাঁরা নিশ্চযই তা ভুলে যাননি।

ওই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। বিমল ও কুমার একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে অকারণেই সুন্দরবাবুর থানায় গিয়ে হাজির হল।

একটা টেবিলের ধারে সুন্দরবাবু চিন্তিত মুখে মাথার টাকে হাত দিয়ে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে বললেন, ''এই যে, হুম্! একেবারে যুগলে উদয, ব্যাপার কি?''

কুমার হেসে বললে, ''কিছুই নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম আপনার সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করে যাই!''

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, ''আর গল্প করব! পোড়া অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? একটা বিচ্ছিরি মামলা নিয়ে মহা-ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেছি ভাই! তবু এসে যখন পড়েছেন, দু-কাপ চা খেয়ে যান!''

বিমল চেয়ার টেনে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''মামলাটা কি, শুনতে পাই না?''

সুন্দরবাবু বললেন, ''শুনে কোনই লাভ হবে না ভায়া, এ মামলার কিনারা করা অসম্ভব।''

—''তবু শুনতে দোষ কি?''

—''তাহলে শুনুন। ...দিন-কয় আগে আমারই এলাকায় একরাত্রে হরেনবাবু নামে একটি ভদ্রলোক খুন হয়েছেন শুনে সকালে তদন্ত করতে গেলুম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, ঘরময় বইছে রক্তের ঢেউ, আর চারিদিকে ছড়ানো কতকগুলো জিনিসপত্তর। তারই মাঝখানে হরেনবাবুর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে, কাঁধে আর বুকে তিনটে গভীর ক্ষত, সেগুলো

ছোরার আঘাত বলেই মনে হল। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলুম, হত্যাকারীর সঙ্গে হরেনবাবু রীতিমত যোঝাযুঝি করেছিলেন। মেঝেতে একটা মাঝারি আকারের ঘড়ি পড়ে রয়েছে, ঘড়িটা রাত বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বোঝা গেল, ঠিক ওই সময়েই ঘটনাটা ঘটেছে। রক্তের মধ্যে পাওয়া গেল কতগুলো নিখুঁত জুতোর ছাপ।

''হরেনবাবুর সঙ্গে ওই বাড়িতেই তাঁর ছোটভাই সুরেন বাস করে। হরেনবাবু বিপত্নীক আর নিঃসন্তান। সুরেন এখনও বিবাহ করেনি। বাড়িতে ওরা দুজন ছাড়া আর একজন প্রায়-কালা বুড়ো চাকর থাকে, ঘটনার সময়ে সে একতালার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার কানে কোন গোলমালই ঢোকেনি। বাড়ির সদর দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, হত্যাকারী কোন জিনিসই চুরি করেনি।

''বাড়ি খানাতল্লাশ করতে করতে সুরেনের ঘরে পাওয়া গেল একজোড়া রক্তমাখা জুতো। সে-জুতো তারই, আর সেই জুতোর সঙ্গে হত্যাকারীর পদচিহ্ন অবিকল মিলে গেল। খুব সহজেই মামলার কিনারা হ'ল ভেবে আমি তখুনি সুরেনকে গ্রেপ্তার করলুম। কিন্তু সুরেনকে বোধহয় আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।''

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, ''কেন?''

—''সুরেন বলে ঘটনার রাত্রে সে তার এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত খেটেখুটে সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে। তার পরদিন সকালে বাড়িতে ফিরে সেই-ই প্রথমে এই হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে। সুরেনের এই বন্ধুর বাপ হচ্ছেন কলকাতা পুলিশেরই আর এক ইন্‌সপেকটার, তাঁর নাম অবনীবাবু। বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়িটা দেখে আমরা জেনেছি, হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। শব-ব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারও সেই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইন্‌সপেকটার অবনীবাবু বলেন, সুরেন সে-রাত্রে তাঁর বাড়ি ছেড়ে এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায়নি। কেবল অবনীবাবু নন, বিবাহ-সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপরেও আর সুরেনকে ধরে রাখি কি করে? বিশেষ, তার স্বপক্ষে আর একটা মস্ত প্রমাণ রয়েছে।''

—''কি প্রমাণ?''

—''মৃত হরেনবাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে গাছকয় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছে। চুলগুলো নিশ্চয়ই হত্যাকারীর, ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার সময়ে হরেনবাবু হত্যাকারীর চুল চেপে ধরেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সুরেনের মাথায় একগাছাও পাকা চুল নেই।''

বিমল বললে, ''চুলগুলো একবার আমাকে দেখাবেন?''

—''কেন দেখাবনা? এই নিন,'' বলে সুন্দরবাবু ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিলেন।

মোড়কটা খুলে বিমল বললে, ''একটা 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' দিতে পারেন?''

—''তা যেন দিচ্ছি, কিন্তু অতটা খুঁটিয়ে দেখবার কিছুই নেই। ওগুলো পাকাচুল, আর সুরেনের মাথার চুল নয়, আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।''

বিমল 'ম্যাগনিফাইং গ্লাসে'র সাহায্যে চুলগুলো পরীক্ষা করে বললে, ''এই চুলগুলো কি প্রমাণ দিচ্ছে জানেন? হত্যাকারীকে মৃত হরেনবাবু চিনতেন, আর খালি তার মাথায় লম্বা পাকা-চুল নয়, মুখেও দাড়ি-গোঁফ ছিল।''

সুন্দরবাবু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, ''কি করে জানলেন আপনি?''

—''পরে তা বলব। আপনি আর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি?''

—"না। তবে হরেনবাবুর মৃত্যুর দিন-দশেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর এক আত্মীয় মরবার সময়ে উইল করে তাঁদের দুই ভাইকে একলক্ষ টাকা দান করে গিয়েছেন। কিন্তু এই উইলের খবর তাঁরা কেউ জানতেন না, কারণ হরেনবাবুর মৃত্যুর মোটে চারদিন আগে ওই আত্মীয়টি মারা পড়েন। এখন অ্যাটর্নি-বাড়ি থেকে এই খবর সবে প্রকাশ পেয়েছে।"

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "হরেনবাবুর অবর্তমানে এখন সুরেনই সব টাকার মালিক হবে তো?"

—"হ্যাঁ! কিন্তু সুরেনও যদি ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তাহলে তাদের সব সম্পত্তি যাবে হরিহরের হাতে।"

—"হরিহর আবার কে?"

—"হরেন আর সুরেনের খুড়তুতো ভাই। ঠিক পাশেই তার বাড়ি।"

—"সেখানে কিছু খোঁজ নিয়েছেন?"

—"তা আবার নিইনি, আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে হে? কিন্তু হরিহর সমস্ত সন্দেহের বাইরে। কারণ প্রথমত, খুনেব সময়ে সে উইলের ব্যাপার জানত না, আর জানলেও সুরেন থাকতে তার সম্পত্তি-লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, তার পায়ের জুতো হত্যাকারীর জুতোর দাগের চেয়ে আধ ইঞ্চি ছোট। তৃতীয়ত, তারও মাথায় পাকাচুল নেই। চতুর্থত, সে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা। ঘটনার দিনে থিয়েটারে এক বিশেষ অভিনয় ছিল, অর্থাৎ সারারাত্রব্যাপী অভিনয়। তিনতিনখানা নাটকে তার পার্ট ছিল। আমি থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, হরিহর ঘটনার পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় বাড়িতে ফিরেছে। বিমলবাবু, আপনাদের সঙ্গে গল্প করব কি, আমি এখন অকূল-পাথারে ভাসছি—হুম্, গল্প করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না!"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার দুরবস্থা দেখে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে! আচ্ছা, আজ আর বেশিক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না, কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করে বিদায় হব।"

—"কি কথা?"

—"ঘটনাস্থলের কাছে, মাঝরাতে সেদিন যে পাহারাওয়ালা রাস্তায় পাহারায় ছিল, তাকে একবার ডেকে দিন।"

পাহারাওয়ালা এল।

বিমল শুধোলে, "তোমার নাম কি?"

—"চন্দর সিং।"

—"আচ্ছা চন্দর সিং যে-বাড়িতে খুন হয় তার কাছ থেকে কত তফাতে তুমি পাহারায় ছিলে?"

—"পাঁচ-ছ খানা বাড়ির পরেই।"

—"খুন হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়নি তো?"

চন্দর সিং আহত কণ্ঠে বললে, "পাহারা দিতে দিতে কোনদিন আমি ঘুমোইনি, হুজুর!"

—"বেশ, বেশ, তুমি দেখছি অসাধারণ পাহারাওয়ালা। তাহলে রাত বারোটার সময় তুমি কোন আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলে?"

—"না হুজুর!"

—"এখন শীতকালের রাত। বারোটার সময়ে পথে খুব কম লোক চলে। ঘটনাস্থলের কাছে রাত বারোটার সময়ে তুমি কি এমন কোন লোক দেখেছিলে, যাকে দেখলে সন্দেহ হয়?"

—"তিন চারজন লোককে দেখেছিলুম, কিন্তু কারুর ওপরে আমার সন্দেহ হয়নি!"

—"এমন কোন লোকই দেখনি, যার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল, আর মুখে ছিল পাকা গোঁফ-দাড়ি?"

চন্দর সিং অল্পক্ষণ ভেবেই বলে উঠল, "হ্যাঁ হুজুর, দেখেছিলুম! একটা বুড়ো বাঙালি-মুসলমান রাত বারোটার খানিক পরেই আমার সামনে দিয়ে হন হন করে চলে গিয়েছিল বটে।"

—"কি করে জানলে, সে বাঙালি-মুসলমান?"

—"তার পরনে ছিল বাঙালির মতো আলোয়ান, ধুতি আর পিরান, কিন্তু পশ্চিমা মুসলমানদের মতো তার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল আর মুখে ছিল লম্বা পাকা গোঁফ-দাড়ি।"

—"তাকে দেখে তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?"

—"সন্দেহ হয়নি বটে, তবে একটা কথা মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল আর মুখের গোঁফ-দাড়ি বেজায় বুড়োর মতন ধব্‌ধবে সাদা, কিন্তু সে হন্‌ হন্‌ করে হাঁটছিল খুব জোয়ান লোকের মতোই!"

—"সাবাস চন্দর সিং! এতটা তুমি লক্ষ করেছিলে? সত্যিই তুমি অসাধারণ পাহারাওয়ালা! আচ্ছা, আমার আর কিছু জানবার নেই।"

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "কি আশ্চর্য বিমলবাবু, এই বুড়ো বাঙালি-মুসলমানটিকে আপনি আবার কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? আমরা পেয়েছি কেবল গাছকয়েক লম্বা পাকা চুল, কিন্তু দাড়ি-গোঁফই বা আপনি কেমন করে দেখতে পেলেন?"

বিমল সহাস্যে বললে, "মানস-চক্ষু আর কল্পনা শক্তি ব্যবহার করলে অনেক কিছু দেখা যায় সুন্দরবাবু! আমার মত কি জানেন? হত্যাকারীকে হরেনবাবু চিনতেন, তাই সে ছদ্মবেশ পরে খুন করতে গিয়েছিল। খালি পাকা চুলে মুখ লুকানো যায় না, গোঁফ-দাড়িরও দরকার হয়।"

—"তাহলে আপনি বলতে চান, খুনির মাথায় পাকা চুলের তলায় ছিল কাঁচা কালো চুল? আমরা যে সুরেনকে ধরেছি, তার মাথাতেও কালো চুল আছে। তবে কি সুরেনই—"

বাধা দিয়ে বিমল বললে, "শীঘ্রই আবার দেখা হবে, তখন সব বলব।" এই বলে সে কুমারের হাত ধরে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে মুখ-ভঙ্গি করে বললেন, "হুম্‌! বিমলবাবু একটি আস্ত পাগল। খালি আস্ত নয়, মস্ত পাগল!"

পরদিন প্রভাতে থানায় আবার বিমল ও কুমারের আবির্ভাব! তখন সুন্দরবাবুর সঙ্গে একটি যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে জোরে সিগারেটে দম মারতে মারতে হাত-মুখ নেড়ে কথা কইছিল। বিমল লক্ষ করলে, যুবকের মাথায় বাব্‌রি-কাটা চুল, মুখে পাউডারের চিহ্ন, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবি, পরনে জরিপাড় দিশি কাপড়, পায়ে বাহারি লপেটা, —হ্যাঁ, লোকটি রীতিমত শৌখিন বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, আসুন, —আসুন, নমস্কার! আবার এক নতুন কাণ্ড দেখুন, —জাল-পুলিশের মামলা! এখুনি আবার হন্তদন্ত হয়ে তদন্তে ছুটতে হবে! যত বদ্‌মাইস্‌ জুটেছে কিনা আমারই এলাকায়!"

বিমল বললে, "জাল-পুলিশের মামলা!"

—"হ্যাঁ। এই ভদ্রলোকেরই নাম হরিহরবাবু, হরেনবাবুর খুড়তুতো ভাই। ইনি সক্কালবেলায় থানায় অভিযোগ করতে এসেছেন, কাল দুপুরে পুলিশের লোকরা নাকি ওঁদের থিয়েটারে

গিয়ে গোলমাল করে আর ওঁর সাজঘরে গিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে এসেছে! অথচ সত্যিকথা বলছি বিমলবাবু, আমরা এর বিন্দুবিসর্গও জানি না!''

বিমল হাসিমুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ''নমস্কার হরিহরবাবু! আপনি নিজেই থানায় এসেছেন দেখে সুখী হলুম, কারণ, নইলে আমাদেরই এখুনি আপনার বাড়িতে ছুটতে হত!''

হরিহর বিস্মিতভাবে ফ্যালফেলে চোখে বললে, ''মশাইকে তো এ-জন্মে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।''

—''উঁহু, এ-জন্মেও দেখেন নি, গেল-জন্মেও দেখেননি বোধ হয়। আপনি আর আমরা এক জগতে বাস করি না তো! কিন্তু আমাকে না চিনলেও আপনি এই চুল-গোঁফ-দাড়িকে চেনেন কি?'' বলেই বিমল একরাশ পরচুলা বার করে তুলে দেখালে।

হরিহরের মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। তার পরেই সামলে নিয়ে সে বললে, ''ওগুলো কার, আমি জানি না!''

—''জানেন না? বেশ বেশ, তাহলে ভালো করে বসুন, ধীরে-সুস্থে একটা ছোট্ট গল্প শুনুন। এ গল্পেরও পাত্রদের নাম হরেন সুরেন দুই সহোদর, আর তাদের খুড়তুতো ভাই হরিহর। হরেন-সুরেনের নামে এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেলেন। তারা সে-সৌভাগ্যের কথা টের পাবার আগেই, অ্যাটর্নি-বাড়ির কেরানি সুবোধে... থেকে হরিহর খবরটা জেনে ফেললে, কারণ তারা দুজনেই এক থিয়েটারে অভিনয় করত।

হরিহর দেখলে, রাতারাতি বড়লোক হবার এ একটা মস্ত সুযোগ! উইলের কথা এখনও কেউ জানে না, এই অবসরে হরেন আর সুরেনকে পথ থেকে সরাতে পারলেই লাখ টাকা তার হাতের মুঠোয়! হরিহর মূর্খ হলেও বোকা নয়, চট্ করে একটা শয়তানি ফন্দি এঁটে ফেললে।

সে রাত্রে তাদের থিয়েটারে বিশেষ অভিনয়, তিন-তিনটে পালা শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যাবে। প্রথম পালা 'কণ্ঠহার' শুরু হল সন্ধ্যার মুখে। তারপর আরম্ভ হল ''চন্দ্রগুপ্ত'', রাত এগারোটার সময়ে। এ পালায় হরিহর সাজলে আলেকজাণ্ডার। মিনিট পনেরোর মধ্যে তার পার্ট শেষ হয়ে গেল। তার পরে শেষ পালা ''আলিবাবা''য় তার 'বাবা-মুস্তাফা' সাজবার কথা, অর্থাৎ মাঝে তার একটানা ঘণ্টা-পাঁচেক ছুটি। হরিহর সবাইকে জানালে, সে থিয়েটারের উপরের একটা ঘরে এই সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।''

কিন্তু সে ঘুমোতে গেল না। থিয়েটার থেকে তার বাড়ি মিনিট-পনেরোর পথ। হরিহর লুকিয়ে বাড়িতে গিয়েই হাজির হল, কারণ সে জানে থিয়েটারের সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, তার পার্টের সময় না হলে কেউ তাকে খুঁজবে না।

হরিহর বাবা-মুস্তাফার পাকা চুল আর দাড়ি-গোঁফ সাজঘর থেকে লুকিয়ে সঙ্গে এনেছিল নিজের বাড়িতে এসে সেইগুলো সে পরে নিলে, কারণ এবারে তাকে পাশের বাড়িতে যেতে হবে, সেখানে সবাই তাকে চেনে।

হরিহর নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়িতে গেল। সে জানত, সুরেন আ... বিয়ে-বাড়িতে থাকবে। প্রথমে সে সুরেনের শূন্য ঘরে ঢুকে জুতো চুরি করলে। তারপ... অন্য ঘরে গিয়ে হরেনকে আক্রমণ করলে। হরেন তাকে বাধা দিতে গেল, পারলে না... কেবল হরিহরের মাথার একগোছা পরচুলা রইল তার হাতের মুঠোয়।

ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে ঘরের টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা যে মাটিতে পড়ে ঠিক রা... বারোটায় বন্ধ হয়ে গেল, এটাও সে জানতে পারলে না। জানলে নিশ্চয়ই সাবধান হত।

খুনের পর হরিহর সুরেনের জুতো পরে রক্তের উপরে পায়ে হেঁটে চলে বেড়াল। তারপ... সরে পড়বার আগে জুতোজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেল।

হরিহর বুঝলে, ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে ধরা পড়ে সুরেনের ফাঁসি হবেই। তখন ল... টাকা ভোগ করবে সে একলা। এক ঢিলে মরবে দুই পাখি।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই হরিহর থিয়েটারে ফিরে উপরের ঘরে ঢুকলে। কিন্তু থিয়েটারে পালিয়ে আসবার সময়ে সে যে তাড়াতাড়িতে নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল, পাহারাওয়ালা চন্দর সিংয়ের মুখে আগেই আমরা সেটা জানতে পেরেছি।...ওদিকে থিয়েটারে 'আলিবাবা'র সময়েও তাকে ষ্টেজে না দেখে 'ড্রেসার' উপরে এসে হরিহরের কপট নিদ্রা ভঙ্গ করলে। সে যে থিয়েটারেই শুয়েছিল, আরও একজন সাক্ষী রইল।

হরিহর বাবা-মুস্তাফার পরচুলা পরে সে-রাত্রে যখন অভিনয় করতে নামল, তখন দুটি সত্য জানতে পারেনি। প্রথমটি হচ্ছে, মৃত হরেনের মুঠোর চুলের সঙ্গে মুস্তাফার মাথার ছেঁড়া পরচুলা মেলানো সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাবা-মুস্তাফার দাড়ির এক অংশে হরেনের রক্ত লেগে আছে।

সে নির্ভাবনায় পরচুলা সাজঘরেই রেখে গেল। এই হচ্ছে সেই পরচুলা। হরিহর নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুক।''

কিন্তু কে পরীক্ষা করে দেখবে? হরিহর তখন চেয়ারের উপর বসে-বসেই দারুণ আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর বললেন, ''হুম্! আপনি কি তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছেন বিমলবাবু? এত অসম্ভব কথা জানলেন কি করে?''

বিমল বললে, ''আপনিও যদি আমার মতো যত্ন করে হরেনের মুঠোর চুলগুলো পরীক্ষা করতেন তাহলেই বুঝতে পারতেন, ওগুলো রুক্ষ মরা চুল, অর্থাৎ পরচুলা। তাইতেই সর্বপ্রথমে আমার সন্দেহ হল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই সকলকার পরিচিত লোক, তাই ছদ্মবেশ পরে খুন করতে যায়। তারপর যখন শুনলুম হরেন-সুরেনের অবর্তমানে লাখটাকার মালিক হবে হরিহর, তখনি আমার কড়া নজর পড়ল তার উপরে। সে থিয়েটারের অভিনেতা শুনে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। কারণ কে না জানে, অভিনেতারাই পরচুলা নিয়ে নাড়াচাড়া করে? এই একটা ছোট্ট সূত্র আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলেই আপনি গোলকধাঁধায় পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।''

সুন্দরবাবু নিজের গালে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, ''স্বীকার করছি, আমি হচ্ছি মস্ত হাঁদা-গঙ্গারাম! কিন্তু, তারপর?''

''তারপর আর কি, পথ খুঁজে পেয়েই আমি থিয়েটারে ছুটলুম। জাল-পুলিশ সেজে খোঁজখবর নিতে লাগলুম। হাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাটর্নি বাড়িতেও গিয়ে খবর পেয়েছি, ওখানকার কেরানি সুবোধও হরিহরের সঙ্গে অভিনয় করে, আর লাখটাকার উইলের গুপ্তকথা তার কাছ থেকেই হরিহর সব-আগে জানতে পারে। থিয়েটারে গিয়ে প্রথমে আমি খোঁজ নিলুম, ঘটনার রাত্রে হরিহর কখন কোন নাটকে অভিনয় করেছিল। হিসাব করে দেখলুম, রাত এগারোটার পর প্রায় পাঁচঘন্টা তাকে সাজতে হয়নি, আর সেই সময়টার মধ্যে কেউ খোঁজও নেয়নি যে, সত্যসত্যই সে থিয়েটারে আছে কি না! তারপর আমার কাজ খুবই সোজা হয়ে গেল। এর ওপর সাজঘরে খানাতল্লাস করে যখন বাবা-মুস্তাফার ছেঁড়া চুল আর রক্তাক্ত দাড়ি পাওয়া গেল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। বাকি গল্পটা আমি আন্দাজে রচনা করেছি, কিন্তু তা যে মিথ্যা নয়, সেটা আপনারা সকলেই দেখছেন তো?... আচ্ছা সুন্দরবাবু, আমার কাজ ফুরুলো, এখন আমরা সরে পড়ি, কি বলেন?''

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মহা-উৎসাহে বিমলের হাত চেপে ধরে বললেন, 'সে কি, বিলক্ষণ! আমার ঘাড় থেকে এত-বড় বোঝা নামিয়ে দিলেন, অন্তত কিছু মিষ্টিমুখ করে যান...ওরে, কে আছিস্ রে! শিগ্গির এক টাকার ভালো সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আয়তো!''

সীমন্ত-হীরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না।

এদেশের লোকের কেমন বদ্ অভ্যাস, ছোটখাটো চুরি-চামারি হইলে বেবাক হজম করিয়া যায়, পুলিশে পর্যন্ত খবর দেয় না। হয়তো তাহারা ভাবে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। নেহাত যখন গুরুতর কিছু ঘটিয়া যায় তখন সংবাদটা পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছায় বটে কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বেসরকারি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবার মতো উদ্যোগ বা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। কিছু দিন হা হুতাশ ও পুলিশকে গালিগালাজ করিয়া অবশেষে তাহারা ক্ষান্ত হয়।

খুন জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিশ তাহাকে হাজত জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকি সময়টুকু নিজের লাইব্রেরি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে, গল্প লিখিয়া বাঙালি পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মতো এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একেবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সেদিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম,—"কি হে, বাংলাদেশের চোর-ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"না। তার প্রমাণ তো খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা তো পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসছে কৈ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার তখনি আসে, তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। ধৈর্যং রহু। আসল কথা আমাদের দেশে

প্রতিভাবান বদমায়েশ—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে, কি করব; দোষ আমার নয়, দোষ তোমাদের দীনাহীনা পিঁচুটি নয়না বঙ্গভাষায়—প্রতিভাবান বদমায়েশ খুব অল্পই আছে। পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ—তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই। জানো তো যে পুকুরে দু'চারটে বড় বড় রুই কাতলা আছে সেই পুকুরে ছিপ ফেলেই শিকারির আনন্দ।''

আমি বলিলাম,—''তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিদ্ যদি কেউ এখানে থাকতেন, তিনি নির্ভয়ে বলে দিতেন যে তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।''

ব্যোমকেশ বলিল, —''তাহলে মনস্তত্ত্ববিদ্ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কখনও নাম শোনেনি—এই হচ্ছে আজকালকার নতুন বিধি। তোমরা আধুনিক গল্প-লেখকের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছ।''

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম,—''ভাই, আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, প্রতিদানের আশা না করে শুধু আনন্দ যোগাই, তবু কি তোমাদের মন ওঠে না? এর বেশি যদি চাও তাহলে নগদ কিছু ছাড়তে হবে।''

দরজার কড়া নাড়িয়া ''চিঠি হ্যায়'' বলিয়া ডাক-পিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখ দীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্রঞ্জ-রং কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন দিয়া আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্য-মুখে আমার হাতে দিয়া বলিল, —''এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের বনিয়াদী জমিদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্যন্ত এসে হাজির।''

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমিদারি স্টেটের নাম। জমিদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারি ইংরাজিতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই,—

প্রিয় মহাশয়,

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরি কার্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথ খরচের জন্য ১০০ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেনে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে স্টেশনে গাড়ি উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—''তাই তো হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরি কার্যটি কি—চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার তো ও সব বিদ্যে আছে।''

''কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতিটি পাশের জমিদার

চুরি করে নিয়ে গেছে; তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।''

''না না, অতটা নয়। দেখছ না একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছে। ভেতরে নিশ্চয় কোনও বড় রকম গোলমাল আছে।''

''ওইটে তোমাদের ভুল; বড় লোক রুগী হলে মনে কর ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উলটো। বড়লোকের ফুসকুড়ি হলে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার-বৈদ্যের কথা মনেই পড়ে না।''

''যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে না কি?''

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল—''হাতে যখন কোনও কাজ নেই, তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা তো হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনও যাওনি।''

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম, —''আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে—''

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, —''দোষ কি? একজনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুশিই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা তো একটা কর্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে—সর্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।''

কোন শাস্ত্রে এমন জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ আছে যদিও স্মরণ করিতে পারিলাম না, তবু সহজেই রাজি হইয়া গেলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়িতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় আমরা তিনজন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,— ''মশাইদের কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?''

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —''মশাইয়ের কদ্দুর যাওয়া হবে?''

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, —''আমি—এই পরের স্টেশনেই নামব।''

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বলিল,—''আমরাও তার পরের স্টেশনে নেমে যাব।''

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ি থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন স্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরার জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ির দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখাচোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, —''ওহে—''

ব্যোমকেশ বলিল,—''জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়িতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালোই!''

তারপর প্রায় প্রতি স্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। স্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামি মোটর লইয়া জমিদারের

একজন কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে বসিলাম। অতঃপর নির্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্মচারিটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু'একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন,—''আমি কিছুই জানি না, মশাই! শুধু আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যাচ্ছি।''

আমরা মুখ তাকাতাকি করিলাম, আর কোনও কথা হইল না। পরে জমিদারভবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম,—সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারত—তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপর বাগান, হট হাউস্, পুষ্করিণী, টেনিস্ কোর্ট, কাছারি-বাড়ি, অতিথিশালা, পোস্ট-অফিস আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ির সম্মুখে থামিতেই জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেক্রেটারি বলিলেন,—''আপনারা মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ করে নিন। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরি হয়ে যাবেন।''

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারি আসিয়া বলিলেন, —''কুমার বাহাদুর লাইব্রেরি ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে—আমার সঙ্গে আসুন।''

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এমনি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মতো সাধারণ পাঞ্জাবি পরা একটি সহাস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা—ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন,— ''আপনিই ব্যোমকেশবাবু? আসুন।''

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল, —''ইনি আমার বন্ধু, সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওঁকে সহজে কাছ ছাড়া করিনে।''

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন,—''আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিতবাবু এসেছেন, আমি ভারি খুশি হয়েছি। কারণ, প্রধানত ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।''

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমিদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। লাইব্রেরি ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম দেয়াল-সংলগ্ন আলমারিগুলি দেশি বিলাতি নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবিলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরি ঘরটি যে কেবল মাত্র জমিদার-গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নহে, রীতিমতো ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন,—''এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।'' সেক্রেটারিকে হুকুম দিলেন, ''তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ

রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।''

সেক্রেটারি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন—''আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ করে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্যাদা জড়ানো রয়েছে।''

ব্যোমকেশ বলিল, —''প্রতিশ্রুতি দেবার কোনও দরকার আছে মনে করিনে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনও বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।''

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—''তামা-তুলসীর দরকার নেই' আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।''

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম,—''গল্পচ্ছলেও কি কোনও কথা প্রকাশ করা চলবে না?''

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, —''না। এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই চলবে না।''

হয়তো একটা ভালো গল্পের মশলা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, —''আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনও কথা প্রকাশ করব না।''

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন,— ''আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরত আছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি কিছু জানেন না—''

ব্যোমকেশ বলিল, —''কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।''

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন, —''আপনি জানেন? তাহলে এ কথাও জানেন বোধ হয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ওই হীরা দেখানো হয়েছিল?''

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—''জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।''

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন,— ''সে সুযোগ আর কখনও হবে কি না জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।''

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—''চুরি গেছে!''

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন, —''হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা শুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমিদার বংশ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বারো ভুঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশাদের আমলে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ এই জমিদারি অর্জন করেন। সাদা কথায় তিনি একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ করে পরে বাদশার কাছ থেকে সনন্দ আদায় করেন। সে বাদশাহি সনন্দ এখনও আমাদের কাছে বর্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের 'রাজা' উপাধি ছিল।''

''ওই 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের পূর্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চলে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনও অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের

সুতরাং বংশ লোপ হয়ে যাবে।''

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন--''জমিদাবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদাবিব উত্তরাধিকারী হয়, এই হচ্ছে আমাদের বংশেব চিরাচরিত লোকাচাব। কনিষ্ঠবা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু'বছব আগে আমার বাবাব মৃত্যুব পব আমি জমিদারি পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ানস্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমিদাবি থেকে পেযে থাকেন।

''এ তো গেল গল্পের ভূমিকা। এবাব হীবা চুবির ঘটনাটা বলি। বস্ত্র-প্রদর্শনীতে আমাব হীবা এক্‌জিবিট্‌ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে কবে সেই হীবা নিযে কলকাতা গেলাম, কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষেব কাছে জমা কবে দেবাব পব তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন প্রদর্শনীতে বরোদা, হাযদ্রাবাদ, পাতিযালা প্রভৃতি বাজবংশেব খানদানি জহরত প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বযং গভর্নমেন্ট, সুতবাং সেখান থেকে হীবা চুরি যাবার কোনও ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাসকেসে আমাব হীবা রাখা হয়েছিল তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

''সাত দিন ধবে এক্‌জিবিশন চলল। শেষ দিনেব দিন আমার হীবা নিয়ে আমি বাড়ি ফিবে এলাম। বাডি ফিবে এসে জানতে পারলাম যে, আমাব হীবা চুবি গেছে, তার বদলে যা ফিবিযে এনেছি, তা দু'শ টাকা দামের একটা নকল।''

কুমাব চুপ কবিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা কবিল, -''চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিংবা পুলিশকে খবব দেননি কেন?''

কুমার বলিলেন, ''খবব দিযে কোনও লাভ হত না। কারণ কে চুবি করেছে, চুবি ধবা পডাব সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেবেছিলাম।''

''ওঃ'' ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারেব মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, - ''তাবপব বলে যান।''

কুমাব বলিতে লাগিলেন, ''এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হযে পাবিবাবিক কলঙ্ক বাব হযে পডে, খবেবেব কাগজে এই নিযে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়, এই ভযে বাডিব লোককে পর্যন্ত এ কথা জানাতে পারিনি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওযান মহাশয।

''কথাটা আবও খোলসা কবে বলা দবকাব। পূর্বে বলেছি, আমাব এক কাকা আছেন। তিনি কলকাতায থাকেন, স্টেট থেকে মাসিক তিন হাজাব টাকা খবচা পান। তাঁব নাম আপনাবা নিশ্চয শুনেছেন, তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যাব দিগিন্দ্রনাবাযণ বায। তাঁব মতো আশ্চর্য মানুয খুব কম দেখা যায। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয অদ্বিতীয মনীষী বলে পবিচিত হতে পাবতেন। যেমন তাব অসাধাবণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধেব সময তিনি প্ল্যাস্টাব অফ প্যাবিস্ সম্বন্ধে কি একটা তথ্য আবিষ্কাব কবে ইংবাজ গভর্নমেন্টকে উপহাব দিযেছিলেন— তাব ফলে 'স্যব' উপাধি পান। শিল্পেব দিকেও তাব কি অসামান্য প্রতিভা, তাব পবিচয সম্ভবত আপনাদেব অল্পবিস্তব জানা আছে। প্যাবিসেব শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবেব প্রস্তবমূর্তি এক্‌জিবিট্ কবে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ কবেন, তা কাবও অবিদিত নেই। মোটেব পব এমন বহুমুখী প্রতিভা সচবাচব চোখে পডে না।'' বলিযা কুমাব বাহাদুব একটু হাসিলেন।

আমবা নডিযা চডিযা বসিলাম। কুমাব বলিতে লাগিলেন, --''কাকা আমাকে কম স্নেহ কবেন না, কিন্তু একটি বিষযে তাঁব সঙ্গে আমাব মতভেদ হযেছিল। ওই হীবাটা তিনি

আমাব কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।''

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—''হীরাটার দাম কত হবে?''

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—''খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই করে দেখিনি। গৃহদেবতার মতোই সে হীরাটা অমূল্য ছিল।

''সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ওই হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেননি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন, —'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই জোড়হাত করে কাকাকে বললাম,—'কাকা, আপনার আর যা ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।' —কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

''তবে পত্র ব্যবহার হয়েছে। যেদিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু পড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।''

চাবি দিয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙলা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,—

কল্যাণীয় খোকা,

দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাওনি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে বলে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্বাদ নিও।

ইতি

তোমার কাকা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরত দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন, —''চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হিরের বাক্স বার করে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের একজন ভালো জহুরি, দেখেই বললেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাত নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।''

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মতো গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন, —''জহুরি ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দুশ টাকার বেশি এর দাম নয়।''

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল, —''তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?''

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, —''হ্যাঁ। কেমন করে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরত

চাই। যেমন করে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার ‘সীমন্ত-হীরা’ আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্যে ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি শর্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।’’

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,---‘‘কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশি হবেন ?’’

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—‘‘কবে নাগাদ ? তবে কি, —তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয় ?’’

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, —‘‘এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরত পাবেন।’’ বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গো কাটিয়া গেল

রাত্রে দুইজনে কথা হইল। আমি -‘‘প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে ?’’

ব্যোমকেশ বলিল, —‘‘না। আগে বাড়িটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।’’

‘‘হিরেটা কি বাড়িতেই আছে মনে হয় ?’’

‘‘নিশ্চয। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয শেষ বযসে ভাইপো’র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—’’

‘‘তোমার বিশ্বাস— ?’’

‘‘যাক্, সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারাযণ খুড়া মহাশযের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওযা পর্যন্ত কিছুই ঠিক করে বলা যায় না।’’

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিযা বলিলাম, —‘‘আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ ?’’

‘‘কোন্ কাজের ?’’

‘‘যে উপায অবলম্বন করে তুমি হিরেটা উদ্ধাব করতে যাচ্ছ।’’

‘‘ভেবে দেখেছি। তাহা নিছক চুবি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয। চোরের পর বাটপাড়ি কবা মহা পুণ্যকার্য।’’

‘‘তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা শুনবে না।’’

‘‘সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।’’

পরদিন দুপুর বেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জ যোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘‘কাজ কত দূর হল ?’’

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল, —‘‘বিশেষ সুবিধা হল না। বুড়ো একটি হর্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালি চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারি বেড়ালের মতো। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারি খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি।’’

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ে চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, —"কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাত মিথ্যে নয়, —খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়িটা নানারকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়; কর্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমত বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকাই মুস্কিল, —ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বসে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচিল ডিঙিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই,—আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচোলো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুশি করে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ির সদর-দরজায় নেপালি ভৃত্য উজ্রে সিং থাপা বাঘের মতো থাবা গেড়ে বসে আছেন, ভালোরকম কৈফিয়ত যদি না দিতে পার, বাড়িতে ঢোকবার আশা ওইখানেই ইতি। রাত্রির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকিদার তো আছেই, তার উপর চারটে বিলিতি ম্যাস্টিফ্ কুকুর কম্পাউন্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্যোদ্ধার করবে সে পথও বন্ধ।"

"তবে উপায়?"

"উপায় হয়েছে। বুড়োর একজন সেক্রেটারি চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ'টাকা মাইনে—বাড়িতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যান্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্‌গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি,—কাল ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে।"

"দুটো দরখাস্ত কেন?"

"একটা তোমার একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।"

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা আটটার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণের ভবনে সেক্রেটারি পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। শহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ি; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মতো আরও কয়েকজন চাকরি অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ির কর্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদারদিগকে ডাকিতেছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয়তো আমাদের ডাক পড়িবার পূর্বেই অন্য কেহ বহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষপর্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নতুন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্তা আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি? এতক্ষণ তো একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরান-পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র

বসিয়া আছেন। বুলডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মতো মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চক্‌চকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ বাহু দুটা বনমানুষের মতো দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে আঙুলগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলার' মতো সরু ও সুদৃশ্য,—একেবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র এবং সর্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ওই কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভালো ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পর স্থির হইল। তারপর এই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুলডগ হাসিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি ওই রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল,—"উজ্‌রে দরজা বন্ধ করে দাও।"

নেপালি ভৃত্য উজ্‌রে সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবিলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন —"কার নাম নিখিলেশ?"

ব্যোমকেশ বলিল, —"আজ্ঞে আমার।"

কর্তা কহিলেন—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দুজনে সল্লা করে দরখাস্ত করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল, —"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন—"বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত পড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক, তুমি এম. এস্‌-সি পাশ করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন য়ুনিভার্সিটি থেকে?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি থেকে।"

"হুঁ। টেবিলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন,—"কোন সালে পাশ করেছ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল, —"আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক, একটা ফাঁড়া তো কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্তা কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—'অজিতবাবু!''

''আজ্ঞে!''

বোমা ফাটার মতো হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় হায়, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

কর্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন, —''লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।''

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কর্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিয়া বলিলেন—''ব্যোমকেশবাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করিনি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।'' ব্যোমকেশের মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন,—''খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কন্‌ভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে।.....হনু আর চোয়াল উঁচু মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি, একগুঁয়ে। Intuition খুব বেশি; reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনও mature করেনি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান বলা চলে।''

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শব ব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা বলিলেন—''আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশি। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাত তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাত তার চেয়েও বেশি।

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—''খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে বলে মনে হয়?''

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্বিকার নীরবতা লক্ষ করিয়া কর্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন—''কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা, কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?''

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল,—''সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব কথা দিয়ে এসেছি।''

কর্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"বটে বটে! তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি। কিন্তু কি করে কাজ হাসিল করবে শুনি? এখনই তো তোমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব। তারপর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, —"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরাটা বাড়িতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্তা বলিলেন, —"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্তার কপালের শিরাগুলো ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে অন্ধ জিঘাংসা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলে ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্তা কহিলেন,—"দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি—না? তোমার মতো ডিটেকটিভ দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাংলাদেশের বার্তিল? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বছর সময় দিলাম, বার কর খুঁজে। And be damned!"

কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন,—"উজ্‌রে সিং!"

উজ্‌রে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্তা আমাদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এই বাবু দু'টিকে চিনে রাখো। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি এঁরা এ বাড়িতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে? যাও।"

উজ্‌রে সিং তাহার নির্বিকার নেপালি মুখ ও তীর্যক চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্তা এবার রঘুবংশের কুন্তোদব নামক সিংহের মতো হাস্য করিলেন, বলিলেন,—"খুঁজি-খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশচন্দ্র?"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে মরে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না; বুঝলে? দিগিন রায় যে-জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে-জিনিস খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম নয়। —ভালো কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামি জিনিস আছে, কিন্তু তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার স্টুডিওতে চললাম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না।—আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিই, —আমার বাড়িময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্লাস্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে, হিরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তাহলে সেই দণ্ডেই কান ধরে বার করে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাসে গোছের একটু হাসিয়া বলিল, —"চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মতো লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম, —"ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটি হল।"

ব্যোমকেশ বলিল, —"বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয়নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের স্টেশনে নেমে যাবেন বলে পাশের গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয়নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল,—"বুড়োর ওই মারাত্মক দুর্বলতাটুকু ছিল বলেই রক্ষে, নইলে হয়তো হাল ছেড়ে দিয়ে হত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম,—"কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ-কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধরে বার করে দিত তাহলে কি হত বলা যায় না। যা হোক, বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ওই থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন্ দুর্বলতার সন্ধান পেলে শুনি! আমি তো বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নির্ভাজ, —লোহার মতো শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। যার যত বেশি বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছো। একটু পরিষ্কার করে বলো।"

"বুড়োর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছি। বাড়িতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন তো আট আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকি শুধু হিরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়িতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবত গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ওই বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রি পুরে দেবে। যা হয় করো, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, —"তা কি হয়, তোমাকেও চাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভালো?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কেহ বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী স্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ির মধ্যে সুপারির মতো একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোনকালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমত, মূল্যবান জিনিসপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারি কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত—সে-জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এডগার অ্যালেন পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমতো খানাতল্লাস শুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি-না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারি খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িখানা চিত্র ও মূর্তির একটা কলা-ভবন (gallery) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্তি প্লাস্টার কাস্ট সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগিল না। সর্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর স্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জন হইল,—"এসো।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবিল চলিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশবাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মতো হবে দেখছি, শেষপর্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল, —"আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"বেশ বেশ। এই নাও চাবি, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম; কিন্তু এই প্ল্যাস্টার-কাস্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমার সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজ্‌রে সিং—"

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা আপনি কি করছেন?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, —"আমার তৈরি নটরাজ-মূর্তির নাম শুনেছ তো? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরি করছি। আর একটা আমার টেবিলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—কি বল?"

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্মিত বিখ্যাত মূর্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, —''ওই মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে এক্জিবিট করিয়েছিলেন!''

স্যর দিগিন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, —''হ্যাঁ। আসল মূর্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।''

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; তাই ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—''নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।''

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—''পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার খুঁজো।'' ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরত দিল; সেটা পকেটে ফেলিযা আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—''ওহে অজিতবাবু, তুমি তো গল্প-টল্প লিখে থাকো; সুতরাং একজন বড় দরের আর্টিস্ট! বলো দেখি এ পুতুলটি কেমন?''—বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্তিটি। কিন্তু ওইটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ওই ক্ষুদ্র মূর্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল,—''চমৎকার! এর তুলনা নেই।''

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—''এটাও কি আপনি নিজে মোল্ড করেছেন?''

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—''হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে?''

ব্যোমকেশ মূর্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, —''এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয়?''

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—''না। কেন বল দেখি? পাওয়া গেলে কিনতে না কি?''

''বোধ হয় কিনতুম। আপনিই এই রকম প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরি করিয়ে বাজারে বিক্রি করেন না কেন? আমার বিশ্বাস এতে পয়সা আছে।''

''পয়সার যদি কখনও অভাব হয় তখন দেখা যাবে। আপাতত জিনিসটাকে বাজারে বিক্রি করে খেলো করতে চাই না।''

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,—''এখন তাহলে উঠি। আবার ও-বেলা আসব।'' বলিয়া মূর্তিটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—''তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটা ভেঙেছিলে!'' তারপর বাঘের মতো ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিলেন,—''তোমাদের একবার সাবধান করে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্তি যদি ভেঙেছ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?''

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—''এইসব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক্ ও বেলা তাহলে আবার আসছ? বেশ

কথা, উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ—; এবার বাড়ির কোন্ দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত করে রাখতে পারি।''

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—''চল, এতক্ষণে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।''

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতি বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাস্টার-কাস্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ি পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—''কি হে, প্ল্যাস্টার-কাস্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?''

ব্যোমকেশ বলিল,—''তুমি তো জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা।''

''তা তো জানি। কিন্তু কি দেখলে?''

''দেখলুম প্ল্যাস্টার-কাস্টিং খুব সহজ, যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মতো ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার করে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা-কিছু ওই ছাঁচটা তৈরি করা।''

''এই! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?''

''দুর্ভাবনা নেই। ছাঁচে প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ওই জাতীয় কোনও শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা মূর্তির মধ্যে রয়ে যাবে।''

''অর্থাৎ?''

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—''অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।''

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়িখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইযা আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভা[illegible] পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের প[illegible]কাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একেবারে বেহায়া—সে অম্লানবদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমাযিকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, —''আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?''

ব্যোমকেশ বলিল,—''আজ বুধবার। এখনও দু'দিন সময় আছে।''

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবিলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, —''এটা কত দিন হল তৈরি করেছেন?''

ভ্রূকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—''দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?''

''না—অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার।'' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, "একজন তক্‌মা-পরা চাপরাসি দিয়ে গেছে!"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেনসিল দিয়া লেখা,—"এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্র্যান্ড হোটেলে আছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুশি হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল, —"এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলায়, তা হলেই সব মাটি। আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে একভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশাপাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যর দিগিন্দ্র মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের শব্দে বোধহয় বুঝিতে পারিল আমি জাগিয়াছি, বলিল, —"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিরেটা বসবার ঘরে টেবিলের উপর কোনওখানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাত্রি ক'টা?"

ব্যোমকেশ বলিল, —"আড়াইটে। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম, —"তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবিলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয়, —দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে তো টেবিলের উপরই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবিলের উপর? হাতির দাঁতের দোয়াতদান, টাইমপিস ঘড়ি, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তারপর আবার দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের ফলে সে মনে মনে কোনও একটা সঙ্কল্প করিয়াছে।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন, —"এই যে মাণিক-জোড়, এসো, এসো। আজ যে ভারি সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি! দুশ্চিন্তায়

রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি?"

ব্যোমকেশ টেবিল হইতে নটরাজের মূর্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"এই পুতুলটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারিনি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, —"ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—কেমন? হল তো? কিন্তু মূর্তিটা দামি জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।"

মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, —"ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পুরিল।

তারপর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল, —"নাঃ, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"কি ব্যাপার বল তো? আমি তো তোমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, —"নানা কারণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হিরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার জায়গা আর হতে পারে কি? হিরেটা চোখের সামনে টেবিলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্ল্যাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হিরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হিরেটার প্রতি তাঁর এত ভালোবাসা, সেটা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ওই পুতুলটার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হিরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক করে বেরিয়েছিলুম যে পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলাম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ করে পুতুলটা আমায় দান করে দিলে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল।—এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম, —"কিন্তু সময়ও তো আর নেই। মাঝে মাত্র একদিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেনসিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যাক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল, —"মাত্র একদিন। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না। এদিকে কুমার বাহাদুর এসে হানা দিয়ে বসে আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক দিয়েই হাস্যাস্পদ করে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!" মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমতো স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। শুনিলাম কর্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নতুন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজ্‌রে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজ্‌রে সিং বারান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের

মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজ্রে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘন্টা দুই পরে আবার যখন দু'জনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু হল না। উজ্রে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া—আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল,—"কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,—"আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হল না। কুমার সাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবিলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ মূর্তিটা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল, —"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি—" তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, —"কি হল?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, —"দেখ দেখ —নেই! মনে আছে, আজ সকালে পেনসিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম? সে অক্ষরটা নেই!"

দেখিলাম সত্যিই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে? পেনসিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও তো পারে!

ব্যোমকেশ বলিল, —"বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, —"উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে।—পুঁটিরাম!"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল, "তুমি শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে,—হিরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই টেবিলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন। আপনার স্পেশাল ট্রেন যেন ঠিক থাকে। পাবামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে থাকা বোধ হয় নিরাপদ হবে না।

আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু করে কাজ নেই—স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না ; —না আপনার সেক্রেটারিকেও নয়—আচ্ছা, নমস্কার।''

তারপর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রে ব্যোমকেশ কখন ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্তিটা যথাস্থানে নাই। সেদিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলিল, —''আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।''

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, ''তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আসনি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।''

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, —''আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আছেন—তাঁকে কাল একরকম জানিয়েই দিয়েছি যে তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।''

স্যর দিগিন্দ্র কিছুক্ষণ কুঞ্চিত-চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন ; ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুলডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—''তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হলাম। খোকাকে বোলো বৃথা চেষ্টা করে যেন সময় নষ্ট না করে।''

''আচ্ছা, বলব।'' —টেবিলের উপর আর একটি নটরাজ-মূর্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—''এই যে আর একটা তৈরি করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন করে রেখেছি; শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতি চিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক। —কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙে যায়,—আর একটা পাব কি?''

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন,—''বেশ, যদি ভেঙে যায়, আর একটা পাবে। আমাব বাড়িতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে এটাও কম লাভ নয়।''

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল,—''আজ্ঞে হ্যাঁ। এত দিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে—ওই ছবিখানাও আমার বড় ভালো লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?'' —স্যর দিগিন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরত দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনি ভাবে তাহার একটা হাত টেবিলের উপর হইতে নটরাজ-মূর্তিটি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ-মূর্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে

চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন—“হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা,” তখন কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কসরত হয় তো আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল,—“এখন তাহলে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়, —মনে রাখবেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চল্লুম তবে, —নমস্কার!”

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ির বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল, —“গ্র্যাণ্ড হোটেল।”

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, —“ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড?”

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, —“এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম হিরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর একটা ঠিক ওই রকম মূর্তি তৈরি করে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল করে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট ‘ব’ অক্ষরটি লেখা না থাকত, তাহলে আমি জানতেও পারতুম না!” বলিয়া পুতুলটা উলটাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেনসিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, —“কাল যখন এই ‘ব’ অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবিল থেকে নটরাজটি উলটে দেখলুম, —আমার সেই ‘ব’ মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস্! তারপর হাত-সাফাই তো দেখতেই পেলে।”

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—“তুমি ঠিক জানো, হিরেটা ওর মধ্যেই আছে?”

“হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোন সন্দেহ নেই।”

“কিন্তু যদি না থাকে?”

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—“তাহলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য বলে কোনও জিনিস নেই; শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।”

গ্র্যাণ্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—“কি? কি হল, ব্যোমকেশবাবু?”

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ-মূর্তিটি টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন,—“এটা তো দেখছি কাকার নটরাজ, কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—”

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে— ?"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে তো? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কি বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, পরীক্ষা করে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন আপনার সীমন্ত-হীরা।"—ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল, তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাস্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।—ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না, আপাতত যত শীঘ্র পারেন বেরিয়ে পড়ুন। খুড়োমশাই যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তাহলে আবার হীরা হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমার বাহাদুরকে স্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল, —"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইনসিওর-করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন দিয়া আঁটা। চেক-এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিতবাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক!] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন! শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি

প্রতিভামুগ্ধ

শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়

লণ্ডন-রহস্য

পরিমল গোস্বামী

ব্রজবিলাস ও তার সহকারী শম্ভুর অতি দুঃসাহসিক এক অ্যাডভেনচারের কথা বলছি। ব্রজবিলাস সরকার এখন মস্ত বড় ডিটেকটিভ, বিলেত থেকে তার কল এসেছিল, একি সোজা কথা? কিন্তু তার আগের কথাটা বলে নিই, তারপর লণ্ডনের ডাক।

সে বিকেলবেলা চা খেতে খেতে খুব আরাম করে বসে একখানা বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিল আর নিজে নিজেই সশব্দে হেসে উঠছিল মাঝে মাঝে। কখনও বা হাসিটি খিকখিক, কখনও হো হো।

তার সহকারী শম্ভু পাশের ঘরে চা খেতে খেতে কয়েকটি ফাইল গুছিয়ে রাখছিল। হাসির শব্দ তার কানেও আসছিল। কিন্তু কাজ শেষ না করে তো আসতে পারে না, তাই সে ওখানে বসেই ভাবছিল ব্রজবিলাস একা একা হাসে কেন? বিলেত থেকে গোয়েন্দাগিরি শিখে আসার পর কি তার মাথা খারাপ হয়ে গেল এতদিন পরে?

কাজ শেষ করে শম্ভু তাড়াতাড়ি ব্রজবিলাসের কাছে এসে দেখে একখানা বইতে তার মনোযোগ বড়ই ঘন হয়ে উঠেছে, আর নিজেই খিক খিক করে হাসছে। সে যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে-খেয়ালই যেন ব্রজবিলাসের নেই।

শম্ভু চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। সেও খুব কৌতুক অনুভব করছিল ব্রজবিলাসের কাণ্ড দেখে। নিশ্চয় ভয়ানক মজার কিছু, নইলে ব্রজবিলাস তো সহজে হাসে না।

ব্রজবিলাস কিন্তু শম্ভুকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তখন তার বই থেকে চোখ ফেরাবার ফুরসত ছিল না। হঠাৎ আরও একবার সে জোরে হেসে উঠে হাসতে হাসতেই শম্ভুকে বলল, এমন অসম্ভব কথাও লোকে লেখে এবং লোকে তা কিনে পড়ে?

কি অসম্ভব কথা?

এই গোয়েন্দা-উপন্যাসখানার কথা বলছি। এমন মাথামুণ্ডুহীন রাবিশ। সমস্ত ঘটনা আজগুবি, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, যুক্তি নেই, অথচ ডিটেকটিভ—

কিন্তু আর পড়াও হল না, বলাও হল না।

জোর টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের ঘন্টা যেমন বাজে, এ তার চেয়েও জোরে। খুব জরুরি ডাক বলেই মনে হল ব্রজবিলাসের। টেলিফোনও তা বুঝতে পেরেছে, আশ্চর্য!

ট্রাংক কল!

খাশ লণ্ডনের ডাক—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের। সেখানকার শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভরা একটা রহস্য ভেদ করতে না পেরে ব্রজবিলাসকে কল দিয়েছে।

কেস অত্যন্ত জরুরি, এবং সেইজন্য সবচেয়ে দ্রুতবেগে ছোটা এক বিশেষ বিমান সেখান থেকে পাঠানো হচ্ছে। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান। সুপারসোনিক যার নাম।

শম্ভু—

কি, বল?

সাহেবি পোশাক তৈরি আছে তো?

তা আর নেই? একজোড়া আছে, পরিপাটি ইস্তিরি করা।

পরে ফেল।

বিমানে উঠে ব্রজবিলাস চোখবুজে বিমানের আশ্চর্য গতির কথাই ভাবছিল, চোখ খুলে দেখে লণ্ডনে পৌঁছে গেছে।

লণ্ডনে যখন সে কয়েক বছর আগে শিক্ষানবিশি করতে এসেছিল, তখন তার নামের উচ্চারণ নিয়ে ভারি মজা হয়েছিল। কেউ বলেছিল ব্রাজা বাইলাস, কেউ বলেছিল ব্রায়াবিলাস। ইংরেজি J অক্ষরটি ইউরোপে (ফ্রান্স ছাড়া) অনেক দেশেই য-উচ্চারণ। Jugoslavia হয় ইউগোস্লাভিয়া, Fjord হয় ফিয়োর্ড। ওরা ব্রজকে ব্রায়া বলেছিল সেইজন্যই, বুঝতে পারেনি কোনটা ঠিক। শেষপর্যন্ত মিস্টার সরকারই শুধু রইল। শম্ভুরও পরিচয় দেওয়া হল, ওরা ভাবল নামটা বোধ হয় স্যামবো। অতএব শম্ভুও মিস্টার ডাটা হয়ে রইল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুলোক না হলে প্রথম নাম ওরা বলেই না আমাদের মতো। যে-দেশের যে নিয়ম।

ব্রজবিলাস লণ্ডনে এসে একমিনিট সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। ইনসপেকটর জন তাকে কেসটা বুঝিয়ে দেবার আগেই সে জিজ্ঞাসা করল, টাইগার আছে তো? যদি থাকে তাকে অবশ্য চাই।

কেসটা কি, শোনার আগেই?

নিশ্চয়। আগে কুকুর, তারপর অন্যকথা। টাইগারকে আনুন আগে, কতদিন যে তাকে দেখিনি। সে যদি থাকে তবেই আমার ভরসা।

টাইগারকে আনা হল। সে ব্রজবিলাসকে দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল এবং ল্যাজ নাড়তে লাগল। টাইগার সঙ্গে থাকলে ব্রজবিলাসের কোনও ভয় নেই, সফলতা-লাভ হবেই।

ইনসপেকটর বলল, মিস্টার সরকার, আপনি যখন ওর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, তখন ও শুধু ইংরেজি ভাষা বুঝতে পারত, এখন আরও অনেক ভাষা বোঝে। ইউরোপের ভাষা তো বোঝেই, চীনা জাপানি হিন্দি বোঝে, বাংলাও বিশেষ করে চর্চা করেছে। বাংলা গানের রেকর্ড শুনতে পেলে টাইগার-যে কি খুশি হয়, কি বলব। অবসর পেলেই ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জির ব্যাকরণ নিয়ে বসে। কি বোঝে সেই জানে।

শুনে আমিও খুশি হলাম—বলল ব্রজবিলাস। এবারে তাহলে সব বলুন, আমি শুনতে শুনতে চিন্তা করি। কিন্তু একটি কথা—আমি যখন চিন্তা করি, তখন তা পায়চারি করতে করতে করি। একটা ঘর কি এমন আছে যা চেয়ার টেবিলে ভরা নয়?

অবশ্যই আছে।

সেখানে চলুন তবে। এবং দেওয়াল ঘেঁষে মাত্র তিনটি চেয়ার রাখতে হবে। আপনার জন্য একটা, শম্ভুর একটা ও আমার জন্য একটা।

ইনসপেকটর বলল, পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতেন শার্লক হোমস। আবার বসে বসেও করতেন। আপনি কি সব সময় মেঝেয় পায়চারি করতে করতে চিন্তা করেন?

ব্রজবিলাস বলল, সব সময় নয়। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে হলে আর বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করি না।

আপনার চিন্তার রীতিতে বেশ নতুনত্ব আছে।

তা আছে একটু।—ব্রজবিলাস গর্বের সঙ্গে বলল।

ওরা পাশের খালি ঘরে গেল। ব্রজবিলাস শম্ভুকে ডেকে বলল, শম্ভু, আমার চিন্তাচক্রপাদুকা—

শম্ভু ব্যাগ থেকে সেটি বার করে দিল।

ব্রজবিলাস বলল, মেঝেতে ঘুরে ঘুরে চিন্তা করার জন্য এই যন্ত্রটি বানিয়ে নিয়েছি। অনেকটা স্কেটের মতো।—বলে ব্রজবিলাস পাদুকা দুটো পায়ে বাঁধতে লাগল। টাইগার ফস করে ছুটে এসে তার গন্ধ শুঁকে স্বস্থানে ফিরে গেল। ব্রজবিলাস পাইপ ধরিয়ে টানতে টানতে বলল, এতে পায়চারি করার পরিশ্রম থেকে বেঁচে গিয়েছি। মেঝের উপর দাঁড়িয়ে, একটু ঝুঁকে পড়লে চাকা ঘুরতে থাকে, দেহ একটু হেলিয়ে দুলিয়ে স্টিয়ারিং করতে হয়। এই দেখুন বলে ব্রজবিলাস মেঝের উপর স্কেটিং করতে লাগল। ইনসপেকটর বিস্মিত। টাইগার ততোধিক।

ব্রজবিলাস বলল, এইবার বলতে থাকুন—আপনার সমস্যার কথা। আমি মেঝেতে ঘুরতে ঘুরতে শুনি আর চিন্তা করি।

ইনসপেকটর বলল, আপনার পাইপে যে তামাক আছে সেও কি নতুন ধরনের কিছু? গন্ধটা নতুন।

নিশ্চয়। এতে ইংলিশ তামাকের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় ক্যানাবিস ইণ্ডিকা মেশানো আছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান হেম্প—বাংলায় গাঁজা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব বাজে কথা না-হয় এখন থাক। আপনি ঘটনা বলতে থাকুন, আমি মেঝেয় ঘুরি।

ইনসপেকটর, চিন্তাচক্রপাদুকায় ঘূর্ণমান, অর্থাৎ মেঝেয় পাকখাওয়া ব্রজবিলাসকে, বলতে লাগল—

শুনুন, গত এক বছর হল অস্ট্রেলিয়াবাসী টমাস বারটন নামক এক রত্নব্যবসায়ী লণ্ডনে এসে এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করে যে, সে পুরানো এবং দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন কিনতে চায়—ভালো দাম দেবে এবং কেনাবেচা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এই বিজ্ঞাপনে কোনও ঠিকানা দেওয়া হত না, শুধু বক্স নাম্বার ব্যবহার করা হত। চিঠি এলে সে নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে কিনত। ভালো দাম দিত সত্যিই।

বেশ, বলে যান তারপর কি হল।

ইনসপেকটর বলতে লাগল, লমবার্ড স্ট্রিটের একটি বড় ব্যাঙ্কে সে হিসাব খুলেছিল এবং একটি লকার নিয়েছিল। ব্যাঙ্কে টাকা খুব বেশি না থাকলেও খুব কমও ছিল না। এক হাজার পাউণ্ড এখনও তার নামে জমা আছে। এই টাকার বেশি কদাচিৎ থাকত। অথচ রত্ন কিনত নগদ টাকায়। এই টাকা সে কোথায় পেত? জানা গেছে অনেক রত্ন সে গোপনে কিনেছিল, কারণ অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকেরা গোপনেই বিক্রি করত এবং

সব ব্যাপারটাই গোপন রাখা হবে এই ভরসাতেই তারা বিক্রি করত। তাই এখন আর জানবার উপায় নেই কি পরিমাণ রত্ন সে হাত করেছিল।

এ পর্যন্ত তার কাজে কোনও প্রতারণা বা অন্য কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

ব্রজবিলাস এতক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরছিল এবং পাইপ টানতে টানতে শুনছিল, কোনও কথা বলেনি। শম্ভু একটু দূরে বসে একবার ইনসপেকটর জনের দিকে, একবার ব্রজবিলাসের দিকে চেয়ে দেখছিল।

টাইগার ইতিমধ্যে শম্ভুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

ব্রজবিলাস হঠাৎ ইনসপেকটরের দিকে চেয়ে তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, এরপর বারটন এক লর্ডের একটি খুব দামি রত্ন আসল দামের চেয়েও বেশি দেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাত করেছে এবং নিরুদ্দেশ হয়েছে, এই তো ঘটনা?

ইনসপেকটর, পাশে দাঁড়ানো চিফ কনস্টেবল, এবং টাইগার, একসঙ্গে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল। ওদের সবারই চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে।

চিফ কনস্টেবল একটু আগেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, আপনি জানলেন কি করে? এ তো আশ্চর্য ব্যাপার!

টাইগারের ল্যাজেও জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ব্রজবিলাস গম্ভীরভাবে বলল, প্রতারণার চেহারাটা পুবনো কি-না তাই একটুখানি শুনলেই বাকিটা সব বোঝা যায়। আমাকে কি করতে হবে?

ইনসপেকটর বলল, যে হিরেটা নিয়েছে তা অদ্ভুত সুন্দর এবং বড় সাইজের। ওর দ্বিতীয় আর নেই। আপনি এই হিরে উদ্ধার করে দিন। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

ব্রজবিলাস চিন্তাচক্রে ঘুরছে আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে। এইভাবে তিনপাক ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কিছু সন্ধান নিয়েছেন?

কি করে নেব? অপরাধীর ঠিকানা জানি না।

ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল বললেন, সেখানে নিশ্চয় একটা ঠিকানা আছে।

ইনসপেকটর নির্বোধের মতো ব্রজবিলাসের দিকে চেয়ে রইল, চিফ কনস্টেবল তার বুদ্ধিতে হতবাক হয়ে তাকে তখনই জড়িয়ে ধরে আদর করবে কি-না ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা যে এত সহজ তা ওদের মাথায় আসেনি। অথচ কি আশ্চর্য, এ-সব কৌশল ব্রজবিলাসকে এককালে ওরাই শিখিয়েছে—সে যখন অনুসন্ধান-রীতি ভালো করে শিখতে এসেছিল।

ব্রজবিলাস তার চিন্তাচক্রে ঘুরে আপাতত চক্রচিন্তা থামাল এবং চেয়ারে এসে বসে পা থেকে যন্ত্র খুলে ফেলল।

ব্যাঙ্ক থেকে বারটনের ঠিকানা পাওয়া গেল, যদিও ব্রজবিলাসের মনে একবার সন্দেহ হয়েছিল সেটি মিথ্যা ঠিকানাও হতে পারে। তবু পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। বারটনের অতীত তার জানা ছিল। আশ্চর্য, ইয়ার্ডের লোকদের তা জানা নেই। তার অপরাধের চেহারা তো সব জায়গাতেই এক। কতগুলো ধনী এবং লোভী লোককে ধরে তাদের টাকায় বারটন ব্যবসা করে। তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ওই ধনীদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

ব্রজবিলাসের কাজ আরম্ভ হল রাত নটায়।

তার লণ্ডনের বাসস্থান তারই ইচ্ছায় নির্দিষ্ট হয়েছে বেকার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে।

ওটি প্রাইভেট ডিটেকটিভদের একটা সম্মানজনক স্থান। শার্লক হোমস এইখানে থেকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ব্রজবিলাস কি রীতিতে অনুসন্ধান আরম্ভ করবে তা ইতিমধ্যেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সব কথা খুলে না বললেও তাদের কাছ থেকে বিশেষ কতগুলো সাহায্য চাওয়া হয়েছে এবং ইয়ার্ডও আনন্দের সঙ্গে সকল রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শম্ভু ও টাইগার-সহ ব্রজবিলাস তার বেকার স্ট্রিটের বাসা থেকে একখানা ট্যাক্সিতে রওনা হয়ে গেল। ট্যাক্সিকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, ওরা ইউস্টন রোড দিয়ে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড হয়ে অলব্যানি স্ট্রিটে এসে পৌঁছাল একটা বিশেষ বাড়ির সম্মুখে। এখানে পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী সাদা পোশাকে একজন কনস্টেবল পায়চারি করছিল।

ব্রজবিলাস এ-বাড়ির দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। জানত, দরজা ঠেললেই খুলবে। কারণ এটাই বারটনের ঠিকানা।

আর সে এটাও জানত তাকে এখন এখানে পাওয়া যাবে না, এবং সেটি অনুমান করেই নির্ভয়ে ঘরে টর্চ জ্বেলে বিদ্যুতের সুইচটা দেখে নিয়ে আলো জ্বালল। দেখা গেল ঘরে সব এলোমেলো ছড়ানো। তার মধ্যে ব্রজবিলাস কি যেন খুঁজতে লাগল। এবং নিজেনিজেই বলতে লাগল, একটা কোনও সূত্র নিশ্চয় পাব। অবশ্য না পেলে আর ব্রজবিলাসের মতো ডিটেকটিভ খুঁজবে কেন। শম্ভুকে ডেকে বলল, জান, শম্ভু, প্রত্যেক অপরাধী তার অপরাধের কোনও একটা প্রমাণ রেখে যায়। এবং তাকে সন্ধান করারও কোনও একটা সূত্র পিছনে ফেলে রেখে যায়। এই দেখ, খুব সহজেই পেয়েছি।

ব্রজবিলাস অনেক জিনিসপত্রের ভিতর থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ একখানা ডায়ারি পেয়ে গেল।

ঘরে দামি টেবিল ও চেয়ার কয়েকখানা। একটি লোহার সিন্দুক। টেবিলের ড্রয়ার ও সিন্দুক খোলা।

ব্রজবিলাস বলল, লোকটি দারুণ শক্তিশালী।

শম্ভু এ কথায় কি যেন ভেবে নিজের পেশি টিপে দেখতে লাগল। টাইগারের ল্যাজে আবার জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্রজবিলাস তার মুখখানা আদর করে নেড়ে দিয়ে বলল, দেখছ না টাইগার, প্রত্যেকটি আসবাব কত ভারি, একটু সরাতে গেলে কত জোর লাগে? টাইগার বুঝল। তার ল্যাজ নত হল।

ব্রজবিলাস তাড়াতাড়ি ডায়ারিখানা উলটে গেল। যা সে চায় তা পেয়েছে। লণ্ডনের এই ব্যবসাতে যে-কজন নির্বোধ এবং লোভী ধনীকে বারটন ঠকিয়েছে, তাদের সবার নাম ঠিকানা ওতে লেখা আছে।

এরপর ওরা সবাই ঘর থেকে বারটনের শোবার ঘরে গেল, যদিও সেখানে বিশেষ কিছুই দেখবার ছিল না। কিন্তু টাইগার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে পাশের একটি ঘরের বন্ধ-দরজা ঠেলতে লাগল। ব্যাপার কি? টাইগার নিশ্চয় কিছুর সন্ধান পেয়েছে। ব্রজবিলাসের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হতেই একটি ক্ষীণ কাতর ধ্বনি কানে এল।

দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ ছিল। ব্রজবিলাস তাড়াতাড়ি তার পকেট থেকে ধন্বন্তরী চাবি নিয়ে দরজা খুলে ফেলল। প্রত্যেক ডিটেকটিভের কাছেই এমন চাবি থাকে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল একটি টেবিল, দুখানা মাত্র চেয়ার এবং টেবিলে দুটি চায়ের

পেয়ালা। নীচে গুলিবিদ্ধ এক ভদ্রলোক। জামা রক্তে ভেজা। টাইগার ও শম্ভু স্তম্ভিত হল এ-দৃশ্য দেখে। দেহটি তখন সম্পূর্ণ মৃতবৎ। মুখে আর কাতর ধ্বনি নেই।

ব্রজবিলাস বলল, কাজটি যে এখানেই হবে ভাবিনি, মনে হয়েছিল মৃতদেহ এর বাড়ি গিয়ে তবে দেখতে পাব। কিন্তু এর নাম কি?

তাড়াতাড়ি মৃতের পকেট খুঁজে নাম পাওয়া গেল। ঠিকানা মিলিয়ে দেখল। বলল, এর বাড়িতে তাহলে আর যাবার দরকার নেই। কিন্তু ব্রজবিলাস যাকে একেবারে মৃত ভেবেছিল সে তখনও সম্পূর্ণ মারা পড়েনি। নাড়ি ধরে দেখল তখনও চলছে। কারণ সে তখনও একটিমাত্র কথা বলবার জন্য বেঁচে ছিল। ব্রজবিলাস যখন বলছিল 'এর বাড়িতে তাহলে আর যাবার দরকার নেই' ঠিক তখনই আহত লোকটি অস্ফুট স্বরে শুধু বলল ''বারটন''—তারপরেই সব শেষ।

পুলিশ ডেকে মৃতদেহ তার জিম্মা করে দিয়েই ব্রজবিলাস ছুটে বেরিয়ে এল পথে এবং একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা তিনজন প্রিন্স অ্যালবার্ট রোড দিয়ে রিজেন্টস পার্ক ঘুরে ব্রাডল' স্ট্রিটের একটি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

সেটি একটি হোটেল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মিস্টার রবার্টসন ঘরেই আছেন, কিছু আগেই তাঁর এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। নির্দিষ্ট ঘরে ওরা গিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার। আলো জ্বেলে দেখা গেল আহত রবার্টসন অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। ব্রজবিলাস গায়ে হাত দেবামাত্র আহত শুধু বলল ''না।''—তারপর সব শেষ।

হোটেলের লোক পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল।

ব্রজবিলাস বলল, যা ভেবেছিলাম।

তারপর মৃতদেহ পুলিশের জিম্মায় রেখে ওরা ছুটে চলল তৃতীয় ঠিকানায়, কেনসিংটন গার্ডনস্-এর উত্তরে হিলগেটের একটি বাড়িতে। সেখানে গিয়েও দেখা গেল মিস্টার জনস্টন আহত অবস্থায় শুয়ে। আত্মীয়েরা পুলিশকে ফোন করে অপেক্ষায় বসে আছে। ব্রজবিলাস তার গায়ে হাত দিতেই শেষ কথাটি উচ্চারণ করল ''থেকে।''

—তারপরই তার মাথাটা বেঁকে গেল।

তারপর ওরা ছুটে চলল আর এক ঠিকানায়। সেটি খুব কাছেই ছিল—পেমব্রিজ রোড। ট্যাক্সির মধ্যে ব্রজবিলাস সেই প্রথম মৃতের পকেটে যে ছোট্ট ডায়ারিখানা পেয়েছিল সেখানা খুলে বলল, মিস্টার ডেল কি বেঁচে আছেন এতক্ষণ? —ভরসা হয় না।

তার অনুমান ঠিক। ডেলের বিছানাও রক্তাপ্লুত। তার কাছে ঝুঁকে পড়তেই অস্ফুট স্বরে শুধু উচ্চারণ করতে পারল ''লণ্ডন''—তারপর আর নিশ্বাস চলল না। আত্মীয়েরা কিছুই জানে না, কে এসে খুন করে গেল।

ব্রজবিলাস অতঃপর ছুটে চলল আর্লস্ কোর্ট রোড ও ক্রমওয়েল রোডের সঙ্গমস্থলে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কোনও ফল হল না। মিস্টার বাডিংটনই ছিল তার শেষ ভরসা, কিন্তু দেখা গেল ঘাতকের অস্ত্রে সেও মৃতপ্রায়। কাছে যেতেই শুধু বলতে পারল ''পালাবে।'' বাড়িতে আর কেউ ছিল না।

ব্রজবিলাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—এই আমার জার্নি'জ এন্ড, —কারণ এই কটি নাম ও ঠিকানাই ওই ডায়ারিতে লেখা ছিল। বারটন তার সঙ্গীদের কাউকে জীবিত রাখল না, কেউ আর দেওয়া টাকা দাবি করবে না, কেউ আর হঠাৎ শত্রু ব'নে গিয়ে বারটনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না।

টাইগারের ল্যাজ সঙ্কোচে আবার নুয়ে পড়ল। শম্ভুও চিন্তান্বিত।

ব্রজবিলাস পাশের ঘরের একটা চেয়ারে বসে পাইপ ধরাল। এবং চিন্তাচক্রদুটি পায়ে পরে তিন মিনিট মেঝেয় ঘুরে নিল। ঘুরতে ঘুরতে ভাবছিল, ভদ্রলোক একা ছিল তাই এখানে হত্যার খুব সুবিধা হয়েছে। শম্ভু এবং টাইগার আদেশের অপেক্ষায় তার দিকে চেয়ে আছে। ব্রজবিলাস ওল্ড্ ইংলিশ তামাকের সঙ্গে এক গ্রেন গাঁজা মিশিয়ে নিয়েছে।

এতে চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে যায়।

স্বচ্ছ হতে সময় লাগল মাত্র পাঁচ মিনিট। ব্রজবিলাসের মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, অর্থাৎ বারটন লণ্ডন থেকে এতক্ষণে পালিয়েছে, সে সন্দেহ দূর হল পাইপে গোটাকত টান দিতেই। সে বুঝতে পারল সে লণ্ডনেই থাকবে। কিন্তু কি সাহস তার!

কিন্তু শম্ভু, শব্দগুলো কি মনে আছে তোমার?

মনে আছে—বারটন, না, লণ্ডন, পালাবে, থেকে।

ঠিক আছে। অর্থ অতি পরিষ্কার। শম্ভু, টাইগার, তোমরাও শুনে রাখ। ওই শব্দ পাঁচটি ছড়িয়ে আছে। জুড়ে নিয়ে একটা অর্থ কর, দেখতে পাবে ওরা সবাই মিলে বলতে চেয়েছিল একই কথা—বারটন লণ্ডন থেকে পালাবে না। আমি মনে মনে শব্দগুলি কুড়িয়ে নিয়ে একত্র সাজাতে সাজাতে পুরো বাক্যটি পেয়ে গেলাম। বুঝতে পেরেছ এবার?

শম্ভু অবাক। এত সোজা অথচ বুঝিনি।

টাইগার বুঝতে পেরেছে এবারে। তার ল্যাজ খাড়া উপরের দিকে এবং খাড়া নীচের দিকে দুবার উঠল এবং নামল। আমরা মাথা উপর-নিচু করে যেমন কোনও কথায় সায় দিই, টাইগার তেমনি ল্যাজ নেড়ে সায় দিল। এই হল ওর 'নড' করা। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে ল্যাজ ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে লাগল।

ব্রজবিলাস বলল, শম্ভু, একটা জিনিস আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। যারা খুন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধনী, অথচ বাড়িতে বাইরের লোক ঢুকে খুন করে গেল কেউ জানতে পারল না। একজনের বাড়ি—অর্থাৎ এই বাড়িটাই-বা খালি কেন?

শম্ভু বলল, ও রহস্য ভেদ করা আপাতত আমাদের এলাকার বাইরে মনে হয়, তাই না?

ঠিক কথা। তবু মনে প্রশ্ন জাগে তো?

কিন্তু আলাপ বেশিক্ষণ চলল না। টাইগার হঠাৎ ভীষণভাবে ডেকে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবে গিয়ে সে-এক দারুণ কাণ্ড। এবং কি হল বোঝবার আগেই অজ্ঞাত আততায়ী ব্রজবিলাসের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে এক আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলল, এবং একলাফে উঠে শম্ভুকেও আক্রমণ করল, এবং তাকেও মুহূর্তে অজ্ঞান করে ফেলল তার বিশেষ কৌশলে। কৌশলটি অন্ধকারেই ঢাকা রইল।

টাইগার মাত্র একবার আততায়ীর বুকে দাঁত বসিয়েছিল, এবং একবার ব্রজবিলাসের পকেট শুঁকেছিল, তা ভিন্ন সে আর কিছু করতে সাহস পায়নি অন্ধকার ঘরের মধ্যে। কিন্তু সেও এক আঘাতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আততায়ী যে কাছেই লুকিয়েছিল তা টাইগার আগে বুঝতে পারেনি, কারণ সকল আহত ব্যক্তির ঘরেই তার গন্ধ ছিল। একই গন্ধ এখানেও, তাই সে অতটা সতর্ক থাকতে পারেনি। গন্ধটা নতুন হলে এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারত না।

কিন্তু এখন সে অজ্ঞান, অজ্ঞান অবস্থায় সে-কথা এখন আর তার বুঝে কি লাভ?

বলা বাহুল্য আততায়ী বারটন। তার সময় বেশি নেই, একটু পরেই পুলিশের লোক আসবে, জানত। সে আলো জ্বেলে একটা বড় থলে সংগ্রহ করে তা থেকে তার শেষ শিকার বাডিংটনের যাবতীয় জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে তার মধ্যে তিনটি চেতনাহারা জীবকে হাত-পা বেঁধে পুরে ফেলল এবং থলের মুখ শক্ত করে বাঁধল। তারপর থলেটাকে টানতে টানতে নীচে নামিয়ে রেখে, দূরে-রাখা গাড়ি দরজার গোড়ায় এনে পিছনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে সেটাকে তুলে গাড়ি ছুটিয়ে দিল ডোভারের পথে। সেখানে কোনও উঁচু জায়গা থেকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, বারটন এত কষ্ট করে তা করবে কেন? করবে, তার কারণ আছে। তিনটি প্রাণীকে অজ্ঞান করে মেরে ফেললেই তো সব গণ্ডগোল মিটে যেত। কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। বাগে পেয়েও অপরাধী ডিটেকটিভকে মারে না। মেরে ফেললে আর গল্প হবে কি করে? তাই অপরাধীদের শাস্ত্রে একটা নিয়ম আছে, তারা ডিটেকটিভকে কখনও খুন করবে না।

আর খুন করতে চাইলেই কি খুন করা যায়?

অপরাধীরা তা ভালো করেই জানে, তাই তারা ডিটেকটিভদের নানা রকম শাস্তি দেয়, কিন্তু মেরে ফেলার বৃথা চেষ্টা করে না।

এখন বুঝতে পেরেছ, বারটন কেন ওদের খুন করার চেষ্টা করেনি? তাই বারটন ওদের থলেয পুরে সমুদ্রে ফেলে দিতে চলল।

মোটর ছুটে চলছিল বেপরোয়া। গভীর রাত, পথ প্রায় জনশূন্য। এদিকে ব্রজবিলাস শম্ভু এবং টাইগারকে বেঁধে থলেয় পোরাব কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের জ্ঞান ফিরে এল। তখন ওরা কি ঘটেছে ভাবতে লাগল। ব্রজবিলাস বলল, আমাদের জলে ফেলতে যাচ্ছে। আরও দু'একবার আমাব এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। একবার পাহাড় থেকে হাজার ফুট নীচে ফেলেছিল, কিন্তু থলে একটা গাছের ডালে আটকা পড়ায় ঝুলে ছিলাম একমাস। কিংবা তিনমাস। ঠিক মনে নেই। তারপর বেপরোয়া গাছ-কাটা নিষেধ হওয়াতে যখন গাছ-চোরেরা গোপনে নৌকাপথে গাছ কাটতে এল সেই দুর্গম স্থানে, তখন তাদের হাতে বেঁচে গেলাম, যদিও পরে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিলাম।

শম্ভু বলল, আমার কাছে ছুরি আছে, থলে কাটব?

না, আগে হাত-পায়ের বাঁধন কাটো, তারপর যখন গাড়ি থেকে থলে নীচে নামাবে তখন থলে কাটতে হবে।

টাইগার ল্যাজ নেড়ে এ-প্রস্তাব সমর্থন করল।

একঘণ্টা চলার পর গাড়ি থামল। নীচে সমুদ্রের মৃদু ঢেউ ভাঙার শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নেই। বারটন থলেটি গাড়ি থেকে নীচে নামাতেই শম্ভু থলে কেটে একলাফে প্রায় ব্যাঙের মতো লাফিয়ে উঠে বারটনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারটন প্রস্তুত ছিল না, তাই হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চকিতে সব বুঝতে পেরে শম্ভুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে আরম্ভ করল।

সে কি কুস্তি! একবার বারটন নীচে যায় একবার শম্ভু। শম্ভু বারটনের পায়ে পা জড়িয়ে তাকে চিত করে ফেলে তার উপরে চাপে, কিন্তু তক্ষুনি বারটন এক ঝাঁকুনিতে

শম্ভুকে নীচে ফেলে। এইভাবে গড়াতে গড়াতে দুজনে সেই উঁচু পাড় থেকে ঝপাং করে একশ ফুট নীচে ইংলিশ চ্যানেলে গিয়ে পড়ল। ব্রজবিলাস উদ্‌বেগে-লাঙুল-আন্দোলনরত টাইগারের পিঠ চাপড়ে বলল, ভালো হল, টাইগার! এবারে বারটনকে ধরার জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে।

শম্ভু সমুদ্রে পড়েই একটা হাত ফ্রান্সের দিকে ঘুরিয়ে কি দেখিয়ে দিল বোঝা গেল না, ব্রজবিলাস অবশ্যই বুঝে থাকবে। ব্রজবিলাসের পকেটে টর্চ ছিল, তা জ্বেলে রেখেছিল ওদের দিকে। তারপর ওরা যখন সম্পূর্ণ জলে ডুবে গেল তখন সে টাইগারকে নিয়ে বারটনের শূন্য গাড়িতে উঠে সমুদ্রতীর থেকে তীরবেগে ছুটে চলল লণ্ডনের দিকে। গিয়ে সোজা উঠল বেকার স্ট্রিটে। এখন সে নিশ্চিন্ত। এখন তার ঘাড় থেকে বিরাট বোঝাটা নেমে গেছে। অতএব খাওয়ার প্রশ্ন উঠল এবারে। শুনে টাইগার আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল।

খাবার ব্যবস্থাও ছিল ভালো। অতএব ওরা মহাতৃপ্ত। টাইগারের বিশ্রামের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে, ব্রজবিলাস বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমটা বেশ ভালোই হয়েছিল। ব্রজবিলাস সকালে উঠে নিজেই চা তৈরি করে নিল। শম্ভুতো ইংলিশ চ্যানেলে। ব্রজবিলাস চায়ের সঙ্গে খানকতক বিস্কুট খেল এবং টাইগারকে এক ডজন ডগ-বিস্কুট খাওয়াল। ওর খাওয়াটা ভালো হল না, কিন্তু এই একবার মাত্র। এরপর তো ওকে ইয়ার্ডেই রেখে আসতে হবে। শম্ভু ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে বোধ হয় আর দরকার হবে না।

ব্রজবিলাস কোট পরে ইয়ার্ডের দিকে বেরোবে, এমন সময় হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে পাইপ বার করতেই কি যেন একটা জিনিস হাতে ঠেকল। বার করে দেখে, বড় একটি হিরে।

কি ব্যাপার!

এটি এল কোত্থেকে?

এরই জন্য লণ্ডন শহর তোলপাড়! আর সেই হিরে আমার পকেটে!

টাইগার, ব্যাপার কি? এ কি ভূতের খেলা? সব খুলে বল।

টাইগার এগিয়ে এসে ব্রজবিলাসের গায়ে দুপা রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, তারপর তার বুক-পকেটে দাঁত বসিয়ে একটুখানি টানল, এবং মুখ নামিয়ে পাশের পকেটে গুঁজে দিয়েই সরে গিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

ব্রজবিলাস তবু স্তম্ভিত। মাথায় টাইগারের ইঙ্গিতটা ঠিক ঢুকছে না। এমন অবস্থায় কি করা যায়?

ঠিক। চিন্তা দরকার। তখুনি সে দুপায়ে চিন্তাচক্র-বেঁধে নিয়ে দুটি হাত পিছনে দিয়ে মেঝের উপর মাত্র চারপাক ঘুরতেই মাথার মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। চিন্তাচক্র খুলে ফেলে আগে গিয়ে টাইগারকে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করতে লাগল, আর বলতে লাগল, আমি কি বোকা!

চল, চল,—টাইগার, আর দেরি নয়। ব্রজবিলাস বুঝতে পারল বারটন যখন ওদের উপর অন্ধকার ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই সময় টাইগার তার বুক পকেট থেকে হিরেটি পকেট সমেত ছিঁড়ে নিয়ে ব্রজবিলাসের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ব্রজবিলাসের পকেটে বারটনের ছেঁড়া পকেটটিও ছিল হিরের সঙ্গে। ওটা কেন, এতক্ষণ বুঝতে পারেনি।

ব্রজবিলাস এখন ভীষণ গর্বিত। সে ইয়ার্ডে পৌঁছেই আগে নির্দেশ দিল, আন্তর্জাতিক পুলিশ ও ফরাসি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এবং ডানকার্ক থেকে বুলয়েন বন্দর পর্যন্ত তীরভূমি পাহারার ব্যবস্থা করুন।

কি ব্যাপার মিস্টার সরকার? কেস তাহলে ভীষণ জটিল?

একেবারে না। আমার নির্দেশ পালন করলে একেবারে সরল।

বুঝেছি, অপরাধী ডুবোজাহাজে—

না, ডুবোজাহাজে সে যায়নি। গেলে ফ্রান্সের তীরে না নেমে জারমানিতে অথবা স্পেনে যেত।

তাহলে কি সে চ্যানেল সুইমার? সাঁতার কেটে ওপারে যাচ্ছে?

দেখুন, সব বলব, কিন্তু আমার নির্দেশ পালনে দেরি করলে কেসটা কঠিন হয়ে উঠবে।

অল রাইট, এখুনি ব্যবস্থা করছি সব। কিন্তু আপনার সহকারী কোথায়?

সব পরে বলছি। কুইক—এক মিনিট দেরি নয়।

এরপর চারটি দিন ভীষণ উদ্‌বেগের সঙ্গে কেটে যাবার পর প্যারিস থেকে টেলিগ্রাম এল, বারটন ও স্যাম্বো ডাটা বুলয়েন বন্দরের কাছাকাছি তীরভূমিতে জলের ভিতর থেকে কুস্তিরত অবস্থায় উঠে এসেছে এবং কুস্তিরত অবস্থায় ওদের ধরা হয়েছে। এরপর কি করব জানান।

ব্রজবিলাস খবর শুনে লাফিয়ে উঠল।

ইনসপেকটর বলল, অপরাধী ধরা পড়েছে, এখন তাহলে বাকি রইল অর্ধেক।

ব্রজবিলাস গর্বের সঙ্গে বলল, অর্ধেক নয়, পুরো। হিরেও পেয়ে যাবেন, কোনও চিন্তা নেই।

সবাই মিলে বিশেষ পুলিশ-বিমানে আধঘণ্টার মধ্যে ওরা ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছল।

আন্তর্জাতিক পুলিশ ও ফরাসি পুলিশের লোকেরা বলল—আমরা সমস্ত দিন চারখানা হেলিকপটার উপকূল বরাবর পাহারা দিয়েছি। রাত্রে অনেকগুলি সার্চ লাইট জ্বেলে উপকূল দিনের মতো আলোকিত করেছি এবং হেলিকপটারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়েছি। উপকূলের এক ইঞ্চি জায়গাও আমাদের নজরের বাইরে যায়নি। কিন্তু একি কাণ্ড! দুজন মানুষ সমুদ্র থেকে কুস্তি করতে করতে উঠল কি করে? শুনলাম চারদিন ওরা সমুদ্রের তলায় কুস্তি লড়েছে। একবার বারটন শম্ভুর বুকে, একবার শম্ভু বারটনের বুকে—এইভাবে গড়াতে গড়াতে ডাঙায় এসে উঠেছে। এ কি করে সম্ভব?

ব্রজবিলাস বলল, অবাক হবার কিছু নেই। অপরাধীদের এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভদের নানাবিদ্যা শিখতে হয়, তারমধ্যে যোগব্যায়াম একটি। যাই হোক আপনাদের পাহারা দেওয়া যে সার্থক হয়েছে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু বারটনের কাছে তো হিরে পাওয়া যায়নি—মিস্টার ডাটা ওকে সার্চ করেছেন। পকেট ছেঁড়া। বোধহয় জলে পড়ে গেছে কুস্তির সময়।

ব্রজবিলাস বলল, তা নাও হতে পারে। হিরে উদ্ধার করতে এসেছি—হিরে ইয়ার্ডের হাতে পেয়ে যাবেন হিরের মালিক।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

সম্পূর্ণ। আমি ইচ্ছা করি, লণ্ডনে একটি বিশেষ পুলিশ-সভা করে সেইখানে সব প্রকাশ করব। আপনাদের সবাইকে আমি সেই সভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা

আসবেন। তিনদিন পরে সভার আয়োজন করতে চাই—ইয়ার্ডের সহায়তায়। সময় নিচ্ছি নানাদেশের পুলিশের লোক যাতে আসতে পারেন সে সভায়, সেইজন্য।

সবাই এ-প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করলেন। বললেন, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

যথানির্দিষ্ট তারিখে সে বেশ বড় সভাই বসল। নানাদেশের পুলিশের লোক, তার মধ্যে বেশির ভাগ ডিটেকটিভ। তারা সবাই অবাক হয়ে ব্রজবিলাসের বক্তৃতা শুনল। কীভাবে মুমূর্ষু লোকদের শেষ কথাগুলি জুড়ে অপরাধী যে লণ্ডনেই আছে তা বুঝতে পেরেছিল, তারপর কিভাবে পরের সব ঘটনা ঘটল তা একে একে বলল। শুধু হিরের কথাটি তখনও বলেনি। সবাই তারপর জিজ্ঞাসা করল, এইবার বলুন তো হিরেটা পাওয়া যাবে কিনা? মানে, আপনি উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা?

ব্রজবিলাস গর্বের সঙ্গে সেটি পকেট থেকে বার করে সবার সামনে হাত উঁচু করে তুলে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হর্ষধ্বনি আরম্ভ হল, যার হিরে সে ছুটে এসে ওটাকে ভালো করে দেখে আনন্দে ব্রজবিলাসকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! ছোট ছেলেকে যেমন বড়রা আদর করে তেমনি ওই হিরের প্রবীণ মালিক ব্রজবিলাসকে আদর করতে লাগল। আর তা দেখে সবাই ছুটে এসে ব্রজবিলাসকে জড়িয়ে ধরল। ব্রজবিলাস চিৎকার করে বলে উঠল, আমার সব কথা আগে শুনুন। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

তারপর যখন সবাই একটু শান্ত হল তখন ব্রজবিলাস বলতে লাগল, এ-অভিনন্দন সবটা আমার প্রাপ্য নয়, এমন কি খুব বেশিও আমি পেতে পারি না। আগে সেই কথাটা বলি।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল—এ হিরে উদ্ধারের সমস্ত কৃতিত্ব টাইগারের, আর অপরাধী ধরার কৃতিত্ব শম্ভু দত্তর—যাকে আপনারা স্যাম্বো ডাটা বলেন, তার।

এরপর ব্রজবিলাস আগে শম্ভুর অলৌকিক যোগব্যায়াম, এবং সেই সঙ্গে কুস্তি শেখার ওস্তাদিতেই যে বারটনকে ধরা সম্ভব হয়েছে, তা আগাগোড়া অতি চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করল। তা শুনে অনেকেই শম্ভুর কাছে যোগব্যায়াম শিখতে চাইল।

ব্রজবিলাস বলল, বড় বড় ক্রিমিন্যালরাও এই বিদ্যা জানে—বারটনও জানে। আর সেজন্য ওরা চারদিন সমুদ্রের জলে ডুবে লড়াই করেছে, অথচ ওরা কেউ বুঝতেই পারেনি যে, ওরা জলযুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। হাঁ, ওকে জলযুদ্ধ বলাই ভালো। এই বিদ্যা জানা না থাকলে ওরা দুজনেই মারা যেত, এবং তাতে হিরে উদ্ধারের আনন্দটা পুরো উপভোগ করা যেত না।

এই সময় কয়েকজন লোক কয়েক হাজার টেলিগ্রাম ওইখানে বিলি করে গেল। ঘটনা ইতিমধ্যেই বেতারের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এই আশ্চর্য-ঘটনায় পৃথিবী স্তম্ভিত। হাজার হাজার লোক অভিনন্দন পাঠিয়েছে ব্রজবিলাসের নামে, শম্ভুর নামে এবং অনেকে টাইগারের নামেও। এবং যদিও টাইগারের ভূমিকা তখনও কেউ জানত না, তবু ব্রজবিলাস টাইগারকে সহকারী-রূপে নিয়েছিল এটাই টাইগারের খ্যাতির পক্ষে যথেষ্ট। ভারতীয় সাঁতারুদের কাছ থেকেও অভিনন্দন পাঠানো হয়েছে অনেক!

ব্রজবিলাস টেলিগ্রামগুলো সরিয়ে রেখে বলতে লাগল আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, হিরে-উদ্ধারের সমস্ত গৌরব একমাত্র টাইগারের প্রাপ্য। আজ থেকে ওকে আমি বেঙ্গল টাইগার বলে ডাকব, এবং এই বেঙ্গল টাইগারই হিরে-উদ্ধারের জন্য আপনাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান পদকটিকে দাবি করতে পারে। বারটন যেমন চতুর তাতে সে হিরে জলে ফেলে দিত, তবু কোনও পুলিশ বা প্রাইভেট ডিটেকটিভের হাতে পড়তে দিত না। টাইগার চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে।

টাইগার এতক্ষণে তার প্রশংসায় লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিল। কিন্তু তার মুখ তুলে ধরে তার গলায় শ্রেষ্ঠ-সম্মান পদকটি পরিয়ে দেওয়া হল। সে এতে ভীষণ বিব্রত হয়ে ছটফট করতে লাগল, ভীষণ অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর এক পরমাশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য তো দূরের কথা—অষ্ট, নব, দশ, একাদশ আশ্চর্যও এখন আর আশ্চর্য নেই। কিন্তু এখন যা ঘটল তা প্রকৃতই এক আশ্চর্য কাণ্ড। টাইগার হঠাৎ মানুষের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গলা থেকে পদকটি খুলে ফেলল এবং সেটি ব্রজবিলাসের গলায় পরিয়ে দিতে দিতে বলল, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে...।

তারপর আর তাকে ওখানে দেখা গেল না। লজ্জায় পালিয়ে গেছে সে।

দর্শকদের মুখে কথা নেই। একসঙ্গে এত অলৌকিক কাণ্ডর কথা শোনা এবং অলৌকিক কাণ্ড দেখা—একেবারের আশাতীত কাণ্ড!

এরপর ব্রজবিলাস ও শম্ভু দিন সাতেক লণ্ডনে থাকতে বাধ্য হল, বড় বড় বাড়িতে ক্রমাগত ডিনার খাওয়া সহ্য করাই শক্ত।

ব্রজবিলাস ও শম্ভু বিমানে দেশে ফিরছে। এবারে আর সুপারসোনিক বিমানে নয়।

ব্রজবিলাস তার সেই অর্ধসমাপ্ত ডিটেকটিভ উপন্যাসখানার বাকি পৃষ্ঠাগুলো পড়া শেষ করে শম্ভুকে বলল, এমন আজগুবি সব লেখে, লোকে পড়ে কেন এসব, বলতে পার শম্ভু?

শম্ভু এ-প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে বলল, বোধ হয় সেই জন্যই পড়ে।

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

সুনির্মল বসু

সেদিন ভোরবেলা শহরের সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এই সংবাদটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

পাঁচশত টাকা পুরস্কার

বাগবাজারের গলিতে কে বা কাহারা একটি অজ্ঞাত বাঙালি যুবককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান যে দিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণাটি পড়ে আমাদের গোবিন্দদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোবিন্দদা'কে তোমরা চেন না? ওই যে যিনি ঘুঁটের ব্যবসা করে এক সময়ে বিস্তর টাকা উপার্জন করেছেন, যাঁর, অব্যর্থ ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন এক সময় সারা বাংলায় হুলুস্থুল লাগিয়ে দিয়েছিল!

ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন! তোমরা যে অবাক হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের অবাক হয়ে যাবার কথাই তো! তখন তোমরা নেহাত ছেলেমানুষ, জানবেই বা কেমন করে?

ছোট্ট ছোট্ট লাল শিশিতে নীল রঙের তরল ওষুধ, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র থাকত। ব্যবস্থাপত্রে ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত—"অতি সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, তাহাকে হাঁ করাইয়া এই অব্যর্থ পাচন এক ফোঁটা মুখে দিয়া দিবেন! খুব সাবধান, দেখিবেন পাচন খাওয়াইবার আগে যেন ছারপোকা মরিয়া না যায়! এই পাচন কার্যকরী না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।"

এই পাচন এখন আর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমরা এক-এক শিশি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতে!

তারপর গোবিন্দদার ভুঁড়ি-সংহারী মালিশ এক অদ্ভুত আবিষ্কার। যত বিপুল ভুঁড়িই হোক না কেন—এই মালিশের গুণে একদম আমসত্ত্বের মতো চুপসে যেত! ভুঁড়িতে মালিশ লাগাবার পর পনেরো দিন মাত্র উপোসের ব্যবস্থা—তারপরেই ব্যাস হাতে হাতে ফল! সে ওষুধও আজকাল আর বাজারে নাই।

যাক্—গোবিন্দদা এখন ওসব আবিষ্কারের পথ ছেড়ে দিয়ে সখের গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছেন। এমন উর্বর মস্তিষ্ক—তিনি আর ছোটখাট কাজে নষ্ট করতে রাজি নন। এই তো সেদিন তিনি একটা ডাকাতের দল প্রায় ধরে ফেলেছিলেন আর কি! অবশ্য জানা গেল,

সেটা ডাকাতের দল নয়, সেটা—কংসহারী যাত্রা-পার্টি।

এরকম ভুল অনেক বড় বড় গোয়েন্দারও হতে পারে। গভীর রাতে একদল লোক মুখে রং-চং মেখে ঢাল-তলোয়ার ছোরা-ছুরি নিয়ে যদি কোথাও যায়, কে-না তাদের ডাকাতের দল বলে মনে করে? গোবিন্দদারও তাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভুল তো নাও হতে পারত! কংসহারী যাত্রাপার্টি না হয়ে, হয়তো ধ্বংসকারী ডাকাতের দলও হতে পারত!

আর একবার একটা টুকরো চিঠির অংশ কুড়িয়ে পেয়ে গোবিন্দদা একটা হত্যার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন আর কি! চিঠির টুকরোতে লেখা ছিল—

আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে......

তারপর অবিশ্যি চিঠির অপর অংশও পাওয়া গেল—সে দুটো অংশ জুড়লে দাঁড়ায়:

প্রিয়নাথ,

বরিশাল থেকে যে রসগোল্লা এসেছে সেগুলো আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। নাহলে পচে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি নিশ্চয়ই এসো। ইতি,

সুধীন—

গোবিন্দদা সেদিন ষড়যন্ত্র ধরতে গিয়ে খুব একচোট রসগোল্লা খেয়ে এসেছেন, —এতে তাঁর লাভ-বই লোকসান কিছু হয় নাই।

যাক্, এইবার তোমাদের আসল গল্পটা বলি।

সেদিনকার খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে গোবিন্দদা মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি গোপনে এই ব্যাপারের তদন্ত করে পুলিশকে সাহায্য করবেন। ফাঁকতালে যদি পাঁচশো টাকা লাভ করা যায়, তা এই মাগ্যির বাজারে মন্দ কি! আর টাকা না পেলেই বা কি, খবরের কাগজে যখন বড় বড় করে গোবিন্দদার বাহাদুরীর খবর বেরুবে —তখন....গোবিন্দদাকে আর পায় কে?

সেদিন রাত্রি বারোটায় গোবিন্দদা বাসে চড়ে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অত রাত্রে বাসে বেশি কেউ ছিল না। ঠিক সামনের আসনে দু'জন ভদ্রলোক আর ঠিক তার পিছনে বসে গোবিন্দদা।

বাঙালি দু'জনের মধ্যে একজনের খুব রোগা ছিপছিপে চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে কালো চশমা, আর একজনের বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা!

ফাঁকা রাস্তায় বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে। গোবিন্দদা অন্যমনস্ক—সেই হত্যা-রহস্যের এখন পর্যন্ত কোনও কূলকিনারা পান নাই।

হঠাৎ তাঁর মনে হল সেই রোগা লোকটি তার সঙ্গীকে বলছে,—"গোবর্ধনকে মেরে ফেল্লাম।"

সঙ্গী প্রশ্ন করল, "কি করে?"

"বিষ খাইয়ে।"

এই পর্যন্ত, ব্যাস্!—গোবিন্দদার চোখ দুটি জ্বলজ্বল্ করে জ্বলে উঠল, আগুনের মতো গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল,—ওঃ একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে! পাছে কোনও রকমে সন্দেহ করে—তাই গোবিন্দদা মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে লোকদুটোর উপর কড়া

নজর রাখতে লাগলেন। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই কিছুতেই।

বাগবাজারের মোড়ে লোক দুটো নামল।—হ্যাঁ—এই বাগবাজারের কোনও গলিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ? তোমরা ঘোরো ডালে ডালে, গোবিন্দদা ঘোরেন পাতায় পাতায়!

গোবিন্দদা বামদিকে নেমে চুপে চুপে খুনি লোকটিকে অনুসরণ করে চললেন। বাড়িটা জেনে এক্ষুনি পুলিশে খবর দিতে হবে।

ওই যে বাড়ি, গ্যাসের আলোতে বাড়ির নম্বরটা বেশ পড়া যাচ্ছে—১৫ নম্বর। আচ্ছা দাঁড়াও।

গোবিন্দদা পুলিশে ফোন করলেন—"হ্যালো, শিগ্‌গির আসুন, হত্যাকারীকে ধরেছি, ঠিকানা ১৫ নং—স্ট্রিট, আমি বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করছি।"

পুলিশ এল, গোবিন্দদা সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই আসামি।"

তারপরের দিনের ঘটনা। গোবিন্দদা মুখ চুন করে বাড়ি এলেন। তিনি আমাদের কিছু বললেন না বটে, তবে আমরা খবর পেলাম গোবিন্দদা হত্যাকারী সন্দেহ করে একজন উদীয়মান সাহিত্যিককে ধরেছিলেন।

সাহিত্যিক বেচারীর একটি উপন্যাস সাময়িক একটা কাগজে প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছিল। সেই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছেন গোবর্ধন। সেই গোবর্ধন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে—পরের সংখ্যায় এই বিষয়টি বেরুবে—তাই সাহিত্যিক বায়োস্কোপ দেখে ফিরবার পথে সেই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। গোবিন্দদা অতটা বুঝতে পারেননি।

তা গোবিন্দদার আর কি দোষ ? ভুল তো সকলেরই হয়।

শার্লক হোমস দি সেকেণ্ড!

শিবরাম চক্রবর্তী

সবে মাত্র অমল বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছে এমন সময়ে—একটু আশ্চর্যই বই কি!

কোনান্ ডয়েলের লেখা শার্লক হোমসের [illegible], গত কদিনের (এবং রাতও বাদ যায়নি) প্রাণপণ চেষ্টায়, আজ সকালে এইমাত্র শেষ করে বুবুর দিদিকে বইটা ফেরত দেবার সদিচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই দুয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের গলির বাঁকটা পেরিয়েছে কেবল।

তখন কে জানত যে আজই, অবিলম্বেই, তাকে শার্লক হোমসের মতোই দুঃসাধ্য এবং দুর্ভেদ্য এক সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে? এবং সেই বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দার মতোই, সমস্ত জটিলতার অত্যন্ত সরল সহজ আর অনিবার্য সমাধান কেবল তার মাথার ওপরেই নির্ভর করবে?

একমাত্র তার মাথার ওপরেই—হ্যাঁ—শীতকালের সেই দুরন্ত আর উড়ন্ত মশাদের মতো তার মাথার ওপরেই নির্ভর করে থাকবে—সমস্যা এবং সমাধান দুই-ই—এ কথা কে আগে ভাবতে পেরেছিল?

গলির মোড়ে ডাকবাক্সটার কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়ে গেল। বলতে গেলে, ভদ্রলোকই তার ঘাড়ে এসে পড়লেন। অশ্রুপ্লুত একজন ভদ্রলোক!

চোখের জলে দুচোখ তাঁর ঝাপসা—সুতরাং ভদ্রলোককে কোনও দোষ দেয়া যায় না। এবং অমলেরই বা কী অপরাধ? আকস্মিক উল্কাপাত সেই বা কি করে আটকাতে পারে?

অতি কষ্টে ভদ্রলোকের কবল থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে, নিজের মুখের অশ্রুজল মুছে ফেলে অমল বলল: ‘‘ধেৎ তেরি!’’

না, অমল কাঁদেনি, ওপরচড়াও সেই ভদ্রলোকের অশ্রুপাতই তার নাকে মুখে চোখে এসে লেগেছিল।

নাক মুছতে মুছতে অমল আবার বলল: ‘‘বিচ্ছিরি!’’ এবং ভালো করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখল। ‘‘এ কী রকম ভদ্রতা?’’—প্রায় এ কথা সে বলতে যাচ্ছিল আর কি, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র সে সামলে নিল। ভদ্রলোকের বেদনাকাতর মুখ, ড্যাবড্যাবে দুই চোখ এবং হাতে একখানা খামের চিঠি, বোধকরি ডাকবাক্সে ছাড়তেই যাচ্ছিলেন—এবং চেহারার মধ্যে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার গোঁফ জোড়া—দীর্ঘনিশ্বাসের তোড়ে তারা ওঠা-নামা করছে।

অমলকে দেখে, এবং খুব সম্ভব, ধাক্কাটা খেয়ে, ভদ্রলোকও নিজেকে অনেকটা সম্বরণ করে এনেছিলেন। করুণ কণ্ঠে তিনি বললেন: ''আমার পকেটবইটা আমি পাচ্ছিনে।''

''তার আমি কি করব?'' চটে মটে বলল অমল, ''আমি কি নিয়েছি যে আমাকে এসে গুঁতোচ্ছেন?''

ভদ্রলোকের হা হুতাশ কিন্তু বেড়েই চলল ক্রমশ: ''আমার পকেটবই। তাতে আমার পাঁচ পাঁচখানা নোট ছিল, দশ টাকার পাঁচখানা—পঞ্চাশ টাকা—যাকগে, তাতে আমার দুঃখু নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা জিনিস আমার গেছে, পাঁচ হাজার টাকা দিলেও যা কোনওদিন আমি ফিরে পাব না—''

ভদ্রলোক হায় হায় করতে লাগলেন।

অমল জিগ্যেস করল: ''গেল কোনখানে?'' কৌতূহল তার বিরক্তিকে দমন করে ওঠে।

''তা কি করে জানব? হারালো, কি খোয়া গেল, কিম্বা, পকেট থেকে কেউ তুলে নিল কিনা তা আমি বলতে পারিনে। আমি ডাকবাক্সে একখানা চিঠি ছাড়তে এসেছিলাম—'' ভদ্রলোকের হাতের খামখানা দেখে অমলের সেটা অনুমান করা খুব কঠিন হয় না—''আর এর মধ্যেই ওটা উধাও হয়েছে!''

অমলের অন্তর্গত শার্লক হোমস এবার গজ্ গজ্ করতে থাকে, সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে: ''তা গেছে ভালোই হয়েছে, আপনি কাঁদছেন কেন? না হারালে কি কোনও জিনিস পাওয়া যায়? আগে খোয়া যাক তারপর তো! খোয়া গেলে তখন ফিরে পেতে কতক্ষণ? আপনি বলুন তো, ঠিক কোনখানে ওটা উপে গেল, দেখি কোনও ক্লু পাই কি-না!''

ভদ্রলোক হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন: ''আমাকে কি আর জানিয়ে গেছে বাপুহে! আমি কি করে জানব?'' এবং পরমুহূর্তেই তিনি হাঁউ মাঁউ করে ওঠেন—

''আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। ও হো হো! আমার পকেটবুক—আমি চিরদিন ওকে বুকে ধরে বুক পকেটে করে রেখেছিলাম যে!—আমাকে না বলে কয়ে কার পকেটে চলে গেল গো!—ও হো হো হো হো—!''

ভদ্রলোকের তোবড়ানো গাল বেয়ে অশ্রুপ্রপাত গড়িয়ে আসে।

অমল ভেবে দেখল, সমস্যা সামান্য নয়—পকেটবই এক নম্বর, এবং স্বয়ং ভদ্রলোক হচ্ছেন নম্বর দুই। কিন্তু সেই বা কি করবে? একেবারে কোনও ক্লু না পেলে, এবং সে-বিষয়ে ভদ্রলোকের কোনও সাহায্য না পেলে কি করে সেই নষ্ট রত্ন সে পুনরুদ্ধার করবে? আসল শার্লক হোমসই বা এরকম বিদঘুটে অবস্থায় কি করতে পারতেন?

''হ্যাঁ, সেই মূল্যবান—না অমূল্য—কী আরেকটা জিনিস ছিল না আপনার পকেটবইয়ে—যার কথা আপনি বলছিলেন যে?—''

''লাখ টাকা দিয়েও তা ফিরে পাবার নয়। আমার মেয়ের ফোটো—আমার একমাত্র মেয়ে—এখন আর সে বেঁচে নেই—তাকে হারিয়েছি, এখন তার ফোটোও হারালুম—আর কী থাকল আমার তরে?''

অমল সান্ত্বনা দ্যায়: ''আপনি ভাববেন না, আমি ফিরিয়ে এনে দেব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!—''

ড্যাব্‌ড্যাবে চোখকে আরও ড্যাব্‌ড্যাবে করে ভদ্রলোক চেয়ে রইলেন: ''তুমি ফিরিয়ে এনে দেবে! কে তুমি?''

অমল লজ্জিত হয়ে বলল: ''তা আমি পারব। আমাকে দেখে আপনি কিছু টের পাবেন না আমার। আপনি শার্লক হোমসের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস? তাঁর কাছেই আমার গোয়েন্দাগিরি শেখা—যদিও অনেকটা একলব্যের মতোই—তবু আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। কেবল এক আধটা ক্লু পেলেই আমার হয়ে যায়, একটা ক্লু দিতে পারেন আমাকে? আধখানা হলেও চলে।''

''তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবে?'' ভদ্রলোকের বিস্ময় তাঁর এতক্ষণের বিলাপকেও ছাপিয়ে ওঠে: ''বলো কি হে তুমি?''

''মেয়েটাকে হয়তো পারবনা, কিন্তু তার ফোটোটাকে, পকেটবই সমেত, ফেরত আনতে পারব, এরকম আশা করি।''

''তা যদি পারো, তাহলে ওই পঞ্চাশ টাকা ওর সমস্তই তোমার। তা দিয়ে তুমি—তুমি—'' একটু আনচান করে বলেই ফেললেন ভদ্রলোক: ''তুমি বায়স্কোপ দেখো, কিম্বা—কিম্বা—চকোলেট খেয়ো। অথবা—অথবা—লজেঞ্চুস—যা তোমার খুশি।''

''আপনি কী যে বলছেন! শার্লক হোমসের সাকরেদদের কি চকোলেট খেলে চলে?—'' অমল নিজেকে ঈষৎ অপমানিত জ্ঞান করে: ''কত বড় বড় দায়িত্ব তাদের মাথায়। গুরুতর দায়িত্ব সব। লজেঞ্চুস চুষবার কি ফুরসত আছে তাদের?''

''কেন, চকোলেট এমন খারাপ কি? পেলে এক্ষুনি আমি খাই। এই দুঃখের মধ্যেই খেয়ে ফেলি। ওর মতো দুঃখ নিবারক আর কি আছে? একটা ফেলকরা ছেলেও চকোলেট পেলে ফেলের দুঃখ ভুলে খেয়ে ফেলে। চকোলেট পেলে পাশ করতেও চায়না! বারম্বার ফেল যাবার যত দুঃখ আমি তো চকোলেট চেখেই লাঘব করেছি? আছে নাকি তোমার কাছে? চকোলেট?''

অমল একটু ইতস্তত করে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, পকেট থেকে নেসলসের একখানা অবশেষে বার করে দ্যায়। ভদ্রলোক সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নেন। তারপরে অত্যন্ত সযত্নে, সন্তর্পণে, ওর চকচকে কাগজের মোড়ক খুলে, সেই খোলাটি—মানে সেই মোড়কখানাই—মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে—চকোলেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দ্যান।

অমল অবাক হয়ে দ্যাখে।

এবং শার্লক হোমস তার পেটের মধ্যে গজ্ গজ্ করতে থাকে।

''আপনার বাড়ি কদ্দুর? কোথ্থেকে আপনি এই লেটার বক্সে চিঠি পোসট করতে এসেছেন?'' অবশেষে জিগ্যেস করে সে।

অনতিদূরবর্তী একটা লালরঙের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে উনি জানান—''ওরই একটা ফ্ল্যাটে দিনকয়েক হল এ-পাড়ায় এসে আমি উঠেছি। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। এই পথের মধ্যে কোথ্থাও ওটা পড়েনি—প্রায় বার দশেক এইটুকু রাস্তা এতক্ষণ ধরে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, তা হলে আমার চোখে পড়ত!—''

''তা বটে! কিন্তু সেকথা আমি বলছিনে! আপনার পকেটবই আমি পেয়ে গেছি বলতে গেলে। এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে—'' অমল বলল: ''আপনার চকোলেট চাখবার মধ্যেই আমার ক্লু মিলেছে। আপনার পকেটবই যে কোথায় রয়েছে তা আমি জানি।

তবু—আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি, তথাপি জিগ্যেস করি, আপনাকে—আপনি যে-চিঠিখানা হাতে করে ডাকে দিতে এনেছিলেন, সেটা ডাকবাক্সে ছেড়েছেন তো?''

''হ্যাঁ, নিশ্চয়! চিঠি ছেড়েচি বই-কি! ফেললাম সে তো অনেকক্ষণ!''

''তাহলে ঠিকই হয়েছে। ডাকবাক্স খোলার পিয়ন ওই আসছে দাঁড়ান!''

কয়েক সেকেণ্ড পরে, পিয়ন ডাকবাক্স খুলতেই, সেখান থেকে পকেটবই উদ্ধার করে অমল ভদ্রলোকের হাতে দিল।

ভদ্রলোক তার থেকে মেয়ের ফোটোটা বার করে বার কয়েক দেখে নিজের বুক পকেটে রাখলেন। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন—''এসব দুর্লভ জিনিস পকেটবইয়ে রাখা নিরাপদ নয়, নিজের কাছে রাখাই ঠিক। না, আর আমি একে কাছছাড়া করছিনে, তাছাড়া তোমাকে ফের আমি পাচ্ছি কোথায়?''

ভদ্রলোকের অপার্থিব উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজের বাহাদুরিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিল অমল, সকৃতজ্ঞ হয়ে সে বলল: ''সেকথা ঠিক! শার্লক হোমসের সাকরেদরা তো সবজায়গায় চরছেনা সচরাচর।''

''কিন্তু যা বলেছি। এই পঞ্চাশটাকা তোমার। এর একখানাও আমি নিচ্ছিনে—ফোটো ফিরে পেয়েছি সেই আমার ঢের। এজন্যে তোমাকে এবং তোমার গুরুদেবকে—কী নাম বললে? রবার্ট ব্লেক্?—দুজনকেই আমার ধন্যবাদ। এই নোটগুলো তুমি নাও, নিলে আমি খুশিই হব, আর ওই পিয়নটাকে কী দিই বলতো? এই পকেটবইখানাই বরং দিয়ে দি' ওকে—এর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ও চিঠি লিখবে এখন। কবিতাও লিখতে পারে—যা ওর খুশি!—''

এই বলে, অদ্ভুত সেই ভদ্রলোক, পিয়নটাকে নোট পাঁচখানা, আর পকেটবইটা অমলের হাতে গুঁজে দিয়ে তরতর করে ফিরে চললেন।

অমল পেছন থেকে ডাক দিল—''ও, মশাই! আপনার চিঠিখানা ডাকে দিতে ভুলে গেলেন যে ফের। যেমন হাতে করে এনেছিলেন তেমনি হাতে করেই---''

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভদ্রলোক তখন আনন্দের আবেগে টগবগ করতে করতে চলেছেন।

হীরক রহস্য

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

বেলা তখন আন্দাজ একটা; খাওয়া দাওয়ার পর হুকা-কাশি বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময় বেয়ারা অমৃত একখানা ভিজিটিং-কার্ড এনে উপস্থিত করল। একবার সেদিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন নামটা অচেনা। ''সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এসো''—বলে খবরের কাগজখানা তিনি এক পাশে সরিয়ে রাখলেন।

একটু পরেই প্রৌঢ়-বয়সী যে বাঙালি ভদ্রলোকটি ভিতরে ঢুকে হুকা-কাশিকে অভিবাদন জানালেন, তাঁর পানে মুহূর্তকাল তাকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে হল। বাস্তবিকই কার্ডে লেখা নামটা আগে থেকে দেখা না থাকলে ইনি যে বাঙালি তা বুঝতে হুকা-কাশির মতো লোকেরও কষ্ট হত। প্রায় সাহেবের মতোই ধবধবে রঙ, পা থেকে গলা পর্যন্ত নিখুঁত সাহেবি পোশাক, চলবার এবং কথা বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত সাহেবি ধরনের। ভদ্রলোকের মুখখানা কিন্তু বড়ই মলিন, চোখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। আগন্তুকটিই প্রথম আলাপ শুরু করলেন, বললেন, ''আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমাদের ফার্মটার নাম সম্ভবত আপনি শুনেছেন। ''

''কোন্ ফার্ম?'' হুকা-কাশি প্রশ্ন করলেন।

''সেন এণ্ড সরকার লিমিটেড—জুয়েলার্স।''

হ্যাঁ, এ নাম হুকা-কাশি শুনেছেন বটে। সাধারণত জুয়ে র্ বা মণিকার বলতে যা বুঝায় এঁরা তা থেকে একটু স্বতন্ত্র রকমের। অবশ্য হীরা-ব বত এঁরাও বেচেন বটে, কিন্তু কারবারের প্রধান কাজ হীরা পালিশ এবং কাটাই করা। এঁরা দমদমে ছোটখাট একটা কারখানা খুলেছেন, সে খবরও হুকা-কাশি রাখেন। ঠিক বিলাতি কায়দায় না হলেও কারখানাই বটে।

আগন্তুক—তাঁর নাম মিস্টার সেন—আবার বললেন, ''আমিই এ কারবারের সিনিয়ার পার্টনার। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডামে কুড়ি বছর হাতে-কলমে কাজ শিখে এসে এখানে ব্যবসার পত্তন করেছি। কাজকর্ম চলছিলও ভালোই, কিন্তু মিস্টার হুকা-কাশি, হঠাৎ আমার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।''

হুকা-কাশি একটু নড়ে চড়ে বললেন, ''সব কথা আমায় খুলে বলুন।''

''বিঘাউনির রাজার নাম শুনেছেন বোধ করি, তিনি আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। দিন কতক আগে তাঁর কাছ থেকে একখানা হীরা আসে, সেখানাকে হালফ্যাসান অনুযায়ী

কেটে পালিশ করে দিতে হবে। কালকে কারখানায় আমাতে আর আমার পার্টনার সরকারেতে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়; হীরাখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি বেশ করে দেখিয়ে দিই যে কি ভাবে কাটলে ওখানার জলুস সব চাইতে বেশি খুলবার সম্ভাবনা। ঠিক হয় আমার উপদেশমতো, আমার সম্মুখে আজ ওটা কাটা হবে। কাল আমার সময় ছিল না, কাজের তাড়ায় বার হতে হয়েছিল। দিনের শেষে কাল যখন কারখানা বন্ধ করা হয় তখনও ওখানা ঠিক জায়গাতেই ছিল। তারপর হীরার কেস বন্ধ করে চাবি দেওয়া হল। কিন্তু আজ কারখানায় এসে দেখতে পেলাম কেসে হীরাখানা নেই, তার খোলটা খালি পড়ে রয়েছে—অর্থাৎ রাত্তির বেলায় হীরাটি চুরি গেছে। অথচ কি ভাবে যে হীরা চুরি যেতে পারে আকাশ-পাতাল ভেবেও আমরা তার কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। সমস্ত কারখানাটির একটি বর্ণনা দিলেই ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন। যে প্রকাণ্ড হলঘরটাতে আমাদের কাজ হয়—হীরা থাকে—সেটা থেকে বাইরে বেরোবার একটি মাত্র দরজা, সারা ঘরে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। ল্যাচ্-কী দিয়ে সে দরজা খোলা হয়, বন্ধও হয় সেইভাবেই। আমার আর মিঃ সরকারের হাতেই শুধু তার চাবি, আর কারও হাতে সে চাবি কখনই পৌঁছুতে পায় না। দরজার পরেই বাইরে শক্ত লোহার কোলাপসিবল্ গেট, তারও চাবি শুধু আমাদের দু-জনার কাছে। কারখানা ছুটি হলে প্রত্যহ আমি নিজ হাতে প্রথমে ভেতরের দরজা, তারপর কোলাপসিবল্ গেট বন্ধ করে দিই। হলের ভেতর আলো আসবার জন্য অনেকগুলি জানালা অবশ্য রাখতে হয়েছে, তবে সেগুলো মানুষের নাগালের অনেকখানি উঁচুতে। সবগুলো জানালাতেই প্রথমত মোটা মোটা লোহার শিক, তার ওপর আগাগোড়া মিহি তারের জালে ছাওয়া। মাছিটিরও গলবার জো নেই। জানালার পাল্লা আগাগোড়া লোহার, কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে সেগুলো এঁটে দেওয়া হয়। ঘরের ভেতর কাজ চলবার সময় যে-সব আবর্জনা জঞ্জালের সৃষ্টি হবে তা পর্যন্ত একটু নড়চড় হবার উপায় নেই। হলের সঙ্গে লাগানো চৌবাচ্চার মাপের প্রকাণ্ড উঁচু আর একটা ঘর আছে—শুধু একটা নর্দমা দিয়েই হলঘরের সঙ্গে তার যোগাযোগ। এটাকে আমরা বলি চৌবাচ্চা-ঘর। ওই নর্দমা পথে সমস্ত জঞ্জাল চৌবাচ্চা ঘরে এসে জড় হয়। এই চৌবাচ্চা-ঘরে ঢোকবারও শুধু একটিমাত্র দরজা, চাবি থাকে কেবল আমার আর মিঃ সরকারের কাছে। আমরা দু-জনা ছাড়া এ ঘরে অন্য কারও ঢুকবারই হুকুম নেই। রোজ বিকাল পাঁচটায় কারখানা বন্ধ হলে আমি এসে জঞ্জালগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার বন্ধ করে চলে যাই। হলঘরে তবুও জানালা রয়েছে, এখানে সে বালাইও নেই, থাকবার মধ্যে আছে কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য ছাতের কাছাকাছি দেওয়ালের গায়ে দুটো ছোট ছোট ফোকর—মোটা শিক সেখানেও এমনিভাবে বসানো যে মানুষের সাধ্য কি সেখানে কোন রকম দন্তস্ফুট করে। মেঝের ওপর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরের ছাদ চোদ্দ ফুট। দিন রাত বন্দুক-কাঁধে বরকন্দাজ পাহারা দিচ্ছে—একজন চৌবাচ্চা-ঘরের কাছে, একজন ঠিক তার উলটো দিকে। একতলায় কারখানা, দোতলায় আমার কোয়ার্টার। আজ বেলা দশটায় কারখানা খোলবার সময় বরাবরকার মতোই বিশেষ লক্ষ করে গেছি, দরজা-জানালা কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ নেই। হীরার কেসগুলোও দিব্যি তালাবন্ধই আছে। কাজেই কিভাবে যে হীরাখানা খোয়া যেতে পারে তা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। আপনি হয়তো বলবেন, কাজ করাবার সময় কারিগরদের ভেতরেই কেউ হয়তো এ-দুষ্কর্মটি করেছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মিস্টার হুকা-কাশি, তা একেবারেই

অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে আমাদের ওখানকার নিয়মই হল যে, এই একবার কাজের ঘরে ঢুকলে কারখানা বন্ধ হবার আগে আর কেউ সে-ঘর থেকে বাইরে আসতে পাবে না। টিফিনের সময়ও জলখাবার খেতে হবে ওই ঘরেরই ভেতরে—যার যা খেতে অভিরুচি বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশন দিয়ে জলের কল, বাথরুম সমস্তই করে রাখা হয়েছে। বাইরে আসবার কোন দরকার নেই। কাজের ঘন্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র ভিতর-দরজাটা আমরা বন্ধ করে দিই, আর সেই বন্ধ দরজার এপাশে সারাক্ষণ একটা দরোয়ান মোতায়েন থাকে। মিঃ সরকার এবং আমি ছাড়া সারাদিনে ওঘরে আর কোনও প্রাণীর ঢোকবার উপায়ও নেই, হুকুমও নেই। তারপর ছুটির ঘন্টা বেজে গেলে কারিগরদের একে একে দরজার সামনে আনা হয়, তন্নতন্ন করে তাদের দেহ তালাস করে তবে আমি ফটকের বাইরে যেতে দিই। বিশ বছর আমস্টার্ডামে চাকরি করে এসেছি, হীরা সরিয়ে নেবার যত রকম সম্ভব-অসম্ভব ফন্দি-ফিকির আছে কোনটাই আমার জানতে বাকি নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার চোখে ধুলো দিয়ে কেউ যে সরে যেতে পারেনি, এ-কথা ধ্রুব সত্য। আর তাছাড়া তার তো প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে—দিনের শেষে কেস বন্ধ করবার সময় হীরা তো কেসেই ছিল দেখা গেছে। এক ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া এ রহস্যের তো আর কোনও সমাধানই আমি দেখতে পাই না। অথচ সময়মতো রাজাবাহাদুরকে তাঁর হীরা ফিরিয়ে দিতে না পারলে আমাদের দশা কি হবে একবার ভেবে দেখুন আপনি।'' ভদ্রলোক হাতের তেলোর ওপর কপালের ভর রেখে ম্রিয়মানভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

হুকা-কাশি ধীরে ধীরে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, ''হুঁ, হীরা চুরির ব্যাপারটা আজকাল কলকাতায় একটু সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আপনি নন, আরও দু-একজন মণিকার এ-বিষয়ে আমার পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন।....আচ্ছা আপনি এখন দমদমায় ফিরে যান, ঘন্টাখানেক বাদেই আমি আসছি।''

মিস্টার সেন গিয়ে মোটরে উঠতেই হুকা-কাশি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন, ''হ্যাল্লো..কে রণজিতবাবু? ভারি ইন্টারেস্টিং—আর একটা হীরা চুরির কেস! হ্যাঁ, এবারে দমদমার সেন এণ্ড সরকার কোম্পানি থেকে। হাতে সময় আছে? একবারটি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে ওখানে?—আধ ঘন্টার মধ্যেই আসছেন? আচ্ছা, আমি তাহলে তৈরি হয়ে থাকি।''

যথাসময়ে, রণজিতকে সঙ্গে করে হুকা কাশি দমদমার সেন এণ্ড সরকারের কারখানায় এসে উপস্থিত হলেন। মিঃ সেন ফটকের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন, অল্প পরে মিঃ সরকারও এসে জুটলেন। হুকা-কাশি বললেন, ''সময় নষ্ট না করে প্রথমেই চলুন অকুস্থানে যাওয়া যাক, মানে যেখান থেকে হীরাখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে।''

দরজা খোলা হল, চারজনেই প্রকাণ্ড হলটার ভিতরে এসে ঢুকলেন। সে-সময়টা টিফিনের, কারিগরেরা কাজকর্ম ছেড়ে ঘরের মধ্যেই যে যার টিফিন খেতে বসে গেছে—কেউ ক্যারিয়ারের বাটি থেকে রুটি-তরকারি বের করছে, কেউ বা গুড় দিয়ে চিড়া খাচ্ছে। কারও কারও আবার স্বাস্থ্যকর জিনিসের ওপর ততটা লক্ষ নেই, মুখরোচক হলেই হল। তারা ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে বের করছে ঝুরিভাজা। কেউ-বা দুনিয়ার একমাত্র সার বস্তুটাকেই শুধু চিনেছে, অর্থাৎ সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও থার্মোফ্লাস্ক খুলে ফেলছে কেবল বাটি বাটি চা। রণজিত একটু হেসে মিঃ সেনকে লক্ষ করে বলল, ''নাঃ, আপনার কারিগরদের ভোজন-বৈচিত্র

আছে বলতেই হবে; কেউ কেউ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেজায় সতর্ক, আবার কেউ কেউ সে বিষয়ে কোন তোয়াক্কাই রাখে না।''

হুকা-কাশি টিপ্পনি কাটলেন, ''অর্থাৎ খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ, এই তো? কিন্তু কেউ কেউ আবার বিশেষ অজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ—দুই-ই। ওই দেখুন, পাছে বাতাস লেগে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ওই লোকটা খাবারের বাক্সে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটো করে নিয়েছে। অথচ খাবার বেলায় খাচ্ছে তেলেভাজা বেগুনি —এককথায় যাকে সদ্য বিষ বললেই চলে!''

মুখে রসিকতা করতে থাকলেও হুকা-কাশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত ঘরখানাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতেছিলেন; গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ''বাস্তবিকই আপনাবা একটি অভেদ্য দুর্গই তৈরি করে রেখেছেন, মিঃ সেন। কোন বাইরের লোকের পক্ষে এখানে ঢুকে কোন কিছু সরিয়ে নেওয়া যেমন অসম্ভব; তেমন ভেতর থেকেও যে-কোনও লোকের পক্ষেই বাইরে কোন জিনিস চালান দেওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার! ওপরের ওই জানালার পাল্লাগুলি তো দেখছি খাঁটি স্টিলের। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিশ্চয় ও-গুলোকে ভেতর থেকে এঁটে দেওয়া হয়।.....এই গুলোই বুঝি হীরার কেস?''

''আজ্ঞে, হ্যাঁ, এ-গুলিও খাঁটি স্টিলেই তৈরি। কেসের ভেতর প্রত্যেকটি হীরার জন্য আলাদা আলাদা খোপ আছে, গায়ে নম্বর আঁটা। এখন কাজ চলছে, তাই কেসের ডালা খোলা, মিঃ সরকার এগুলোর কাছে কাছেই থাকেন। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপে হীরা আছে কিনা দেখে নিয়ে ডালা বন্ধ করে চাবি এঁটে দেবেন। তার মানে লোহার সিন্দুকের মধ্যেই এগুলো রাখা হল।''

''বুঝেছি, এখন চলুন, পার্টিশনটার ওধারটা একবার দেখে আসা যাক। বাঃ, এদিকেও তো দেখছি আপনাদের সতর্কতার সীমা নেই —একেবারে দুর্গ।'' পার্টিশনের এধারে এসে হুকা-কাশি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ''আপনার কারিগরেরা কি মাঝে মাঝে খিচুড়ি দিয়েও টিফিন করে নাকি মিঃ সেন?''

''খিচুড়ি? কই, দেখিনি তো কখনও। তা খেতে পারে, আশ্চর্য কি?''

''আমি কিন্তু রান্নাকরা খিচুড়ির কথা বলছি না—কাঁচা খিচুড়ি।''

''কাঁচা খিচুড়ি! সে আবার কি?''

''নইলে এগুলো এখানে এল কোত্থেকে? এই দেখুন।'' বলিয়া তিনি গুটিকয়েক ডাল এবং চাল মেঝে হইতে তুলিয়া মিঃ সেনের হাতে দিলেন।

এগুলির দিকে কিন্তু আর কারোরই নজর পড়ে নাই। সেন এবং সরকার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন, ব্যাপারটা তাঁদের কিছুই বোধগম্য হল না। কিন্তু হুকা-কাশির আর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, একখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ততক্ষণ তিনি ঘরের মেঝে পরীক্ষা করতে বসে গেছেন। পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ রণজিতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ''দেখুন তো রণজিতবাবু, মেঝের ওপর ছড়ানো এগুলো কি?''

রণজিৎ খানিকটা দেখে নিয়ে বলল, ''এ তো দেখছি বালি।''

''কিন্তু সাধারণ বালি নয় নিশ্চয়ই। না না, হাতে করে অত জোরে রগড়াবেন না, কি-রকম খরখরে দেখছেন তো, হাত ছড়ে যাবে যে!''

মিঃ সেনেরও কৌতূহল হয়েছিল, হাতে করে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, ''এ তো দেখছি কাঁচের গুড়ো, কারখানায় এ-জিনিস আনলে কে?''

হুকা-কাশি বললেন, ‘‘আমার এ-দিকটা দেখা হয়ে গেছে, আর কোন জায়গা যদি দেখাবার থাকে তো চলুন মিঃ সেন।’’

‘‘আর কোন জায়গা?’’

‘‘সবই যখন দেখা হল, তখন আপনাদের চৌবাচ্চা-ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? চলুন ওটাও দেখে আসি।’’

হল হতে বের হয়ে সকলে চৌবাচ্চা-ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ সেন পকেট হতে চাবি বের করে দরজাটি খুলে দিলেন—ভিতরে এত অল্প জায়গা যে চারজন লোকের স্থান সংকুলান হওয়াই শক্ত; তার উপর আলোর অভাবও যথেষ্ট। মিঃ সেন পকেট থেকে খুব দামি একটা টর্চ বের করে এ-ধার ও-ধারে টর্চের তীব্র আলোক ফেলতে লাগলেন। এক কোণে ছোট্ট সাদা মতো কি একটু জিনিস দেখা গেল; আঙুলে করে সেটুকু তুলে এনে মিঃ সেনকে হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘দেখুন তো এটা কি আপনাদের হীরা কাটার কোন কাজে আসে?’’

মিঃ সেন দুই হাতে জিনিসটা একটুকাল নাড়াচাড়া করে বললেন, ‘‘এ তো দেখছি তুলো, কিন্তু সাধারণ তুলো এ তো নয়, এ-যে প্রায় রেশমের শামিল—এ-আমাদের কারখানায় ঢুকলো কোত্থেকে?’’

‘‘ঠিক বলছেন, কাঁচের গুড়োও যেমন অসাধারণ তুলোও ঠিক তাই! বাজারে এ-ধরনের তুলো আপনি কিনতে পাবেন না। চলুন, এবারে বার হওয়া যাক, আমার কাজ হয়ে গেছে।’’

দরজা বন্ধ করতে করতে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘ব্যাপারটা কিছু আঁচতে পারছেন?’’

‘‘তা পারছি বই-কি, বারো আনা রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে।’’

‘‘বটে নাকি?’’ মিঃ সেন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, পলকের জন্য আশার আলোকে তাঁর সমস্ত মুখ ভরে উঠল, বললেন, ‘‘মহারাজের হীরা তবে ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে?’’

‘‘তা নেই, একথাই বা বলি কি করে! কাল আর আমার দেখা হয় তো আপনি পাবেন না, তবে পরশু নাগাদ আমার কাছ থেকে একটা টেলিফোন আপনি আশা করতে পারেন। এখন যাবার আগে একটা কথা—কারখানা-ঘরের দারোয়ানটাকে আমি একটু আড়ালে ডেকে গুটি দুই প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য আপনাদের যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।’’

‘‘সে কি কথা, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন, আমাদের আবার কি আপত্তি।’’

‘‘বেশ, তবে চলুন এবার তার কাছে আমায় নিয়ে।’’

হুকা-কাশি ঠিকই বলেছিলেন, বাস্তবিকই পরদিন সারাবেলা তাঁর আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তিনি ঝড়ের মতো রণজিতের বাড়ি এসে উপস্থিত, বললেন, ‘‘চট করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিন তো রণজিতবাবু, একবার ‘বঙ্গ-বিশ্লেষণ’ আপিসে যেতে হবে।’’

‘‘কেন? সেখানে কি দরকার?’’

‘‘ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্স একটা বিজ্ঞাপনের কপি আমার হাতে দিয়েছে, কালকের ‘বঙ্গ-বিশ্লেষণ’ পত্রিকায় সেটা বার হওয়াই চাই। আমার কথায় এত দেরিতে ওরা যদি বিজ্ঞাপনের কপি নিতে আপত্তি করে, তাই আপনাকে সঙ্গে নেওয়া। খবরের কাগজ-মহলে

আপনার খুব খাতির, আপনার অনুরোধ ওরা কেউ ঠেলতে পারবে না।''

খবরের কাগজের আপিস হতে বের হয়ে হুকা-কাশি আবার ডুব মারলেন, পরদিন বিকাল পর্যন্ত আর তাঁর কোন খবরা-খবর নাই। রণজিত অদম্য কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে অনবরত ঘর-বার করছিল, এমন সময় ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে রিসিভারটা কানে দিল; তারপর চোঙার কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, ''হ্যাল্লো, ওঃ মিস্টার হুকা-কাশি? খবর কি? আমার আর আপনার দু-জনারই সন্ধ্যার পর মিঃ সেনের ওখানে নেমন্তন্ন? হঠাৎ এত আনন্দোৎসবের কারণ কি? বলেন কি, বিঘাউনি-রাজের হীরার উদ্ধার এর মধ্যেই হয়ে গেছে? আপনি মানুষ নন মিস্টার হুকা-কাশি, কিছুতেই মানুষ নন—হ্যাঁ অপদেবতা, তাই বটে! আমায় ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাবেন? আচ্ছা!''

রণজিত ট্যাক্সিতে এসে উঠলে হুকা-কাশি বলতে শুরু করলেন, ''একেবারে বৈজ্ঞানিক চুরি মশাই, এ-দেশে এমনতর ব্যাপার বড দেখা যায় না। অক্ষয় নামে এক নামজাদা ঝানু জোচ্চোর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এক নতুন ধরনের জোচ্চুরি শুরু করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের অনেকগুলো নকল হীরা জোগাড় করে—সে-সব কোথায় পাওয়া যায় আপনি না জানলেও জোচ্চোরেরা তার খবর রাখে—সে কলকাতার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াত। খদ্দের সেজে দোকানের কাউন্টারের ওপর হীরা পরখ করবার ছুতোয় নকল হীরা বাক্সে চালান দিয়ে, আসলখানা বার করে এনে বলত, 'না মশাই, পছন্দ হল না।' তারপর দোকানির চোখের সামনেই খুট করে বাক্সটা টিপে দিয়ে চলে আসত। চোখের সামনে হীরা বন্ধ করা হয়েছে দেখে দোকানির আর কোন সন্দেহ হত না। তারপর আসল ব্যাপারটি যখন খোলসা হত তখন খদ্দের একদম ভেগে পড়েছে। এই রকম বার দু-তিন ঘটতেই মণিকার-মহল সাবধান হয়ে গেল। দু-একজন আমাকেও খবর দিলে। অক্ষয়ও বুঝল, ঘন ঘন এক ফিকির বেশিদিন চালানো নিরাপদ নয়, একটু অন্যপথে যাওয়া দরকার। হঠাৎ তখন তার মনে পড়ল সেন এণ্ড সরকার কোম্পানির কথা। শোনা যায় ওদের হীরা নাকি বাজারে চলতি হীরার চাইতে ঢের বেশি দামি। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? টাকা কবলে বনমালী নামে সেন এন্ড সরকার কোম্পানির এক কারিগরকে অক্ষয় হাত করে ফেললে। এবার প্ল্যান হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। ঝানু জোচ্চোর কিনা, হরেক রকম জোচ্চুরিরই সাজ-সরঞ্জাম ওর কাছে আছে। এই সরঞ্জামের মধ্যে আছে গুটিকয়েক শেখানো পায়রা। আপনি নিশ্চয় জানেন শিক্ষিত পায়রাকে কোন জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে সে উড়ে গিয়ে ঠিক তার মালিকের বাড়িতেই হাজির হবে। আগেকার দিনে সেনাপতিরা এদের পায়ে চিঠি বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে পর্যন্ত খবর পাঠাতেন। এ-রকম একটি শেখানো পায়রা বনমালীকে দেওয়া হল। সেন এণ্ড সরকারের কারখানা-ঘরে কর্মচারীদের ঢোকবার বেলায় কোন রকম 'দেহ-তল্লাস' করা হয় না, কেননা তা অনাবশ্যক, ওটা করা হয় শুধু বার হবার সময়তেই। বনমালী তার টিফিনের বাক্স হাওয়া চলাচলের উপযোগী গুটিকয়েক ছ্যাঁদা করে পায়রাটিকে তারই ভেতর পুরে ফেললে, তারপর টিফিন বলে চালিয়ে বাক্সটাকে নিয়ে এল কারখানা-ঘরের মধ্যে। ভেল্কিওয়ালার পায়রার মতো অক্ষয়ের পায়রাও ডাকে না, চুপচাপ পড়ে থাকে। বনমালী আগেই খবর পেয়েছে পাকা জহুরী মিঃ সেনের উপস্থিতি ছাড়া বিঘাউনি-রাজের হীরা কাটা হবে না, আর সেদিনই টিফিনের সময় মিঃ

সেনকে কাজের তাগাদায় বেরুতে হবে; ফিরবেন তিনি কারখানা বন্ধ হবার সময়—'দেহ-তালাসি' করতে। কাজেই টিফিনের পরই সে সুযোগ বুঝে অক্ষয়ের দেওয়া একখানা জুতসই নকল হীরা কেসে রেখে আসল হীরাখানা তুলে নিল। যেমন গহনাগাটির দোকানে সচরাচর হয়ে থাকে—কাজের খাতিরে সকলকেই সর্বদা কেসের কাছে যেতে হচ্ছে, সন্দেহের কোনই কারণ নেই। পার্টিশনের এধারে বাথরুমে এসে অন্যের অলক্ষ্যে পায়রার পায়ে বিঘাউনি রাজের হীরা বেঁধে দিতে তার কোনই কষ্ট হয়নি। তারপর বাক্সে ফের পায়রা পুরে সে আবার চলে এল হল-ঘরে, যেখানে জঞ্জাল ফেলবার নর্দমা ঠিক তারই মুখে। এ-নর্দমাটিও সর্বদাই ব্যবহার হচ্ছে, কাজেই হুঁসিয়ারির সঙ্গে চারদিক দেখে নিয়ে কৌশলে সে যখন পায়রাটিকে এই নর্দমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে তখনও কারও কোনও সন্দেহ হবার কারণ ঘটেনি। পায়রা এসে পড়ল চৌবাচ্চা-ঘরে; সে ঘরের খুব উঁচুতে আলো ঢুকবার ফোকরগুলিতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। চোর আটকাবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত বটে, কিন্তু পায়রার পক্ষে সে-পথে গলে যাওয়া কিছুই কষ্টকর নয়। শিক্ষিত পায়রা সেই পথেই উড়ে এসে অক্ষয়ের হাতে বিঘাউনি-রাজের হীরা পৌঁছে দিল।''

''এদিকে এক মুহূর্তও হীরার খোপ খালি পড়ে থাকেনি বলেই ওদিকে কারুর নজর যায়নি, আর বনমালীও এতটা সাহস পেয়েছিল। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপই ভর্তি আছে দেখে মিঃ সরকারও কিছু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যকও মনে করেননি, কেস বন্ধ করে ফেলেছেন। সকলেরই ধারণা বিঘাউনি-রাজের হীরা সারারাত কেসেই ছিল।

পরদিন বনমালী এসে প্রথমেই সেই নকল হীরা, মানে কাঁচের টুকরোটা কেস থেকে তুলে এনে পেষাই-কলে ফেলে এক মুহূর্তে বালির মতো মিহি করে ফেললে। তারপর সেই কাঁচের গুড়ো পার্টিশনের ওধারে ফেলে দিল—যাতে জলের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়িতে কাজ সারতে যাওয়ায় অল্প একটু গুঁড়ো কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নকল হীরাটাকে এভাবে নষ্ট করার অর্থ এই যে, মিঃ সেনের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাবে রাত্তিরেই বাইরের কোন চোর এসে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা আত্মসাৎ করেছে, ভেতরের কোন কারিগরের এর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ একদম উলটোদিকে অনুসন্ধানের মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া।''

রণজিত অবাক হয়ে সমস্ত ঘটনা শুনছিল, হুকা-কাশির বর্ণনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সে একটুকাল চুপ করে থাকল, তারপর বলল, ''বাস্তবিক, এ যে আপনি কি করে বার করলেন ভেবে ভেবে কিছুই কূল-কিনারা পাচ্ছিনা।''

হুকা-কাশি হেসে বললেন, ''আচ্ছা শুনুন তবে, কূল-কিনারা পাইয়ে দিচ্ছি।...''

''সেন এণ্ড সরকার কোম্পানির কারখানায় এসে গোড়াতেই একটা জিনিস একদম পরিষ্কার হয়ে গেল—রাত্রিযোগে বাইরের কোন চোর ভেতরে এসে যে হীরা চুরি করেনি সেটা সুনিশ্চিত। এমন একটা সুরক্ষিত দুর্গে তাদের আসাই যে শুধু দুরূহ ব্যাপার তাই নয়, দরজা অথবা জানালা কোথাও তাদের আসবার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, এমন কি হীরার কেসটি পর্যন্ত বন্ধ অবস্থাতেই দেখা গেছে। কাজেই প্রথম হতেই সে সম্ভাবনাটা একদম বাতিল করে বিচারের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে আনলাম।''

''বাইরে থেকে কেউ যখন আসেনি তখন নিশ্চয়ই ভেতর থেকে হীরা চালান দেওয়া হয়েছে। কারখানা-ঘরটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে এও বেশ বোঝা যায় যে হীরা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলানো যেতে পারে এমন ফাঁকও কোথাও নেই, বাদ শুধু

ওই নর্দমাটা। শুধু ওই নর্দমার পথেই হীরা আসতে পারে হলঘর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরে। কাজেই নর্দমাটাই হবে আমার অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য। বিচারের বিষয় আরও সীমাবদ্ধ হয়ে এল।''

''তারপর বিবেচ্য, চৌবাচ্চা-ঘরে মিঃ সেন ভিন্ন আর কারও ঢোকবার উপায় নেই, কাজেই সেখান থেকে হীরাখানাকে ফের কোথাও চালান দিতে হলে তার একমাত্র পথ—প্রায় চোদ্দ ফুট উঁচুতে আলোবাতাস ঢোকবার উদ্দেশ্যে লোহার শিক দেওয়া যে দুটো ফোকর রয়েছে তারই কোনও একটা। এ-অবস্থায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে হীরা চালান দেওয়া কোন লোকের পক্ষে শুধু নিজের চেষ্টায় অসম্ভব, হয় তাকে কোন যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, নতুবা কোন জীবের। এতখানি বোধসম্পন্ন যন্ত্র থাকতে পারে বলে আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। কাজেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয় কোন জীবের। সে জীবটি এত ছোট হওয়া চাই যে একটা নর্দমার পথ দিয়ে অনায়াসে সে গলে যেতে পারে, একটা টিফিন বইবার বাক্সে করে অনায়াসে তাকে কারখানা-ঘরে আনা চলে, কেননা ও-ভাবে আনা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই তাকে কারখানা-ঘরে আনা সম্ভব নয়। কাজেই অন্যসব চিন্তা ছেড়ে আমায় শুধু দেখতে হবে ঘরের কোথাও এ-হেন কোন জীবের কিছুমাত্র চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। বিচারের বিষয়টা কতখানি ছোট্ট হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছেন?''

''ঘরে ঢুকেই একজন কারিগরের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি একটু কটাক্ষ করেছিলাম মনে আছে? খাবার নষ্ট হবার ভয়ে খাবারের বাক্সে ছোট ছোট ছ্যাঁদা করে নিয়েছিল বলে! খাবার টাট্‌কা রাখবার উদ্দেশ্যে এ-কাজ সে করেছে এ-কথা কিন্তু তখনও বিশ্বাস করিনি, ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল যে জীবটিকে বাক্সে পোরবার পর তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া সরবরাহের জন্যই এ-ব্যবস্থা। পার্টিশনের এ-পাশে মেঝের ওপর চাল আর ডাল দেখতে পেয়ে আপনারা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু হইনি। এগুলো সে জীবটিরই খাবার—এ পাশে এনে তাকে খোলবার সময় বাক্স থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পেরেছিলাম। কি ধরনের জীব, খাবার দেখে তাও কিছুটা আন্দাজ হল—যদিও আমার মনে মনে ওই রকমেরই ধারণা ছিল।''

''তারপর চৌবাচ্চা-ঘরে তুলো জাতীয় জিনিসটা দেখে মিঃ সেনের মনেও সন্দেহ হয়েছিল যে সাধারণ তুলো ওটা নয়। আমি কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছি—সাধারণ অসাধারণ কোন তুলোই ওটা নয় সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, একটা সাদা পায়রার পালক। নর্দমার পথে ঘষা-ঘষিতে পায়রার রোঁয়া ওপর-ওপর উঠে এলে সেটা ঠিক রেশমি তুলোর মতই মনে হওয়ার কথা। সমস্ত ব্যাপারটার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল—পায়রার পায়ে বেঁধে কারখানারই একজন কারিগর হীরা চালান দিয়েছে, এবং সে কারিগরটি কে তা আঁচতেও কষ্ট হল না—ছ্যাঁদাওয়ালা খাবারের বাক্সের মালিক যিনি তিনিই—অর্থাৎ খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা লোকটা।''

''পার্টিশনের ও-ধারে মেঝের ওপর আরও একটি রহস্যময় জিনিস পাওয়া গেল, মিঃ সেন ঠিকই এঁচেছিলেন, ওগুলো সত্যিই কাঁচের মিহি গুঁড়ো, হীরার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, থাকলে মিঃ সেনের মতো পাকা জহুরি কখনই ভুল করতেন না। কাঁচের গুঁড়ো তাঁর কারখানায় কি করে এল ভেবে মিঃ সেন আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ব্যাপারটাতো এই—কোন কারণে হীরা-চোরের একখণ্ড কাঁচ কারখানার ভেতরে আনার দরকার হয়েছিল, তারপর দরকার চুকে গেলে

সেটাকে আর কোনও মতে লুকোবার উপায় নেই দেখে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে!''

''এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি জন্য কাঁচের টুকরোটাকে কারখানায় আনার প্রয়োজন হতে পারে। একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বিঘাউনি-রাজের নম্বর আঁটা হীরার খোপটা খালি রেখে পায়রার পায়ে সেটি বাঁধবার চেষ্টা করা বিশেষ দুঃসাহসের কাজ,—কেন না তাতে তো কিছু সময় লাগবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। কাজেই কারিগর স্বভাবতই চেষ্টা করবে এক টুকরো নকল হীরা সেই খোপে রেখে সবার চোখে ধুলো দিতে। পরদিন একটু সকাল সকাল এসে সেই কাঁচখানা উড়িয়ে দিলেই হল, কারিগরের সম্বন্ধে কর্তাদের কোন সন্দেহ হবে না, পুলিশ তাদের পেছনে লাগবে না। সুযোগ বুঝে কাঁচখানাকে পেষাইকলে চূর্ণ করতে আধ মিনিটও সময় লাগে না—এ অতি সহজেই সমাধা হতে পারে।''

''আমি গোপনে দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পরশু দিন সব্বার আগে কারখানার গেটে এসে পৌঁছেছিল ওই খাঁকি প্যান্ট পরা লোকটাই; বড় বেশি গরজ কিনা, তাই দেরি সয়নি। ওর নাম যে বনমালী তাও দারোয়ানের কাছে শুনেছি।''

''এর পরের ঘটনা আর বেশি করে বলবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বললেই চলবে। আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি কারখানার কাছে কোনও একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপর ছুটির পর বনমালী বার হতেই গোপনে তার পিছু নেওয়া গেল।''

''সে এসে উপস্থিত হল বাগবাজারের একটা বাড়ির দরজায়। বারকতক কড়া নাড়তেই যে-লোকটা এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে আমায় দস্তুরমতো চমকে যেতে হল—বছর কয়েক আগে এক জোচ্চুরির ব্যাপারে ধরতে গেলে আমিই ওকে জেলে পুরেছিলাম। লোকটার নাম অক্ষয়; জোচ্চোরের ধাড়ি। ভাবলাম জেল থেকে বেরিয়ে ও আবার 'হীরার ব্যবসা' ধরেছে নাকি? হালে কলকাতার মণিকার-মহলে আসল হীরার জায়গায় মাঝে মাঝে যে নকল হীরা চালানো হচ্ছে সেগুলির মূলে এই মহাত্মাটি নেই তো। একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে তো। ফলে পরদিন অনেকটা সময় আমায় বাগবাজারেই কাটাতে হল।''

''বিশেষ লক্ষ করে দেখেছিলাম, অক্ষয়চন্দ্র আমাদের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মক্কেল মেসার্স ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন তাদেরই নামে 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বার করে দেওয়া গেল—কয়েকখানা হীরা তাদের ওখানে অল্প দামে বিক্রি হবে, শো-কেসে আছে—যে কোন লোক এসে দেখে যেতে পারেন।''

''বেশ জানতাম, ভয়ের চাইতে লোভটাই অক্ষয়চন্দ্রের বেশি। 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ'-এ বিজ্ঞাপন পড়বার পর সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, একটা-না-একটা জোচ্চুরির মতলব মাথায় নিয়ে ঠিক এসে হাজির হবে। হলও ঠিক তাই। যেমনি সে-দোকানে এসে ঢুকল, আমিও অমনি ক্যাঁক করে ওকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এল খান পনেরো নানান সাইজের নানান প্যাটার্নের হীরা।''

''এর পর আর বেশি কিছু বলবার নেই,—শুধু এটুকু ছাড়া যে আমার টেলিফোন পেয়ে অক্ষয়চন্দ্রেরই বিছানার তোশক কেটে মিঃ সেন পুলিশের সাহায্যে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা উদ্ধার করে এনেছেন, অক্ষয়চন্দ্র এবং বনমালী দু-জনাই এখন হাজতে।''

''এই যে আমরা দমদমায় মিঃ সেনের বাড়ি এসে পড়েছি—এ পাঁয়জি, রোখকে, রোখকে!''

কৃত্তিবাসের অজ্ঞাতবাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চিৎকার করে উঠেছি আতঙ্কে।

তারপর পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়েছি একেবারে উন্মাদের মতো।

হ্যাঁ, আমি স্বয়ং শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার না করে পারছি না যে, পাঁচ বছরের আটাশে ছেলের মতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালিয়েছি।

ভয়টা যা নিয়ে সেইটেই হল সবচেয়ে লজ্জার। ভয়টা বাঘ-ভালুক সাপ-খোপ চোর-ডাকাতের নয়।

ভয়টা ভূতের, এবং সে ভৌতিক অভিজ্ঞতাটা আমার প্রত্যক্ষ। প্রথমেই কল্পনা করতে বলি একটা গড়-প্রমাণ বাড়ির বিরাট ধ্বংসস্তূপ। চারদিকে ছড়ানো ভাঙা ইট কাঠ জঞ্জালের টিবিগুলোই বাড়িটাকে অগম্য করে রেখেছে। তার ওপর আছে গোলকধাঁধার মতো তার ভেতরকার জটিল যাওয়া-আসার সব রাস্তা, ধ্বসে-পড়া বাড়িতে যা জায়গায় জায়গায় ভয়াল সুড়ঙ্গের রূপ নিয়েছে।

এরকম একটা ধ্বংসপুরীর সঙ্গে ভূতের ভয় আপনা থেকে জড়ানো থাকে জানি। রজ্জুতে তাই সর্পভ্রম হয়—আলো-ছায়ার নকশাকে মনে হয় অশরীরী কারুর আভাস, সামান্য দরজা জানালার নড়াচড়াতে বিকট আওয়াজের বিভীষিকা হাত-পা অবশ করে দেয়।

কিন্তু সে-রকম কোন ভ্রান্তি আমার হয়নি, স্বভাব-ভীরুও আমি নই। ভূতপ্রেত আমার কাছে হাসির ব্যাপার বলে আমি নিজে থেকে জোর করে কাউকে কিছু না জানিয়ে এ ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করতে গিয়েছি, আর তারপর...

তারপর সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে সে ধ্বংসপুরী থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছি।

সাধারণ হিসাবে মোটামুটি সাহসী ও যুক্তিবাদী হলেও এমন আতঙ্কে কি করে অভিভূত হলাম, বোঝাবার জন্যে ঘটনাটা একটু বর্ণনা করতে হয়।

আবছা একটি নারীমূর্তি ধ্বংসপুরীর গোলকধাঁধার মতো আঁকাবাঁকা জড়ানো পথ দিয়ে কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও চোখের আড়াল হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সব রহস্যের সমাধান আমার হাতের মুঠোয় মনে করে সাফল্যের আনন্দে নিঃশব্দে আমি তাকে অনুসরণ করছি।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থামতে হয়েছে। শুভ্রবসনা মূর্তিটি একটা জানালার ধারের অন্ধকারে কি যেন দেখবার জন্যে মাথা নিচু করে উঁকি দিচ্ছে। দেখার চেষ্টা করছে বোধ

হয় আমাকেই, সুতরাং এই সুযোগ।

নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত ধরে টান দিয়েছি।

পরের মুহূর্তে আতঙ্ক-বিহ্বল গলা দিয়ে চিৎকারটা আপনা থেকে বেরিয়ে গেছে। কোমল উষ্ণ হাতটা তখনও আমার হাতের মধ্যে ধরা আর মূর্তিটার কোন চিহ্ন নেই। হ্যাঁ, সত্যিই আমার টান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা হাতটা গরম একটা তরল কিছুতে আমার গা ভিজিয়ে আমার হাতেই খুলে এসেছে, আর সভয়ে শিউরে সেটা ফেলে দেবার পর মূর্তিটা যেন চোখের ওপরই গিয়েছে মিলিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝাবার জন্যে এ বিবরণ এখানে থামিয়ে গোড়া থেকেই শুরু না করলে নয়। তাই করছি।

একেবারে পুরোপুরি ডুব দিতে পেরেছিলাম।

এমন অতল ডুব যে ওপরে দুটো বুজকুড়িও উঠবে না।

একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস যাকে বলে। রেল স্টেশন কমপক্ষে বিশ ক্রোশ দূরে। পোস্টাফিস পর্যন্ত পুরো একবেলা হেঁটে তবে পৌঁছানো যায়।

জায়গাটা অবশ্য বাংলা দেশেই। নামটা বলব না। বললেই যে কেউ চিনে ফেলবেন এমন সম্ভাবনা অবশ্য নেই। তবু নামটা একটু পালটে নিজস্ব অঞ্চলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঝুমুরডি-ই রাখলাম। জায়গাটা সম্বন্ধে খুব বেশি কৌতূহল থাকলে অবশ্য ম্যাপটা খুলে দেখতে বলব। দক্ষিণে সুবর্ণরেখা আর উত্তরে রূপনারায়ণকে রেখে যে নদীটি হুগলি নদীর মোহানায় বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে, সেই পোশাকি নামের কংসাবতী যদি বা আমাদের কিছুটা চেনা হয়, তার সেবিকা সখী কুমারীর নাম খুব বেশিজন জানে বলে মনে হয় না। আমাদের পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্তের সবচেয়ে শুকনো জেলায় সেই কুমারী নদীরই আবার দুটি শাখার মাঝখানের যে জায়গাটা নেহাত বিশেষ মানচিত্রে ছাড়া প্রায় ফাঁকা চিহ্নহীন দেখায়, তারই মাঝখানের একটি গ্রাম এই ঝুমুরডি। কি রকম গ্রাম ঝুমুরডি, তার আর একটু আভাসও দেওয়া যেতে পারে। মোটের ওপর ছড়ানো ছিটোনো বেশির ভাগ খোড়ো চালের কুঁড়ে আর খামার বাড়ি, হাজামজা কটা পুকুর, ডোবা, আর চুড়ো-ভাঙা একটা মন্দির নিয়েই ঝুমুরডি গ্রাম। হপ্তায় একবার যেখা" অতি দুঃখিনী একটা হাট বসে, সেই জটিরথানের একমাত্র মুদির দোকানে ছাড়া টিনের চালও একটা দেখা যাবে না। গ্রামের চিরকাল যে এ-দশা ছিল না, তার অবশ্য কিছু প্রমাণ এখনও একেবারে লোপ পায়নি। সে-প্রমাণের একটা যেমন নাগের বাঁধ। এখন ভেতরটা শুকনো পিপাসী মাঠেরই শামিল। চারধারের উঁচু বাঁধ ও অগুনতি ফুটো ফাটল দিয়ে বছরের পর বছর ভেঙে ধ্বসে যাচ্ছে। বর্ষার পর কদিনের জন্যে ভেতরের নামাল জমিতে যে-সবুজের ছোপটুকু কদিনের জন্য লাগে, তা থেকে এ-বাঁধ যখন অতিবৃষ্টির দিনের জল ধরে রেখে অনাবৃষ্টির দিনে সারা গাঁয়ের ফসলের জল যোগাত, সেই সার্বোক গৌরবের দিনের একটু আভাস হয়তো পাওয়া যায়।

আর আভাস পাওয়া যায় নাগের বাঁধের ঠিক বিপরীত দিকে গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তের হাজা-মজা ডাকাতে বিলের ধারের সেই বিরাট আধা ভগ্নস্তূপটার, যার গড়মাদার নামটার মধ্যেই জমকালো দূর-অতীতের ঝলক একটু আছে। গড়মাদার যে কতকালের পুরানো ধ্বংসস্তূপ তা নিয়ে কেউ গবেষণা করেনি। বহুকাল সেটা অব্যবহারেই পড়ে ছিল। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে তার ওয়ারিশানদের কে-একজন বৃদ্ধা বিধবা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই কোন

একটা মাথা গোঁজবার ঘরে আশ্রয় নিয়ে আছেন। গড়মাদারের ওই ভূতুড়ে পোড়ো ভিটের ওপর লোভ করবার মানুষ গাঁয়ে নেই বলেই বৃদ্ধা বিধবার উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠেনি। বৃদ্ধা আসবার আগেও যেমন, তিনি আসবার পরেও তেমনি,—গাঁয়ের লোক ও ধ্বংসপুরীর ত্রিসীমানাও পারতপক্ষে মাড়ায় না।

সারা গাঁয়ে দালান-কোঠা বলতে ওই পোড়ো গড়মাদারকে বাদ দিলে খড়ের চাল হলেও কাঁচা ইটের দেয়ালের একটি যে বাড়ি আছে, নাগেদের সেই কাছারি বাড়িতেই আমি উঠেছি। নাগেদের অনেক পুরুষের বেশ কিছু জমিজমা এখানে ছিল। জমিদারি উঠে গেলেও নতুন বিলিব্যবস্থা করবার জন্যে কাছারি বাড়িটা এখনও চালু আছে। নাগেদের এক ছেলের লেখা-টেখার শখ। আমার কাগজে লেখা নিয়ে আসার সূত্রে আলাপ হয়েছে। সেই আলাপে এই গ্রাম আর তাদের কাছারি বাড়ির কথা জানতে পেরে নিজে থেকেই এখানে এসে কিছুদিন থাকবার সুযোগটা চেয়ে নিয়েছি।

কিন্তু দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এমন একটা অখদ্দে গাঁয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন কেন? শুধু একটা বাজির জন্যে।

হ্যাঁ, বাজিটা পরাশরের সঙ্গেই। নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে কথায় কথায় একদিন তাকে তাল ঠুকে বলেছিলাম যে, যত বড় ধুরন্ধরই সে হোক, ইচ্ছে করলে এমন গা-ঢাকা দিতে পারি যে একমাসের মধ্যে আমায় খুঁজে বার করা তার সাধ্য হবে না।

পরাশর প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু এমন একটা মুখটেপা হাসি হেসেছিল যাতে গায়ের জ্বালায় তখনই বাজি ধরে বলেছিলাম, এই রইল তোমার সঙ্গে বাজি, যেদিন আমি অন্তর্ধান হব, তার পর থেকে একমাসের মধ্যে তুমি আমার খোঁজ পাবে না। কি, রাজি আছ এ বাজি রাখতে?

এবার একটু যেন দমে গিয়ে পরাশর বলেছিল, রাজি যদি হই তো বাজিটা কি হবে?

বাজি? দু'সেকেণ্ড ভেবেই চটপট বলে দিয়েছিলাম, আমি যদি হারি তো পরপর চার হপ্তা তোমার কবিতা আমার কাগজে ছাপব; আর তুমি যদি হারো, তাহলে একমাস আর কবিতা লিখবে না।

একমাস কবিতা লিখব না!—পরপর চার হপ্তা কবিতা ছাপার কথায় পরাশরের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল! বলেছিল, বাজিটা ঠিক ন্যায্য হচ্ছে না। তবু তোমার সুমতির আশায় রাজি হচ্ছি।

পরাশরের সঙ্গে এই বাজি রাখার দিন পাঁচেকের মধ্যে একদিন উধাও হয়েছিলাম। যাবার আগে পরাশরকে ডাকে শুধু একটা পোস্টকার্ড দিয়েছিলাম আমার অজ্ঞাতবাস শুরু হওয়ার তারিখটা রেকর্ড করে রাখবার জন্যে।

ঝুমুরডিতে নাগেদের কাছারি বাড়িতে এসে ওঠবার পর পরাশরের জন্যে একটু দুঃখই হয়েছে। সত্যি, বাজিটা ঠিক ন্যায়সঙ্গত হয়নি। আমি হারলে তো চারবার পরাশরের কবিতা ছাপিয়েই খালাস। কিন্তু হেরে গেলে পরাশরের শাস্তিটা যে অনেক গুরুতর। পুরো একটি মাস কবিতা না লিখে থাকাটা তার পক্ষে যে কি যন্ত্রণার, তা তো আমি ভালো করেই জানি। একমাস চোখ বেঁধে কাটিয়ে দেওয়া বরং তার কাছে অনেক সহজ।

বাজির শর্তে তার ওপর যে বেশি রকম অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, সেটা আরও ভালো করে বুঝেছি সারারাত ধিকিধিকি এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটিয়ে, সকাল সাতটার পর ধু ধু মাঠের মধ্যে প্রায় ভুলে-যাওয়া এক স্টেশনে নেমে। স্টেশনের নাম উর্মা। জানা

না থাকলে টাইমটেবল ঘেঁটেও সহজে কেউ বার করতে পারবে বলে মনে হয় না। এই স্টেশন থেকেই সনাতন গোরুর গাড়িতে আন্দাজ বিশক্রোশ ভেঙে ঝুমুরডি যেতে যেতে পরাশরের করুণ অবস্থার কথা ভেবেছি। আমার চিঠিটা পাওয়ার পর সে আমার ঠিকানা বার করবার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়। কিন্তু অত বড় কলকাতা শহর থেকে আমি যে একটা রদ্দিমার্কা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সারারাত কাটিয়ে উর্মার মতো একটা স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়িতে বিশক্রোশ পাড়ি দেব, তা কি তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব?

নাগেদের কাছারি বাড়িতে ভালো হোটেলের আরাম আশা করে যাইনি। একটু-আধটু অসুবিধে হলেও দিনগুলো তাই একরকম ভালোই কাটছিল। আসল সমস্যাটা ছিল নিঃসঙ্গতা নিয়ে। কাছারি বাড়ির সরকারমশাই আর গ্রামের দু'চারজন নিষ্কর্মা কি চাকরি জীবনের শেষে অবসর নেওয়া মানুষ ছাড়া কথা বলবার কেউ নেই। আমি অবশ্য এ-সমস্যার মীমাংসার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়ে গিয়েছিলাম। গিবনের রোমের অবনতি ও পতন কাঠির দ্বিতীয় খণ্ডটি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। প্রথম খণ্ড বহুকাল আগে পড়া হলেও দ্বিতীয় খণ্ডটি খোলার সময় এতদিনে আর হয়নি। এক মাস অজ্ঞাতবাসে সেই কর্তব্যটাই সম্পাদন করে, একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা সেরে আসব এই ছিল সঙ্কল্প।

কিন্তু মাসের অর্ধেক না কাটতেই সে সঙ্কল্পে অমন বাগড়া পড়বে তা ভাবতে পারিনি।

প্রথম কদিন আমি সকাল-বিকেল সারা গ্রামটা ঘুরে ফিরেছি। দেখবার কিছুই নেই, তবু যেখানে পুরো একটা মাস কাটাতে হবে সে জায়গাটা নেহাত অচেনাই বা কেন থাকবে!

হপ্তা দুই বাদে গিবন সাহেবের মান রাখবার জন্যে সন্ধেবেলা কেরোসিনের টেবল ল্যাম্পটা জ্বেলে বইটি সবে খুলেছি, এমন সময়ে সরকারমশাই ঘরে ঢুকেছেন।

সরকারমশাই মাঝবয়সী সাধাসিধে গেঁয়ো মানুষ। এমনিতেই একটু বেশি বিনয়ী। কিন্তু এদিন দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে মুখের ভাবে আর শেষপর্যন্ত কথা বলার ধরনে কেমন যেন অত্যন্ত লজ্জিত অপরাধীর চেহারা ফুটে উঠেছে।

বই থেকে আমি মুখ তুলে তাকাবার পর বারকয়েক ঢোক গিলে তিনি প্রথমে শুধু থেমে থেমে বলেছেন, আজ্ঞে একটু মুশকিল হয়েছে।

মুশকিল! কি মুশকিল?—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছি।

আজ্ঞে, আজ রাত্রে আপনার দুধ খাওয়া হবে না।

সরকারমশাইয়ের অমন ট্র্যাজিক ভাবভঙ্গির পর সমস্যাটা মাত্র দুধের জেনে হেসে ফেলে বলেছি, তা নাহলে আর কি করা যাবে।

একটু থেমে সরকারমশাইকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্যেই তারপর জিজ্ঞাসা করেছি, তা দুধের হয়েছে কি? গয়লা এখনও দিয়ে যায়নি? কিন্তু সবে তো এখন সন্ধে। একটু দেখুন না, এখনও আসবার সময় তো আছে।

আজ্ঞে গয়লা আজ আর আসবে না।

আসবে না মানে!—সরকারমশাইয়ের কথার ধরনে এবার গলাটা ঠিক মধুর রাখতে পারিনি, গয়লা কি তাই বলে পাঠিয়েছে?

আজ্ঞে বলে পাঠাতে পারলে সে তো দুধই পাঠিয়ে দিত।

অবাক হয়ে সরকারমশাইয়ের দিকে এবার চেয়েছি। এ আবার কি হেঁয়ালি করছেন সরকারমশাই। আমার সঙ্গে রসিকতার সম্পর্ক তো তাঁর নয়।

একটু রুক্ষ হয়ে বলেছি, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।

খুলেই এবার বলেছেন সরকারমশাই। যা বলেছেন তাতে অবাক একটু হলেও উপভোগ করবার মতো মজাই পেয়েছি।

আমাদের আলাপ যা হয়েছে তার ধারাটা এই রকম—

ভূতের ভয়েই আমাদের গয়লা নাকি আজ সন্ধের পর আর আসতে পারবে না।—জানিয়েছেন সরকারমশাই।

এতদিন তো বেশ আসছিল। ভূতের ভয় হঠাৎ আজই হল কেন? জিজ্ঞাসা করেছি আমি।

কাল রাত্রেই সেই অশরীরীরা গ্রামে দেখা দিয়েছেন বলে।

তা যাঁরা দেখা দিয়েছেন তাঁরা যে ভূত, তা বোঝা গেল কি করে? জ্যান্ত মানুষকেও তো ভূত বলে ভুল হতে পারে।

না, জ্যান্ত মানুষ নয়, ভূতই। ভূত ছাড়া গড়মাদারের ওই ধ্বসেপড়া আতঙ্কপুরীতে জ্যান্ত মানুষ কারুর যাবার ক্ষমতা কি সাহস হবে না।

আচ্ছা ভূতই না হয় মানলাম, কিন্তু গড়মাদারে ভূত দেখা গেছে তো গাঁয়ের পথে হাঁটতে ভয় কিসের?

ভয়ের রীতিমত কারণ আছে। গাঁয়ের লোক দশ বছর আগের কথাটা ভোলেনি। গড়মাদারে ভূতুড়ে কিছু দেখলেই কিছুদিন সন্ধের পর কেউ আর ঘরের বার হয় না।

কি হয়েছিল দশ বছর আগে?—জিজ্ঞাসা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সরকারমশাইয়ের কাছে যা জানবার জেনেছি। দশ বছর আগে কিছু ভূতুড়ে ব্যাপার দেখলেও প্রথমে কেউ সেটা খুব গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। ভূতুড়ে বাড়িতে ভূত দেখা যাবে এ আর আশ্চর্য কি! রাত্তিরে আলো নড়াচড়া আর নানারকম আওয়াজ পাওয়ার মতো অমন অমন দু-চারটে অদ্ভুত ভুতুড়ে ব্যাপার আগেও গড়মাদারে কেউ কেউ দেখেছে মাঝে মাঝে। সেবারে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হয়েছিল। গড়মাদারে ভূতুড়ে আলো-টালো দেখা যাবার পরই একদিন সকালে ডাকাতে-বিলের ধারে বেঁহুশ একটা মানুষকে রক্তে-কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। লোকটা মরেনি, কিন্তু মাথায় চোট খেয়ে অবস্থা কাহিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই লোকটা ঝুমুরডির সম্পূর্ণ অচেনা!

বিলের ধার থেকে তুলে এনে একটু সেবাশুশ্রূষা করার পর লোকটার জ্ঞান ফিরেছে। তখন সে যা বলেছে তাতে সবাই তাজ্জব। কে তাকে কেন মেরেছে তা তো নয়ই, এমন কি, কেমন করে এখানে সে এসেছে তাও সে জানে না। এ তল্লাটের লোক সে নয়। অনেক দূরের এক জায়গা থেকে কে যেন ভোজবাজিতে তাকে এনে মেরে বেহুঁশ করে রেখে গেছে।

কথাটা শুনতে আজগুবি, কিন্তু একেবারে অবিশ্বাসই-বা করা যায় কি করে! এ তল্লাটের সম্পূর্ণ অজানা একটা লোক খামোকা এখানে মার খেয়ে অজ্ঞান হতেই বা আসবে কেন?

এরপর যা হয়েছে তা একেবারে অভাবিত। অদ্ভুত ব্যাপারটায় কূলকিনারা না পেয়ে দিন কয়েক বাদে এঁদের একজন শেষপর্যন্ত বেশ দূরের পুলিশ-চৌকিতে গেছিল খবরটা দিতে। তার ফিরে আসবার আগেই জখম লোকটা হঠাৎ একদিন উধাও। যেমন এনে ফেলেছিল, তেমনি কে যেন ভোজবাজিতে তাকে হাওয়ায় দিয়েছে মিলিয়ে।

এই অন্তর্ধানে ঝুমুরডি গ্রাম একেবারে ভয়ে কাঠ। গড়মাদারের ভূত সম্বন্ধে সন্দেহের বাষ্পও সেই থেকে গেছে উবে। সেখানে ভূতুড়ে কিছু দেখা গেলে কিছুদিনের মতো সন্ধে হতে না হতেই সব দরজায় ডবল হুড়কো আঁটা হয়ে যায়। ভাগ্যের কথা এই যে, এই ভুতুড়ে ব্যাপারটা যখন-তখন দেখা যায় না। কালে-ভদ্রে বড়জোর বছরে একবার গড়মাদার কিছুদিনের জন্যে সারা গাঁয়ের বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

মনে মনে হাসলেও সরকারমশাইয়ের সব কথা খুব গম্ভীর মুখেই শুনেছি। জিভের ডগায় এলেও কোন প্রশ্নই করিনি।

মনের মধ্যে সঙ্কল্পটা তখনই অবশ্য স্থির হয়ে গেছে।

সেই সঙ্কল্পের ফল যা দাঁড়িয়েছে তাই দিয়েই এ-কাহিনী শুরু।

হ্যাঁ, সত্যিই সে রাত্রে সরকারমশাই তাঁর কুঠুরিতে শুতে যাবার পর তাঁর নাকডাকার শব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

গাঁয়ের রাস্তা একেবারে অন্ধকার নয়। শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদের আলোর সঙ্গে ঝকমকে আকাশের তারার ঝাঁকে ঝিকিমিকিতে পথ-ঘাট বেশ চেনা যায়। সারা গাঁয়ের নিথর নিস্তব্ধতাটাই শুধু কেমন যেন গা-ছমছম করিয়ে দেয়। আঁকা-বাঁকা গাঁয়ের পথে গড়মাদারের দিকে যেতে যেতে একবার দূরে কোথাও কটা কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। আমার যেন মনে হল সে-ডাকও একবার উঠতে গিয়ে কিসে যেন চাপা পড়ে গেল।

অস্বস্তি একটু যে না হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করবার মতো মন নিয়ে বার হইনি। নির্জন নিস্তব্ধ গাঁয়ের পথে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে গড়মাদারের ধ্বংসস্তূপের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন সপ্তমীর চাঁদ অস্ত যেতে আর বাকি নেই। সামঞ্জস্য সৌষ্ঠবহীন বিরাট ধ্বংসস্তূপটা সেই মরাচাঁদের রুগ্ন বিবর্ণ আলোয় যেন একটা ভয়াল নিষেধের মতো মজাবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত মনটা প্রস্তুত করে নেবার জন্যে সেখানে দাঁড়ালাম। দিনের বেলা এদিক দিয়ে ঘুরে যাবার সময় এ-ধ্বংসস্তূপের একমাত্র অধিবাসিনী বৃদ্ধা বিধবা মহিলা কোন্ দিকে কোথায় থাকেন তা দেখে গিয়েছি। সেদিকটা বাদ দিয়ে অন্যদিক দিয়ে গড়মাদারের ধ্বংসপুরী ভালো করে সন্ধান করব এই আমার সঙ্কল্প। বাইরের পরিবেশ যতই ভয় জাগাবার অনুকূল হোক না কেন, এ-পুরীর ভূতুড়ে ব্যাপারটা যে কিছুটা মূঢ় কুসংস্কার জড়ানো কল্পনা, আর কিছুটা কোন মতলববাজ দলের কারসাজি, এ বিষয়ে তখন আমার কোন সন্দেহ নেই। ভূতের ভয় দেখিয়ে নিশ্চয়ই ধূর্ত কোন একটা দল এই গড়মাদারের ধ্বংসপুরীতে তাদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছে। তাদের সেই কারসাজিই আমি ধরে ফেলতে চাই।

ভূতপ্রেত না হোক, দুষ্টু মানুষের শত্রুতা: ভয় একেবারে করিনি এমন নয়। তবে এই নেহাত নগণ্য গ্রামের একটা পোড়ো ভিটেতে সত্যিকারের কোন বাঘা বদমায়েশের দলের দেখা পাব বলেও মনে করিনি। কিছু পেলে নেহাত ছিঁচকে বদমায়েশদের গোপন নেশাভাঙের আড্ডা-ই খুঁজে পাব বলে ধরে নিয়েছি; আর সে-রকম দু-চারটেকে সামলাবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগেনি।

ধারণাটা ওইরকম ছিল বলেই মনস্থির করে নিয়ে ধ্বংসপুরীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে একটু বেশি রকম চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

দূরে ধ্বংসস্তূপের একটা ঢিবির ধারে অস্পষ্টভাবে যা চোখে পড়েছে, আমার ধারণার সঙ্গে তা ঠিক মেলে না।

দূরে যা দেখা যাচ্ছে তা আবছা হলেও সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা যে একটি নারীমূর্তি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভৌতিক প্রকাশ একটা-কিছু দেখব বলে জানতাম, কিন্তু সেটা অন্যরকম, আরও সাধাসিধে কিছু হবে বলে মনে করেছিলাম। মূলত চাষী গাঁয়ের গোপন নেশাভাঙের দলের কাছে এরকম নারীমূর্তি দেখাবার ফন্দি আশা করিনি।

একবার মনে হল এ পোড়োভিটের একমাত্র অধিবাসিনী সেই বিধবা বৃদ্ধাকেই দেখছি না তো! কিন্তু একেবারে উল্টোদিকে তাঁর কুঠরি ছেড়ে তিনি এ প্রান্তে এমন সময়ে ওই ঢিবির ওপর উঠতে যাবেন কেন? তা ছাড়া যত অস্পষ্টই হোক, চেহারাটা তো কোন বৃদ্ধার বলে মনে হয় না।

বৃদ্ধা যে নয়, মূর্তিটা হঠাৎ সরে ভেতর দিকে যাওয়ার সঙ্গে নির্ভুলভাবেই বোঝা গেল। চলার ভঙ্গিতে বার্ধক্যের ছাপ তো নেই-ই, যুবতী হিসেবেও কেমন যেন তার মধ্যে একটু ছন্দের তফাত।

মূর্তিটা সরে যাবার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা আমি কিন্তু ভাবিনি। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দ আর দ্রুতপায়ে তখন আমি তাকে অনুসরণ করছি।

ওই বিশাল ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে গোপনে কাউকে অনুসরণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। যে-কোন মুহূর্তে জানাজানি হয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনাই বেশি।

নেহাত ভাগ্যের জোরেই সে-বিপদ আমার হয়নি বলে মনে করেছি। একটু করে ব্যবধান কমিয়ে মূর্তিটির বেশ কাছে পৌঁছবার পর মূর্তিটির চলাফেরার ধরনে কেউ-যে তাকে অনুসরণ করছে তা সন্দেহ করেনি বলেই মনে হয়েছে। কোথাও একটু থেমে, কোথাও আবার যেন অকারণে একটু ঘুরে বেড়িয়ে মূর্তিটা যেভাবে এগিয়ে গেছে, তাতে তার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরি হয়নি। সে-উদ্দেশ্য হল এত রাত্রেও গাঁয়ের পথে এ-তল্লাটে আসবার স্পর্ধা যদি কারুর হয়ে থাকে, তো তাকে ভয় দেখানো। সেইজন্যই এদিক-ওদিক ঘুরে মূর্তিটা মাঝে-মাঝে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাইরে থেকে যেখানটা দেখা যায়।

এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়াবার সময়েই পেছন থেকে তাকে ধরব এই ছিল মতলব। কিন্তু মতলবটা অত সহজে সিদ্ধ হল না। আমার অত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও কি করে জানিনা হঠাৎ একসময়ে মূর্তিটা বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মনে হল।

এরপর তার গতিবিধি গেল বদলে। আমি যেমন তাকে, সেও যেন তেমনই তার অদৃশ্য শত্রুকে ধরবার জন্যে সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে এক ধরনের লুকোচুরি শুরু করে দিল।

তা করা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কিভাবে তাকে ধরেছি এবং ধরার ফল কি দাঁড়িয়েছে, তা দু'বার বলবার দরকার নেই।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে উন্মাদের মতো গড়মাদারের ধ্বংসপুরী থেকে বেরিয়ে কতদূরে ছুটে যেতাম জানি না। কিন্তু সে ভগ্নস্তূপ থেকে বার হবার সময়েই একটা ঢিবির ওপরে বুনো লতায় পা জড়িয়ে পড়ে গেলাম।

সজোরে সেই পড়ে যাওয়াতেই আমার হুঁশ ফিরে এল। এ আমি করছি কি! একটু সামলে নিজের হাত পায়ের দিকে তাকালাম। শরীরের স্পর্শে যা টের পাচ্ছি, সেই একটা গাঢ় ভিজে কিছুর ছোপ হাতে-জামায়-কাপড়ে লেগে রয়েছে। কিন্তু এ কি রক্ত?

এতক্ষণে খেয়াল হওয়ায় পকেট থেকে টর্চটা বার করে দেখলাম। রঙটা লালই বটে, কিন্তু রক্ত এ তো নয়! রক্ত হলে এতক্ষণে তো জমতে শুরু করত।

জিনিসটা তাহলে কি? আর খানিক আগে যা ঘটেছে সে ব্যাপারটারই বা কি?

নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে হাতপায়ের বেশ একটু কাঁপুনি অনুভব করলেও দাঁতে দাঁত চেপে টর্চটা ধরে আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

এদিকে-ওদিকে একটু খোঁজবার পর সঠিক জায়গাটা পেতে খুব দেরি হল না।

প্রথমেই সারা শরীরটা তখন অবশ্য শিউরে উঠেছে। ঠাণ্ডা নরম কি একটা রবারের মতো জিনিস পায়ে মাড়িয়ে ফেলেছি।

হৃদপিণ্ডটা একেবারে যেন লাফ দিয়ে উঠলেও কোনরকমে নিজেকে সামলে জিনিসটা মেঝে থেকে এবার তুলে টর্চটা জ্বালালাম।

লাল গাঢ় ছোপ-লাগা সেই ছিঁড়ে-খুলে-আসা হাতটা।

পায়ের তলায় এইটেই রবারের মতো লেগেছিল। জিনিসটা নিপুণভাবে রবারেরই তৈরি—ফোম রবারের। পাশে একটু খোঁজার পর খড়ের তৈরি মূর্তিটাও পেলাম। একটা হাত-কাটা অবস্থায় ঘরের কোণটায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

হাতটা সঙ্গে নিয়েই কাছারিবাড়িতে ফিরে এলাম। সরকারমশাইয়ের নাক-ডাকা আর শোনা যাচ্ছে না। দুবার বাইরে থেকে ডেকে ঘরেই গিয়ে ঢুকলাম। সরকারমশাই সেখানে নেই।

পরের দিন সকালে আমার টেবিলেই তাঁর চিঠিটা পেলাম। হঠাৎ বাড়িতে বিপদের খবর পেয়ে তাঁকে রাত্রেই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমার সেবার কোন ত্রুটি যাতে না হয়, সে-ব্যবস্থা তিনি করে যাচ্ছেন। আমি যেন তাঁকে মাফ করি।

সেবাযত্নের ব্যবস্থা সত্যিই যে করেছেন সকালেই গয়লা আসায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কাল রাত্রে দুধ দাওনি কেন? জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

আজ্ঞে, সরকারমশাই যে খবর দিয়ে পাঠালেন, দুধ রাত্রে লাগবে না বলে!

চুপ করে শুনলাম। একটু বেলায় গ্রামের নতুন আলাপীরা এলে গড়মাদারের ভূতুড়ে কিংবদন্তির কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

তাঁরা শুনে অবাক। অনেককালের পোড়োবাড়ি হলে যা হয়, সেই ভূতুড়ে বদনাম বাড়িটার থাকলেও সরকারমশাই আমায় যা বলেছেন, সেরকম কোন গল্প তাঁরাই শোনেননি।

কিন্তু কাল রাত্রে সমস্ত গ্রাম হঠাৎ অমন নির্জন নিস্তব্ধ ছিল কেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

নির্জন নিস্তব্ধ ছিল?—আলাপীরা হাসলেন। তারপর বুঝিয়ে দিলেন যে নেহাত বেয়াড়া কিছু না ঘটলে ঝুমুরডির মতো গ্রাম প্রতিরাত্রেই অমনি নিস্তব্ধই থাকে। আমি এর আগে রাত্রে বার হইনি বলে জানতে পারিনি।

সোজা তারপরদিনই কলকাতায় ফিরে এলাম। ফিরে স্টেশন থেকে ঝুমুরডির নাগের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে সুবুদ্ধিটা মাথায় এল। নাগের কাছে

তো নয়ই, নিজের অফিসেও এখন যাবার দরকার নেই। বাজির মাস শেষ হতে আর কয়েকটা দিন বাকি আছে। সে-কটা দিন কোন হোটেলে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কিছু নেই। পরাশর কি করছে গোপনে সে-খবরও নেওয়া যাবে।

বুদ্ধিটা যে ভালোই এসেছে, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের একটা ছোটখাট হোটেল থেকে পরাশরের বাড়ি ফোন করেই তা বোঝা গেল। পরাশর বাড়িতে নেই, কলকাতাতেও না। আমি কলকাতা ছাড়ার দিনকয়েক বাদেই কোথায় যে গেছে আর কবে যে ফিরবে তার বাড়ির অনুচর কিছুই জানে না।

মনে মনে একটু হাসিই পেল। নাগেদের সরকারমশাইয়ের কাছে আমি নাকাল হয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে ডবল হয়রানি পরাশরের এখন হচ্ছে না কি? নিজের গোয়েন্দাগিরির মান রাখতে হিল্লি দিল্লি কোথায় আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে।

ঠিক একমাস পূর্ণ হবার পরদিন নিজের বাসায় ফিরে গেলাম।

পরাশর এখনও ফিরেছে কি না তার বাসায় খোঁজ করবার জন্যে ফোনটা তুলতে গিয়ে নামিয়ে রাখতে হল। স্বয়ং পরাশরই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকছে।

কিন্তু তার হাতে ওটা কি?

হাতে যে কি, পরাশর টেবিলের ধারে এসে বসে হাসিমুখে নিজেই জানিয়ে দিলে, তুমি পরপর চারহপ্তা ছাপাবে কথা দিয়েছিলে, তাই বাছাই করবার জন্যে কটা বেশি কবিতাই রেখেছি!

পরপর তোমার কবিতা ছাপব,—কটমটিয়ে পরাশরের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ বিমূঢ় বিহ্বল গলা দিয়ে আর স্বর বার হতেই চায় না।

তু...তু...মি! তারপর একটু সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমার ঠিকানা পেলে কি করে?

সামান্য একটু খরচ করে। পরাশর তাচ্ছিল্যভরে পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে আমায় হাতে দিয়ে বললে, এই যে, দেখ না।

দেখলাম। খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটা নিরুদ্দেশের। বেশি নয়, মাত্র গুটিকয়েক লাইন: খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীকৃত্তিবাস ভদ্র কয়েকদিন হইতে নিখোঁজ। কেহ তাঁহার সন্ধান জানিলে এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিয়া বাধিত করিবেন!

আমার পড়া শেষ হবার আগেই পরাশর বলে গেল, ও বিজ্ঞাপন বার হবার পরদিনই মিঃ নাগ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর তাঁর একটু সাহায্য নিয়ে যা করবার করেছি। ওই ফোমরবারের হাতটা বানাতে যা একটু হাঙ্গামা হয়েছিল; আর প্রথমে গিয়ে মিঃ নাগের চিঠি থাকা সত্ত্বেও সরকারমশাইকে এ-ষড়যন্ত্রে রাজি করাতে হয়েছিল।

কিন্তু, কিন্তু—গলাটা বৃথাই স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই নারীমূর্তিটি কে?

কেন? পরাশর একটু গর্বভরে জানালে, খুব খারাপ মানিয়েছিল? ছেলেবেলায় ফিমেল পার্ট করেছি যে! এখন মন দিয়ে শোন, কটা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি। নাগেরও দুটো আছে—

নাগেরও আছে? তাও আমায় ছাপাতে হবে?

বাঃ, তা হবে না!—আমার আগুনের হুঙ্কার মতো বাচনিকভঙ্গি গ্রাহ্য না করে পরাশর জোর দিয়ে বললে, একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে!

চোর-চক্রান্ত

সুকুমার সেন

উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরে শিখর-চূড়ায় বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে একটি বড় হীরা গাঁথা আছে। তার কিরণে উজ্জয়িনীর হর্ম্যাবলী ধৌত হয় না বটে তবে দিনের বেলায় তার চকমকানি আর রাতের বেলায় তার ঝকঝকানি (চাঁদ থাকলে) ও ঝিকমিকানি (রাত তারা ভরা হলে) দূর থেকেও লোকের চোখে পড়ে। হঠাৎ একদিন সকলের মনে হল, তাই তো মন্দির-চূড়ায় তো আর হীরার চকমকানি নেই। একেবারে অন্ধকার। হল কী?

এ ব্যাপার আগেই মহাকালের মন্দিরের অধ্যক্ষ মধুরক্ষিতের নজরে এসেছিল। তিনি চূড়ায় লোক উঠিযে জেনেছিলেন যে হীরা নেই। তার স্থানে আছে এক টুকরো উজ্জ্বল মসৃণ পাথর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহামন্ত্রী শারদানন্দ ও কালিদাসকে খবর পাঠান। তাঁরা এসে পাথরের টুকরোটি নামিয়ে আনান আর মধুরক্ষিতকে বলেন এ বিষয়ে একেবারে চুপচাপ থাকতে। ইতিমধ্যে তাঁরা গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাবেন।

অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ব্যাপারটি চেপে রাখা গেল না। বড় বড় নাগরিকেরা মধুরক্ষিতের কাছে খবর নিতে এলেন। কালিদাসের পরামর্শ অনুসারে মধুরক্ষিত কৌতূহলীদের জানিয়ে দিলেন যে বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার জন্যেই হীরাটি খুলে পড়েছে। তাই চূড়ায় আর চকমকানি দেখা যাচ্ছে না। হীরাটি পাওয়া গেছে কিনা সে বিষয়ে নাগরিকেরা কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করায় মধুরক্ষিত আশ্বস্ত হলেন।

তারপর শারদানন্দের উপদেশ মতো ঢেঁটরা পিটিয়ে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হল।

বহু বহু কাল পূর্বে মহাকাল-মন্দিরের শিখরচূড়ায় আবদ্ধ হীরকখণ্ডটি কালক্রমে শিথিলবন্ধন হওয়ায় সেটির স্থানচ্যুতি ঘটেছে। সেটিকে যথাস্থানে পুনর্বিন্যাস করতে কিছু সময় লাগবে। জনসাধারণ যাতে এ বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করেন সে কারণে এই ঘোষণা দিচ্ছেন মহাকালের মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রীমধুরক্ষিত।

ইস্তাহার ঘোষণার পরদিন মধ্যাহ্নে মহামন্ত্রীর উপকারিকায় অনুসন্ধান-সমিতির গোপন বৈঠক বসল। শারদানন্দ, কালিদাস ও মধুরক্ষিত এই তিনজনকে নিয়ে সমিতি।

অধিবেশনের গোড়াতেই মধুরক্ষিত আপনার কিছু ত্রুটি স্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে মাস তিনেক আগে তিনি এক ব্যক্তিকে দিয়ে হীরাটি পালিস করিয়ে নিয়েছিলেন। পালিস করার পর হীরাটির উজ্জ্বলতা যে বেড়েছিল তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

কালিদাস প্রশ্ন করলেন, 'তার আগে যে হীরার উজ্জ্বলতা কমে গিয়েছিল তাও কি তুমি প্রত্যক্ষ করেছিলে?'

মধুরক্ষিত মাথা চুলকিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন, 'হলপ করে বলতে পারব না। তবে কিছু দিন থেকে মনে হচ্ছিল যেন হীরাটার দীপ্তি কমে গেছে।'

কালিদাস বললেন, 'এমন মনে হবার কারণ?'

'কারণ আমার মূঢ়তা,' মধুরক্ষিত বললেন।

'সে কীরকম?' কালিদাস বললেন।

'তুমিই তো লিখেছ—''মূঢ় পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।'' আমি অপরের কথায় কান দিয়ে অত্যন্ত মূঢ়ের কাজ করেছিলুম?'

শারদানন্দ বললেন, 'খুলে বল দেখি।'

'তখন কিছুদিন ধরে কোন কোন লোকের মুখে শুনছিলুম যে হীরার জলুস কমে গেছে। আমার তো প্রথমে তা বোধ হয়নি। লোকের কথা শুনতে শুনতে মনে হল হবেও বা।'

'কার কার মুখে শুনেছিলে?' কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন।

'একজন ছাড়া আর কারো মুখ বা নাম মনে পড়ছে না।'

'সে ব্যক্তি কে?'

'মহাকালের মন্দির-শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের বিশ্বস্ত কর্মচারি ইন্দ্রশিব।'

'তারপর।' শারদানন্দ বললেন।

'তারপর একদিন ধনদত্ত নিজে এসে ওই কথা বললে, আর বললে যে শীঘ্রই এক ভালো মণিকার আসছে। তাকে দিয়ে হীরার সংস্কার করে নেওয়া যেতে পারে। আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম।'

'তারপর।'

'এই কথাবার্তার দিন দশ পনেরো পরে ইন্দ্রশিব মণিকারকে নিয়ে এসে বললে যে কর্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন চূড়ামণি সংস্কারের জন্যে। আমি মণিকারকে সব জোগাড় করে দিলুম। সে চূড়ায় উঠে সারাদিন ধরে কাজ করলে। সন্ধ্যার আগে নেমে এসে বললে, ''সব ঠিক করে দিলুম। অনেক দিন ওতেই বেশ চলবে।'' সন্ধ্যা হলে পর দেখা গেল হীরার জ্যোতি বেশ বেড়েছে।'

'তারপর।'

'তারপর আর কী? এই অন্ধকার।'

কালিদাস বললেন, 'ব্যাপার বোঝা গেল এই যে তোমার চোখে ধুলো দিয়ে এক প্রতারক মহাকালের চূড়ামণি চুরি করে নিয়ে গেছে। দেখি কালো হীরাটা।'

মধুরক্ষিত সন্তর্পণে কোঁচড়ে গোঁজা কোঁচার খুঁটের গাঁট খুলে একটি কৌটো বার করে কালিদাসের হাতে দিলেন। কালিদাস তা খুলে পাথরের টুকরোটি বার করলেন। বললেন, 'কৌটোর মধ্যে রেখে বুদ্ধির কাজ করেছ।'

মধুরক্ষিত বললেন, 'তুমিই তো বলেছিলে কৌটোর মধ্যে রাখতে।'

কালিদাস পাথরের টুকরোটি হাতে নিয়ে রোদে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দেখে এসে বললেন, 'লোকটা খুব নিপুণ শিল্পী। টুকরোটার গায়ে ভালো আটা দিয়ে অভ্র স্ফটিক ও হীরক চূর্ণ এমনভাবে লেপে দিয়েছিল যাতে পাথরটা ভালো করে পালিস করা হীরার ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলন করতে পেরেছিল। রোদের তাতে আটা শুকিয়ে যায়, চূর্ণপ্রলেপ খসে

পড়তে থাকে। অবশেষে প্রতিফলন ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়।'

শারদানন্দ কালিদাসের হাত থেকে নিয়ে পাথরখণ্ড ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'তোমার সিদ্ধান্ত যথার্থ। এখন কী করা যায় তুমিই বলো। তোমার উপরেই আমরা তদন্তের ও চোরধরার ভার দিলুম।'

মধুরক্ষিত এতক্ষণ বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলেন। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

কালিদাস বললেন, 'বেশ। আমি ভার নিলুম। তবে ফল পেতে দেরি হবে। চতুর চোর-চক্রান্ত ভেদ করতে সময় লাগবে। তবে ভেদ করতে পারব বলে আশা করি। চূড়ামণি উদ্ধারেরও ভরসা রাখি।'

'তা হলে আজ এইখানেই সভা ভঙ্গ হোক।' শারদানন্দ গাত্রোত্থান করলেন। কালিদাস মধুরক্ষিতকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাথরখণ্ডটি শারদানন্দের কাছেই রইল।

বাড়ি ফিরে এসে কালিদাস মধ্যাহ্ন-ভোজন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন অগ্নিশর্মাকে। অগ্নি এলে পর তাঁকে চূড়ামণি-চুরির কথা সব বললেন। তারপর নির্দেশ দিলেন ইন্দ্রশিবের উপর দিনরাত নজর রাখতে হবে। সে কি করে, কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর অবিলম্বে এনে দিতে হবে তার পরিচয়। কোথাকার লোক। কী বৃত্তান্ত। কতদিন উজ্জয়িনীতে আছে। তার সংসারে কে আছে। ইত্যাদি সব খবর।

কাজের ভার নিয়ে অগ্নিশর্মা চলে গেলে পর কালিদাস গেলেন মহামন্ত্রীর কাছে। গিয়ে বললেন, 'দেবপাদকে বলুন গিয়ে কদিনের জন্যে বেতালভট্টকে চাই।'

তখনি শারদানন্দ রাজকুলে গেলেন আর একটু পরেই বেতালভট্টকে নিয়ে হাজির হলেন।

কালিদাস বেতালভট্টকে বললেন, 'কালই তোমাকে জরুরি কাজে মথুরা যেতে হবে। সেখানকার শ্রেষ্ঠীরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরাজহরতের কারবারী। তোমাকে কিছু খবর আনতে হবে। উপস্থিত কিনতে পাওয়া যাবে এমন বড় হীরার বিবরণ ও দামের তালিকা আনবে। তবে অনুসন্ধান করবে গোপনে। যদি বোঝ তা হলে তক্ষশিলায় ও মূলস্থানেও যেতে পার। আমার মনে হয় সে দু স্থানের বাজারের সংবাদ মথুরা থেকেই পেতে পারবে।'

বেতালভট্ট বললে, 'আমি ভোরেই রওনা হচ্ছি।'

কালিদাস এইভাবে সবেগে তদন্ত কার্য আরম্ভ করে দিলেন।

তিন দিনের মধ্যেই অগ্নিশর্মা ইন্দ্রশিবের সম্বন্ধে প্রথম রিপোর্ট দাখিল করলে। সে মূলস্থানের লোক। মথুরায় এক শ্রেষ্ঠীর দোকানে কাজ করত। ধনদত্ত তার পরিচয় পেয়ে তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের খাস কর্মচারি করে রেখেছে উজ্জয়িনীতে। সে আজ বছর পাঁচ ছয় আগেকার কথা। ইন্দ্রশিব একা থাকে। তার সংসারে কেউ কোথাও আছে বলে জানা নেই। অত্যন্ত বিনীত ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি। সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। বহু লোকের সঙ্গে সে মেশে। নিজের কাজে খুব তৎপর। বাড়িতে থাকে এক পরিচারক ও এক দ্বাররক্ষক। মাঝে মাঝে অতিথি আসে। দুচার দিন থেকে চলে যায়। চরিত্র দুষ্ট নয়। কোন বদ খেয়ালও নেই। তবে মাঝে মাঝে রাত্রিতে শুঁড়ি-বাড়ি থেকে সাদা কলসি করে পানীয় আসে। সে নিষ্ঠাবান শৈব। শৈবাচার্যদের মঠের শিষ্য। শিবের পূজা করে

প্রত্যহ। সংসারযাত্রা অনাড়ম্বর।

কালিদাস শুনে বললেন, 'বেশ। তুমি এখন ওকে দিনরাত্রি লক্ষ করতে থাক। সন্দেহজনক কিছু দেখলে বা শুনলে তখনি আমাকে জানাবে।'

দিন কুড়ি কেটে গেল। নতুন কোন খবর নেই। বেতালভট্টের ফিরতে দেরি হচ্ছে। কালিদাসের কথামতো শারদানন্দ নতুন এক ঘোষণা দিলেন এই মর্মে—

মহাকালের মন্দির-চূড়ায় হীরকখণ্ডটিতে চোট লেগেছে। ওটির বদলে ওইরকম একটি হীরা সংগ্রহ করবার চেষ্টা হচ্ছে। মূল্যের কোন আটকাল নেই। হীরা পেলেই অবিলম্বে চূড়ায় বসানো হবে। জনসাধারণকে আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি। মহামন্ত্রী শ্রীশারদানন্দ।।

আরও আট দশ দিন কেটে গেল। বেতালভট্ট ফিরে এসে হীরার মূল্য তালিকা দাখিল করলে পর এই তৃতীয় ঘোষণা দেওয়া হল—

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ ধনী ও অভিজাতবর্গ এবং শ্রেষ্ঠীসমাজকে জানানো হচ্ছে যে মহাকালদেবের মন্দিরচূড়ায় নূতন হীরকখণ্ড বসাতে হবে। যদি কারো কাছে বড় হীরকখণ্ড বিক্রয়ার্থে থাকে তবে তিনি অবিলম্বে মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রীমধুরক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। যথোচিত মূল্য দেওয়া হবে। বিক্রয়কারীর অতিরিক্ত লাভ হবে চিরস্থায়ী পুণ্য। মহামন্ত্রী শ্রীশারদানন্দ।।

ঘোষণাটি প্রচারিত হবার দুতিন দিন পরে ইন্দ্রশিব মধুরক্ষিতের কাছে এসে বললে, 'আমার মনিব আমাকে পাঠিয়েছেন হীরার ব্যাপারে। আমাদের রত্ন-ভাণ্ডার খুঁজে একখণ্ড হীরা পাওয়া গেছে। সেটির আকার-ওজন আপনাদের রত্নটির মতোই। তিনি বিকালে আপনার কাছে আসবেন।'

খুশি হয়ে মধুরক্ষিত বললেন, 'অমনি হীরাটিও সঙ্গে আনতে বলবেন। তখনি দরদাম সব চুকিয়ে দেব।'

'যে আজ্ঞা, তাই বলব।' বলে ইন্দ্রশিব মধুরক্ষিতকে নমস্কার করে চলে গেল।

মধুরক্ষিত তখনি শারদানন্দ ও কালিদাসকে খবর পাঠালেন যে তাঁরা যেন বিকাল বেলায় মন্দিরে অবশ্য অবশ্য আসেন। ধনদত্ত ও তাঁর কর্মচারী ইন্দ্রশিব হীরা বেচতে আসবে।

বিকেল হবার আগেই কালিদাস মধুরক্ষিতের আবাসে হাজির হলেন। একটু পরেই শারদানন্দ এলেন। তখন কালিদাস মধুরক্ষিতকে বললেন, 'ইন্দ্রশিব যা তোমাকে বলেছিল তা মনে থাকলে ঠিক ঠিক বলো।'

মধুরক্ষিত ইন্দ্রশিবের উক্তি যথাযথ পুনরুক্তি করলেন। শুনে কালিদাস চাঙ্গা হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ।' শারদানন্দ তাঁর মুখের দিকে চাইলে বললেন, 'পরে বলছি।'

দণ্ড দুই পরে ধনদত্ত ও ইন্দ্রশিব এসে হাজির হল। তাদের বসতে বললেন মধুরক্ষিত। তিনজনকে প্রণাম করে দুজনে আসন গ্রহণ করলে।

মধুরক্ষিত বললেন, 'কই হীরা এনেছেন না কি?'

'হাঁ এই যে,' বলে ধনদত্ত ইন্দ্রশিবকে ইঙ্গিত করলে। ইন্দ্রশিবের কোমরে গোঁজে বাঁধা ছিল। সে তা খুলে তার থেকে একটা কৌটো বার করলে। তারপর কৌটোর ঢাকা খুলে

তা মধুরক্ষিতের হাতে দিলে। মধুরক্ষিত দেখে শারদানন্দের হাতে দিলেন। শারদানন্দ দেখে কালিদাসের হাতে দিলেন। কালিদাস দেখে মধুরক্ষিতকে ফেরত দিলেন। মধুরক্ষিত কৌটোটি ধনদত্তের হাতে দিয়ে বললেন, 'রাখুন। আমি মিলিয়ে দেখি আকার-আয়তন ঠিক মিলছে কি না।'

এই বলে তিনি উঠে গিয়ে দপ্তরখানা থেকে বই এনে আগেকার হীরার বর্ণনা পড়ে নিলেন। ইন্দ্রশিবের গেঁজেতে ছোট মাপকাঠি আর হীরাজহরত ওজনের ছোট তুলাদণ্ড ছিল। হীরাটির মাপ আর ওজন যথাযথ মিলে গেল।

ধনদত্ত বললেন, 'এখন দামের কথাটা।'

শারদানন্দ বললেন, 'আপনারা দুজনে একটু বাইরে যান। আমরা নিজেদের মধ্যে একটু কথা কয়ে নিই।'

ধনদত্ত ও ইন্দ্রশিব বাইরে চলে গেল।

মধুরক্ষিত বললেন, 'এ তো আমাদেরই সেই হিরে।'

কালিদাস বললেন, 'ঠিক বটে তো?'

মধুরক্ষিত বললেন, 'কোন ভুল নেই।'

শারদানন্দ বললেন, 'এখন তা হলে করা যায় কী?'

কালিদাস বললেন, 'আপাতত মধুরক্ষিত ওদের দুজনকে নিয়ে যান মণিরত্ন-কোষ্ঠাগারে টাকা দেবার অছিলা করে। তারপরে উনি বাইরে এসে কোষ্ঠাগারে তালা মেরে দিন। তারপরে যা করবার আমি করব। আপনারা দেখে যান আর আমি যেমন বলি তা করুন।'

মধুরক্ষিত ধনদত্ত ও ইন্দ্রশিবকে ভিতরে ডেকে এনে বললেন, 'চলুন রত্নভাণ্ডারে। সেখানে আপনারা যে দাম চান তা চুকিয়ে দেব।'

তিনজনে পাশের দরজা দিয়ে ধনভাণ্ডারের দিকে চলে গেলেন। রত্নভাণ্ডারের দ্বারে গিয়ে মধুরক্ষিত তিন তালা খুললেন। তারপর তিনজনে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'ওই যা হিরেটা তো আনা হয়নি। যাই আনি গে। আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন।'

রক্ষী-বিহীন রত্নভাণ্ডারে থাকতে পেয়ে শ্রেষ্ঠী ও তার কর্মচারি মনে মনে খুব খুশি হল। মধুরক্ষিত বেরিয়েই বাইরে তালা এঁটে দিলেন। তখন তাদের মনে আরও আনন্দ হল। দুজনে এদিকে ওদিকে সোনারূপার বাসনপত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল।

এদিকে দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যায় মধুরক্ষিত আর আসেন না। ধনদত্ত ও ইন্দ্রশিবের মনে আতঙ্কের আর্বিভাব হল।

মহাকালের সন্ধ্যারতির ঢাক বাজল। আরতি শেষ হলে তা থেমে গেল। তবুও রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলে না।

অবশেষে যখন খুলল তখন শ্রেষ্ঠী ও তাঁর কর্মচারির অবস্থা কাহিল। মধুরক্ষিত এসেছেন দুজন মন্দির-প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে। কোন কথা না বলে মধুরক্ষিত ধনদত্ত ও ইন্দ্রশিবকে নিয়ে প্রকোষ্ঠের বাইরে এসে তিন তালা লাগালেন।

ক্ষীণকণ্ঠে ধনদত্ত বললে, 'আমার টাকাটা।'

'হবে হবে। হিসাবে একটু গড়বড় হচ্ছে।' মধুরক্ষিত বললেন।

'কী গড়বড়?'

'একটু পরেই শুনতে পাবেন।' এই বলে ধনদত্তকে প্রহরী দুজনের জিম্মায় রেখে মধুরক্ষিত ইন্দ্রশিবকে নিয়ে চলে গেলেন। যেখানে শারদানন্দ ও কালিদাস বসেছিলেন সেখানে তাকে হাজির করলেন।

ইন্দ্রশিব ঘরে ঢুকতেই কালিদাস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো মন্দিরের চূড়া রত্নটিকে কখনো দেখোনি?'

'আজ্ঞে না। দেখবার কোন উপায় ছিল না।'

'তা হলে কী করে বুঝেছিলে যে তোমাদের রত্নটি ঠিক চূড়ারত্নের মাপসই।'

'কই সে কথা তো আমি বলি নি।'

'হ্যাঁ বলেছিলে মধুরক্ষিতকে। মনে করে দেখ। সকালের কথা বিকেলে ভুলে গেলে! 'আমাদের রত্নভাণ্ডার খুঁজে একখণ্ড হীরা পাওয়া গেছে। সেটির আকার-ওজন আপনাদের রত্নটির মতোই।'

ইন্দ্রশিব নির্বাক।

কালিদাস বললেন, 'এইভাবে চূড়ারত্ন চুরি করবার মতলব কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তোমার না কর্তার?'

ইন্দ্রশিব বললে, 'সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না মহাশয়। সব দোষ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কর্তাকে রেহাই দিন।'

কালিদাস মধুরক্ষিতকে কিছু ইঙ্গিত করলেন। মন্দিরাধ্যক্ষ ইন্দ্রশিবকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর ধনদত্তকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই কালিদাস প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন, 'মতলবটা কে ফেঁদেছিল—আপনি না ইন্দ্রশিব।'

ধনদত্ত কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বললে, 'আমি কিছুই জানি না। সবই ওই ইন্দ্রশিবেটার কাজ।'

'কিন্তু আপনিই তো বেচতে এসেছেন। টাকাটা তো আপনিই নিতেন। টাকায় তো আপনারই অধিকার, ওর তো নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কালিদাস বললেন, 'আপনার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আপনার পূর্বপুরুষেরা বহুকাল ধরে মহাকালের রত্নভাণ্ডারের পরীক্ষক ছিলেন। সেই খাতিরে আপনাকে মন্দিরশ্রেষ্ঠীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সে মর্যাদাকে আপনি কাদায় লুটিয়েছেন। আপনার এ অপরাধের বিচার প্রকাশ্যে এবং রাজসভায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাতে বাধা রয়েছে—মহাকালের মর্যাদাহানি ঘটবে জনসাধারণের চোখে। তাই আমরা এখনই আপনার বিচার শেষ করতে চাই। মহামন্ত্রী বিচারক। আমি অভিযোক্তা। মন্দিরাধ্যক্ষ সাক্ষী।'

ধনদত্ত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

কালিদাস বললেন, 'বিচার আরম্ভ হবার আগে একটা কথা জানতে চাই। সত্য করে বলুন কেন রত্নটি বাইরে পাচার না করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। ওটি যে আপনার কাছে ছিল তা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। আপনিই ওটি এখানে বেচতে এনেছেন।'

মাথা নত করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধনদত্ত হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'রত্নটি সরিয়ে ফেলবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক স্বপ্ন দেখে সে চেষ্টা আর করিনি।'

'কী স্বপ্ন?'

'রত্নটি হাতে আসবার তৃতীয় দিন রাত্রিবেলায় স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন রত্নটি নিয়ে মথুরার পথে হনহন করে চলেছি। যেতে যেতে হঠাৎ পাশের ঘাসবন থেকে একটা সাদা

মোটা সাপ ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে আমার মাথায় ছোবল মারলে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। তখনি ঘুম ভাঙল। বুক দুড়দুড় করছে। ঘামে ভিজে গেছি। বুঝলুম মহাকালের এ স্বপ্নাদেশ। এ রত্ন তাঁকে ফেরত দিতেই হবে নইলে নিস্তার নেই। কিন্তু দিই কী করে? ইন্দ্রশিবকে স্বপ্নের কথা বললুম। শুনে সে শিউরে উঠল। সেও বললে—যেমন করে হোক হীরাটি মন্দিরে ফেরত পাঠাতেই হবে। আমি ভাবলুম, না হয় পূজার ছলে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে চুপি চুপি রেখে আসব। কিন্তু সত্যি কথা বলি, মনে লোভও আছে। ওটি হস্তগত করতে বেশ কিছু অর্থব্যয় হয়েছিল। সেটা কি পূরণ করা যায় না? লাভ না হয় নাই হল। এই রকম ভাবছি এমন সময় ইন্দ্রশিব এসে আমাকে মহামন্ত্রীর প্রথম ঘোষণাটির কথা বললে। আমার মনে ভরসা জাগল, হয়ত কিছু টাকা তুলতে পারব। তারপর যখন মহামন্ত্রীর দ্বিতীয় ঘোষণার কথা শুনলুম তখন মনে খুবই আশা হল। সেই দিনই ইন্দ্রশিবকে বললুম, চল যাই আজই ওটি মন্দিরাধ্যক্ষকে বেচতে। ও বললে, এত তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না। আটদশ দিন সবুর করলে ভালো হয়। আমার আর তর সইল না। তাই আজ সকালেই ওকে পাঠিয়েছিলুম।'

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ।

তারপর নীরবতা ভাঙলেন কালিদাস। তিনি মহামন্ত্রীকে বললেন, 'এখন আপনি বিচার করে আজ্ঞা দিন।'

শারদানন্দ খানিকক্ষণ ভেবে নিলেন। তারপর ইন্দ্রশিবকে হাজির করতে বললেন। মধুরক্ষিত ইন্দ্রশিবকে নিয়ে এলেন।

তারপর ধনদত্তকে সম্বোধন করে মহামন্ত্রী বললেন, 'এ ব্যাপারে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার। রত্নচুরির ষড়যন্ত্র আপনারই করা। ইন্দ্রশিব এবং মূলস্থান থেকে আগত মণিকার আপনারই নিয়োগ ও আদেশ মতো কাজ করেছে। ওরা চোরের সহযোগী, তবে নিজেরা চোর নয়। আপনিই আপাতত একমাত্র অপরাধী।

'আপনার অপরাধ আপনার উক্তি ও আচরণেই অভিব্যক্ত হয়েছে। সাক্ষী-সাবুদের আবশ্যক করে না। আমাদের অর্থাৎ মহাকালের দিক থেকে অপরাধ খুব গুরুতর নয় বটে—সাধারণ চুরি কখনোই গুরুতর অপরাধ নয়—তবে আপনার দিক থেকে এ অপরাধ গুরুদ্রোহের মতোই মহাপাপ। এ পাপ আপনার অন্তরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিক শাস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

'তবে আপনার যে আর উজ্জয়িনীতে থাকা চলবে না তা আপনি নিজেই হয়ত স্বীকার করবেন। আমি বলি কি, মাস তিন চারের মধ্যে আপনি উজ্জয়িনী থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে নিয়ে সিন্ধুসৌবীর দেশে চলে যান। এ কাজ আপনি স্বেচ্ছায় ও ধীরে সুস্থে করবেন। তাতে কেউ কিছু জানতে বা বুঝতে পারবে না। চার মাসের মধ্যে আপনি যদি উজ্জয়িনী পরিত্যাগ না করেন তবে পঞ্চম মাসের প্রথম দিন রাত্রেই আমাদের লোক গিয়ে আপনার ঘরদ্বার সমভূমি করে দিয়ে আসবে।'

ধনদত্ত চুপ করে রইলেন। তাঁর মন ইতিমধ্যেই খানিকটা হালকা হয়ে গেছে।

ইন্দ্রশিবের দিকে চেয়ে মহামন্ত্রী বললেন, 'তুমি অন্যায় করেছ। তবে যেহেতু তা প্রভুর নিয়োগ অনুসারে করেছিলে সেই হেতু আমাদের সরাসরি দণ্ডযোগ্য নও তুমি। তোমাকে কোন দণ্ড দিচ্ছি না তবে সাবধান করছি দুষ্ট প্রভুর আদেশ অনুসারে পুনরায় অপরাধ করলে আর রেহাই পাবে না।'

বিচার শেষ হয়ে গেল।

তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আমরা কাশ্মির যাচ্ছিলাম।

কলকাতা থেকে পাঞ্জাব পৌঁছতেই দুদিন লাগে—তারও পরে ওধারে যাত্রা বাকি। এই দীর্ঘ সময় ট্রেনে কি করে কাটানো যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করা গেল যে সকলে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চমকপ্রদ গল্প এক একটি বলতে থাকবে। এতে যাত্রার একঘেয়েমি অনেকটা কাটবার সম্ভাবনা।

প্রথমেই মক্কেল পাকড়ানো গেল তরুণকে। সে গোয়েন্দা মানুষ—অনেক বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছে এবং হচ্ছে। তার কাহিনীই সকলের চেয়ে বিচিত্র হবে নিশ্চয়!

তরুণ কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সেবার রেঙ্গুন থেকে আসবার সময় কি অদ্ভুত উপায়ে একটা চোর ধরেছিলুম আর এক বেচারী ভদ্রলোকের ছেলেকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলুম সেই কথাই বলব।

মহামান্য ব্রহ্ম গবর্নরের একটা সামান্য কাজে রেঙ্গুন গিয়েছিলুম। দিন সাতেক পরে জাপান লাইনের প্রকাণ্ড এক জাহাজে ফিরছি। সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কিন্তু তার আগে সুন্দরী মা-সিনের কথা কিছু বলা দরকার।

জাহাজে উঠলুম বিকেলবেলা। তার একটু পরে সন্ধের সময় ডিনার খেতে ঢুকেছি খাবার ঘরে, হঠাৎ ঘোষালের সঙ্গে দেখা। ঘোষাল এখন বুঝি রেঙ্গুন ব্যাঙ্কের কি একটা হোমরা-চোমরা হয়েছে। যাই হোক ঘোষাল আমায় দেখেই লাফিয়ে উঠল এবং খুব স-কলেবরে অভ্যর্থনা করলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের দুজনেরই এক টেবিলে সিট পড়েছিল। মনটা খুশিতে ভরে উঠল—হাজার হোক পুরনো বন্ধু, বিশেষত জাহাজে উঠলেই এত মন খারাপ হয়ে যায় আর এত নিঃসঙ্গ ঠেকে যে, যে-কোনও চেনা মুখ দেখলেই মনে আনন্দ হয়।

খেতে খেতে ঘোষাল বললে, ওহে তরুণ, তোমার বাঁ ধারের টেবিলে কে বসে আছে দেখেছ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—একটি রূপসী বার্মিজ মেয়ে। তার দু পাশে দুটি ওই দেশীয় ছোকরা বসে আছে। তার মধ্যে একটির ওপরেই মেয়েটির কিছু পক্ষপাত, সেইজন্যে আর একজনের ক্ষোভের আর সীমা নেই। আরও দেখলুম যে ঘরসুদ্ধ সকলকারই দৃষ্টি সেই দিকে।

ঘোষালকে বললুম, কি ব্যাপার! একটি বার্মিজ মেয়ের দিকে ঘরসুদ্ধ সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে—এ ছাড়া আর তো কিছু বুঝলুম না!

ঘোষাল অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি কি মা-সিন্‌কে চেন না?

আমি বললুম, না। এবং চেনার জন্য ব্যস্তও নই।

ঘোষাল বললে, বিখ্যাত ধনকুবের স্যার মংফুর একমাত্র কন্যা। সম্প্রতি রেঙ্গুন থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। ভারতের সব বিখ্যাত স্থান দেখবার ইচ্ছে আছে। ওধারের ছোকরাটির নাম চাংফু—ওই যে যার সঙ্গে ও বেশির ভাগই হেসে কথা কইছে। আর এধারেরটি হচ্ছে য়িজয় অর্থাৎ আমাদের সোজা বাংলায় যাকে বলে বিজয়। দুটিই বড়লোক, দুটিই মা-সিনের পাণিপ্রার্থী। কিন্তু মা-সিন্ যে কাকে বিয়ে করবে শেষপর্যন্ত এ নিয়ে বেশ মোটা মোটা বাজি ধরা হচ্ছে জাহাজের ভেতর।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, বল কি? এ নিয়ে আবার জুয়াখেলা হয় নাকি?

ঘোষাল বললে, নিশ্চয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমিও কি বাজি ধরেছ?

একটু লজ্জিত হয়ে ঘোষাল বললে, হ্যাঁ। হাজার খানেক টাকা ধরেছি বিজয়ের ওপর।

আমি আর একবার তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, বিজযের যে কিছু আশা-ভরসা আছে বলে মনে হয় না তো!

ঘোষাল হেসে বলল, তুমি বার্মিজ মেয়েদের চেন না। ও শুধু বিজয়কে একটু উত্ত্যক্ত করার ফন্দি। দেখো শেষপর্যন্ত আমিই বাজি জিতব।

সেদিন ওই পর্যন্ত, কিন্তু মনটা ওইখানেই পড়েছিল—মা-সিনের দিকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় একটু নজর রাখতে শুরু করেছিলুম। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা উঠে দেখলুম—ঘোষালের কথাই সত্যি, অত সকালে তখনও কেউ ওঠেনি, নিরিবিলি ডেকের ওপর মা-সিন্ আর বিজয় পাশাপাশি বসে আছে।

সেদিন জাহাজের লোকদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিলে। মা-সিন্ সমস্ত দিন চাংফুর দিকে একবারও নজর দিলে না। যখনই মা-সিন্‌কে দেখা যায় তখনই দেখা যায় বিজয় আছে তার পাশে।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে বিজয়ের একটা শারীবিক ত্রুটি—ও একটুখানি খুঁড়িয়ে চলত—খুব সামান্য, তাহলেও সেটা নজরে পড়ে।

সেদিন সন্ধে থেকে অকস্মাৎ সমুদ্রের হাওয়া গেল বন্ধ হয়ে। ন'টার পর যদিও শুতে গেলুম কিন্তু কেবিনের মধ্যে থাকতে পারলুম না এবং ঘুমও এল না। ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে এলুম ডেকের ওপর। তখন ডেক একেবারেই খালি। ওপরের ডেকে উঠে জলের ধারে পাশাপাশি দুটি চেয়ার পাতা, তার একটাতে মা-সিন্ বসে আর একটা খালি। বুঝলুম বিজয় ছিল, নেই, কোথায় উঠে গেছে! হয়তো ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম—যতদূর নজর চলে জনমানবের সন্ধান নেই, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খানিকটা পায়চারী করে ওপরের ডেকের উদ্দেশে চলতে লাগলুম। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনগুলোর পাশ দিয়েই যেতে হয়, যেতে যেতে হঠাৎ একটা কেবিনের দোর খুলে বেরিয়ে এল একটি লোক, সামনে আমাকে দেখে কয়েক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করলে, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। স্পষ্ট দেখলুম একটু খোঁড়াচ্ছে। বুঝলুম বিজয়। কেবিনটার দিকে চেয়ে দেখলুম ছ'নম্বর....

পরের দিন ভোরবেলা এসে ঘোষাল কেবিনের দোরে ধাক্কা মারলে, ওহে তরুণ উঠেছ?

কি ব্যাপার?

ঘোষাল মুখে চোখে একটা ঘোরতর রহস্যের ভাব এনে বলল, কাল রাত্রে কি একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে জান?

মানতে হল যে জানি না।

ঘোষাল বললে, মা-সিনের আড়াই লাখ টাকা দামের মুক্তোর মালা চুরি গেছে। এই জন্মদিনে ওর বাপ ওকে উপহার দিয়েছিল।

চট্ করে কাল রাত্রের কথাটা মনে পড়ে গেল। প্রশ্ন করলুম, মা-সিনের কেবিনের কত নম্বর জান?

—ছ-নম্বর।

ভীষণ একটা সন্দেহ হল—তাহলে বিজয় কি!

জিজ্ঞেস করলুম, বিজয়ের কীরকম অবস্থা জান?

—চাংফুর থেকে গরীব। কিন্তু তুমিও কি বিজয়কেই সন্দেহ করছ?

বললুম, তার মানে? 'তুমিও কি' বলছ কেন?

ও বললে, কাল রাত্রে নাকি একজন লোককে ছ-নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল—সে নাকি একটু খুঁড়িয়ে চলে।

আমি বেশ একটু উত্তেজিতভাবে বললুম, তাই নাকি? তাহলে আর বিজয়কে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই!

এইবার ঘোষালের উত্তেজিত হবার পালা। বললে—কেন? কেন?

আমি ঘোষালের চোখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে বললুম, কারণ কাল রাত্রে সেসময় ডেকের ওপর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না! আমি খুব ভালো করে দেখেছি। সুতরাং একথা রটনা করলে কে? বিজয় নিশ্চয় নিজের কথা নিজে রটনা করেনি। আছাড়া আমায় দেখে সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া, সেটাও নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত—মানে সাক্ষী রাখা।

ঘোষাল তো অবাক্।

—বলো কি হে? কী ব্যাপার!

তখন সব কথাই খুলে বললুম।

ঘোষাল আমার হাত দুখানা চেপে ধরলে, বললে, ভাই, দেখ দেখি যদি এর একটা মীমাংসা করতে পারো, বিজয়ের ওপর আমার অনেকগুলো টাকা ধরা আছে। আজ সকালেও দেখি চাংফু খুব সান্ত্বনা দিচ্ছে মা-সিনকে। বিজয় দেখা করতে গিয়েছিল, মাথা ধরেছে বলে মা-সিন্ দেখা করেনি।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, তুমি যাও, ওধারে খোঁজ-খবর নাওগে—আমি মুখ হাত ধুয়ে যাচ্ছি।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে আমি বাইরে আসতেই ঘোষালের সঙ্গে দেখা, বললুম, কি হে further developments কি?

ঘোষাল বললে, ক্যাপ্টেনের আদেশে বিজয়ের ঘর সার্চ করা হল!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পাওয়া গেল কিছু?

ঘোষাল মাথা নেড়ে বললে, কিচ্ছু না।

আমি বললুম, আমি ডেকের ওপর আছি। তুমি একটু ওদিকে ঘুরে, মানে কাপ্তেনের কাছে গিয়ে যদি জেনে আসতে পার যে তারা এখন কী করবে তাহলে বড় সুবিধা হয়।

ঘোষাল তখনই চলে গেল। আমি ডেকের ওপর বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলুম। চারপাশের সব লোকেরই মুখে ওই এক কথা—মা-সিনের মুক্তোর মালা, বিজয় আর চাংফু। যারা চাংফুর ওপর বাজি ধরে দুশ্চিন্তায় মরছিল কাল থেকে তাদের মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে। জাহাজময় একটা ভীষণ রকম সাড়া পড়ে গেছে। কেউ বলছে, জাহাজের ওপর চুরি গেছে, ও আর পাবার আশা নেই। কেউ বা আশ্বাস দিচ্ছে, যদি এখনও সে জিনিস জাহাজের ওপর থাকে তাহলে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে। ইত্যাদি—

ঘণ্টাখানেক পরে ঘোষাল ফিরে এল, বললে, অনেক কষ্টে, ক্যাপ্টেনকে বিস্তর খোসামুদি করে কথা বার করা গেছে। আজ রাত্রে নটার সময় একটা 'ভ্যারাইটি এন্টারটেনমেন্ট'র ব্যবস্থা আছে। আজই জাহাজে শেষ রাত কি না! সুতরাং আশা করা যায় যে সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকবে; সেই অবসরে ওরাও সব কেবিনগুলোয় রীতিমত সার্চ করবে। তাতেও না পাওয়া গেলে ওইখানে উপস্থিত সব লোকদের সার্চ করা হবে।

সব কথা শুনে ঘোষালকে বললুম, ওহে তোমার কোনও মহিলা বন্ধু জাহাজের মধ্যে আছেন?

সে জিজ্ঞেস করলে, কেন বল দেখি?

—আমায় একটু 'উল' এনে দিতে পার। এই হাত চারেক হলেই হবে।

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললুম, 'উল' গো, পশম যাকে বলে।

ঘোষাল আমার মাথার দিকে চাইলে—আমি বললুম, ভয় নেই, পাগল হইনি, তুমি যদি বাজির টাকার শোকে পাগল না হতে চাও তো পত্রপাঠ যা বললুম নিয়ে এসে দাও।

ঘোষাল গেল বটে কিন্তু বেশ বুঝলুম যে আমার মাথা সম্বন্ধে সন্দেহ একটা রইলই তার মনে।

'ভ্যারাইটি এনটারটেনমেন্টে'র আয়োজন ভালোই হয়েছিল। জাহাজের লোকও আর কেউ উপস্থিত হতে বাকি ছিল না।

আমি এমন জায়গায় বসেছিলুম যাতে চারদিকে নজর চলে। দেখলুম চাংফু আর মা-সিন্ পাশাপাশি বসে। বিজয় বেচারা একটু দূরে মুখ শুকিয়ে বসে আছে; তার ঘর থেকে জিনিস না পাওয়া গেলেও সন্দেহ এখনও লোকের যায় নি।

প্রথমেই একটি বাঙালি মেয়ে গান ধরলে,

'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—!'

গান সবে আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে চাংফু মা-সিনের কানে কানে কি-একটা বলে উঠে চলে গেল। ঘোষাল তার জায়গা থেকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল, আমার মুখের দিকে চাইলে কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে বসে রইলুম।

মিনিট তিনেক পরেই চাংফু ফিরে এল। তখন শেষ অন্তরা গাওয়া চলেছে—

'যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
নিখিল প্লাবিয়া, ভুবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া,
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে!'

গানটি শেষ হবার পরই দেখলুম প্রোগ্রামে লেখা রয়েছে একটা বিলাতি গান হবে। কিন্তু মেমসাহেবের বদলে বেরিয়ে এলেন কাপ্তেন। তিনি 'নড্' বা অভিবাদন করে ভূমিকা যা শুরু করলেন তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

'দেখুন, কাল রাত্রে জাহাজে যে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে, খুব সম্ভব তা আপনারা অনেকেই জানেন। একজন ফার্স্টক্লাস আরোহীর বহু টাকা দামের একটি মুক্তোর মালা চুরি গেছে.....এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তা এখনও পাওয়া যায়নি। ব্যাপারের গুরুত্ব আপনারা নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন এবং আশা করি আমরা যে ব্যবস্থা করেছি তা আপনারা অনুমোদন করবেন। আপনাদের প্রত্যেকের কামরা আপনাদের অনুপস্থিতিতে সার্চ করানো হবে এবং যতক্ষণ সে কাজ না হয় আমার অনুরোধ আপনারা কেউ বাইরে যাবেন না।'

কাপ্তেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র আমি উঠে দাঁড়ালুম, বললুম, আমি একটা কথা বলতে পারি কি? সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। কাপ্তেন বললেন, [illegible]

আরম্ভ করলুম, কাল রাত্রে কোন কারণে ঘুম না হওয়ায় আমি অনেকক্ষণ বাইরে পায়চারী করছিলুম। যখন ডেকের ওপর থেকে কেবিনে ফিরছিলুম তখন ছ-নম্বর কেবিনের দোর খুলে একটি লোক বেরিয়ে আসে, আমাকে দেখে একটু ইতস্তত করে এবং শেষে ডেকের দিকে হেঁটে চলে যায়। আমি লক্ষ করে দেখলুম, লোকটি একটু খুঁড়িয়ে চলছে।—

এই পর্যন্ত বলতেই চারিদিকে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। চাংফুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর বিজয় উঠল লাফিয়ে।

মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, তখন আমি আমার কেবিনেই ছিলুম।

কাপ্তেন বললেন, এই গুজবের ওপর নির্ভর করেই আমি আজ সকালে ওঁর ঘর পরীক্ষা করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।

আমি খুব শান্তস্বরে বললুম, একজন লোক এখন পাঠিয়ে দিন, ওঁর ঘর থেকেই বেরোবে।

বিজয়ের চোখ এমন জ্বলছিল যে ভয় হতে লাগল লাফিয়ে পড়ে বুঝি আমার ঘাড়ের ওপর—"সব মিথ্যে কথা! এ-সব চক্রান্ত!" এই বলে চেঁচাতে লাগল। এধারে দেখলুম চাংফুর মুখও শুকিয়ে উঠেছে—

কাপ্তেন তখনই একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। সে লোকটি মিনিট পাঁচ-সাত পরে ফিরে এল, তার হাতে একটি ছোট সরু ভেলভেটের খাপ। বললে, ওর বিছানার উপর ছিল।

কাপ্তেন কেসটা খুলতেই নজর পড়ল, শুভ্র সুন্দর মুক্তার একগাছি মালা।

কাপ্তেন আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন!'

বিজয়ের মুখ তখন ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে।

আমি কাপ্তেনকে অভিবাদন করে একটু চেঁচিয়ে, যাতে ঘরসুদ্ধ সবাই শুনতে পায় এমন ভাবে বললুম, 'প্রথমেই বলে রাখি আমি একজন গোয়েন্দা।...কাল যখন প্রথম সে লোকটিকে দেখি তখন মনে করেছিলুম তিনিই মিঃ বিজয়, কিন্তু আজ ভোরে উঠে যখন শুনলুম যে গভীর রাত্রে ছ-নম্বর থেকে তাঁর বেরোবার কথা জাহাজসুদ্ধ সবাই জানে তখনই বুঝলুম যে তিনি আর যেই হোক মিঃ বিজয় নন।'

সকলে দেখি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে, বোধহয় তখন একটা ছুঁচ পড়লে আওয়াজ পাওয়া যায়। আর সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা বিজয়ের—

'কারণ তখন ডেকে আমি ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না এবং যে-হেতু আমি সে-কথা কাউকে বলিনি তখনও, সে-হেতু নিশ্চয় এমন লোক একথা প্রচার করেছে যার মিঃ বিজয়ের নামে কলঙ্ক রটনায় লাভ আছে। তখনই আমার মনে হল যে একটু ইতস্তত করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য ও সাক্ষী রাখা। মিঃ বিজয়ের মতো খুঁড়িয়ে চলতে সকলেই পারে। মনে রাখবেন আপনারা, আগে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারপর খুঁড়িয়ে চলে যাওয়া, এর উদ্দেশ্য কত স্পষ্ট!...তারপর মিঃ বিজয়ের কেবিন যখন সার্চ করা হয় তখনও হয়তো ওর ঘরে চোরাই মুক্তোর মালা রাখার সুযোগ আসে নি। কিন্তু আমি ঠিক জানতুম যে আবার সার্চ করা হবে একথা জানলে চোর তার আগেই কোনও সুযোগে মুক্তোর মালা মিঃ বিজয়ের ঘরে রেখে আসবে যাতে তিনি প্রমাণ সুদ্ধ ধরা পড়েন। সেই জন্যই আপনাকে বলি ওঁর ঘরে লোক পাঠাতে।'

মা-সিনের দিকে চেয়ে দেখি তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর বিজয়? বিজয় বোধ হয় তখন কৃতজ্ঞতায় আমার পা জড়িয়ে ধরতে পারত।

কাপ্তেন হতাশার স্বরে বললেন, কিন্তু চোর যে কে তা তো জানা গেল না!

আমি তখন একটু বিনয় প্রকাশ করে বললুম, 'তার জন্যও একটু ছোটখাট রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম বৈকি!'

চাংফু উত্তেজনায় দু-পা এগিয়ে এল। মা-সিন্ উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই, কাপ্তেন সুদ্ধ প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললুম, 'আমি জানতুম যে আমরা এ ঘরে সমবেত হলে তখনই চোরাই মাল সরাবার চেষ্টা করা হবে। তাই ঠিক এখানে আসবার আগে " নিকটা 'উল' খড়ির গুঁড়ো মাখিয়ে মিঃ বিজয়ের কেবিনের দোরে এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত বেঁধে রেখে এসেছিলুম, মেঝে থেকে ঠিক সাড়ে চার ফুট উঁচুতে! 'উলে'র মতো জিনিস একটু লাগলেই ছিঁড়ে যাবে জানতুম কিন্তু তার আগে চোরের অজ্ঞাতসারে নিজের কাজ করবে তাও জানতুম। ধরুন যদি মিঃ চাংফুর মতো কালো কোট গায়ে দিয়ে সে গিয়ে থাকে তাহলে তার গলার কাছাকাছি কালো কোটের গায়ে সূক্ষ্ম খড়ির গুঁড়োর রেখা স্পষ্ট দেখা যাবে—

এই বলে নাটকীয়ভাবে আমি চাংফুর গলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললুম, 'যেমন মিঃ চাংফুর গলার নীচে ওই দাগ দেখা যাচ্ছে!'

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে সরু একটি শ্বেতরেখা বাঁ-দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত তার কোটের ওপর দিয়ে চলে গেছে। চাংফু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মা-সিন্ শুধু বিজয়ের হাত দু'খানা ধরে বললে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

ঘোষাল বাজির টাকা থেকে দিয়েছিল আমায় শ'পাঁচেক টাকা। আর মা-সিন্ হাজার দুই!

গোলকধাম

লীলা মজুমদার

সমস্ত ব্যাপারটার ইতিবৃত্ত সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে খাতায় লেখা আছে। আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা যেখানে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করতেন। ব্যাপারটা খুব ঘোরেল। অকুস্থলের নাম বলব না, শেষটা সবাই চিনে ফেলবে। শুধু এইটুকু বলে রাখি ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রথম বর্গের প্রথম অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। তারই উত্তর দিকে একটা পুরোনো রাস্তা। সেই রাস্তার গায়ে গায়ে লাগা দুটি বাড়ি, সেকালে যেমন হত। মাঝখানের দেয়ালটা এ বাড়িরও, ও বাড়িরও। তবে ছ্যাঁদা করে করে দেখবার উপায় নেই, কারণ দুদিকের বাসিন্দারাই আরেক প্রস্ত ইঁট লাগিয়ে দেয়ালটাকে তিন পুরু করে নিয়েছিল। একটা বাড়ির নম্বর ১২, একটার ১৩, একটার বাঁ-পাশ দিয়ে একটা সরু গলি, সেখানে সিংগেল রিক্সা ছাড়া কিছু ঢোকে না। গলিতে ১১ নম্বরের সদর দরজা সর্বদা হাট করে খোলা থাকে, যদিও একটা গোঁপওয়ালা গুণ্ডালোক তার পাশে সারাদিন টুলে বসে থাকত। আবার তেমনি ১৩ নম্বরের ডান পাশে আরও সরু একটা গলি, সেখানে পাড়ার ছেলেরা সাইকেল-চাপা শেখে, আর কিছু ঢোকে না। সেখানে ১৩ নম্বরের দরজাও সর্বদা খোলা থাকত, কেউ বসেও থাকত না। তবে শোনা যেত একতলার বই বাঁধাইওয়ালা নাকি ওদের বিশ্বাসী চর।

১১ নম্বরের এক তলায় একটা ভদ্রগোছের ওষুধের দোকান, বড় রাস্তার উপর তার সদর দরজা। দোতলায় 'ধ্রুপদ'দের পার্টির আপিস। ধ্রুপদ কারও বাপের দেওয়া নাম নয়, একটা রাজনীতিক দলের নাম। তারা বেজায় প্রাচীনপন্থী। সভ্যদের বয়স একটু বেশি, অবস্থা বেশ ভালো, কোনও কিছুর ভালো হয় তাঁরা চাইতেন না। তিনতলায় গোলকবাবার আস্তানা। সাধুসন্তদের ব্যাপার, নিরীহ-নীরব। গোলকবাবাজির কানের ব্যামো ছিল, হঠাৎ শব্দ সইতে পারতেন না। তবে তিনি কেবলমাত্র শীতকালে তিন মাসের জন্য শহরে আসতেন, শোনা যেত বাকি সময়টা হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ওই তিন মাসও তিনি তাঁর নিজের ঘরটিতে গোঁফ দাড়ি নিয়ে ধ্যানস্থ থাকতেন। সেখানে শিষ্যদেরও প্রবেশ নিষেধ। নাকি নানারকম ক্ষমতা ছিল তাঁর, তার উপর বেজায় রাগী। যখন তখন কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না। মাসে একবার জনসাধারণের সামনে দেখা দিতেন। ঘটনার সময় তিনি যে চোখ উল্টে ধ্যানে বসা ছিলেন সেটা পুলিসের কর্তা নিজে দেখেছিলেন। ১১ নম্বরের তিন তলায় শিষ্যরা চার বেলা গুরুদেবের খরচায়

রাশি রাশি ভাত-ডাল-তরকারি, মাছ-মাংস-ডিম, দুধ-দই-ছানা, চা-রুটি-কচুরি, গিলত। বাজারের ব্যবসাদারদের মধ্যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের চররা এই সব খবর সংগ্রহ করেছিল। গুরুদেবের ওই ষণ্ড চৌকিদার ছাড়া, আরও ষণ্ড একজন চাকর আর সবচেয়ে যণ্ড একজন বামুনঠাকুর ছিল। নাকি যোগাভ্যাস করে ওই রকম শরীর হয়েছিল। শিষ্যদেরও দুবেলা ছাদে মুগুর ভাঁজতে, ডন-বৈঠক করতে দেখা যেত। ওদের গুরুদেব দুপায়ে তিনজন করে শিষ্য ঝুলিয়ে প্যারালেল বারে নিজে আধঘণ্টা অনায়াসে ঝুলে থাকতেন। অবিশ্যি এ-সব হয়তো অনেক বাড়িয়ে বলা তবে আমার বন্ধু গুপির ছোটমামা বলেন 'যা রটে তার কতক বটে'।

একদিনে এত খবর সংগ্রহ হয়নি। এক মাস একনাগাড়ে লেগে থেকে তবে মিঃ সমাদ্দার এত জানতে পেরেছিলেন। বলাবাহুল্য খবর সরবরাহের প্রধান ছিলেন ওঁর দ্বিতীয় টিকটিকি অর্থাৎ ছোটমামা। একটা সুবিধা ছিল যে ওঁদের আফিসটা বর্ধমানে হওয়াতে অকুস্থলের কেউ ওঁদের কাউকে চিনত না। দ্বিতীয় টিকটিকিকে তো নয়-ই তাঁর কাজের নিয়ম এমন ছিল যে তাঁর নিজের আপিসে-ই খুব কম লোক তাঁর আসল নাম জানত। তাঁকে দেখে কে খুঁদে টিকটিকি বলে চিনবে? রোগা লিকপিকে চেহারা, বড় বড় কান, কেউ জোরে কথা বললেই গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ শব্দ বেরোয়, কিন্তু ভিতরে সিংহের মতো তেজ। নইলে গোলকধামের জটিল রহস্য-উদ্‌ঘাটন করা যার তার কর্ম ছিল না।

১১ নম্বরের বাড়িটার-ই নাম ছিল 'গোলকধাম'। বলাবাহুল্য মালিক ছিলেন গোলকবাবাজিব পবম ভক্ত। কেউ কেউ বলত নাকি ভাড়া নিতেন না। মালিক নিজে অবিশ্যি একটা ছোট কাঠের বাড়ি কিনে, সেখানেই থাকতেন। সমতলের বাতাসে তাঁর হাঁপানি বাড়ত। একতলার ওষুধের দোকানের মালিক নাকি ভাড়া আদায় করত, মেরামত ইত্যাদি করাতো। তাঁর নাম শ্যামরতন ঘোষ। আশা করি কারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে ১১ নম্বরের বাড়িটাব অবস্থা ছিল অনেক ভালো। দিব্যি মেরামত-করা তাজা রঙলাগানো, অধিবাসীরাও একটু বেঁটার ক্লাসের। তবে সেজন্যে ওর খ্যাতি ছিল না। সবাই ১১ নম্বরের নাম জানত ওখানে 'ধ্রুপদ' আপিস বলে। ধ্রুপদের তখন খুব হাঁক-ডাক। বিশেষ করে সেই বছরই সকলের চোখ ছিল ধ্রুপদের উপর। কারণ খুব জরুরি একটা আঞ্চলিক ইলেকশনে ওরাই ছিল পাবকদের একমাত্র বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী।

বলছিলাম কি যে পাবকদেব আপিস ছিল পাশের বাড়িতে, অর্থাৎ ১৩ নম্বরে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান যদি এক খেলার মাঠে থাকতে পারে, তো এরাই বা পাশাপাশি থাকবে না কেন? সব বিষয়ে পরস্পরের উল্টো ছিল। পাবকদের অনেকে 'পরশু পন্থী' বলত। কাল বাদে পরশু অন্যলোকে যে চিন্তা করবে, ওরা হয়তো গতকালই সে-সব ভেবে রাখত।

ইচ্ছা করেই ১৩ নম্বর বাড়ি নিয়েছিল ওরা, সাযেবরা ১৩ নম্বরকে অলুক্ষণে বলে কিনা, তাই। রোগা টিংটিঙে একপাল সভ্য, আধময়লা জামা পরে দিনরাত খোঁটমোট করত। আসলে অবিশ্যি সবাই সব বিষয়ে একমত ছিল। তর্ক করাটা শুধু একটা অভ্যাস। খাওয়ার মধ্যে শুধু মুড়ি আর তেলেভাজা। অধিকাংশেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। আপিস ঘরের ভাড়া ছিল মাসে ত্রিশ টাকা। তেমনি ঘরও বটে। 'পরশুপন্থী'দের দলের নেতা বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখা যেত আপিসঘরে বসে কাগজপত্র দেখছেন, দলের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলত, এক

মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল, কালো সার্ট, কালো প্যান্ট, বয়স তেত্রিশও হতে পারত আবার তেষট্টিও হতে পারত। নাকি বে-নামায় কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হেড-মাস্টারি করতেন। নইলে টাকাকড়ি কোত্থেকে আসবে। ওরা তাকে পাঁচুদা বলে ডাকত।

দ্বিতীয় টিকটিকি একদিন আমাদের বাড়িতে বসে, গুপির আর আমার সামনেই বাবাকে বললেন, 'বিশ্বাস করুন দাদা, এই খেমো-চেহারার লোকগুলোর এমনি প্রতিপত্তি যে পাশের বাড়ির বড়লোক 'ধ্রুপদ'রা থরহরি কম্পমান! সমস্ত এলাকাটাকে ওরা একেবারে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিল। ইলেক্শনে ওদের হারানো খুব একটা সহজ কাজ হবে না, এটা ধ্রুপদরাও খুব ভালোভাবেই জানত। তবে টাকায় কি-না হয়? ধ্রুপদরা ঠিক করেছিল তেমন তেমন হলে কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ করবে।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এত কথা কি করে জানলি রে, চাঁদু?' ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমি জানব না তো কে জানবে, বলুন? নেতারা গায়েব হলে তো একরকম বলতে গেলে সমস্ত তদন্তটাই দ্বিতীয় টিকটিকির হাতে এসে পড়ে। একমাত্র সে-ই অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে, সব গোপন কথা টেনে বের করতে পারে।'

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। 'অ্যাঁ, নেতারা গায়েব হয়েছিল নাকি? বলিস কী? দুজনেই নাকি?'

'নইলে আর বলছি কি দাদা? রাজনীতির ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। ভোটগণনার সঙ্গে সঙ্গে দুই ক্যান্ডিডেটই ডিসয়েপিয়ার্ড! স্রেফ্ কপ্পুর। আর সে কী গণনা! পৃথিবীতে এর জুড়ি দেখা যায়নি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। টাউন হল লোকে লোকারণ্য, পাহারা, পুলিশ। দুই দলের লোক নীরবে নিজেদের চুল ছিঁড়ছিল। খানিকটা খুব বেশিক্ষণের আবেগের জন্য, তবে বেশির ভাগটা আগের ক'দিন ধরে সমানে চ্যাঁচানোর ফলে কারও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না।'

বাবা বললেন, 'কাগজে পড়েছিলাম বটে সে আশ্চর্যের বিষয়, দুই দলের ক্যান্ডিডেট একেবারে সমান ভোট পেয়েছিল! নতুন করে আবার ভোটের কথাও হয়েছিল, কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের নাকি আর পাত্তাই পাওয়া যায়নি। আশ্চর্য!'

ছোটমামা মুচকি হেসে বললেন, 'ভিতরের কথা জানতে পারলে আর আশ্চর্য হবার মতো কিছুই পাবেন না, দাদা। কিন্তু জানছে কে? আমার বস, আমি আর দুতিনটি লোক, আর এতদিন পরে আপনি। সমস্ত ব্যাপারটা দেশের শান্তিরক্ষার জন্য একেবারে চেপে দেওয়া হয়েছিল যে। জানবে কে?' আমি বললাম, 'গুপি আর আমি মনে থাকে যেন এতে আমাদেরও পার্ট ছিল।' শুনে বাবা তো অবাক। 'তোদেরও পার্ট ছিল। কই আমি তো সে-বিষয়ে কিছুই জানি না।' ছোটমামা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'খুব ছোট পার্ট, দাদা, পার্টটাইম পার্টও বলতে পারেন। তাই আর আপনাকে বা জামাইবাবুকে বিরক্ত করিনি। ওদের পড়াশুনোরও ক্ষতি করিনি। সবটা সমাধান হয়ে গেছিল ওদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আর নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার মাঝখানের দশদিনের মধ্যে। ওরা তো ভালোভাবেই উপরের ক্লাসে উঠে গিয়েছে, আমি কোনও ক্ষতি করেছি, কেউ বলতে পারবে না। বরং ওদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছি।

গুপি বলল, 'আমাদের সাহায্য না পেলে দশ-বারো দিনে ওই রহস্য উদ্ঘাটন ছোটমামার সাধ্য ছিল না।'

ছোটমামা বললেন, 'বুঝলেন দাদা, আগে গিয়ে চাক্ষুসভাবে অকুস্থল পরীক্ষা করে এলাম। তাও ছদ্মবেশে বলাইবাহুল্য। সেই দাড়ি-গোঁফটা যে আমার কি কাজেই আসে কি বলব! গুপি বলল, 'সাবধান। শেষে ওটা না দুর্বৃত্তদের চেনা হয়ে যায়।'

'না, না, নেভার। ওর মাঝখান থেকে কিছু লোম কেটে নিয়ে দুটো রঙের বুরুশ বানিয়েছি, তাই গোঁফটা হয়েছে এখন নাদীর শা গোছের। কেউ চিনবে না।'

বাবা বললেন, বাই-ইলেকশনে দুজন জমকালো নেতা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার তদন্ত করল সমাদ্দার কোম্পানি? কেন, পুলিশদের কী হয়েছিল?'

ছোটমামা বোধহয় একটু রেগে গেলেন। বললেন, 'যেসব কেসে পুলিশরা কিছু করতে পারে না, সেসব তদন্তের ভার তারা প্রাইভেট কোম্পানিকে দেয়। যাই হোক, দেখলাম ১৩ নম্বরের একতলায় একটা বই-বাঁধাইয়ের দোকান আর একটা চায়ের দোকান। দোতলায় পাবকদের পার্টি আপিস, তিন তলায় মোটে দুটো ঘর। তাও প্রায়ই বন্ধ থাকে, কারণ বাড়ির মালিক চীনেবাজারের কোনও এক এনামেলের বাসনের দোকানের ট্রাভেলিং সেল্‌স্‌ম্যান। মাঝে মধ্যে তালা খুলে ঘরে ঢোকে, দুচার হপ্তা থাকে, নীচে চায়ের দোকানের মালিকের কাছে খায়দায়। অবস্থা খুব ভালো নয়, রোগা, ক্লিন সেভ করা, চোখে চশমা, ভিতু গোছের লোক। লুকিয়ে পানু তার ফোটো পর্যন্ত তুলেছিল। পরে ওটাই হয়েছিল 'ক্লু নং ওয়ান।'

'গোড়া থেকে বলো।' এই বলে বাবা পা তুলে বসে রামাকানাইকে আরও চা আনতে ইশারা করলেন। ছোটমামা বলতে লাগলেন, 'ভোট-গণনার রাত থেকেই দুই ক্যান্ডিডেট নিখোঁজ। এই সাংঘাতিক সংবাদ ওদের পার্টির লোকরাই পুলিশকে দিয়েছিল। দু'দলেরই ধাবণা অন্যপার্টি তাদের নেতাকে গুম করে রেখেছে। তাই নিয়ে থানায় সে কী জেরা করা! কিন্তু কোনও ফল হল না। মনে হল সত্যি সত্যি কেউ কিছু জানে না। নেতাদের ভাবনায় দুই দলের মধ্যে এমন ভাব হয়ে গেল যে স্পষ্টই বোঝা গেল আবার ভোট হলে এরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে আর কখনও লড়তে পারবে না। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারিদের এই মত।'

কিন্তু লোকদুটো গেল কোথায়? সমস্ত বাড়ি সার্চ হল, প্রত্যেকটা লোককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। খালি গুরুদেব কোনও কথা বলেন না, যেমন চোখ তুলে বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। স্থানীয় থানার কর্তা তাঁর ভক্ত। তিনি বললেন, দেখুন ওঁকে ঘাঁটানো যা, ভগবানকে ঘাঁটানোও তা।'

শেষপর্যন্ত শিষ্যদের দশজনকে আর চাকরদের তিনজনকে জেরা করেও কিছু পাওয়া গেল না। তারা কেউ ইলেকশনের নামও শোনেনি। একতলায় ওষুধের দোকানের মালিক বেশ কয়েকদিন থাকতেই অনুপস্থিত ছিলেন, নাকি শরীর খারাপ। তিনি কার্সিয়াং-এ ভগ্নীপতির কাঠের বাড়িতে শরীর সারাতে গেছিলেন, সব চুকেবুকে গেলে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'দেখেছ কী কাণ্ড!' এই তো গেল ১১ নম্বরের কথা।

১৩ নম্বরের অবস্থাও তাই। তিনতলায় বাড়িওয়ালার ঘরে ঘরে তালা দেওয়া, তিনি দুমাস অ্যাবসেন্ট, শিগগির ফেরার কথা।

একতলায় চায়ের দোকানের মালিক একান্নজন সাক্ষী এনে উপস্থিত করেছিল। তারা একবাক্যে বলল, ঘটনার ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে কেউ না-কেউ সমস্তক্ষণ মালিককে আর তার দুজন ছোকরা অ্যাসিস্টেন্টকে দোকানে শুয়ে, বসে বা কাজ করতে দেখেছে। বই

বাঁধাইওয়ালার দিন পনেরো থেকে হাম, পাড়ার ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, ঘটনার দিন পর্যন্ত সে পথ্যি পায়নি। বিছানা ছেড়ে উঠবারও তার ক্ষমতা নেই, দুজন দুর্ধর্ষ নেতাকে গায়েব করা দূরের কথা। তাছাড়া পাঁচুদা তার দেবতা, তার বাবা, মা ও ভাইবোন। এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তাঁর যদি কোনও অনিষ্ট হয়ে থাকে তো সে 'ধ্রুপদ' বাবুদের দেখে নেবে, নইলে তার নাম বংশু মাইতিই নয়। এই অবধি বলে সে কপালে দুচোখ তুলে, গা-টান করে, ফিট গেল। তদন্তকারীদের চায়ের দোকানের ছোকরাকে ডেকে পত্রপাঠ প্রস্থান।

এই রকম ডেড্-লক্ অবস্থায় সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্সকে না ডেকে তারা করে কি? শহরেও যে আরও এবং সুদক্ষ ডিটেকটিভ কোম্পানি নেই তা নয়, তারা যে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে তারই বা ঠিক কি? হয়তো এ-দলে নয়তো ও-দলে পক্ষপাতিত্ব থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। বলেইছি তো সমাদ্দারের গোপন তদন্ত মানেই ছোটমামা আর ছোটমামা মানেই আমি আর গুপি। আমার নাম পানু, সেকথা এতক্ষণ বলা হয়নি। শেষরাতের গাড়িতে ছোটমামা এসে গুপিকে তুলে, তারপর আমাদের বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে গুপি বলল, 'ফোটো আছে?'

'ফোটো? কার ফোটো'? 'অকুস্থলে যাদের দেখা গেছিল, ঘটনার আগে ও ঠিক পরেই, তাদের মধ্যে যত জনের পাওয়া যায়।'

ছোটমামা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই দেখছি টিকটিকির বাড়া। অত ছবি কোথায় পাব?'

'তুলবে।'

'আমি ইয়ে—আমার ছবি ভালো হয না, তাছাডা ক্যামেরাটা পাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'পুলিশের কাছে কিছু থাকতে পারে।' ছোটমামা ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। শেষ অবধি ছবি কতক ইলেক্‌শন পোস্টারের নেগেটিভ থেকে, কতক বাড়ি থেকে জোগাড় হল, কতক আমি বাবার খুদে ফিক্সড্ ফোকাস্ পুরনো কোভ্‌ডাক দিয়ে তুললাম, লুকিয়ে লুকিয়ে বই বাঁধাইওয়ালার দোকানের চাকরিপ্রার্থী সেজে গিয়ে। ওই ছবিগুলোকে ছোটমামা আগে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুন না কেন, শেষটায় ওর মধ্যেই চূড়ান্ত ক্লু পাওয়া গেছিল। যাক্‌গে, সে সব পরের কথা।

বারবার নানান সাজে গিয়ে গিয়ে ওই রাস্তা, ১১ নং আর ১৩ নং বাড়ি, বাড়ি দুটোর দুপাশের গলি, বাড়িতে যারা থাকত, যারা পাবক আপিসে আসত-যেত, চায়ের দোকানের খদ্দের, বই বাঁধাইয়ের মক্কেল, ওষুধের দোকানের সাইন-বোর্ড, ওখানকার যত দোকানপাট, চুল কাটার সেলুন, অন্যান্য বাড়ির অধিবাসী, সব আমাদের একেবারে নখদর্পণে এনে ফেললাম। লুকিয়ে কি করে ছবি তুলতে হয় তা এমনই রপ্ত হয়ে গেল যে পরে যুদ্ধের সময়কার স্পাইদের ছবি তোলার গল্প পড়ে আমার হাসি পেত।

অদ্ভুত সব ছবি, একেক জনার ছিরি দেখে কত হাসব। 'ধ্রুপদ'রা পার্টি আপিস তুলে দিল। তার বদলে ওখানে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলল। প্রতিষ্ঠা দিবসে ওদের মস্ত ছবি দেখলাম। গুপি কোন ফাঁকে টুক করে ছবির ছবি তুলে ফেলল। 'পাবক'দেরও যে নেমন্তন্ন হয়েছিল, সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ দুই দলই-ততদিনে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিল। 'ধ্রুপদ'দের বন্ধুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদের ঘরে পাবক মেমোরিয়াল পুস্তকাগার খোলা হল, তাও ওই এক-ই দিনে। পাঁচুদার খুব ভালো একটা ছবির আরও ভালো একটা ছবি

তুললাম।

ছোটমামা প্রকাশ্যে এ-সব অনুষ্ঠানে যেতেন না। তাঁর হয়ে ভিড়ে মিশে আমরা দুজন সর্বদা যেতাম। দুটো বাড়ি, প্রত্যেকটা ইট, ভাঙা খড়খড়ি, নড়বড়ে রেলিং, দেয়ালের ছবি, ছিটকিনির ডিজাইন, কড়ি বর্গার সংখ্যা আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছিল।

এমনকি গোলকধামের গোলকবাবাজিকে একদিন সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম করে এসেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'সব ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' হয়েছিলও প্রায় সবই। একটা তো তখনই হয়েছিল, কারণ এ সুযোগে গুপি তাঁর একটা ফ্রন্ট ভিউ আর একটা প্রোফিল তুলেছিল।

দেখলাম শিষ্যরা অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শুনলাম গুরুদেব নাকি সবকটাকে ধরে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণের সঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছেন। শিষ্যদের প্রত্যেকের ছবি আমাদের কাছে এখনও আছে। পাচক, চাকর আর চৌকিদার কিছুতেই গেল না। স্রেফ পালিয়ে 'ধ্রুপদ'দের তিনজনের বাড়িতে ভালো মাইনের চাকরি নিয়ে নিল। কে পাচককে রাখবে তাই নিয়ে নাকি ওই তিনজনের মধ্যে চিরকালের মতো কথা বন্ধ হয়ে গেছিল।

পরে তিনতলাটা কোন সরকারি আপিসের কার যেন ফ্যামিলি কোয়ার্টার হয়ে গেছিল। এই সবই মাত্র একমাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। ছোটমামা বললেন, এমন পরিপাটি তদন্ত নাকি কম দেখা যায়। ১৩ নম্বরের মালিকও এই সময়ের মধ্যে সফর শেষ করে সাত দিনের জন্য দেখা দিলেন। আমি গলিতে দাঁড়িয়ে তাঁর চমৎকার ছবি নিলাম। আলাপও হল। তিনি বললেন, বয়স হয়েছে, আর কাজকর্ম ভালো লাগে না, এনামেলের বাসন কেউ কিনতেও চায় না, কাজেই সংসার ত্যাগ করে, আলমোরার কাছে কোনও দুর্গম পাহাড়ের উপরে তাঁর গুরুর আশ্রমে তিনি চলে যাচ্ছেন। আর ওই দুটো অমনি চায়ের দোকানের মালিক তার পরিবারের জন্য ভাড়া নিয়ে নিল। এইসময় ১১ নম্বরের ওষুধের দোকানের মালিক ফিরে এলেন। দশ পারসেন্ট কমিশনে তিনি দুই বাড়ির যাবতীয় ভাড়া আদায় ও মেরামতির ভার নিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন সুন্দরভাবে চুকেবুকে গেল বলে যেমন খুশি পুলিশ, তেমনি খুশি সমাদ্দার। ধ্রুপদ ও পাবক সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা করে আদায় করার ফী-টা পকেটে পুরতে পুরতে মিঃ সমাদ্দার ছোটমামার পিঠ চাপড়ে, তৎক্ষণাৎ দুই মাস পরে পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। সেই ছুটিতেই বাবার কাছে এই লোমহর্ষক বিষয়ে গল্প করা হল।

ছোটমামা থামলে বাবা একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সে কি চাঁদু, আসল কথাই তো জানা গেল না। সেই অদৃশ্য দুটি নেতার কী হল?'

ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'ও, বলিনি বুঝি? তাঁরা তো নিজেদের হাতে পুলিশের কাছে বিনা ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন যে তারা গোলকবাবাজির আশীর্বাদে রাজনীতি ছেড়ে বাকি জীবনটা নির্জন বাস করবেন, তদন্ত করে আর যেন তাঁদের জ্বালানো না হয়। সভ্যরা বলল এ-যে তাঁদের হাতের লেখা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নেই, সই হুবহু চিঠিপত্রের সইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বাস্! ফাইল ক্লোজড। ও রামকানাই, আজ দুপুরে তোমাদের বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে?'

বাবাকে তবু খুব খুশি মনে হল না দেখে আমি একতাড়া ফোটো বের করে বললাম, 'মজা হচ্ছে যে এই ছবিগুলোকে পাশাপাশি রাখলে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব প্রত্যেকটাতে ধরা পড়ছে। পাঁচুদা, ধ্রুপদ-নেতা, গুরুদেব, ১৩নং-এর মালিক। এই দেখ প্রত্যেকের ডানকানের লতি ছেঁড়া, বাঁ-কানের লতি জোড়া, বাঁ-দিকের নাকের ফুটোর উপরে আঁচিল

আর ডান চোখের নীচে ঠিক একই মাপের একই ডিজাইনের জরুল।

বাবা আঁতকে উঠলেন। 'অ্যাঁ, বল কী! তবে কি সবাই একই লোক নাকি। ছদ্মবেশে একেকটা পার্ট প্লে করেছিল? কেউ তাদের কখনও একসঙ্গে দেখেনি নাকি?'

ছোটমামা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'দেখার কোন কারণই ঘটেনি। যে যার নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন। চেহারা আলাদা রকমের। অবিশ্যি কিছু নকল চুল, দাড়ি, নীল চশমা, গালের মধ্যে আলুর টুকরো বা সুপুরি, গায়ের চারদিকে পাতলা রবারের বালিশ আর দুটো-একটা রঙের শিশি থাকলে চেহারা কোনও কিছু ঠিক থাকে না। কালোই বা কি ফরসাই বা কি, রোগাই বা কি মোটাই বা কি?—তাছাড়া—'

এই বলে উঠে পড়ে ছোটমামা চটিতে পা গলালেন। 'যাই, চুলটা কেটে আসি।'

'বস।' বলে এমনি ধমক দিলেন বাবা যে চিঁ-চিঁ করে ছোটমামা বললেন, 'আবার কেন?'

'তাছাড়া কী?'

ছোটমামা বললেন, 'ইয়ে, মানে, জানেনই তো যে পনেরো দিনের ছুটির প্রথম দশদিন রানিক্ষেত ছাড়িয়ে কিছু পর্বতারোহণ করে কাটিয়েছিলাম। সেখানে একটা স্বাস্থ্যময় ছোট্ট শহরে একটা সুন্দর কাঠের বাড়ির নাম দেখলাম 'গোলক'। বেজায় কৌতূহল হল। ঢুকে পড়লাম। মালিক আদর করে বসালেন। দেখলাম ডানদিকের লতি ছেঁড়া, বাঁকানের লতি জোড়া, নাকে সেই আঁচিল, চোখের নীচে জরুল। বললাম, 'খুলে বল তো, কোন স্টেপস্ নেব না।' সে বেজায় রেগে বলল, 'কী স্টেপ নিতে পার তুমি? কোন বেআইনি কাজ করিনি। জীবনটা একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল বলে দুটো রাজনীতিক দলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী-নেতা সেজে দুই-পক্ষেই জয়ী হয়েছি। সেটা কিছু বে-আইনি নয়। আর পাবকরা ধ্রুপদদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো এই-এই দেব। আবার ধ্রুপদরা পাবকদের নেতাকে বলল, যদি গণনার রাতে কেটে পড় তো হেনা-তেনা দেব। কারও মনে কষ্ট দিতে পারিনে, কাজেই দুজনার কথাতেই রাজি হয়ে, নিজের বাড়িতে নিজের গুরুদেব সেজে ধ্যানে বসে গেলাম। এর কোনোটাই বে-আইনি বলতে পার না। তারপর সবাই মিলে এমনি খ্যাঁচ-ম্যাঁচ লাগিয়ে দিল যে নিজের আস্তানায় নিরিবিলিতে, নিজের খরচায় চলে এলাম। সেটাও কি বে-আইনি? ১১ নং আর ১৩ নং একটা আমার বাবা, একটা আমার জ্যাঠা আমাকে দিয়ে গেছিলেন, সে কি বে-আইনি? শিষ্যগুলোকে হিমালয়ভ্রমণে পাঠিয়েছি। পরের পয়সায় কজন সে সুযোগ পায়? নাকি সেটাকেও বে-আইনি বলবে? এখন সবকথা ফাঁস করলেই আবার চ্যাঁ-ভোঁ লাগবে, আমাকে আবার অন্য আরও দুর্গম আস্তানায় চলে যেতে হবে। রাঁধবার লোকটাকে আমিই রেখেছি। খেয়ে যাবে নাকি?'

প্রচণ্ড খেয়ে এলাম।

বাবা বললেন, 'কাকেও কিছু বলেছ নাকি?'

ছোটমামা জিব কেটে বললেন, 'ছি, ছি, পায়েস খাবার পর কথা দিয়ে এসেছি যে কাকেও কিছু বলব না।'

গুপি বলল, 'তাছাড়া বলবেটা কী? সে-বেচারা তো কোনও অন্যায় কাজ করেনি।'

আমি বললাম, 'বরং ভালো করেছে। আমাদের কেমন তদন্ত শিক্ষা হয়েছে। কি ঠিকানাটা যেন বলবেন?'

ছোটমামা ভ্রূকুটি করে বললেন, 'ভুলে গেছি।'

সুজন সিং-এর সংবর্ধনা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

গ্রামের নাম নিয়ামতপুর।

নামে গ্রাম হলেও ওটাকে একটা শহরের ছোটখাট সংস্করণও বলা চলে। সুন্দর সুন্দর বাঁধানো রাস্তা, ফুলের বাগান যার আর এক নাম নিয়ামতপুর পার্ক, খাবার জলের জন্য সংরক্ষিত দিঘি যাকে বলা হয় রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, বিজলি আলো, ছেলেদের জন্য তো বটেই, মেয়েদের জন্যও চমৎকার হাই স্কুল, সভাসমিতি করার জন্য মোটা মোটা থামওয়ালা পাবলিক হল্, যার সঙ্গে লেজুড় হিসেবে আছে একটা লাইব্রেরি আর ক্লাব ইত্যাদি এবং আধুনিক ছোটখাট শহরের যা কিছু থাকা উচিত তার প্রায় সবই আছে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে।

আর এর মূলে আছে দুটি পরিবার—লালকুঠি আর নীলকুঠি, দুই জমিদার বাড়ি।

একটা গ্রামে দুই জমিদার বাড়ি শুনতে একটু কেমন কেমন লাগলেও সত্যিই তাই। না, এক জমিদারি ভেঙ্গে দু'টো জমিদারি হয়নি, গ্রামের পুব পাড়া আর পশ্চিম পাড়ায় দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বংশের জমিদারিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দু'শ আড়াইশ বছুর আগে, শোনা যায় দূর বিদেশ থেকে দুই বন্ধু ভাগ্যান্বেষণে এসে এইখানে ডেরা বেঁধেছিলেন। তারপর নিজেদের বুদ্ধি, কৌশল আর কর্মপটুতার ফলে ধীরে ধীরে জমিজমা বাড়াতে বাড়াতে শেষে দুটি পৃথক জমিদারির পত্তন করেন। দুই বন্ধুতে ছিল গলাগলি ভাব। একে অপরের সুখে-দুঃখে, আপদে-সম্পদে সর্বদাই পরস্পরের দোসর। কাজেই এঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় জমিদারি পৃথক হলেও গ্রামের উন্নতি হয়েছিল আশ্চর্যরকম।

তারপর?

তারপর চিরকাল যা হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিতীয় পুরুষে দুই জমিদারে সদ্ভাব থাকলেও আগের মতো অতটা মাখামাখি আর রইল না এবং তার পরের পুরুষে শুরু হল রেষারেষি। একজনের নাম হলে অন্য জনে তা সহ্য করতে পারে না।

ইতিমধ্যে দুই জমিদারের আরও একটু পরিবর্তন হয়েছে। লালকুঠির জমিদার সুজন সিং বেশ চালাকচতুর, যাকে বলে কাজের লোক। তাঁর চেষ্টায় জমিদারি আরও ফেঁপে উঠেছে। আশপাশের আরও অনেক গ্রাম এখন চলে এসেছে তাঁরই জমিদারির আওতায়। এক কথায়, পয়সার দিক দিয়ে তিনি এখন সত্যিকারের একজন বড়লোক। টাকা যেমন কামাচ্ছেন, তেমনি জনপ্রিয় হবার চেষ্টার ক্রুটি নেই তাঁর। গ্রামের এত যে উন্নতি তাতে তাঁর ভূমিকা নেহাত কম নয়। তাঁর দান ধ্যানের খ্যাতি গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে

পড়েছে। সবাই তাঁর কথা উঠলেই হাত দু'টি মাথায় ঠেকিয়ে বলে—সুজন সিং ? দেবতুল্য লোক। আহা বেঁচে থাকুন। ওঁর দৌলতেই তো আমাদেরও আজ এমন রমরমা অবস্থা।

পক্ষান্তরে নীলকুঠির জমিদাররা অতটা উঠতে পারেননি। নীলকুঠির বর্তমান জমিদার মোহন সিং কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। জমিদারি বাড়াবার কিংবা সাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্যে নিজেকে নেতা বানাবার কোন উৎসাহই নেই তাঁর। সুজন সিংকেও তিনি ভালো চোখে দেখেন না। কাগজে তাঁর ছবি বেরুলে, কি কেউ এসে তাঁর গুণগান করলে মুখে কাষ্ঠহাসি হাসেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব যে খুশি হন এমন মনে হয় না। তা ছাড়া সুজন সিং-এর চাইতে তিনি বয়সেও অনেক বড়। সুজন সিং তাঁর ছেলের বয়সের না হলেও দুজনের বয়সের তফাত অনেক। তা ছাড়া তাঁর জমিদারির আয় এখন এত কমে গেছে যে সুজন সিং-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপন মনেই থাকেন।

এহেন মোহন সিং-এর বড় ছেলে ফতে সিং কিন্তু হয়ে দাঁড়াল একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের জীব। জমিদারির সে যে কোনও ধার ধারে তার চালচলনে তার আভাস পাওয়া যেত না। তারা যে এককালে রাজপুত ছিল, দেশ ছেড়ে অন্য দেশে এসে বসতি স্থাপন করলেও তার রক্তে যে এখনও রাজপুত রক্ত খানিকটা রয়ে গেছে একথা শুনলে সে হেসে উড়িয়ে দিত। সে আধুনিক যুগের ছেলে, এযাবৎ দুই জমিদার বাড়িরই ছেলেরা সবাই বাড়িতে মাস্টারমশাইয়ের কাছেই লেখাপড়া শিখে এসেছে, স্কুলে গিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বসে একত্রে পড়াশোনা করার কথা কেউ চিন্তায়ও আনেনি; কিন্তু ফতে সিং জোর করেই গ্রামের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল আর সেখান থেকেই দিব্যি পাশটাস করে যেদিন বাপকে গিয়ে বলল যে এবার সে শহরে গিয়ে কলেজে পড়বে তখন মোহন সিং খুব খুশি হতে পারেননি। জমিদারের ছেলে কি হবে অত দিগ্গজ পণ্ডিত হয়ে? তার চেয়ে জমিদারির কাজকর্ম একটু একটু করে দেখতে শিখলে আখেরে কাজে লাগবে। 'জমিদার' কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও তার মেহনতও তো কম নয়। মামলা মোকদ্দমা তো লেগেই আছে, করব না বললেও রেহাই নেই; তা হলে জমিদারিই লাটে উঠবে। তা ছাড়া দরকার মতো প্রজাদের সায়েস্তা করা, লেঠেল লাগিয়ে অন্য জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গা করা এসব না করতে পারলে কি জমিদারি টিকিয়ে রাখা যায়? ইচ্ছে না থাকলেও মোহন সিংকে এসব করতে হয় বাধ্য হয়েই। ফতে সিংও এখন থেকে এসব শিখুক। শহরে গিয়ে কলেজে পড়া মানেই তো আর পাঁচটা সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে মাখামাখি গলাগলি! তাতে তো জমিদারের অভিজাত্য থাকে না! আর কে না জানে ওই জিনিসটাই জমিদারদের আর সবাকার চাইতে উঁচু করে রেখেছে।

ফতে সিং কিন্তু নাছোড়বান্দা। কলেজে সে পড়বেই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এযুগে জন্মগ্রহণ করার কোন মানেই হয় না।

কলেজের পড়া শেষ হল। এবার ফতে সিং-এর নতুন আবদার।—দেশে নয়, সে এবার বিদেশে পাড়ি দিয়ে বিদ্যেটায় আরও শাণ দিয়ে আসবে। এটা বিজ্ঞানের যুগ, আর এই বিজ্ঞান ভালো করে শিখতে হলে আমেরিকাই হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান। আর কে না যাচ্ছে এখন বিদেশে? ওসব জাতপাতের বালাই মানতে গেলে মানুষ হওয়া যায় না। খরচ? ওদের জমিদারি ছোট হয়ে গেলেও একটা ছেলেকে বিলেতে বা আমেরিকায় পাঠিয়ে পড়াবার খরচ চালাবার সাধ্য তার নিশ্চয়ই আছে। না হয় কিছু ধারকর্জ হবে।

সে যখন ফিরবে তখন তো সে একা একাই ফিরবে না, তার সঙ্গে থাকবে সে দেশ থেকে শিখে আসা বিদ্যে। সেই বিদ্যের সাহায্যেই সে-ধার শোধ করা কিছু কঠিন হবে না।

আসলে নীলকুঠির জমিদারির অবস্থা যে কতটা পড়ে গিয়েছিল ফতে সিং-এর তা ধারণা ছিল না। মোহন সিং-এর ছিল, আগেই বলেছি, আভিজাত্যের অহঙ্কার। সত্যিই তাঁর অবস্থা তখন এত পড়ে গেছে যে ছেলেকে আমেরিকায় পাঠিয়ে পড়াবার বিপুল খরচ বহন করা প্রায় দুঃসাধ্য। ছেলেকে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফতে সিং নাছোড়বান্দা। অতি আদরের ছেলে সে। যা বায়না করবে আদায় করে ছাড়বেই। অগত্যা যেতে দিতেই হল এবং মোহন সিং বুঝলেন এই নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ায় তাঁকে কিছু ধার-দেনা করতেই হবে। কিন্তু কার কাছে চাইবেন?

কে আর দিতে পারে এক লালকুঠির সুজন সিং ছাড়া? বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সুজন সিং-এর কাছেই বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ধার চাইতে হল। সুজন সিং অবশ্য কোন দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা দিয়ে দিলেন। তাঁর অঢেল টাকা। টাকা ঢেলে সুনাম কুড়োবার এও তো একটা মস্ত সুযোগ।

এরপর বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। ফতে সিং আমেরিকায় গিয়ে পড়াশোনা প্রায় শেষ করে এনেছে। সুজন সিং ইতিমধ্যে আরও নামজাদা হয়ে পড়েছেন। তখনও দেশে ইংরেজ রাজত্ব চলছে। তাদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাব তিনি আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন, এবারে একেবারে রাজাবাহাদুর! অবশ্য, এজন্য বেশ মোটা টাকা খরচ করতে হয়েছে। কয়েক হাজার নয়, কয়েক লাখ। ইতিপূর্বে যাদের যাদের তিনি টাকা ধার দিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে এখন ধার শোধ দেবার জন্য চাপ দেওয়া ছাড়া উপায় কী? যারা যারা টাকা ধার নিয়েছে, ধার শোধ করেনি, কার কাছে কত সুদ বাকি, এসবের ফর্দ নায়েব-গোমস্তারা করে ফেলেছে এবং তাদের কাছে তাগাদা দিতেও শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, মোহন সিংও ওই ফর্দের মধ্যে পড়েছেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায় তিনিও তাঁর দেনা শোধ করতে পারেননি। দেনা শোধ করা দূরের কথা, সুদও দেওয়া হয়নি। ফতে সিং ফিরে এলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে বলে বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড।

মোহন সিং মনমরা হয়ে ভাবছিলেন, লালকুঠি শুধু বড়ই হয়নি, ওখানকার জমিদার এবার রাজাবাহাদুর উপাধি পেতে চলেছেন; আর তিনি? তাঁর আভিজাত্যে আঘাত লাগা তো স্বাভাবিকই! তার ওপর ওই তরফের নায়েব গোমস্তার আনাগোনা এক নতুন উপদ্রব ছাড়া আর কি?

সেদিনও তিনি গড়গড়ায় টান দিতে দিতে এই সব কথা ভাবছিলেন, এমন সময় চাকর একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। ফতে সিং-এর টেলিগ্রাম। সে দেশে ফিরছে। পরশু দিনই বাড়ি এসে পৌঁছবে। শিকাগো থেকে মস্ত বড় একটা ডিগ্রিও সংগ্রহ করেছে সে।

মোহন সিং খাড়া হয়ে বসলেন, মনে হল একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে যেন রেহাই পেলেন। ফতে সিং এলে দেনাটার ব্যবস্থা সে-ই করতে পারবে নিশ্চয়ই—তাই তো সে বলে গিয়েছিল। তা ছাড়া রাজাবাহাদুর যত বড়ই হোন না কেন, আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই-বা কি কোনও অংশে কম? নাঃ, ফতে সিং তাঁর মুখ রেখেছে।

ফতে সিং ফিরে এল। একেবারে অন্য মানুষ। কোন দেমাক নেই, বিদ্যের অহঙ্কার নেই, সকলকার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে। মোহন সিং তাকে বিপদের কথা জানানোয় প্রথমটা সে অবশ্য একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, তার পর কি ভেবে বলল, "সে আমি বুঝব। তোমাকে কিছু করতে হবে না। লোকের সঙ্গে যত ভালো ব্যবহার করবে তত ভালো ব্যবহার পাবে। ও দেশে গিয়ে এটুকু আমি শিখে এসেছি।"

পরদিনই ফতে সিং সুজন সিং-এর বাড়ি গিয়ে হাজির।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজন সিং অবাক হয়ে বললেন "কে, ফতে সিং! তুমি কবে ফিরলে? শুনলাম মস্ত বড় পণ্ডিত হয়ে এসেছ? তা খুব ভালো কথা খুব ভালো কথা, তোমরাই তো নিয়ামতপুরের নাম রাখবে।"

ফতে সিং সলজ্জভাবে বলল, "কি যে বলেন কাকা। আমি আর এমন কী হয়েছি, কিন্তু আপনি যা হয়েছেন তাতে যে আমাদের বুক কত ফুলে উঠেছে, মুখ কত উজ্জ্বল হয়েছে তা কি করে বোঝাব? আমি তো ফিরে এসে শুনে তাজ্জব বনে গেছি। আর আরও অবাক হয়েছি গ্রামের লোকদের ক্যাবলামি দেখে। এত বড় একটা ব্যাপার, আপনাকে একটা সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থাও করেনি? ছি ছি।"

"তাতে কী হয়েছে? ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

"তাতে কী হয়েছে? কি বলছেন আপনি! গ্রামের লোকের কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমি তো লজ্জায় মুখ দেখাতে পাচ্ছি না। কিন্তু যা হবার হয়েছে, আমি যখন এসেছি আমিই এর ব্যবস্থা করব। না না, আপত্তি করবেন না। এ না করলে আমরা গ্রামসুদ্ধ লোক অপরাধী হয়ে যাব।"

সত্যি, ফতে সিং-এর পরে গ্রামের করিতকর্মা লোকদের জড় করে সুজন সিং-এর সংবর্ধনা সভার আয়োজনে মেতে উঠল। মোহন সিং একবার ছেলেকে বলেছিল, 'তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস!" শুনে ফতে সিং জবাব দিয়েছিল, "তুমি চুপ কর তো বাবা। সব কাজেই বাধা দেওয়া তোমার একটা স্বভাব। যা করছি ভালোই করছি। সম্মানিতকে সম্মান জানানোই তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ।"

ঠিক হল নিয়ামতপুরের পাবলিক হলে এই সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আর, এই সুযোগে পাবলিক হলের নামটাও পালটে দেওয়া হবে। এবার থেকে ওর নাম হবে সুজন সিং হল। জেলায় নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। ফতে সিং একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গেও দেখা করে এল এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজিও করিয়ে এল।

"অনুষ্ঠানসূচি তৈরি করা হল, আমন্ত্রণপত্র ছাপা হল, বিলি করা হল জেলার বাছা বাছা লোককে, বাইরেও কিছু গেল। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের বড় রাস্তায় খুঁটি পুঁতে রঙিন কাগজের শিকল আর ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হল, একটা বড় তোরণও গড়া হল। তারই তলা দিয়ে সুজন সিংকে সভায় নিয়ে আসা হবে। আসবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর গণ্যমান্য লোকেরা। ফতে সিং-এর আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

অবশেষে সেই সংবর্ধনার দিন সত্যিই এসে পড়ল। ব্যবস্থামতো সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে চলল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যথাসময়ে এসে সভাপতির আসনে বসেছেন। সুজন সিংও এসেছেন। পরনে তাঁর রাজবেশ। গণ্যমান্য লোকেরা হল ভর্তি করে বসে আছেন।

প্রথমেই উদ্বোধন সংগীত, তার পর স্থানীয় গার্লস্ স্কুলের ছোট একটি মেয়ে এসে রাজাবাহাদুরের কপালে চন্দনের তিলক এঁকে দিল, আর একটি মেয়ে এসে পরিয়ে দিল

মস্ত বড় মোটা একটা ফুলের মালা। তার আগে ফতে সিং এগিয়ে এসে মালাটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল—কিভাবে মালাটা পরাতে হবে তাও দেখিয়ে দিল। ফুলের মালাটা কিন্তু সাধারণ ফুলের মালা নয়,—বাছাই করা নানা দুষ্প্রাপ্য ফুল দিয়ে গাঁথা এই মালা রাজধানীর নিউ মার্কেটের কোনও এক সাহেবের দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে করিয়ে আনা হয়েছে। অনেক টাকা দাম। এর পর প্রবল করতালিতে সভা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে আর কি?

এরপর রাজা বাহাদুরের প্রশস্তি লেখা একটি মানপত্র পড়া শুরু হল। মস্ত বড় মানপত্র, পড়তে বেশ সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল রাজাবাহাদুর কেমন উসখুস করছেন। মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু মুখের ভাবে মনে হল খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি। কী ব্যাপার?

মানপত্র পড়া হলে সেটি রাজাবাহাদুরের হাতে দিতে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা তাঁর নেবার কথা। কিন্তু কই, তিনি উঠছেন না তো। হাত-পা অসাড় হয়ে গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখ দু'টো বোজা। মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। কী হল? কী হল?

একজন এগিয়ে এসে আস্তে রাজাবাহাদুরকে একটু নাড়া দিতেই তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখন সভাব অবস্থা বর্ণনা করা অসাধ্য। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! তবে কি সুজন সিং-এর হার্ট খারাপ ছিল? আজকের এই উত্তেজনায় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল?

সকলে ধরাধরি করে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এল। ফুলের মালাটা তখনও তাঁর গলায় ঝলমল করছে। ফতে সিং এগিয়ে এসে মালাটি আস্তে খুলে নিতে গেল, কিন্তু সহজে তা বার করে আনা গেল না। সবাই বলল, ''থাক্ থাক্, ওটা নিয়েই যাক না!''

আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তার মিত্র। তিনি আর একবার সুজন সিংকে পরীক্ষা করে দেখলেন, যদি এখনও প্রাণের কোন চিহ্ন থেকে থাকে তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। মালাটা খুব সাবধানে খুলে নিয়ে তিনি খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন, তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। না, সত্যিই সুজন সিং মারা গেছেন। এখন আর কিছু করার নেই। ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে এলেন মালাটি তাঁর হাতেই রয়ে গেল। যা ছিল আনন্দ-সভা, তাই শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল শোকসভা।

সুজন সিং চলে গেলেন। নিয়ামতপুরের জনজীবন কিছুদিনের জন্য কেমন ঝিমিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুই চিরদিন একরকম থাকে না, আস্তে আস্তে সেখানেও আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে লাগল।

সুজন সিং-এর ছেলে নেহাতই নাবালক। অত বড় জমিদারি দেখাশোনা সহজ নয়, তবে কি জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর হাতে চলে যাবে নাকি?

সেটা উচিত হবে না। সরকার জমিদারি দেখাশোনার ভার নিলে হয়তো অনেক লোকের অন্ন যাবে। ফতে সিং এখন গ্রামের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এনেছে। সে-ই এসব ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার ভার নিল।

কিন্তু......

কিন্তু হঠাৎ একদিন নীলকুঠির জমিদার বাড়িতে নিঃশব্দে পুলিশের আবির্ভাব হল। ফতে সিংকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে তারা।

মোহন সিং যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ফতে সিং তাঁকে ভরসা দিল, ''তুমি কিছু ভেবো না বাবা। পুলিশের কাণ্ড তো! কোন্ উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে।'' ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে পুলিশ-অফিসারের সঙ্গে গিয়ে জীপে উঠল।

থানার দারোগা বললেন, ''কিছু মনে করবেন না স্যার, আমরা হুকুমের চাকর। আপনার বিরুদ্ধে বড় গুরুতর চার্জ এসেছে। হত্যার চার্জ। চার্জ এনেছেন কলকাতার সেই ডাক্তার মিত্র, যাকে সুজন সিং-এর সংবর্ধনা সভায় নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল।

''ডাক্তার মিত্র!'' এবার বিস্ময় ফুটে উঠল ফতে সিং-এর মুখে।

''হ্যাঁ, আদালতে হাজির হলেই কি তাঁর বক্তব্য জানতে পারবেন।''

এর পরের সমস্ত ঘটনা পরপর বলতে গেলে হয়তো পাঠকের ধৈর্য থাকবে না। তাই এখানে সংক্ষেপে বাকি ব্যাপারটা বলছি।

আদালতে ডাক্তার মিত্র জানালেন, কোন কারণে, কারণটা ঠিক তিনি জানেন না, তবে শুনেছেন দুই জমিদারির মধ্যে তেমন সম্প্রীতি ছিল না। তা সত্ত্বেও সুজন সিং-এর কাছ থেকে মোহন সিং অনেক টাকা ধার করেছিলেন—ওই ফতে সিং-এর জন্যই। সেই টাকা যখন সুজন সিং ফেরত চাইলেন তখনই বাঁধল গোলমাল, এবং এর ব্যবস্থা নেবার ভার ফতে সিং নিজেই তুলে নিল।

আমেরিকায় ফতে সিং পড়তে গিয়েছিল বিজ্ঞান। সাধারণ বিজ্ঞান নয়, —প্রাণিবিজ্ঞান, আরও ভালো করে বললে ওই প্রাণিবিজ্ঞানেরই একটা শাখা কীটতত্ত্ব বা এন্টমোলজি। ওতেই বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এল সে।

কীটপতঙ্গের মধ্যে এমন কতকগুলি পোকামাকড় আছে যারা অত্যন্ত বিষাক্ত। এদের মধ্যে অ্যানড্রেনা ভেনমেটেপিয়া নামে এক জাতের মৌমাছি একটি। সাধারণত মৌমাছিরা হচ্ছে হাইমেনোপুটেয়াবর্গের অ্যাপয়ডিয়া গোত্রের পতঙ্গ। আমরা জানি মৌমাছিরা চাক বেঁধে একসঙ্গে বাস করে। কিন্তু কোন কোন মৌমাছি এরকম চাক না বেঁধে একা একা থাকতেই ভালোবাসে। অ্যানড্রেনা ভেনমেটেপিয়া এই ধরনের একরকম একচোরা মৌমাছি। ঈষৎ বাদামি রঙের মটরদানার মতো খুদে চেহারার মৌমাছি ওরা। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, আবার দরকার হলে শত্রুর গায়ে হুল ফোটাতেও ছাড়ে না। সাধারণ মৌমাছিদের পেটের পেছনে থাকে এই হুল। হুল ফুটিয়েই ওরা তার মধ্যে খানিকটা অ্যাসিড জাতীয় রস ঢেলে দেয় যার জন্য মৌমাছি হুল ফোটালে অসম্ভব জ্বালা করে। হুল ফুটিয়ে মৌমাছি কিন্তু নিজেও বাঁচে না। কেননা হুল ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে হুলের সঙ্গে ওদের পেটেরও খানিকটা অংশ ছিঁড়ে যায়, যার জন্য ওদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। অ্যানড্রেনা ভেনমেটেপিয়ার বেলায়ও ঠিক একই কাণ্ড ঘটে। তবে তফাত হচ্ছে এই যে এদের হুলের সঙ্গে যে বিষাক্ত রস বেরিয়ে এসে ক্ষতস্থানে পড়ে তা সাপের বিষ বা স্নেকভেনমের মতোই মারাত্মক। কাজেই এই ধরনের মৌমাছি যদি কারু গায়ে হুল ফোটায় তাহলে বিষটা এত তাড়াতাড়ি তার দেহে সঞ্চালিত হয়ে যায় যে কিছু বুঝবার আগেই সে অসাড় হয়ে পড়ে এবং একটু পরেই মারা পড়ে। অবশ্য যে মৌমাছি হুল ফোটাল সেও রেহাই পায় না। সাপে কাটলে সঙ্গে সঙ্গে যেরকম দারুণ যন্ত্রণা শুরু হয় এখানে কিন্তু তা হয় না। প্রথমে একটু একটু চুটমুট করে, তারপরই অজ্ঞান।

ডাক্তার মিত্র সুজন সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর গলার কাছে মালার নীচে ছোট একটা ফুলে ওঠা লাল দাগ লক্ষ করেছিলেন। আর মালাটার গায়েও একটা সদ্যমৃত ওই জাতের মৌমাছি ফুলের রেণুর সঙ্গে জড়াজড়ি অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিষাক্ত মৌমাছির কথা তিনি আগেও শুনেছিলেন। সাধারণত আমেরিকার শিকাগো অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। গলার লাল দাগ আর তার পাশেই মালার গায়ে ওই মৌমাছি লক্ষ করে তিনি কৌতূহল মেটাবার জন্য মালাটা আর ফেরত দেননি, মৌমাছি সমেতই সেটা নিয়ে এসেছিলেন। কারণ এদেশে ওই মৌমাছি বড় একটা দেখা যায় না; এসেই তিনি ছোটেন তাঁর এক কীটতত্ত্ববিদ্ বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি পরীক্ষা করে বলেন যে হ্যাঁ, সত্যিই ওটা একটা অ্যানড্রেনা ভেনমেটেপিয়া। এখানে কী করে এল? ফতে সিং যে সম্প্রতি শিকাগো থেকে কীটতত্ত্ববিশারদ্ হয়ে ফিরেছে এ খবর তাঁর জানা ছিল। তবে কি সে-ই এরকম কিছু মৌমাছি শিকাগো থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল? কিন্তু কী জন্যে? তখনই তিনি ব্যাপারটা পুলিশকে জানান এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে আরও অনেক খবর বেরিয়ে পড়ে। খুব একটা দামি মালা না দিলে উৎসবের গুরুত্ব হ্রাস পাবে এইকথা বুঝিয়ে, ফতে সিং নিজে থেকেই কলকাতায় চলে এসেছিল সাহেব দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে মালা গড়িয়ে নিতে। তার মৌমাছির গুদাম কলকাতারই কোন এক কীটতত্ত্ববিদের কাছে ছিল। সেখান থেকে মৌমাছিটিকে সন্তর্পণে সঙ্গে করে এনে সে ওটা নিয়ে ফুলের মালার একটা পুষ্ট ফুলের বাদামি রেণুর মধ্যে রেখে দিয়েছিল, আর ঘন আঠা দিয়ে তার পা এমনভাবে ফুলের সঙ্গে আটকে দিয়েছিল যে মৌমাছিটা উড়ে পালাতে পারবে না, যদিও হুল ফোটাবার ক্ষমতা তার পুরোপুরিই থাকবে। অবশ্য এ কাজ তাকে খুবই সাবধানে করতে হয়েছিল, কারণ একটু অসতর্ক হলে তার গায়ে মৌমাছিটা হুল ফুটিয়ে দিতে পারত, সতর্ক হতে হয়েছিল সেই মেয়েটির সম্বন্ধেও যার হাত দিয়ে মালাটা সুজন সিং-এর গলায় পরানো হবে। মালার কোন জায়গাটা ধরা সবচেয়ে নিরাপদ ঠিক সেই জায়গায় মেয়েটির দু'হাত রেখে তাকে মালাটি নিয়ে সুজন সিং-এর গলায় পরিয়ে দিতে হয়েছিল। মালা পরানো মাত্র সেই বিষাক্ত মৌমাছি সামনে সুজন সিং-এর গলা দেখে সেখানে তার হুল ফুটিয়ে দেয়, আর সুজন সিংও একটু উসখুস করতে করতে অসাড় হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে তীব্র বিষ তাঁর প্রাণ হরণ করে নেয়। মৌমাছিটিও রেহাই পায় না। তাকেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

এরপর চলল জেরার পর জেরা। জবরদস্ত উকিলের পাল্লায় পড়ে শেষপর্যন্ত ফতে সিং স্বীকার না করে পারল না যে, পারিবারিক আক্রোশ মেটাবার জন্য এই জঘন্য কাজটা সে করেছে।

এরপর রায় বেরোয়। বলাবাহুল্য জজসাহেব ফতে সিংকে রেহাই দেননি।

মনিষ্যির রক্ত

আশাপূর্ণা দেবী

চোর আর গোয়েন্দা এ দুইয়ের মধ্যে সামাজিক মানসম্মানের যতই তফাত থাক, আসলে কিন্তু একটি জায়গায় দুজনাই প্রায় একই শ্রেণীর। দুজনারই মাথা অতি পরিষ্কার থাকা দরকার, দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম এবং ঘ্রাণশক্তি, অনুভবশক্তি আর অনুমানশক্তি অতীব প্রখর। আর থাকা দরকার অসীম ধৈর্য।

এই গুণগুলি না থাকলে তুখড় গোয়েন্দাও হওয়া যায় না, আর পাকা চোরও হওয়া যায় না।

তা ছাড়া—দুজনারই অবশ্য-প্রয়োজনীয় একটি শাগরেদ। চোরেরও, গোয়েন্দারও। দুজনেই একা না ভ্যাকা!

শাগরেদহীন গোয়েন্দারও নজির যেমন ভুভারতে কোথাও নেই, কদাচও ছিল না, চোরেরও অবিকল তাই। তবে কিনা পৃথিবীজুড়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে যত লেখালিখি, যত ফলাও করে তাঁদের বুদ্ধি-কৌশলের জমজমাটি কাহিনীর প্রচার, অভাগা হতভাগা চোরেদের বেলায় কিন্তু তা নয়। তাদের বুদ্ধি-কৌশল চাতুর্য আর লক্ষ্যভেদ-এর নিষ্ঠা নিয়ে বিশেষ কোনও কাহিনী লেখা হয় না।

হতে পারে চোরেদের কর্মটি তেমন মহৎ নয়, অপকর্মই বলা হয়, তবু তাদের গুণগুলো কি একেবারেই উড়িয়ে দেবার মতো?

এই যে বটকেষ্ট সর্দার আর তার শাগরেদ যোগা মণ্ডল দিনের পর দিন, বলতে গেলে রাতদিন স্টেনলেস স্টিলের কারবারি নন্দীরাম গড়গড়ির বাড়িখানি ওয়াচ করে চলেছে অসীম ধৈর্য আর লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিষ্ঠা নিয়ে সে-কি একটি বড় গোয়েন্দার থেকে কম?

বটকেষ্ট বেশ কিছুকাল থেকেই সন্ধান পেয়ে আসছে নন্দীরামের বাড়ির দেওয়ালের মধ্যে নাকি সোনার চাঁই পোঁতা আছে।

কথাটা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসব 'সন্ধান' দেবার পাকা লোকও থাকে চোরেদের সন্ধানে। তা শুনে অবধিই বটকেষ্ট সুলুক জেনে নেবার কাজ চালিয়ে চলেছিল, এখন স্থির জেনে ফেলেছে 'সন্ধানটা' সত্যি!

যদিও এমনিতে নন্দীরামের বাড়িটি দেখলে কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত। কালীঘাটের কাছাকাছি সরু একটা গলির মধ্যে নন্দীরামের নেহাতই মাঝারি সাইজের একখানি দোতলা বাড়ি। তাও পুরনো ধাঁচের। বাড়িতে না আছে গ্রিলের বাহার মোজাইকের জেল্লা, আর কাচের

শার্সির কারুকার্য। একদম সাদামাটা যাকে বলে।

আর নন্দীরামও তথৈবচ।

নন্দীরাম জীবনে কখনও ধুতি ফতুয়া, অথবা হাফ পাঞ্জাবি ভিন্ন অন্য কোনও পোশাক পরিধান করেছে, এমন কেউ বলতে পারবে না।

তাও সেই ধুতি মোটাসোটা এবং বহরে খাটো! পাঞ্জাবি-ফতুয়া তার সুঙ্গেই মানানসই।

সারাক্ষণ পান চিবোনো ছাড়া আর কোনও বিলাসিতার বালাই নেই। গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে আছে, তাদের হালও বাপেরই মতো। পড়ে নাকি কর্পোরেশান স্কুলে।

আর বাড়িতে নিত্য যা বাজার আসে সে হচ্ছে কালীঘাট বাজারের যত সব ঝড়তি-পড়তি ওঁচা মাল। সাত্ত্বিক পরিবার, মাছটাছ খাওয়ারও বালাই নেই।

এই মানুষের বাড়ির দেওয়ালে সোনার চাঁই হয় না-কি?

তা জগতে কত অসম্ভব ঘটনাই না সম্ভব হয়! 'বিশ্বস্ত সূত্রের খবর' নন্দীরামের নিজস্ব 'ঠাকুর-ঘরের' দেওয়ালই না-কি সেই সোনার খনি!

ভগবান জানেন 'সত্যি' না হিংসুটেদের রটনা।

দোষের মধ্যে শুধু নন্দীরাম তার ঠাকুরঘরের দেওয়ালটি স্টেনলেস স্টিলের পাত দিয়ে মুড়ে ঝকমকে করে রেখেছে। যেচে যেচে কৈফিয়ত দিয়ে বলছে—এই স্টিলই আমার 'লক্ষ্মী'। এর দৌলতেই দুটো মোটা ভাত-কাপড়ে বেঁচে আছি, তাই ঠাকুরঘরটুকু এই ভাবেই বাহার করে নিয়েছি।

কিন্তু বটকেষ্ট জেনে ফেলেছে ওই স্টিলের আড়ালেই 'সোনা'।

শাগরেদ যোগা মণ্ডল অবশ্য প্রথমে কথাটা শুনে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। বলেছিল, তুমি আর হাসিও না সর্দার। লোকটার পরন-পরিচ্ছদ দেখেছ? হালচাল দেখেছ? ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা দেখেছ?

তা বলবেই তো। শাগরেদরা তো একটু কমবুদ্ধিরই হয়। তা সে কী গোয়েন্দার, কী চোরের।

কিন্তু ওস্তাদেরা তো আর কমবুদ্ধির হয় না। বটকেষ্ট বলেছিল—ওরে ওই হালচালটা হচ্ছে ভেক। আসলে ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল। তুই ওয়াচ করে যা।

তদবধি ওয়াচ করে চলেছে যোগা! কাজেই নন্দীরামের বাড়ির কাছাকাছি একটা জরাজীর্ণ শিবমন্দিরে বাসা বাঁধতে হয়েছে যোগাকে। যোগা নিরীক্ষণ করে করে ওস্তাদকে রিপোর্ট দিয়ে চলেছে।

কী ধরনের রিপোর্ট?

কী আবার ধরন? লোকটার বাড়িতে কজন মেম্বার, তাদের সঙ্গে লোকটার কী সম্পর্ক, তাদের বয়েস কীরকম, পেশা কী, কখন বেরোয়, কখন ফেরে, বাড়ি কোনও সময় খালি থাকে কিনা, থাকলে কোন্ সময়, কতক্ষণ,—এই সবই তো রিপোর্টের ব্যাপার। তো নন্দীরামের বাড়ির ব্যাপারে রিপোর্ট অতি পরিষ্কার ঝরঝরে।

নন্দীরামের একটা বউ, দুটো মেয়ে, তিনটে ছেলে। তাদের সঙ্গে নন্দীরামের যা সম্পর্ক হবার তাই সম্পর্ক। বউ অর্থাৎ গিন্নির বয়েস পঁয়ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। কলে মাড়াই-হওয়া আখের ছিবড়ে দেখে কী বোঝা যায় সেটা কোন্ ফসলের আখ?

তবে নন্দীরামের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছেলেমেয়েগুলোর বয়েস পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে হবে। এদের মধ্যে গোটা-তিনেকের পেশা স্কুলে যাওয়া, বাকিদের পেশা খিদে পেয়েছে বলে বায়না করার। যারা স্কুলে যায়, তারা বেলা দশটায় বেরোয় বিকেল চারটেয় ফেরে, এবং ফিরে রুটি আর গুড় খেয়ে ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা শুধুই দাপাদাপি করে।

নন্দীরামের গিন্নির বাড়ি থেকে বেরোনোর কোনও প্রশ্ন নেই, সে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অবিরত কাজ করে চলে। বাড়িতে কোনও কাজ করবার লোক নেই, শুধু মাঝে মাঝে একটা নড়বড়ে বুড়ি এসে একঝুড়ি করে ঘুঁটে দিয়ে যায়, আর চারটি কয়লা ভেঙে দিয়ে যায়। তা বুড়িটা এমন বদ্ধকালা যে তাকে জিগ্যেস করে ভেতরের খবর জানবার কোনও উপায় নেই। বাকি নন্দীরাম গড়গড়ি স্বয়ং !

নন্দীরাম ভোরবেলা উঠে নিজের জুতোজোড়া বুরুশ করে রাখে, নিমের দাঁতন দিয়ে একটুকরো উঠোনে দুলে দুলে দাঁতন করে। তারপর উঠোনের চৌবাচ্চাটা ধুয়ে সাফ করে তাতে জল ভরতে দেয়, অতঃপর চান করে দোতলায় উঠে গিয়ে একটা কাচা ধুতি পরে পুজোর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পুজো করে। তবে পুজো করে কী টাকা গোনে, সে জানে আর তার ঠাকুর জানে।

ভাঙা শিবমন্দিরের গায়ে গজানো অশ্বত্থ গাছটার মগডালে উঠে ডালপালার আড়ালে আত্মগোপন করে অনেক কিছুই দেখতে পায় বটে যোগা মণ্ডল, তবে ঠাকুরঘরটির মধ্যেটা দেখার উপায় নেই। ঠাকুরঘরে কোনও জানালা নেই, আছে উঁচুদিকে কটা ঘুলঘুলি, তাও তাদের জালি দিয়ে ঢাকা। দরজা একটাই, সেটা নন্দীরামের শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দীরাম মোটা কাচের গ্লাসের একগ্লাস চা খায়, আর একবাটি মুড়ি। আগে তেল-নুন মেখে খেত, তেলের দাম বেড়ে যাওয়া-ইস্তক শুধু নুন মেখে খায়। তবে রান্নাঘরের পিছনে বাসন মাজার চাতালের ধারে একটা দিব্যি ঝাঁকড়া কাঁচালঙ্কার গাছ আছে, তা থেকে পটাপট দুটো লঙ্কা ছিঁড়ে আনে, বিনা খরচে মুখের স্বাদ আনা আর কী।

চা খেয়ে নন্দীরাম গড়গড়ি চটের থলিটি হাতে নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়ে। বাজারের মাঝখানে কদাচ ঢুকতে চায় না। আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে যত রাজ্যের সস্তা মাল কিনে এনে গিন্নির হাতে ধরিয়ে দিয়ে জোর গলায় বলে, 'চটপট ভাতটা দিয়ে দিও।'

গিন্নি চিঁচিঁ করে বলে, 'এইসব কানা বেগুন, শুকনো ডাঁটাপাতা, ভ্যাপসা কুমড়ো—এ দিয়ে চটপট কী হবে শুনি?'

নন্দীরাম হুঙ্কার ছাড়ে, 'তো আমি কি পোলাও কালিয়া খেতে চাইছি? ডাল-ভাত আর একটা ঘ্যাঁট হলেই আমার তোফা চলে যায় জানো না?'

অতঃপর নন্দীরাম বড় এক গেলাস জল খেয়ে তার কারখানার হিসেবের খাতা দেখতে বসে।

যোগা সুদূর মন্দিরচুড়ো থেকে ওই খাতা নিয়ে বসার দৃশ্যটা দেখতে পায়, তবে খাতার মধ্যেকার ব্যাপারটা দেখবার কোনও উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হিসেব দেখে নন্দীরাম খাতাপত্তর সিন্দুকে তুলে ফেলে তাতে চাবি দিয়ে চাবিটি কোমরে বাঁধা ঘুনসিতে টাইটফিট করে বেঁধে, ধুতির কষি তার ওপর চাপিয়ে ঢেকে ভাত খেতে বসে।

বড় একথালা ভাত বড় একটা জামবাটি ভর্তি ডাল আর ল্যাবড়া একটা চচ্চড়ি। হাপুসহুপুস করে দুমিনিটে ফর্সা করে ফেলে কেডস জোড়াটি পায়ে গলিয়ে কর্মস্থল উদ্দেশে রওনা হয়। ফেরে সেই রাত আটটায়।

এই রিপোর্ট।

যোগা বলে, 'এই লোকের ঘরের দেয়ালে সোনা পোঁতা থাকতে পারে? হ্যাৎ! যত্তোসব!'

বটকেষ্ট বলে, 'এইসব লোকেরই থাকে রে যোগা! ভাব দেখায় যেন গরিবের গরিব তস্য গরিব। ওই যে হিসেবের খাতা, সব দু-নম্বরি! বুঝলি? এক-নম্বরি যা থাকে দোকানে। ভারি নিরীহ হিসেব। আয়করের হানার ভয় নেই। তবে ওই স্টেনলেসের দেয়াল করেই মরেছে। লোকের সন্দেহ, আসলে ওটা করেছে বোধ হয় হঠাৎ পাছে কেউ দেয়াল খোঁড়াখুঁড়ি করে। পুরনো বাড়ি, নোনাধরা দেয়াল!'

তা তাই নাহয় হল। কাঁহাতক আর এই ভাবে ভাঙা মন্দিরের চুড়োয় উঠে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থেকে থেকে ওয়াচ করা যায়?

যোগা একটা ফন্দি করল। গাছ থেকে নেমে পড়ে যোগা ছদ্মবেশ পরে লজেন্স চকোলেটওলা সেজে পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। ভারি সস্তা কারবার।

'লে লে বাবু টোয়েন্টি ফাইভ। সবকোই মাল টোয়েন্টি ফাইভ!'

হ্যাঁ, একটা লজেন্সও পঁচিশ পয়সা, একটা চকোলেটও পঁচিশ পয়সা। বাচ্চাদের জালে পড়তে কতক্ষণ?

ভীষণভাবে জালে পড়ে গেল আবার নন্দীরামের সেজো ছেলে গঙ্গারাম।

গঙ্গারামের কাছে পঁচিশ পয়সাও থাকে না। কঞ্জুস বাপের ছেলেদের যা হয়।

কিন্তু তাতে কী?

লজেন্সওলা যে 'ভারি ভালো'। ও গঙ্গারামকে ডেকে ডেকে চকোলেট দেয় আর বলে, 'আমার কত রয়েছে, তুমি খাও না দুখানা। কিছু হবে না। লজ্জা কী! আচ্ছা তুমি নাহয় বড় হয়ে আপিসে চাকরি করে আমার শোধ দিও।'

অতএব গঙ্গারাম রোজ একখানা করে চকোলেট খায়, আর বাড়ির খবর সাপ্লাই করে।

বাবার নাম নন্দীরাম। কতদিন ফন্দি করছে কী করে টাকা জমাবে। ঠাকুরঘরের দেয়ালে যে কী ফন্দি সেঁটে রেখেছে বাবাই জানে। ঘরে ঢুকে পুজো করে না হাতি! কেবল দেয়ালে হাত বুলোয় আর মাথায় ঠেকায়।

মাথায় ঠেকায়!

রিপোর্ট শুনে বটকেষ্ট লাফিয়ে ওঠে, অ্যাঁ? আর তুই বলছিস দেয়ালে কিছু নেই? শুধু কচু আছে, কাঁচকলা আছে, ঘোড়ার ডিম পোরা আছে? ওরে যোগা কোনওমতে একদিন ওই গড়গড়িটাকে লাউ-গড়গড়িয়ে কোথাও চালান করিয়ে দিতে পারিস না? একটা হেস্তনেস্ত দেখে মরি।'

যোগা মণ্ডল নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সে আর তুমি দেখেছ ওস্তাদ! শুদুমুদু কতকগুলো দিন কাবার। তবে হ্যাঁ, ছিঁচকে চোরের দিন আর নেই। এখন শার্ট-পেন্টুল পরে বড় বড় বিদ্বান বাবুরা দলবেঁধে দিনদুপুরে বড় মানুষদের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে, স্টেনগান-পাইপগান দেখাচ্ছে, রিভালবার উঁচিয়ে লকার সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিচ্ছে। কাজ ফতে করে গটগট করে বেরিয়ে এসে অ্যাম্বাসাডার চেপে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা?...বুক হেঁচড়ে হেঁচড়ে ভাঙা-মন্দিরের চুড়োয় উঠে, অশ্বত্থ গাছের ডালে বেম্মদত্যির মতন পা দুলিয়ে

বসে বসে, মশার কামড় খেয়ে ওয়াচ করছি। হ্যাৎ! এ পেশায় ধিক্কার।

বটকেষ্ট সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'সুদিন আসবে রে যোগা। একবার যদি ওই গড়গড়িটাকে ফাঁসাতে পারি, ব্যাস্। কেল্লা মার দিয়া। এই হতভাগ্য জীবন থেকে মুক্ত হয়ে একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করে নতুন জীবন ধরব।

কিন্তু সেই 'একবার'টা আসছে কই?

নেহাত বাকি চকোলেট-লজেন্সগুলো চোরাই মাল, তাই সাপ্লাই দেওয়া যাচ্ছে সস্তায়, বিনি পয়সায়।

তবে হ্যাঁ। লোকশাস্তরে বলে, 'সাধুর সাতদিন চোরের একদিন।' সাধু মানে কি আর সন্নিসি? তা নয়। সাধু হচ্ছে গেরস্থ। গেরস্থ হয়তো হঠাৎ একদিন অসাবধান হয়ে যায়, আর সেই দিনটিই চোরের পোয়াবারো!

আজ যোগা মণ্ডল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে রিপোর্ট দিল, 'কত্তা, মোক্ষম খবর। গড়গড়ি কোম্পানি এখন দুদিন বাড়িছাড়া থাকবে।'

'অ্যাঁ? বলিস কী? কে বলল?'

'কে আর? আমার খবর সাপ্লায়ার গঙ্গারাম। নন্দীরাম সপরিবারে দেশের বাড়িতে যাচ্ছে খুড়োর ছেরাদ্দয়। ছেরাদ্দর দিন না-কি খুড়োর উইল পড়া হবে। খুড়োর ছেলেপেলে নেই, ভাইপোরাই তার বিষয়-সম্পত্তি পাবে। তো ব্যাটা গড়গড়ি তো আর সুযোগ ছাড়তে পারে না? ও গিয়ে হাজির না হলে নির্ঘাত অন্য ভাইপোরা সব হাপিস করে দেবে। গঙ্গারাম তো আহ্লাদের চোটে পাক খেয়ে খেয়ে নাচছে। বলে, কী মজা-কী মজা। জন্মে-জীবনে রেলগাড়ি চড়ি নাই, খুড়ো দাদুর ছেরাদ্দয় চড়ব। ভাগ্যিস খুড়ো দাদু পটল তুলল।'

'অ্যাঁ। বলছে এই কথা? কী অসভ্য ছেলেরে বাবা। তো যাবার আগে কি আর পাহারাদার একটা না রেখে যাবে!'

'না, না। সে রাখবে না।'

গঙ্গারামের সাপ্লাই—পিথিবীতে কাউকে বিশ্বাস আছে নাকি বাবার? মা তো বলছিল মামা এসে থাকুক দুদিন। তো বাবা বলেছে কোনও দরকার নেই। ষোলোটা তালাচাবি জোগাড় করেছে বাবা পাঁচজনার কাছে চেয়ে-চিন্তে।

'তালাচাবি?'

বটকেষ্ট মুচকি হাসে।

'বটকেষ্টর কাছে তালাচাবি? গডরেজের কলও কায়দা করে ফেলতে পারে বটকেষ্ট। বুঝলি যোগা?'

'সে তো এ যাবৎ দেখে আসছি!'

'তো কবে যাবে?'

'পরশুদিনকে।'

'জায়গাটা কোথায় বললি?'

'ওই তো গঙ্গারাম পুরুলি পুরুলি করছিল। বোধহয় পুরুলিয়াই হবে। উইলকে বলল হুইল। তবে ওস্তাদ ছেলে।'

'আরে বাস্। পুরুলিয়া? তা হলে তো কথাই নেই। অন্তত দুটো রাত হাতে পাওয়া যাবে। তো মেরেপিটে আর দুটো দিন লড়ে যা যোগা। লক্ষ্য রাখ কখন বেরোল, কে কে বেরোল। বাড়িতে কাউকে পাহারা রেখে গেল কিনা।'

তা সব খবরই যথাযথ দিয়েছে যোগা তার গুরু বটকেষ্টকে।

বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভোরবেলা একখানা ট্যাক্সি চেপে বেরিয়ে গেল নন্দীরাম। ট্যাক্সি চড়ার মতো বিলাসিতা করতে বাধ্য হয়েছে নন্দীরাম এখন খালি পা বলে। জ্ঞাতি-অশৌচে জুতো পরা নিষেধ।

যোগা বলল, 'সদরে পরপর ছটা তালা লাগিয়ে গেছে—'

'যেতে দে। অ্যাসিডের বোতলটা বাগিয়ে রাখ।'

'সে তো আছেই। অ্যাসিড মুখোশ তোমার গে' যন্তরের থলি। সব মজুত!'

'রাত বারোটার পরই বেরিয়ে পড়া যাবে। কী বলিস শাগরেদ?'

শাগরেদ বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমাদের আর ও ছাড়া উপায় কী? আমরা তো আর বেলা বারোটায় বুক ফুলিয়ে অভিযানে বেরোবার এলেম রাখি না। তেমন দিন কি পাব কখনও?'

'তেমন দিন?'

বটকেষ্ট একটা হুঙ্কার ছাড়ল।

'বলেছি না, একবার একটু সুরাহা হলেই এই পাপজীবন ছেড়ে নতুন জীবন ধরব। মা কালী যেন দয়া করে। নন্দীরাম গড়গড়ির দেয়ালে সোনার তাল মেলে।'

চোর-ডাকাতদেরও 'মা কালী' আছেন বৈকি। দয়া-টয়াও করেন। না হলে দেশে যেখানে-সেখানে এত সব ডাকাতে-কালীর মন্দির কেন?

দয়া করলেন মা কালী।

রাত দুপুরে অন্ধকারে চোখে মানিক জ্বেলে বটকেষ্ট তার শাগরেদকে নিয়ে গড়গড়িয়ে দরজার ছটা, সিড়ির দরজার চারটে, আর শোবার ঘরের দরজার পাঁচটা তালার চাবির গর্তে দু'চার ফোঁটা করে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে ফটাফট খুলে ফেলে ঢুকে এল আসল জায়গায়।

'এখানে টর্চ জ্বালা যায় ওস্তাদ,' বলল যোগা মণ্ডল, 'একটাও জানলা-ফানলা নেই।'

'ঠিক আছে জ্বাল। আর যন্তরের থলিটা আমার হাতে দে।'

'সারা দেয়ালে তো ইস্টিলের পাত মারা ওস্তাদ, সব ওপড়াবে?'

'দূর! পাগল না ক্ষ্যাপা! ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতেই ওপড়াব।'

যোগা বলল, 'তো সেটা টের পাবে কেমন করে?'

'নাঃ এতদিন আমার শাগরেদি করেও তোর গাধাজম্মো ঘুচলনা রে যোগা। দেখ কী করে টের পাই। আওয়াজেই মালুম হবে।'

বটকেষ্ট একটা ছোট্ট ধাতুতে গড়া বেঁটে রড নিয়ে সারা দেওয়ালে ঠুকঠুক করে ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ এক জায়গায় ঠুকেই স্থির হয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'যোগা! পেয়ে গেছি।'

'পেয়ে গেছো? কী পেয়ে গেছো?'

'মোক্ষম জায়গাটা আবিষ্কার হয়ে গেছে। যন্তরগুলো দে মানিক।'

ভগবান জানেন কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র-টন্ত্রর সাহায্যে চাড় দিয়ে একখানা শিট খুলে ফেলল বটকেষ্ট। উপড়ে খুলে নিল।

সেখানে?

সেখানে একটা বড় কুলুঙ্গি। আর সেই কুলুঙ্গির মধ্যে একটা....

'আঁ আঁ আঁ! হাঁ হাঁ হাঁ। ওরে বাবারে! ওরে বাবারে!'

কী? কী সেখানে? মস্ত একটা গোখরো সাপ?

আরে বাবা সেসব কিছু নয়। সেখানে একটা তামার কলসি বসানো। কিন্তু তাতে কী? সেটাকে টেনে দেখছে কে?

হঠাৎ আচমকা পিছনে ওই বুকফাটা আর্তনাদ!

'আঁ আঁ আঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে বাবারে—ওরে বাবারে—'

ব্যাস্। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো দমাস করে মাটিতে পড়ে সটান লম্বা শ্রীনন্দীরাম গড়গড়ি।

কিন্তু যেভাবে পতন, তারপর কি আর শ্রী' রইলেন? নাকি চন্দবিন্দু হয়ে গেলেন?

না, নন্দীরামের দেশের ভিটে পুরুলিয়ায় নয়। ভিটে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরুসুলিয়া গ্রামে। গ্রাম-গঞ্জের যে কতরকম নামই থাকে। মানে থাক না থাক, যা হোক একটা নাম হলেই হল।

তো সে গ্রাম তো কলকাতা থেকে ঘন্টা দুই। ইস্টিশান থেকে আর ঘন্টাখানেক।

খুড়োর শ্রাদ্ধশান্তির শেষে উইল পড়াপড়ি ব্রাহ্মণভোজন অন্তে নিজেদের ভোজন সমাধা হতেই নন্দীরাম ছটফটিয়ে উঠে বউকে বলল, 'তুমি ছেলেমেযে নিয়ে এখানে থাকো দু'দিন, আমি চলি।'

বউ তো হতভম্ব।

'এই রাত্রিকালে 'চলি' কী গো? সকাল হলেই না হয়—'

'না, না। রাতটাই আসল।'

সেই আসল সামলাতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে নন্দীরাম। এসেই দেখল, সদর দরজার ছুটা তালা কাত হয়ে দুলদুলিয়ে দুলছে...মরিয়া হয়ে সিঁড়িতে উঠে দেখল সেখানেও একই দৃশ্য। আর ঘরের দরজায় এসে—

এসে আর কী? দেয়ালের পাত খুলে হাঁ হাঁ করা দৃশ্য!

বুকের মধ্যে দমাদম হাতুড়ির ঘা। মাথার মধ্যে দাউ দাউ আগুন। চোখে সুরষে ফুল। এতেও আঁ আঁ আঁ হাঁ হাঁ হাঁ করে মাথা ঘুরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যাবে নন্দীরাম গড়গড়ি?

যার নাম 'স্ট্রোক'।

জ্ঞান নেই গম্যি নেই, মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে!

'এ কী হল ওস্তাদ? টেঁসে গেল নাকি?'

বটকেষ্ট বলল, 'যেতে দে। আমরা মালটা নিয়ে সরে পড়ি।'

কলসির মধ্যে সত্যিই ড্যালা ড্যালা সোনা।

'যোগা, বুঝতে পারছিস এসব সোনা কীসের?'

'বুঝেছি। আমরা আর আমাদের মতোনরা যে সব গহনাগাঁটি সাফাই করে ছপট পোদ্দারের দোকানে গলিয়ে ফেলে প্রমাণ লোপ করে ফেলি।'

'জীতা রও ব্যাটা। বুঝেছিস তাহলে? আর সস্তায় চোরাই সোনা কিনে কিনে জমিয়েছে?'

যোগা বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু লোকটাকে তো দেখতে হয় ওস্তাদ। চোখেমুখে একটু জল দিতে পারলে—'

বটকেষ্ট খিঁচিয়ে বলে, 'বাঃ, চমৎকার। তুই ওর চোখেমুখে জল দিয়ে চোখ খোলা আর ও উঠে তোকে কামড়ে দিক। যেমন আছে থাক। চল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!'

যোগা মণ্ডল কিন্তু অনমনীয়।

'তাই কি কখনও হয় ওস্তাদ? চোর বলে তো আর জানোয়ার নই! 'মনিষ্যত্ব' বলে একটা কথা আছে তো? লোকটাকে এইভাবে মরণের মুখে রেখে দিয়ে—না না, তা হয় না।'

কোথা থেকে একঘটি জল নিয়ে আসে যোগা।

বটকেষ্ট হতাশভাবে বলে, 'তুই তবে বসে বসে মনিষ্যত্ব কর! ডাক্তার ডেকে আন! ওষুধ খাওয়া, সেবা কর।'

যোগা অকুতোভয়ে বলল, 'তা দরকার হলে সবই করতে হবে! জলজ্যান্ত লোকটাকে আজ কতদিন ধরে দেখছি। খাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, বাজারে যাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে। ওয়াচ করতে করতে চেনা হয়ে গেছে। সেই লোকটাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে, নাঃ। নির্ঘাত মরে যাবে। তখন মনে হবে একটা নরহত্যের কারণ হলাম।'

প্রায় ডুকরেই কেঁদে উঠল যোগা।

বটকেষ্ট তাকিয়ে দেখল।

কথাটা অবশ্য ঠিকই। এভাবে ফেলে রেখে গেলে নিশ্চিত মরবে। দু'তিন দিন পরে বউ, ছেলেমেয়ে এসে দেখবে লাশ পচে গন্ধ ছাড়ছে। এ বাবা! ভীষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে সেটা।

বটকেষ্টরও মন দুলল।

তবু যোগার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি হেনে বলল, 'মরুক না। তোর কী? খুব তো পাইপগান মেশিনগান বলে তড়পাস! তাহলে তো নিজেরাই 'নিহত' করে রেখে চম্পট দিতে হত।'

যোগা রেগে বলল, 'সে কথা বাদ দাও। এখন একে দেখে আমার মাথা বনবন করছে। এ যে নড়েচড়ে না। সোনার শোকে লোকটা সত্যিই হার্টফেল করল না কি? না বাবা। একটা ডাক্তার ডাকা দরকার।'

বটকেষ্ট বলল, 'তবে যা ডাকতে। এই রাত্তিরে কোন্ মহাত্মা ডাক্তার আসে দেখি।'

'বেশি টাকা দেব বললে আসতে পারে।'

বটকেষ্ট উদাসভাবে বলল, 'তা আসতে পারে। তবে মনে রাখিস এই সোনাভর্তি ঘড়া ফেলে রেখে হাতকড়া পরে জেলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাক।'

যোগা একগুঁয়ের মতো বলে, 'পরের কথা পরে ভাবা যাবে ওস্তাদ। এখন তো—'

'আচ্ছা। দাঁড়া একটু। লাশটাকে ধরাধরি করে ওর ঘরের বিছানায় শুইয়ে রেখে ডাক্তার ডাকতে যা। এভাবে পড়ে থাকতে দেখলে—'

যোগা ধরাধরি করে নন্দীরামকে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু তারপর?

ডাক্তার পেল যোগা?

তা পেল। পাড়ারই ডাক্তার। নন্দীরাম গড়গড়ির 'যায় যায়' অবস্থা শুনে বলল, 'নন্দীরাম লোকটা অতি ছ্যাঁচড়া। তবে পাড়ার লোক, যেতেই হয়, কিন্তু তুমি কে হে বাপু? তোমায় তো চিনছি না।'

'আজ্ঞে ওনার দেশের গ্রামের জমিদারির প্রজা। উনি ওনার কাকার ছেরাদ্দয় দেশে গেছল। তো ফেরার সময় আমাদের দু'জনাকে সঙ্গে আনল, রাতে একা আসছে বলে। তো বাড়ি ফিরেই এই বিপত্তি। হঠাৎ গোঁ গোঁ করে শুয়ে পড়ল।'

ভবেশ ডাক্তার এলেন। রোগী দেখলেন। পরিস্থিতিও দেখলেন। (তবু.ঠাকুরঘরের মধ্যেটা দেখেননি) 'মরেনি' বলে ওষুধও দিলেন। তবে বাড়ি ফিরে টেলিফোন করে পুলিশে একটি খবরও দিলেন।

ওই ষন্ডামার্কা লোক দুটো যে নন্দীরামের জমিদারির প্রজা এটা তাঁর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না।

তা পুলিশেরও তা হল না। তারা এসেই বলে উঠল, 'আরে সাবাস্! একসঙ্গে' মানিকজোড়। অনেক দিন আমাদের হাত ছাড়িয়ে বাইরে হাওয়া খেয়েছ চাঁদু। আবার চলো শ্বশুরঘরে ঢুকতে!'

যোগা আর বটকেষ্ট বলল, 'চলো।'

হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল।

আর নন্দীরাম? সে কি বেঁচে উঠল?

তা উঠল। তবে তারও হাতে হাতকড়া উঠল। বেশ কিছুদিন তাকে খাইযে শুইযে সেবা চিকিৎসা করে শক্ত করে তুলে হাজতে নিযে গেল। এবং আয়কর ফাঁকি দেওয়া আর বেআইনি চোরাই সোনা বাড়িতে মজুত রাখার অপরাধে আড়াই বছরের জেল আর দশ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য হল। অনাদায়ে আরো তিন মাস জেল।

গারদে ঢোকবার সময় যোগা বলে উঠল, 'স্যার এই যে আমরা নিজেদের বুদ্ধি-কৌশলে একটা আসামীকে ধরিয়ে দিলাম তার কোনও পুবস্কার নেই? আপনাদের কোনও গোয়েন্দা যদি এটা করত পুরস্কার পেত কিনা?'

পুলিশ সাহেব মুচকে হেসে বললেন, 'তা পেত। তোরাও পাবি। ওরে কে আছিস এদের বাড়তি বিশ ঘা করে বেত মেরে যা তো।'

চোর আর গোয়েন্দার মধ্যে এই তফাত।

গারদঘরে ঢুকে এসে বটকেষ্ট গামছা দিযে গাযের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'তখনি বলেছিলুম তুই-ই ডোবাবি যোগা!'

যোগাও ঘামছে, তবে মুছল না।

যোগা মণ্ডল বেজার গলায় বলল, 'তা তুমি তো সুযোগ পেয়েছিলে ওস্তাদ। আমি যখন ডাক্তার ডাকতে গেলাম, তুমি পালালেই পারতে। লাশ আগলে বসে পাখার হাওয়া করতে লাগলে ক্যানো।'

'ওঃ বটে!' বটকেষ্ট চোখ লাল করে বলল, 'ওঃ বটে! তুই-ই শুধু মনিষ্যি, আর বটা একটা জানোয়ার, কেমন? তার গায়ে মনিষ্যির রক্ত নেই, কেমন? তবে দেখলি তো? জীবনটাকে একবার নষ্ট করে ফেললে আর কখনও নতুন জীবনের আশা নেই। মনিষ্যির রক্ত গায়ে থাকলেই-বা কী!'

একটি চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী

সুকুমার দে সরকার

নিজের নাম নিয়ে শেষে এমন মুশ্‌কিলে পড়ব কে জানত? শেক্সপিয়র বলে গেছেন নামেতে কী আসে যায়? আমার মামা আমার বেলায় মহাপুরুষের সেই মহাবাক্য প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ যে কোনও বিশেষ্য বা বিশেষণ যা তাঁর বেশ লাগসই মনে হয় তা তিনি আমার ওপর লাগিয়ে বসেন। তাই তাঁর কাছে কখনও আমি পেঁচা কখনও গোরু কখনও ভাল্লুক আবার কখনও দোল গোবিন্দ বলেও আখ্যাত হই। আমার মেসোমশায়ের কিন্তু অন্য মত—তিনি আবার মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্! তিনি বলেন নামের ওপরেই এক-একজনের মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে—নামই সব। বাপ মা যা নাম দেয় সেসব ভুল, তার ভেতর থেকে চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না, তাই যে-সব লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন, তাদের সকলকে তিনি নিজে এক-একটা নাম দেন। আমার কপালে জুটেছিল—হরির লুঠ।

তারপরে আমার পিসেমশাই। তিনি অত যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। তাঁর পরিচয় তোমরা শিগ্‌গিরই পাবে, তবু আগে থাকতে এটুকু জেনে রাখ যে তিনি রসোগোল্লা খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন আর রসোগোল্লা কথাটা সবসময়ে তাঁর মুখে লেগে আছে। আমার পিসেমশাই পয়সাওয়ালা লোক, কিন্তু তেজারতি ব্যবসা করে তাঁর প্রকৃতিটা বেশ কৃপণ হয়ে উঠেছিল। সদানন্দ রোডে প্রকাণ্ড এক পাঁচতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে থাকতেন। মোটের ওপর চলছিল ভালো, কিন্তু গোলমাল বাধালে একছড়া প্রকাণ্ড মোটা সেকেলে সোনার বিছেহার।

সেদিন সকালে তখন সবে বিছানায় উঠে বসেছি হঠাৎ মামা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন,—এই দেখ, ঠিক যা ভেবেছি পেঁচাটা ঘুমোচ্ছে।

—কই মামা, ঘুমোচ্ছি কোথায় এই তো উঠে বসে আছি।

—তবে তো খুব কাজ করেছ। নে নে চল।

—কোথায়?

—শুনিসনি তোর পিসেমশায়ের বাড়ি যে ভীষণ চুরি হয়ে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ রে ভাল্লুক। চল শিগ্‌গির চল।

একবার মামার দোকানের একটা মুক্তোর মালা চুরির চোর ধরার সাহায্য করেছিলাম বলে মামার কাছে আজও আমার খুব খাতির। আমার মামা জুয়েলার আর পিসেমশাই তেজারতি করেন, তাই ওঁদের দুজনের মধ্যেও খুব খাতির।

মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম—পথে যেতে যেতে মামা আমাকে চুরির সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন।

পিসেমশায়ের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে তেতলায় সম্প্রতি এক বেহারি ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেছেন। কালরাত্রে সেই ভদ্রলোক পিসেমশায়ের কাছে এসে বলেন—বাবুজি আমি নূতন কলকাতায় এসে টাকার অভাবে বড় বিপদে পড়ে গেছি, শুনলাম আপনি টাকা ধার দেন, তা আমার এই হারটা বাঁধা রেখে যদি আপনি পাঁচশো টাকা ধার দেন তো বড় উপকার হয়।

অবশ্য কথাগুলো সব হিন্দিতেই হয়েছিল। পিসেমশাই হারটা পরীক্ষা করে দেখলেন একেবারে পাকা সোনার দামি হার! তবু বললেন—আপনি কাল আমার দোকানে আসবেন—দিয়ে দেব।

তখন সে ভদ্রলোক বললেন—বাবুজি আমার হাতে একটাও পয়সা নেই, আজই যদি আপনি দেন তো বিশেষ উপকার হয়। এখন, সেদিন কি কারণে পিসেমশায়ের হাতে টাকা ছিল, তিনি হারটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেন। তারপরে হারটা তাঁর সেকেলে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে যথারীতি কাজটাজ সেরে তিনি শুয়ে পড়েন। লোহার সিন্দুকটা থাকত পিসিমার ঘরে, পিসিমা কিছুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। পিসেমশায়ের শোবার ঘর তার পাশে। সকালবেলা তিনি উঠে দেখেন পিসিমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খোলা। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়। উঠে এসে দেখেন সেকেলে লোহার সিন্দুকের ডালা ভাঙা পড়ে আছে, ভেতরে কিছু নেই। আর বারান্দা থেকে বাঁধা একটা লম্বা দড়ি নীচে মাটিতে ঝুলছে। সিন্দুকে আর কিছু বিশেষ ছিল না, কিছু টাকা আর সেই হারটা। সব উধাও। পিসেমশাই প্রথমে টেলিফোন করে মামাকে আনান, তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সব লিখেটিখে নিয়ে বলে যে, এই রকম সিন্দকু-ভাঙা চুরি কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো হয়েছে, কিন্তু চোরকে তারা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

এই তো গেল সংক্ষেপে ব্যাপার, তারপরেই মামা আমার কাছে আসেন। পিসেমশায়ের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ন'টা হবে। বাড়িতে ঢোকবার প্যাসেজের সামনেই রামসিং দারোয়ানের ঘর। ফ্ল্যাট হিসেবে ভাড়া দেওয়া কি-না তাই রামসিং বাড়ির তাঁবেদারি করে, আমাদের দেখে রামসিং বেরিয়ে এল। ইয়া তাগড়া লম্বা চেহারা বুক পেট সব সমান গোল আর মুখে বিশাল এক ঝাড়ুদারি গোঁফ। মামাকে দেখে রামসিং বলল—কি বাবুজি, ডাকু পাকড়াবার জন্যে কি এই খোঁখাবাবুকে নিয়ে এলেন নাকি?

মামা বললেন—হ্যাঁ।

রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে আমার কাঁধে তার বিশাল হাতটা বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে ধরে—তেমনি করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—খোঁখাবাবু পালোয়ান, ডাকু পাকড়কে লিয়ে আসবে।

রামসিং আবার হো হো করে হেসে উঠল। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল, তবু রামসিং-এর চোখে একটা অদ্ভুত লোভী আলো দেখে চুপ করে গেলাম। এরকম ব্যাপারে যত চুপ করে দেখা যায় ততই ভালো।

ওপরে গিয়ে দেখি পিসেমশাই একটা ইজি চেয়ারে উদাস হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখেই হাউমাউ করে উঠলেন—এই দেখ রসোগোল্লাটা এই সময় জ্বালাতে এসেছে, আমি মরছি আর এখন হল ওর মজা দেখবার সময়! ওরে উঃ আমার বুক কেমন করছে!

মামা বললেন—ওরকম করছো কেন? চুপ করো।

—চুপ করব? আমার মান-সম্মান সব গেল। দেওনারায়ণের কাছে মুখ দেখাব কী করে!

দেওনারায়ণ সেই বেহারি ভদ্রলোকের নাম।

মামা বললেন—কী আর হয়েছে, নাহয় টাকাটা তুমি দিয়ে দেবে—

অ্যাঁ! ওরে বাবা হা—জা—র টাকা! পিসেমশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে আমার বুক কেমন করছে, বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে। ওরে রসোগোল্লা ডাক্তার ডাক।

আমি মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বললেন—যা রে শুট্‌কি মাছ তোর মেসোমশাইকে একবার খবর দে।

মেসোমশাই আত্মীয়দের সকলেরই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ন—ভিজিটটা বেঁচে যায় কি-না!

একটু পরে দুমদাম করে এসে মেসোমশাই ঘরে ঢুকলেন, কাঁধে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আমরা তো অবাক! জিগ্যেস করলাম—ওতে কী মেসোমশাই?

—কমলালেবু।

—কমলালেবু কী হবে?

—উঃ উঃ কী বোকা! নে! কমলালেবু কী হয়? নে নে একটা খেয়ে দেখ কী হয়।

—তা তো জানি, কিন্তু নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন। এর মানে কী? ওগুলো পিসেমশায়ের জন্য বুঝি?

—অ্যাঁ? না, না, বুকের ব্যামো। ও লেবু খাবে কি? আর নীচে গাড়িতে রেখে আসার কি জো আছে? ড্রাইভারটা যদি খেয়ে নেয়?

ভেবে দেখ তোমরা, প্রকাণ্ড মাস্টার বুইকে যিনি ঘুরে বেড়ান তাঁর ভয় একটা লেবু যদি ড্রাইভার খেয়ে নেয়। আবার জিগ্যেস করলাম—

—তা লেবু খেলে তো শুনেছি হার্ট শক্ত হয়, পিসেমশায়ের বেলা কি সে নিয়ম খাটে না?

—অ্যাঁ? আচ্ছা দে আধখানা।

তারপরে পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন—এইবার বলতো টেঁশুরাম কেমন আছো?

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—টেঁশুরাম কাকে বলছো?

—কেন তোমাকে! আমি ভেবে দেখলাম ওই নামটাই তোমার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার মানায়। একেবারে খাপে খাপ বসে যায়, কি বলিস রে হরির লুঠ?—আমার দিকে ফিরে মেসোমশাই বললেন।

আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। পিসেমশাই তখন উঠে বসেছেন, তাঁর বুকের ব্যথা কখন ভালো হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—আমি টেঁশুরাম? তা হলে তুমি—তুমি একটা (পিসেমশাই খুঁজতে লাগলেন).....তুমি একটা রসোগোল্লা!

—খামোখা কেন রাগ করছো? মেসোমশাই বললেন। তারপরে মামার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা তুমি বলো গদাধর।

—গদাধর কাকে বলছো? —বাজখাঁই গলায় উত্তর এল।

—কেন তোমাকে। ওটা তোমার নাদাপেটের সঙ্গে যা মানায়—

—চমৎকার!

—কি? কী বললে আমার নাদা পেট?

তারপরে যা কাণ্ড শুরু হল ঘরের ভেতর, সে আর বলবার নয়। কাকে রেখে কাকে সামলাই? ঘরের ভেতর যেন কথার কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। আমি শেষে চটেমটে বললাম—তোমরা তা হলে এই করতে থাক, আমি চললাম।

রাগ করে পথে নেমে এলাম। তিনজন বয়স্ক লোক—তাঁদের একী কাণ্ড! সকাল বেলাটাই আমার নষ্ট হল দেখছি। হঠাৎ পেছন থেকে পিসেমশায়ের চিৎকার শুনলাম—এই রসোগোল্লা!

সঙ্গে সঙ্গেই মেসোমশায়ের ডাক—হরির লুঠ! দেখি সামনের বারান্দায় পিসেমশাই আর মেসোমশাই দুজনেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন।

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

কি আর করি—ফিরলাম। কিন্তু একী বিপদ! আমার পেছু পেছু এত লোক আসে কেন? দেখতে দেখতে পথটা লোকে ভরে গেল আর সবাই পিসেমশায়ের বাড়ির সামনে এসে জড় হল। একজন হেঁকে বলল—কই মশাই রসোগোল্লা হরির লুঠ কোথায়?

পিসেমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন—না সে আপনাদের নয় মশাই ওই ওকে!

—কেন আমরা বুঝি খেতে জানি না? হরির লুঠ দেবেন তার আবার একে ওকে কি?

মেসোমশাই আমাকে ডাকলেন—এই হরির লুঠ।

—কই মশাই কই? শুধু শুধু লোককে মিথ্যে কথা বলেন কেন?

—আপনাদের বলছি না মশাই।

—বলছেন না কি রকম, হরির লুঠ বলে আকাশ ফাটিয়ে ফেলেছেন আর আসলে শূন্য?

কতক্ষণ এরকম চলত বলা যায় না। কিন্তু সব থেকে বাঁচালেন মামা, আমার ওপর মামার জীবজগতের জ্ঞান-প্রয়োগ এতদিনে দেখলাম সার্থক হল। মামা হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমাকে হেঁকে বললেন—এই ডালকুত্তা তেড়ে যা না, হাঁ করে দেখছিস কী?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল—অ্যাঁ, ডালকুত্তা? তারপরেই সব হাওয়া।

ওপরে এসে বললাম—তোমরা কি সারাদিন আজ এই করবে না চুরির ব্যাপার কিছু বলবে?

মামা বললে—ব্যাপার আর কী বলবার আছে? একটা চোর দড়ি বেয়ে এই বারান্দায় উঠেছে, কোন যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে তারপরে সিন্দুক ভেঙে লোপাট।

পিসেমশাই শুধু একবার হাউ-মাউ করে উঠল।

আমি বললাম—যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে কী করে জানলেন?

—প্রথম, যে চোব সিন্দুক ভাঙতে পাবে সে দবজাও ভাঙতে পাবে; দ্বিতীয, দবজাব একটা নতুন বড কবে ছেঁদা কবা হযেছে।

—আচ্ছা পিসেমশাই আপনাব সেই ভদ্রলোক সেই হাবটাব কথা বা টাকাব কথা ওই বামসিং দাবোযানকে বলেছিল কিনা জানেন?

— না তা তো জানি না, তবে ডেকে জিগ্যেস কবতে পাবি।

—হ্যাঁ, করুন না একবাব।

দেওনাবাযণবাবুকে ডেকে আনা হল।

মামা বলল— এই প্যাঁচা কী জিগ্যেস কববি তুই কব।

আমি জিগ্যেস কবলাম—আচ্ছা, আপনি আপনাব হাবটা কি বামসিংকে দেখিযেছিলেন বা বন্ধকেব কথা বলেছিলেন?

ভদ্রলোক ফ্যাল-ফ্যাল কবে আমাব মুখেব দিকে চেযে বইলেন। পিসেমশাই বললেন—ও উনি আবাব ভালো বোঝেন না সব। আচ্ছা আমি জিগ্যেস কবছি।

অনেকক্ষণ ইকডি মিকডি কবাব পব জানা গেল হাবটাব কথা দেওনাবাযণবাবু বামসিংকে বলেওছিলেন দেখিযেওছিলেন এবং বন্ধক দিযে যে টাকা নিযেছিলেন সেকথাও বলেছিলেন। এক দেশেব আব এক ভাষাব লোকেব কাছে অত লুকোচুবি কববাব দবকাব মনে কবেন নি।

দেওনাবাযণবাবু চলে গেলে মামা বলল— বামসিং এব কথা জিগ্যেস কবছিস কেন?

আমি বললাম—হাবটাব কথা দুজন লোকেব মোটে জানবাব কথা, এক দেওনাবাযণ, দুই পিসেমশাই— তৃতীয যদি কেউ জানে তাহলে সন্দেহটা তাব ওপব পডে। এখন এটা সাধাবণ চোবেব কাজ নয, কাবণ ঠিক হাবটা যেদিন বাখা হল চুবিও সেদিনই হল। এব মধ্যে একটা যোগাযোগ বযেছে। এ কোনও জানা চোবেব কাজ।

পিসেমশাই লাফিযে উঠলেন—ঠিক হযেছে। নিশ্চয ওই ব্যাটা বামসিং নিযেছে। আমাব এখানে যে আব কিছু থাকে না, সব দোকানে থাকে ও জানে। কাল শুনেছে হাবটা ওখানে বেখেছি, ব্যাটা দডি বেঁধে ওপবে উঠেছে তাবপব দবজা কেটে সিন্দুক ভেঙে চুবি কবেছে। দাঁডাও দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।

— দাডান দাঁডান পিসেমশাই— এখন নয।

— কেন?

—আগে ভালো কবে দেখা যাক। চলুন তো বাবান্দাটা একবাব দেখা যাক।

বাবান্দায এসে আমি বললাম—দডিটা কোথায় গেল?

—পুলিশে নিয়ে গেছে।

—দডিটা কোথায বাঁধা ছিল?

মামা আব পিসেমশাই দেখিযে দিলেন, মেসোমশাই দাঁডিযে দাঁডিযে লেবু খেতে লাগলেন।

বাড়িটা প্রকাণ্ড লম্বা—সামনেব দু সাব ছোট ছোট ব্যালকনি ওপবে উঠে গিযেছে, আমাব মাথাব ওপব আমাদেব মতোই ব্যালকনি আবও চাবটে ওপবে উঠে গেছে। ব্যালকনিগুলো ঢালাই কবা, তাব ওপব বালিব কাজ। দেখলাম যেখানে দডিটা বাঁধা ছিল বলে ওঁবা দেখিযে দিলেন সেখানে কোন দাগ নেই —চুনবালিব ওপব কোনবকম দাগ পডেনি। একটু আশ্চর্য হযে গেলাম।

সেদিন আর কিছু হল না, চলে এলাম। মনটা চিন্তিত হয়ে রইল। পথে যেতে যেতে ভাবলাম একটা লোক দড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল অথচ রেলিং-এর চুনবালিতে কোন দাগ পড়ল না? লোকটা কি পাখির মত হাল্কা নাকি? লোকটা দড়ি বেঁধে তো উঠেও এসেছে। তাতে চুনের ওপর অনেক ঘষা লাগবার কথা। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা কথা মনে চমকে গেল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোর দড়ি বেঁধে ওপরে উঠে চুরি করেছে। বারান্দায় দড়িটা বাঁধা ছিল। কিন্তু চোর নীচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ি বাঁধল কী করে? চোরের তো আর পাখা থাকতে পারে না। আর থাকলে সে দড়ি ব্যবহার করবে কেন? হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!

সন্ধেবেলা আবার পিসেমশায়ের ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ি অন্ধকার কুপ কুপ করছে। সিঁড়ির মুখে রামসিংকে কারণ জিগ্যেস করলাম—এত অন্ধকার কেন? ডাকু পকড়নেকা সুবিস্তা হোগা আপকা খোঁখাবাবু—রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে বলল—নেই খোঁখাবাবু বিজলি লাইন ফিউজ হো গিয়া, মিস্ত্রি আতা হ্যায়।

আর কিছু না বলে ওপরে উঠতে লাগলাম। হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে লাগল ঠোক্কর কার সঙ্গে। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—কি মশাই দেখতে পান না? অন্ধ নাকি?

একটা কড়া জবাব দিতে যাব হঠাৎ লোকটা প্রায় ছুটে নেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কে লোকটা, অমন করে পালাল কেন? তাড়াতাড়ি পিসেমশায়ের ঘরে ঢুকতেই পিসেমশাই বলে উঠলেন—কি রে রসোগোল্লা, কী মনে করে?

দাঁড়ান, বলে বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ি থেকে দেওনারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা একবার সন্দিগ্ধভাবে উপরে তাকাল, তারপরে হনহন করে পা চালিয়ে দিলে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ওর সঙ্গেই যে আমার ধাক্কা লেগেছিল এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ও নাকি বাংলা জানে না? এ-লুকোচুরির মানে কী? প্রথমত ও মিথ্যে কথা বলেছে বাংলা জানে না বলে, দ্বিতীয়ত বাংলা বলে ফেলে ও ওরকম লুকিয়ে পালাতে চাচ্ছে—এর মানে কী? আর হঠাৎ সত্যিটা মনে চমক দিয়ে গেল।

হারটার কথা তিনজন জানত। পিসেমশাই, দেওনারায়ণ আর রামসিং। এখন রামসিং নীচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ি বাঁধতে পারে না। পিসেমশায়কে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তা হলে থাকে দেওনারায়ণ। সে তার বারান্দা থেকে দড়ি বেঁধে নেমে এসে হারটা চুরি করেছে তারপরে ওঠবার সময় দড়ির নীচের দিকটা পিসেমশায়ের বারান্দায় বেঁধে আবার ওপরে উঠে গেছে। তারপর নিজের বারান্দা থেকে দড়িটা খুলে একেবারে নীচে ফেলে দিয়েছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। তার দু'রকম লাভ—টাকাটাও হারটাও। আর তাই আমরা নীচের বারান্দায় কোনরকম দড়ির দাগ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে ভেতরে এলাম—পিসেমশাই আপনার থানার ইন্‌সপেক্টরের সঙ্গে ভাব আছে?

—কোন্ ইন্‌সপেক্টর?

—যে এই চুরির ভার নিয়েছে।

—না, তবে তোর মামার সঙ্গে তার ভাব আছে।

—তবে ডাকুন মামাকে।

আধঘণ্টা পরে মামা এসে বলল—কি রে গোরু আবার কী খেয়াল?

—মামা ইন্‌সপেক্টরকে একটা খবর দিতে হবে। খবরটা ঠিক কি-না জানি না, তবে মনে হয় আমার সন্দেহ ঠিক।

—খবরটা কী ?

পিসেমশাই বললেন—রসোগোল্লা।

—অ্যাঁ, রসোগোল্লা ? সে আবার কী ?

আঃ তোমরা আবার শুরু করো না—আমি বললাম, দাঁড়াও সব বলছি।

সেই রাতেই ইন্‌সপেক্‌টর বিজয়লালবাবু এসে দেওনারায়ণকে বললেন, বাবুজি আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার আসতে পারি ?

—জরুর, দেওনারায়ণ জবাব দেয়।

আমরা বিজয়লালবাবুর পেছনে ভিতরে যাই এবং কোন কথা না বলে একেবারে বারান্দায় গিয়ে হাজির হই। বেশি খুঁজতে হয় না, বারান্দায় চুনবালির রেলিং-এর হাতলে, গোল করে কাটা দাগ। বিজয়লালবাবু হেসে ওঠেন, তারপরে আমাকে বলেন—শাবাশ ভায়া! ওই দড়ির দাগ, ওইখান দিয়ে ও নীচে নেমেছিল।

পিসেমশায় লাফিয়ে ওঠেন—উঃ উঃ সাহস দেখেছ! হতভাগাকে জেলে দেব, হতভাগা একটা...একটা...রসোগোল্লা! আমরা ভেতরে আসি আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—দেওনারায়ণ কোথায় ?

—অ্যাঁ, পিসেমশাই বলেন।

- পালিয়েছে। বললে মামা।

বিজয়লালবাবু হাসেন—এইটাই হল বোঝার উপর শাকের আঁটি। লোকটা চালাক হয়েও বোকা, ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে, ওর ওই পালানোটাই ওর বিরুদ্ধে শেষ প্রমাণ। তবে বাছাধনকে যেতে হবে না বেশি দূর। নীচে আমার লোক এমনই সাধারণ পোশাকে খাড়া আছে, যতক্ষণ আমি ওপরে থাকব ততক্ষণ কেউ পালাতে পারবে না।

তারপরে ? আরও শুনতে চাও ? দেওনারায়ণ ধরা পড়ল, বামাল পাওয়া গেল। শুধু পিসেমশায়েরটা নয় আরও অনেকের। লোকটা বেহারি মোটেই নয়, একটা পাকা বাঙালি চোর। নানা জায়গায় নানারকম সেজে চুরি করেছে। সিন্দুক ভাঙায় লোকটা একেবারে পাকা। তারপরে তার দুঃখের কাহিনী আর নাই-বা শুনলে।

এসবের পর অনেকদিন কেটে গেছে। সেসব দিনগুলো আজকাল একেবারে স্বপ্নের মতো মনে ভেসে আসে, আবার স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যায়। স্মৃতির ওপর কিন্তু তাদের দাগ থেকে যায়, তাই স্মৃতির পাতা থেকে এক-একটা কাহিনী তোমাদের উপহার দিই। কী অদ্ভুত আমাদের এই চলে যাওয়া দিনগুলো!

ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিকাশরা কলকাতার লোক নয়, ঝাড়সুগুড়ায় থাকে। কলকাতা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। তা তার ঠাকুরদার আগে থেকেই থাকে। ঠাকুরদার বাবা এদিকে বিস্তর জমিজমা কিনেছিলেন। সব জমি যে ভালো ফল দিয়েছে, তা নয়, তবে সরকার কিছু জমি বছর চল্লিশ-পঞ্চাশ আগে কিনে নিয়েছেন। সেগুলো থেকে লাভ বেশ ভালো।

ঠাকুমাকে নিয়ে মাস-ছয়েকের জন্যে বিকাশ কাশীতে এসেছে। তিনি প্রায়ই বলেন, 'তাঁরা ছিলেন সেকালের লক্ষ্মীমন্ত লোক। আর তোরা এমন উড়নচণ্ডী হলি কী করে? কিছুতেই মন নেই। যা পাচ্ছিস তাই উড়িয়ে দিচ্ছিস। মধুপুরের বাড়িটা কিনতে না কিনতেই দিলি সেটাকে দু'হাজার টাকার কমে বিক্রি করে। এতে কার লাভ হল শুনি? আসলে মা-লক্ষ্মী ঘরে আসতে না আসতেই তোরা তাকে বিদেয় করে দিতে ব্যস্ত। আব তোর ঠাকুরদাকে দ্যাখ তো, যা ধরেছেন, তা-ই সোনা হয়ে গেছে। লোহা ধরতে না ধরতেই সোনা। দেখেই তো লোকে শেখে, তোরা কিছুই শিখলি না। আমি আর ক'দিন আছি। আমি চলে গেলেই বুঝবি বুড়ি ঠিক কথাই বলেছিল।'

সেদিনও ঠাকুমা এই কথাই বলছিলেন। বিকাশ বলল, "ঠাকুমা, অত রেগে যাচ্ছো কেন? আগে আমার কথাটা শোনো। একজন দক্ষিণের খুব বড়লোক, কালাহাঁড়ির বড় ব্যবসায়ী, দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের পছন্দ হয়ে গিয়েছে শুনলাম, ক'লাখ পাওয়া যাবে কে জানে!"

ঠাকুমা তাতে আরও রেগে গিয়ে বললেন, "ওসব ছেঁদো কথা রেখে দে, তার চেয়ে ঘরের কথায় আয়। পুজোর সময় যে কলকাতায় নিয়ে যাবি বলেছিলি, সে-কথা বল। এতদিনে বোধহয় থিয়েটারের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। শুনেছি তারাসুন্দরী নাকি তিনদিনের জন্য কলকাতায় আসবেন। আমার কপালে কি তাঁকে তিনদিন দেখা আছে?"

বিকাশ বলল, "নিরাশ হোযো না ঠাকুমা। ধৈর্য ধরে থাকলে সব হবে।"

ঠাকুমা বললেন, "তবে চ, সেই কথাই হোক। তিনদিন বক্সে বসিয়ে বেশ ভালো থিয়েটার দেখাবি কিন্তু। সেই...সেই জায়গাটা কী সুন্দর! যেখানে তারাসুন্দরী বলছেন, 'জনা চাহে। প্রতিবিধিৎসিতে।' সেই জায়গাটা যতবার দেখেছি, ততবার আমি আর চোখের জল রাখতে পারিনি। বিকাশ, তুই তো রেকর্ড শুনেছিস নিশ্চয়?"

বিকাশ বলল, "সে-সব রেকর্ড তো এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে, সেরকম ভালো আর বাজে না।"

ঠাকুমা বললেন, "খোঁজ করলে দেখবি এই বাড়িতেই এখনও হয়তো দুটো রেকর্ড পড়ে আছে, কেউই তো বাজায় না এখন। আয় দাদা, এই ছুটিতে আমরা দুটিতে গিয়ে

আবার জনা দেখে আসি।''

বিকাশ বলল, ''দুটিতে আবার কী করে হবে? দুটি-দুটি করে হলেও থিয়েটারকে দশজনের টিকিট দিতে হবে। অত টিকিট কি আর পাওয়া যাবে?''

ঠাকুমা একটু রেগে গিয়ে বললেন, ''আমাদের কাছ থেকে জমি কেনার সময় মনে ছিল না যে, এ-সব টিকিট আমরা চাইতে পারি? এখন ওসব ফ্যাচাং তুললে চলবে কেন? তার চেয়ে চল এক্ষুনি কর্তাকে কলকাতায় একটা চিঠি লিখে দিই। লেখা থাকবে: এই চিঠিকে টেলিগ্রাফ বলিয়া মনে করিবে। তোমার উত্তর পাইবার আগে আধসের রাবড়ি ও দুটি মর্তমান কলার ভোগ ছাড়া আর কিছু খাওয়া হইবে না। অত্র ভালো। তোমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত কী রকম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছি বুঝিতে পারিতেছ। পুনশ্চ: আকাশে বিকালে মাঝে-মাঝে মেঘ করিতেছে, কিন্তু ঝড়-জলের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহার উপর পাঁজিতে দেখিলাম দেবী এবার নৌকায় আসিবেন। কাশীকে নরককুণ্ড বলিলে পাপ হওয়া সম্ভব, কিন্তু এরকম নরককুণ্ড পৃথিবীতে আর আছে কি না জানা নাই। বাজারে এখনও ভালো করিয়া কপি উঠে নাই। জিনিসপত্রের অসম্ভব দাম বাড়িয়াছে। এসব দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করা যায় না, আর লিখিতে গেলেও পোস্টকার্ডে জায়গা হইবে না। যাই হোক্, সুখবর জানাইতে বিলম্ব করিও না। উত্তরের আশায় রহিলাম।''

এই চিঠি শুক্রবার ডাকে দেওয়া হয়েছিল। শনিবার এসে পৌঁছল কলকাতায়। সেদিন বিকেলেই বিলি হয়ে গেল। তখনকার ডাকবিভাগ আর-একটু তৎপর ছিল। চিঠিটা সন্ধের একটু আগে সুনীত মিত্র মশাইয়ের হাতে পৌঁছল। তখন আন্দাজ বিকেল পাঁচটা। তিনি বেরোচ্ছিলেন, চিঠিটা হাতে নিয়েই গাড়িতে উঠলেন। চিঠিটা দু'বার পড়লেন, তারপর ভাবলেন টিকিট যখন কিনতেই হবে, তখন একবার 'সুরঙ্গমা' থিয়েটার হয়ে যাওয়াই ভালো। তাঁর সঙ্গে নিমু নামে এক ছোকরা সবসময় থাকত। তিনি বললেন, ''ওহে নিমু, গাড়িটা তো একবার ঘোরাতে হচ্ছে, একবার থিয়েটারে যাব।''

নিমু বললে, ''এখন সেখানে গিয়ে কী করবেন স্যার! আজ তো থিয়েটারের দিন, সেখানে খুব ভিড় হয়েছে।''

কর্তা চটে গিয়ে বললেন, ''ভিড়ে আমার কী করবে? আমি তো আর থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি না। দেখি, আসছে সপ্তাহের টিকিট পাওয়া যায় কি না। গাড়িটা ঘোরা, অনেকদিন সুললিতকে দেখিনি। সুললিতের হাতে থিয়েটার কেমন সোনা হয়ে গেল দেখলি তো!''

থিয়েটার-বাড়িতে পৌঁছে কর্তা নামার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। চাদরটাকে গুছিয়ে বাঁ কাঁধে রাখলেন। এক পায়ের জুতো খোলা ছিল, সেটাকে পায়ে গলিয়ে সন্তর্পণে ফুটপাতে পা দিলেন। লবিতে খুব ভিড়, তাও ঠেলেঠুলে টিকিটঘরের দিকে এগোলেন। টিকিটবাবুকে বললেন, ''সুললিতবাবু এসেছেন?....ও এখনও আসেননি? আচ্ছা সে যাকগে। আসছে বৃহস্পতিবার আমাকে দশখানা টিকিট দিতে পারবেন সামনের সারিতে?''

টিকিটবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে জানালেন, হ্যাঁ, পারবেন। এই বলে ড্রয়ার থেকে টিকিটের বই বার করলেন।

এমন সময়, এক কাণ্ড ঘটে গেল। কর্তা কেবল পার্স বার করতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় পিস্তল ছোঁড়ার দুটি আওয়াজ হল। কর্ডাইটের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নিমু পড়তে গিয়েও সামলে নিলে, কিন্তু কর্তামশায় সেই যে মাটিতে পড়লেন, আর উঠলেন না।

টিকিট কাউন্টারের ভদ্রলোক উঠে এসে কর্তামশায়কে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্যাশ পাছে বে-হাত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় উঠতে পারলেন না।

আর-একজন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি থানার ছোটবাবু। সবেমাত্র অন্য পাড়া থেকে বদলি হয়ে এ-পাড়ায় এসেছেন। তাঁর কাজ ছিল পাড়ার লোকদের মুখ চিনে রাখা। আগে তিনি বড়তলা থানায় ছিলেন। তিনি হেঁকে বললেন, ''এই, ফারাক সে!'' তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে বললেন, ''কেউ কাছে আসবে না।'' এর মধ্যে কোথা থেকে পুলিশের কয়েকটা ভ্যান এসে দাঁড়াল। তখনকার মতো রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল, টিকিট বিক্রিরও ঘাটতি।

এর মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরের লোকেরা ভিতরে আসতে পারছে না বলে চেঁচাতে লাগল, এবং ভিতরের লোকেরাও বাইরে যেতে পারছে না বলে চেঁচামেচি শুরু করল। কর্মকর্তারা নোটিস টাঙিয়ে দিলেন 'অদ্য বিশেষ কারণে অভিনয় হইতে পারিল না। আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টায় যথারীতি অভিনয় হইবে। দর্শকদের সহানুভূতি কামনা করি। ত্রুটি মার্জনীয়।'

কলকাতায় সন্ধ্যা নেমে এল। সুনীত মিত্র মশাইয়ের গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, পুলিশের লোকেরা তার চারদিকে চক দিয়ে দাগ কেটে দিল, এবং থিয়েটারের কাছ থেকে লোকজনদের জটলা সরিয়ে দিতে লাগল। থেকে-থেকে ফ্ল্যাশ বালব জ্বলছে দেখে বাইরের লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বোম্বের সিনেমায় এই ধরনের দৃশ্য তো লোকে হামেশাই দেখছে, তাই তত কৌতূহল হল না। পরদিন কলকাতার সকালের কাগজে, খবর ছাপা হল: বিখ্যাত ধনকুবের সুনীত মিত্র অকস্মাৎ আততায়ীর গুলিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। আততায়ী, বলা বাহুল্য, তাহার কোনও পরিচয়ের চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।' খবরের কাগজে একদিন পরে আরও খবর বার হল। সুনীত মিত্র মশায় লেখাপড়ায় কী রকম ভালো ছিলেন, এবং অল্পবয়সেই স্কুলে সবাই পরীক্ষার ফল দেখে ধন্যধন্য করত, এইসব খবর।

সে-রাত্রে ট্রেন যখন মোগলসরাই ছেড়ে এল, তখনও ট্রেনের যাত্রীরা এ-খবর পাননি। ঠাকুমা এক ভাঁড় রাবড়ি আর দুটো মিষ্টি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, ''আমার আর কলকাতায় যাবার আগে খাবার রুচি হবে না।''

তাঁর নাতি বিকাশ লুচি, আলুর দম, চাটনি ও দুটো প্যাঁড়া খেল। তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসতে দেরি হল না। রাত্রে একবার স্বপ্নে দেখল, কর্তা তাকে বলছেন 'কী রে, কটা টিকিট চাই তোর? তার চেয়ে বরং থিয়েটারটাই কিনে নে, এতে লাভও হয় খুব।' বিকাশ টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখল, ভোর হবার ঘন্টা-দুয়েক বাকি আছে। বর্ধমানে ট্রেন এসে থামতে না থামতেই শুনতে পেল হকারবা হাঁকছে: গ্রে স্ট্রিটে দারুণ কাণ্ড! থিয়েটারে খুন। পুলিশ তো হয়রান হয়ে পড়েছে। এর উপরে যে খবর বেরিয়েছে, তার সঙ্গে পাঠকদের তো ইতিমধ্যে পরিচয় হয়েছে। ঠাকুমা বললেন, ''কী দেখছিস রে, বিকাশ? কাগজে কী বেরিয়েছে? ছবিটা যেন চেনা-চেনা লাগছে।'' বিকাশ তো স্তম্ভিত। কিন্তু তখনকার মতো ঠাকুমাকে সে কিছু বলল না।

এর মধ্যেই হাওড়ায় ট্রেন এসে দাঁড়াল। বিকাশের বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি, অনেক লোকজন সঙ্গে এসেছিল। স্টেশনে সাদা কাপড় পড়া কয়েকজন পুলিশের লোকও ছিল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বিকাশ কলেজে পড়েছে। সে বিকাশকে বলল, ''তুই চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। আমি আপিসে আছি। তোর কাছ থেকে খবর নেব।''

ঘন্টা-দুয়েক পরে বিকাশ এসে দেখল ইনসপেকটর নাড়ুগোপাল শিকদার টেবিলে বসে আছে। সামনে আরও দু'জন লোক। তাদের সে তখন ভাগিয়ে দিল। নাড়ুগোপাল বলল, ''চল্, পাশের ঘরে গিয়ে বসি। সব কথা তোর মুখ থেকে শুনি আগে। তোর ঠাকুরদা

কি আগে থেকে হুমকি-টুমকি পেয়েছিলেন কিছু? লোক তো ভালোই ছিলেন, দান-ধ্যানও ছিল শুনেছি।''

বিকাশ বলল, ''সে-সব ভাই আমি কিছু বলতে পারব না। কী থেকে যে কী হয়ে গেল!''

এর মধ্যে একটা ঘন্টির আওয়াজ হল। নাড়ুগোপাল বলল, ''এই রে, বড়বাবুর তলব পড়েছে। এখন তো উঠলাম, বিকেলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পুরনো বইয়ের দোকানগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করিস, দেখা হয়ে যাবে। আর যদি না হয়, তা হলে বুঝবি আটকা পড়েছি। পুলিশের কাজ তো, কিছুই ঠিক নেই। আমি পরে তোর সঙ্গে দেখা করব।''

বিকাশ বলল, ''তা হলে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই। যত কম লোকের চোখে পড়ি ততই মঙ্গল।''

নাড়ুগোপাল বলল, ''সেই ভালো, এখানকার সবই তো তুই চিনিস্।''

বিকাশের সামনে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাকে দেখে হঠাৎ কেন যেন তার নিজের কথা মনে হল। কিন্তু তার কাছে যাবার আগেই সে ডান দিকে ঘুরে ঈশ্বর মিল লেনে ঢুকে গেল। বিকাশ কিছুদূর লোকটিকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর মিল লেন যেখানে বড় রাস্তার গলিতে এসে মিশেছে, সেখানে এসে আটকে যাওয়া বিচিত্র নয়, তার সামনে মোটরগাড়ি, পিছনে বয়েলের গাড়ি। আটকে তো যাবেই। বিকাশ মনে-মনে ভাবল, এত বাধা পড়লে আমি তো কোন ছার, শার্লক হোমসও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতেন না। অনুসরণের চেষ্টা করে আর লাভ নেই।

পরদিন সকাল সাতটায় চা খেতে বসে বিকাশ শুনল, তার ফোন এসেছে। ফোনে নাড়ুগোপালেব গলা। নাড়ুগোপাল বলল, ''শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।''

''আপিসে আসব?''

''না, আপিসে আসার দরকার নেই। আমি তো কাল যেতে পারিনি। তুই আজ সন্ধ্যা ছ'টায় আবার আয় প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বইয়ের দোকানে।''

বিকাশ বলল, ''তাই হবে।''

সেপ্টেম্বর মাস, দিনের আলো তাড়াতাড়ি চলে যায়। রাস্তার আলো কোনওদিন জ্বলে, কোনওদিন জ্বলে না। সেদিন জ্বলেছিল। ওরা দু'জনেই এক চক্কর ঘুরে নিয়ে গোলদিঘির সামনে গিয়ে বসল। বেঞ্চিতে আর-এক ভদ্রলোক বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন। এই আগন্তুকদের দেখে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বিরক্তমুখে উঠে গেলেন। নাড়ুগোপাল বলল, ''বিকাশ, তোর যে একজন ভাই আছে, সে-কথা তো কখনও বলিসনি?''

বিকাশ বলল, ''দেবুর কথা বলছিস তো? সে আমার আপন ভাই নয়, সেজন্য বলিনি। আর আমাদের কোনও দেখাসাক্ষাৎও নেই। তার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। ও বাইরে-বাইরে থাকে। ঠাকুরদারা ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তা যদি বলিস, উনিও তো আমার আপন ঠাকুমা নন। ছেলেবেলায় আমার বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন; ওঁরাই মানুষ করেছেন। রক্তের সম্পর্ক যে বিশেষ আছে, তা নয়। মানুষ আর হলাম কোথায়, বড় হয়েছি মাত্র।''

নাড়ুগোপাল বলল, ''তুই উইলের কথা কিছু জানিস?''

বিকাশ বলল, ''দাদুর বাবা অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ মরবার আগে একটা উইল করে গিয়েছিলেন। তার একটা শর্ত: তাঁর ছেলে অর্থাৎ আমার ঠাকুরদার মৃত্যু হলে সম্পত্তি ঠাকুমা পাবেন। কিন্তু তিনি কিছু বিক্রি করতে পারবেন না। দু'জনের মৃত্যু হলে সমস্ত

সম্পত্তি একটা হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া হবে। দেবু শুনলাম অন্য একটা উইল বার করে বলছে, ওটা জাল। আসল উইলে নাকি আছে কর্তার মৃত্যু হলে সম্পত্তির আট আনা দেবু পাবে। বাকি আট আনা ঠাকুমা তাঁর জীবদ্দশায় ভোগ করবেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তুই এসব কথা জানলি কী করে?''

নাড়ুগোপাল সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, ''পুলিশের চোখ সব জায়গায় ঘোরে তা তো তুই জানিস্, তাদের হাতও খুব লম্বা।''

বিকাশ বলল; ''দেবু এখন কলকাতায় এসেছে; আমাদের সঙ্গে একই বাড়িতে উঠেছে।''

''তোর ঠাকুমার রি-অ্যাকশন কী হল?''

''রি-অ্যাকশন আর কী হবে। ঠাকুমা তো তাকে দেখলেনই পনেরো বছর পরে। প্রথমটা কান্নাকাটি করলেন খুব। দেবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেবু, এই দ্যাখ্, আমাদের কী সর্বনাশ হয়ে গেল।' এই বলে ঠাকুমাও যত কাঁদেন, দেবুও তত কাঁদে।''

''তুই কী করলি?''

''আমি আর কী করব। ছেলেরা হাউ-হাউ করে কাঁদলে আমার কীরকম খারাপ লাগে। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।''

নাড়ুগোপাল বলল, ''তা বেশ করেছিস। এদিকে আমার মাথাতেও একটা প্ল্যান এসেছে।''

বিকাশ বলল, ''তোর প্ল্যানটা একবার শুনি। আমি কিন্তু দাড়ি, গোঁফ, পরচুলা পরতে পারব না। থিয়েটারের উপর আমার চিরকালের বিতৃষ্ণা।''

''না, না, তোকে সে-সব কিছুই করতে হবে না। পাউডার পর্যন্ত মাখতে হবে না, যদি না তুই নিজে চাস। আমরা পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় হোটেলে একদিন লাঞ্চ খেতে ঢুকব। কবে দেবুকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে, পুলিশই তোকে সে-খবর দেবে। শুধু একটু ঘুরতে হতে পারে, এই যা। আমরা সামান্য পিছনে বসব। তুই শুধু ভালো করে দেখবি, সে তোদের দেবু কি না। তার দু-একদিন পরেই হয়তো পুলিশের রিপোর্ট এসে যাবে।''

বিকাশ বলল, ''ভালো জায়গায় যদি খাওয়াস, আমার আপত্তি নেই। পার্ক স্ট্রিট হলে কী হবে, সব জায়গায় রান্না কিন্তু ভালো নয়।''

নাড়ুগোপাল বলল, ''সে তোকে ভাবতে হবে না। ভালো জায়গাতেই নিয়ে যাব। তোর চোখ কেমন, সে-কথা বল। চিনতে পারবি কি না বল।''

বিকাশ বলল, ''চিনতে পারব বলেই তো মনে হচ্ছে।''

যাই হোক, দিন-পাঁচেক পরে দিন ঠিক হল। পার্ক স্ট্রিটের একটা নামকরা হোটেলে দেবুর টেবিলের দু'সারি পিছনে এসে টেবিল বুক করা হয়েছে। দরজার সামনের টেবিলে সাদা পোশাকে দু'জন পুলিশ স্প্যাগেটি খাচ্ছে। স্প্যাগেটি কী জিনিস তারা আগে জানত না। তাদের ব্যাজার মুখ দেখে মনে হল খাওয়া তাদের পছন্দ হয়নি। দেবু এসে প্রথমে ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ নিল। সেটা শেষ করে স্মাক্‌ড হিলশা নিল। পিছনে বিকাশরা তো অত খরচ করতে পারবে না। তারা লেমন স্কোয়াশ উইদাউট সুগার ও মাছভাজা নিয়ে বসল। যতক্ষণ পারে ওরা বসে রইল এবং যাকে তাদের 'আসামি' মনে হচ্ছিল, তাকে দেখতে লাগল। আসামি উঠে যাবার পাঁচ-দশ মিনিট পরে তারা উঠল। সাদা পোশাক পরা লোক দুটিও আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, আসামি কোনদিকে গেল দেখতে। নাড়ুগোপাল বলল, ''কী রে, কিছু বুঝলি?''

বিকাশ বলল, ''বুঝলাম বলেই তো মনে হচ্ছে।''

নাড়ুগোপাল বলল, "তা হলে চল, একবার আপিসে যাই।"

এর দু'দিন পরে নাড়ুগোপাল বিকাশের কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি পেল যে, তার ঠাকুমা আগামী বুধবার সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কীর্তনের আসর বসাচ্ছেন। যদি নাড়ুগোপাল আসতে পারে, তা হলে খুব ভালো হয়; একটু কাজের ব্যাপারও আছে। পুনশ্চ করে লেখা আছে, 'তুই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসিস, যেমন সবাই আসে, কীর্তনের আসরে। ট্রাউজার বুশশার্ট পরে আসবি না।'

নাড়ুগোপাল দু-একবার ভাবল, তারপর যথাসময়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি ও উপরে একটি উড়ুনি চড়িয়ে বিকাশদের গ্রে স্ট্রিটের ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হল। রামচন্দ্র অধিকারী কীর্তন ভালোই করেন। সেদিনও খুব জমেছিল। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। তখন গান হচ্ছে 'বঁধুয়া চলে গেল যবে মধুপুরে...।' এমন সময় বিকাশ শুনল তার কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলছে, 'চলো, তোমাকে মধুপুরেই নিয়ে যাচ্ছি।' পিছন দিকে তাকিয়ে বিকাশ কোনও চেনা মুখ দেখতে পেল না, কেবল দেখল হাস্যমুখ পুরুষ্টু গোঁফওলা এক ভদ্রলোক সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

গানের এক কলি শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয় কলি আরম্ভ হচ্ছে এমন সময় কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'কেউ নড়বে না।' আর দু'জন লোক কোথা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেবুর হাত দুটো চেপে ধরল। দেবু চেঁচিয়ে বলল, "এ কী করছ তোমরা? আমি কে জানো? এর ফল পরে বুঝতে পারবে।"

নাড়ুগোপাল বলল, "খুব জানি। এতদিন ধরে তো তোমার খোঁজই নিয়েছি। তুমি জলন্ধরে কী করতে? তোমার কীসের ব্যবসা? সবই লেখা আছে পুলিশের খাতায়। এবার তুমি মধুপুরে চলো।" ঠাকুমা এতক্ষণ একটি ধারে চুপ করে বসে ছিলেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। নাড়ুগোপাল বলল, "গড় করি ঠাকুমা আপনাকে। কী করে চিনলেন আসামিকে?"

ঠাকুমা বললেন, "কেন চিনব না? তোমরা এত পুলিশের লোক হুলুস্থুল না করলে আগেই ধরে ফেলতাম।"

নাড়ুগোপাল বলল, "বলুন না তাও, শুনি।"

ঠাকুমা বললেন, "ছোটবেলায় আমাদের দেবু যখন কাঁদত, তখন সব সময় ওর একটা চোখে খুব জল পড়ত, আর-একটা চোখ ভিজত না। তা কীর্তন-গান শুনে এই দেবুর মায়াকান্না থেকেই ধরে ফেললাম যে, এ-দেবু সে-দেবু নয়। তোরা তো আজকাল ইংরেজি ইস্কুলে পড়িস, বাংলা কিছুই শিখলি না। তা না হলে সত্যেন দত্তর কবিতাটা মনে পড়ত: 'একটি চোখে কাঁদে যখন,/আর-একটা চোখ হাসতে থাকে'। আগেকার কথামতো তোদের ইশারা করলুম।"

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, "কী ইশারা ঠাকুমা?"

ঠাকুমা বললেন, "সেই যে বলেছিলাম, পাঁচটা এক টাকা নোট নয় কিন্তু, কাঁচা টাকা, একটা সিল্কের থলেতে পুরে কীর্তনিয়ার দিকে ছুড়ে দিলাম। সেই ঠুন শব্দ তো তোরা সবাই শুনেছিলি। নাড়ুগোপালকে তো আগেই বলা ছিল।"

নাড়ুগোপাল বলল, "আবার গড় হই ঠাকুমা, আপনি যা কাণ্ড দেখালেন।"

বিকাশ বলল, "ঠাকুমা, এইবার চলো, একটা থিয়েটার দেখে আসি।"

ঠাকুমা বললেন, "থিয়েটারের আর দরকার নেই। তোরা বাড়িতেই যা থিয়েটার দেখালি!"

বিড়ালের চোখ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বিড়ালের চোখ মানে সত্যি-সত্যিই কোন বিড়ালের চোখ নয়।

দুটি 'স্টোন' বা পাথর, যাকে বলা হয় 'ক্যাটস আই' বা বৈদুর্যমণি, এবং দেখতে যা অবিকল বিড়ালের চোখের মতোই, এ-কাহিনী তাকেই কেন্দ্র করে।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, এবং বৃষ্টি যে শিগগির থামবে, তার কোন লক্ষণই নেই। এক জায়গায় একবার যাবার ছিল, কিন্তু আপাতত যে সেটা সম্ভব হবে না, তা বুঝতে পেরেই বিরূপাক্ষ তার বসবার ঘরে তৃতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সবে একটা চার্মিনার ধরিয়েছে, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

এক জোড়া নয়, দুই জোড়া জুতোর শব্দ।

এক জোড়া জুতোর শব্দ বিরূপাক্ষর চেনা, অন্যটি ওঁর পরিচিত নয়, এবং জুতোর শব্দ থেকেই বিরূপাক্ষ বুঝতে পারে শিশিরের সঙ্গে কেউ আসছে। অন্য জুতোর শব্দটা ভারী নয়, হাল্কা, এবং একটু যেন থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। মনে হয়, দ্বিতীয় জন শিশিরকেই অনুসরণ করছে।

বিরূপাক্ষ ঘরের দরজার দিকেই তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই শিশিরের পিছনে পিছনে থলথলে ভারী চেহারার একজন ভদ্রলোক এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ওদের দিকে তাকাল বিরূপাক্ষ। ''কীরে শিশির, এই বৃষ্টি মাথায় করে...''

''আলাপ করিয়ে দিই। রামদাস আগরওয়ালা, বিরাট অয়েল মার্চেন্ট, আমার যে-বইটার এখন শুটিং চলছে, তার প্রডিউসার। আর মিঃ আগরওয়ালা, এই আমার বন্ধু বিরূপাক্ষ সেন। বসুন।'' কথাগুলো বলে শিশির একটা সোফায় বসল। আগরওয়ালাও বসল।

বিরূপাক্ষ একটাও কথা বলেনি এতক্ষণ। এবারে শিশিরের দিকে তাকিয়ে বললে, ''কিন্তু কেন এসেছিস এই বৃষ্টি মাথায় করে, তা তো কই বললি না।''

''ওঁর, মানে মিঃ আগরওয়ালার, দুটো অত্যন্ত দামি পাথর চুরি গিয়েছে, সেই ব্যাপারেই, মানে আমিই ওঁকে তোর কাছে নিয়ে এলাম বিরু—''

''দামি পাথর? কী, হীরা?''

''না, হীরা নয়।''

''তবে?''

''এ পেয়ার অব ক্যাটস্ আই.....দুটো ক্যাটস্ আই পাথর।''

''বৈদুর্যমণি!''

''কী বললি?''

''না বলছিলাম, ক্যাটস্ আই পাথরের এমন কী দাম?''

''সো বাত্ ঠিক বলিয়েসেন সেন সাব্।'' আগরওয়ালা এতক্ষণে কেমন যেন কর্কশ খ্যানখেনে গলায় প্রথম কথা বললে, ''দাম হীরার মতো নয় ঠিকই, কিন্তু ওই পাথর দুটোর দাম আমার কাছে লাখ টাকার চাইতেও বেশি।''

আগরওয়ালার কথা শুনে বিরূপাক্ষ বুঝতে পারে, হারানো ক্যাটস্ আই দুটো, দামের দিক দিয়ে ভয়ানক একটা কিছু মূল্যবান না হলেও, ওই পাথর দুটির পিছনে কোন একটা ইতিহাস আছে, যে-কারণে তার মূল্যও অনেক বেশিই ওই মানুষটির কাছে।

বিরূপাক্ষ তার চার্মিনারে একটা টান দিয়ে বললে, ''ব্যাপারটা একটু যদি খুলে বলেন, মানে ওই যে পাথর দুটোর দামের কথা বললেন—''

''কাকু—''

একটি বালকের কণ্ঠ শোনা গেল ঠিক ওই সময় দরজার গোড়া থেকে।

বিরূপাক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে ''আরে মিতুলবাবু যে, এসো, এসো।''

একমাথা ঝাঁকড়া চুল—বড় বড় দুটি দুষ্টুমি-ভরা চোখ, বছর আষ্টেক বয়সের একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে।

গায়ে একটা কলার তোলা মিকি মাউস আঁকা গেঞ্জি, পরনে একটা হাফপ্যান্ট, পায়ে চপ্পল, হাতে একটা খেলনা পিস্তল। গলায় কারে ঝোলানো একটা বাঁশি।

''দেখি, এ-দিকে এসো তো মিতুলবাবু। নিশ্চয়ই ভিজেছো।'' বিরূপাক্ষ সস্নেহে বলল।

মিতুল বললে, ''একটু একটু, বেশি নয়!''

''এই বৃষ্টির মধ্যে কেন বেরুলে?''

''বা রে, সেই বেড়ালের চোখের গল্পটা যে শেষ করলে না কাল।''

''বেড়ালের চোখ—বোস এই ভদ্রলোক একটা সত্যিকারের বেড়ালের চোখের গল্প আমাদের শোনাতে এসেছেন, বসে শোন,'' আগরওয়ালাকে দেখিয়ে বিরূপাক্ষ বললে।

আগরওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ''নেহি সেন সাব্, গপ্পো নয়—সাচ্ হামার ক্যাটস্ আই দুটো খোয়া গিয়েছে—''

''হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো আপনি একটু আগেই বললেন। বলুন তো এবার কী করে আপনার ক্যাটস আই দুটো খোয়া গেল।'' বিরূপাক্ষ শুধালো।

''খোয়া গিয়েছে, লেকিন কী করে যে খোয়া গেল সে তো হামিও জানে না সেন সাব্।''

''তা কোথায় ছিল ক্যাটস্ আই পাথর দুটো আপনার?''

''হামার ঘরে আয়রন সেফের মধ্যে একটা চন্দনের বাক্সোর মধ্যে। হামার দাদা মানে গ্র্যান্ডফাদার দৌলতরাম আগরওয়ালা জার্মানি থেকে একটা চমৎকার টয় এনেছিলেন, একটা ঠিক যেন জ্যান্ত বিল্লি, তার দুচোখে বসানো ছিল আস্লি অওর বহুৎ দামি দুটো ক্যাটস্ আই পাথর। অন্ধকারে জ্বলতো।''

''খেলনার চোখে আসল ক্যাটস্ আই পাথর? আশ্চর্য তো!''

''তাজ্জব কি বাতই বটে। আসলে ওই দুটো যে আসলি ক্যাটস্ আই পাথর ছিল, তাও আমার দাদা জানতেন না। একটা খেলনার দোকানে ওই খেলার বিল্লিটা দেখে

তাঁর পসন্দ হওয়ায় পঞ্চাশ মার্ক দিয়ে খেলনাটা নিয়ে আসেন কিনে।''

''তারপর ?''

''পাথর দুটো যে আসলি পাথর, ক্যাটস্ আই, তা জানতে পারলেন এদেশে আসার পর। আমি তখন ছোট, বয়স ধরুন সাত-আট হবে। টয়টা এনে দাদা আমাকে দেন। একদিন ওই বিল্লিটা নিয়ে দাদার ঘরে বসে খেলছি, দাদার এক জানা জহুরি মৈনাক সরকার কী ব্যাপারে যেন দাদার কাছে আসেন। তিনিই আমার বিল্লিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, দেখি-দেখি বিল্লিটা। হামি অতশত জানি না, দিলাম বিল্লিটা তাঁর হাতে, তিনি পাথর দুটো দেখে বললেন দাদাকে, দৌলতরামজি, এ তো বড় তাজ্জব কি বাত—এ দুটো দেখছি আসল এবং অনেক দামি ক্যাটস্ আই পাথর।

''দাদা তো তাঁর কথা শুনে অবাক। বললেন, সাচ্?''

''জি হ্যাঁ—ওই পাথর দুটো বেচবেন ?''

''কৌতুক করে দৌলতরামজি বললেন, তুমি কিনবে ?''

''হ্যাঁ, যদি বেচেন।''

''তা কত দাম দেবে ?''

''পাঁচ হাজার—''

''বল কী মৈনাক ?''

''জি—বেচেন তো বলুন—''

''তারপর ?'' বিরূপাক্ষ শুধালো।

''দাদা রাজি হলেন না। এবং ওই ঘটনার মাস পাঁচ-ছয় বাদে দাদা দৌলতরামজিকে কে-বা কারা যেন হত্যা করল।''

''সে কী ?'' বিরূপাক্ষর কণ্ঠে বিস্ময়।

''জি হ্যাঁ। তাঁকে মৃত অবস্থায় তাঁর শোবার ঘরে পাওয়া যায়, বুকে ছোরা বেঁধানো ছিল। পুলিশ এল এনকোয়ারি হল, কিন্তু হত্যাকারী ধরা পড়ল না।''

''আর বিল্লিটা—''

''সেটা আমার পিতাজি—ঘনশ্যাম আগরওয়ালা আমার দাদাজির নির্দেশমত আমার কাছ থেকে নিয়ে সিন্দুকের মধ্যে একটা চন্দনবাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। বরাবর সেখানেই সেটা ছিল, পরশু হঠাৎ জানতে পারলাম—''

''কী ?''

বিল্লির দু চোখের কোটরে বসানো ক্যাটস্ আই দুটো আসল ক্যাটস্ আই নয়—নকল—দুটো ঝুটো পাথর। অথচ দিন পনের আগে মাত্র আসল ক্যাটস্ আই দুটোই বিল্লির চোখে বসানো ছিল দেখেছি—''

''তা আপনি বুঝলেন কী করে যে ওদুটো ঝুটা—নকল পাথর ?''

২

কথা বললে ওই সময় বিরূপাক্ষের প্রশ্নের জবাবে শিশিরই। বললে, ''উনি মানে এই রামদাস আগরওয়ালা অয়েল মার্চেন্ট হলেও জুয়েল্স্ নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন, এবং ওঁর নিজস্ব সংগ্রহে অনেক দামি দামি রেয়ার জুয়েল্স্ আছে। এটা ওঁর একটা হবি বিরূ।''

''আচ্ছা। তা—''

''তাছাড়া জুয়েল্স্ চিনবার ওঁর অসাধারণ ক্ষমতা থাকায়, বহু নামী এবং বড় বড় জুয়েলার অনেক সময় অনেক জুয়েল্স্ নিয়ে সেটা আসল না নকল সেটা যাচাই করতে

আসে।''

''আশ্চর্য হবি—বলতেই হবে।'' বিরূপাক্ষ বললে।

''ওই দুটো ক্যাটস্ আই যেমন করেই হোক সেনসাব্..হামার..টাকার জন্য পরোয়া করবেন না—পাথর দুটো হামাকে আপনি খুঁজে দিন—''

বিরূপাক্ষ কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে সে ধূমপান করতে থাকে। চার্মিনারের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বাইরে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে তখন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার আগরওয়ালার মিনতি ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ''সেন-সাব্ বলুন, কুছু বলুন!'' মিতুল ওই সময় হঠাৎ বলে উঠল, ''আগরওয়ালা সাহেব, কিছু ভাববেন না আপনি, ও কাকু ঠিক চোরকে ধরে দেবে! যাবে কোথায় চোর?''

বিরূপাক্ষ হেসে ফেলে, ''কিন্তু মিতুলবাবু, ব্যাপারটা সত্যিই কঠিন।''

''কিছু কঠিন না কাকু!''

''কঠিন নয় বলছ মিতুলবাবু?''

''না।''

''তা এ কথা তুমি বলছ কেন মিতুলবাবু?''

''বলব, তোমাকে আমি পরে বলব।'' গম্ভীরভাবে মিতুল বললে।

''তাই বলো। আচ্ছা মিঃ আগরওয়ালা...''

''বোলিয়ে সেন-সাব্!''

''পরশু মানে বিশ তারিখ এ-মাসের—জুলাইয়ের যদি হয় তো আপনি এ-মাসের পাঁচ তারিখে শেষ দেখেছিলেন পাথর দুটো ঠিক আছে? তাই তো?''

''জি হাঁ।''

''আচ্ছা ওই পাঁচ তারিখ ও বিশ তারিখের মধ্যে সিন্দুক আর খোলেননি আপনি?''

''না।''

''আপনার ঠিক স্মরণ আছে তো?''

''হাঁ, ঠিক স্মরণ আছে। ওই সিন্দুক তো আমি বেশি একটা খুলি না, কারণ—''

''কী?''

''টাকা পয়সা যা-কিছু হামার শোবার ঘরের একটা আয়রন-সেফেই থাকে, তাই দাদাজির ঘরের সিন্দুক আমার খোলবার বড় একটা দরকার হয় না।''

''তবে পাঁচ তারিখেই-বা ওই সিন্দুক খুলেছিলেন কেন? তারপর আবার বিশ তারিখেই-বা কেন খুলেছিলেন সিন্দুকটা?''

''ওই সিন্দুকটার মধ্যে আমার বহুত সব দামি দামি জুয়েল্স্গুলো থাকে। পাঁচ তারিখে একজন জানাশোনা জুয়েলার এসেছিল কিছু রেয়ার ক্যাটস্ আই পাথর নিয়ে, তখন তাকে রেয়ার দামি ক্যাটস্ আই পাথর দেখাবার জন্যই সেফ থেকে বিল্লির চোখ দুটো খুলে আমি নিচে নিয়ে যাই তারই বিশেষ অনুরোধে। তারপর—''

''বলুন—থামলেন কেন?''

''দেখিয়ে এনে পাথর দুটো আবার বিল্লির চোখের কোটরে বসিয়ে দিই।''

''হুঁ। তারপর পনের তারিখে—''

''একটা রেয়ার দামি রক্তমুখী নীলা-পাথর কিনেছিলাম, সেটা সেফে রাখতে এসেই হঠাৎ বিল্লির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মনটা খট্ করে ওঠায় পাথর দুটো হাতে নিয়ে এক পলক দেখেই চমকে উঠলাম—হায় রাম—এতো আস্‌লি ক্যাটস্ আই

নয়, ওরিজিন্যাল পাথর দুটো নয়, এ যে ঝুটা, নকলি! সেন সাব্, হামার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আজ দুদিন দুরাত ভেবে আমি পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে! এ কী করে সম্ভব হল? আস্‌লি ক্যাটস্ আই পাথর দুটোর বদলে ওই নকলি পাথরদুটো কোথা থেকে কেমন করে এল!''

''মিঃ আগরওয়ালা—''

''বোলিয়ে সেন সাব।'' আগরওয়ালার দুচোখের কোণে জল।

''পাঁচ তারিখে যিনি এসেছিলেন আপনার কাছে—''

''হ্যাঁ, ওই মৈনাক সরকারের ছেলে জুয়েলার লোটন সরকার—এসেছিলেন—''

''কেন এসেছিলেন তিনি?''

''ওদের দোকানে একজন জার্মান সাহেব-খরিদ্দার এসেছিলেন দুটো ক্যাটস্ আই পাথর কিনতে, কিন্তু লোটন সরকারের স্টকে যে-সব ক্যাটস্ আই ছিল সেগুলো সাহেবের পছন্দ হয় না। বলে লোটনকে, সে ঠিক যেরকম পাথর খুঁজছে সে-রকম পাথর সে ওইগুলোর মধ্যে পাচ্ছে না। ওগুলো নাকি সব ঝুটা পাথর। সে দশ বিশ যা লাগে দিতে রাজি, কিন্তু আস্‌লি মাল চাই। লোটন তখন সাহেবকে বলে পাথরগুলো কোনটাই ঝুটা নয়, এবং সেটা সে আমাকে দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে, বলে সে আমার পরিচয় দেয় সাহেবকে।''

''তারপর?''

''সাহেব ইন্টারেস্টেড হয়ে ওঠে এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে বলে। আমি যদি ঠিক আছে বলি তবে সে কিনবে। সেইমতো লোটন সরকার সাহেবকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি লোটনের পাথর থেকে দুটো বাছাই করে দিয়ে বলি, ওই দুটো সাহেব কিনতে পারে—''

''সাহেবের খুঁতখুতুনি কিন্তু তবু যায় না। সেই সময় লোটনই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে আপনার কাছে তো সেই পাথর দুটো আছে—দিন না বেচে—''

''আপনি কী বললেন?''

''বললাম, না। ও পাথর আমি বেচবো না লক্ষ টাকার বিনিময়েও।''

''লোটন তখন বলে, সাহেবকে পাথর দুটোর কথা বলব ভাবছিলাম।''

''আমি বললাম, না।''

''তারপর?''

''কিন্তু লোটন সরকার তার কথা রাখেনি, সাহেবকে পাথরদুটোর কথা বলে দিল। সাহেব তখন পাথর দুটো দেখতে চায়।''

''আর আপনি সিন্দুক থেকে এনে পাথরদুটো দেখান?'' বললে বিরূপাক্ষ।

''হ্যাঁ।''

'এবং সাহেব কিনতে চায় পাথরদুটো দেখেই, তাই কি?

।''

''মিঃ আগরওয়ালা, ওই দিনই, আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, আপনার অজ্ঞাতে কোন এক ফাঁকে আসল ক্যাটস্ আই দুটো বদল হয়ে গিয়েছে।''

''সিয়ারাম, কী বোলচেন আপনি সেন-সাব্?''

''তাই। আপনি টেরও পাননি। শুনুন, আপনি এক কাজ করুন...''

''কী?''

''কাল সকালের দিকে লোটন সরকারকে আপনার বাড়িতে আপনি ডেকে পাঠান।''

''ডেকে পাঠাব? কেন?''

''বলবেন, ক্যাটস্ আই দুটো আপনি বিক্রি করবেন স্থির করেছেন। এবং বদলে দুটো ক্যাটস্ আই আসলি কিনতে চান।''

''কিন্তু—''

''যা বলছি, তাই করুন। আমিও সেখানে উপস্থিত থাকব। অন্য এক জুয়েলারের ছদ্মবেশে।''

৩

ওদের বিদায় দিয়ে বিরূপাক্ষ মিতুলকে বললে, ''বেড়ালের চোখের গল্প শুনলে মিতুলবাবু?''

''ওতো সত্যি ঘটনা।'' মিতুল বললে, ''পাথরদুটো নিশ্চয়ই চুরি করেছে—''

''কে চুরি করেছে বলে তোমার মনে হয়?''

''ওই লোটন সরকার লোকটাই মনে হয়।''

''কেন?''

''জানি না, তবে আমার মনে হয় সে-ই ম্যাজিক করেছে।''

''তুমি ম্যাজিক করতে পারো তার মতো?''

''কীরকম করে করব?''

''আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো—তুমিও কাল সকালে আমার সঙ্গে যাবে।''

''সত্যি।''

''হ্যাঁ, বৃষ্টি এখন ধরেছে, এবারে বাড়ি যাও।''

''মিতুল চলে যাবার পর জামাটা গায়ে দিয়ে বিরূপাক্ষ বাড়ি থেকে বের হল তার— শিশিরের মতে—মান্ধাতা আমলের ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা নিয়ে।

প্রথমেই গেল জার্মান কনসুলেটে। সেখানকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল।

মিঃ রিবেনট্রপ বিরূপাক্ষকে দেখে বললেন, ''গুড্ মর্নিং মিঃ সেন, কী ব্যাপার, এই বৃষ্টির মধ্যে?''

''আপনি কিছুদিন আগে একজোড়া মূল্যবান হিস্টোরিক ক্যাটস্ আইয়ের কথা বলেছিলেন, মনে আছে?'' আপনাদের দেশের এক ধনীর প্রপার্টি ছিল সে-দুটো। আশ্চর্যজনকভাবে বছর পঁচিশ আগে খোয়া যায়, অনেক চেষ্টা করেও তার কোন কিনারা করতে পারা যায়নি এখনও।''

''হ্যাঁ।''

''আচ্ছা আপনি জানেন কী করে সে-দুটো খোয়া গিয়েছিল?''

''সে এক বিচিত্র এবং রহস্যজনক ব্যাপার মিঃ সেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের বছর চারেক পরে। এক খেয়ালি ধনীর জুয়েলস্ সংগ্রহের বাতিক ছিল। ওই রেয়ার ক্যাটস্ আই দুটো তিনি এক পারস্যের জুয়েলারের কাছ থেকে কিনে একটা টয় বেড়ালের চোখে পাথর দুটো বসিয়ে তাঁর সেফে রেখেছিলেন, হঠাৎ একদিন তিনি দেখতে পেলেন— ''

''পাথর দুটো চুরি গিয়েছে!''

''হ্যাঁ, কিন্তু কী করে যে বাড়ির মধ্যে থেকে চুরি গেল সেটাও আশ্চর্য! তাঁরা অনেক চেষ্টা করলেন পুলিশ ও ডিটেকটিভ দিয়ে, কিন্তু সে-দুটো আর পাওয়া গেল না, এখন

পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে এত বছর পরে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে মিঃ সেন—"

"মজার ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, সেই পরিবারেরই একটি ছেলে হঠাৎ যেন কী করে সংবাদ পায় যে সে-দুটো ইনডিয়াতে আছে, সে এখানে চলে আসে—"

"কবেকার কথা এটা?"

"এই তো মাস দুই হল তিনি এখানে এসেছেন পাথর দুটোর খোঁজে।"

"খোঁজ পেয়েছেন তিনি কিছু?"

"হ্যাঁ, কিন্তু যাঁর কাছে ক্যাটস্ আই দুটো ছিল, তিনি বলে দিয়েছেন, পাথর দুটো বিক্রি করবেন না লক্ষ টাকা দিলেও—"

"পাননি তিনি পাথর দুটো তাহলে আজও?"

"না, তবে যে বাঙালি জুয়েলার তাঁকে সেই ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন কিছুদিন অপেক্ষা করতে, যে-ভাবেই হোক ক্যাটস্ আই দুটো যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন, ছেলেটি তাই এখনও কলকাতাতেই আছেন।"

"কোন হোটেলে?"

একটা হোটেলের নাম করলেন কনসাল।

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল বিরূপাক্ষ।

কনসুলেট থেকে বের হয়ে বিরূপাক্ষ হোটেলে গেল।

নিজের ঘরেই ছিলেন জার্মান ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিরূপাক্ষ এক-সময় ঘর থেকে বের হয়ে এল।

বাড়িতে ফিরে আসার ঘণ্টা-দুই বাদে রামদাস ফোন করলেন বিরূপাক্ষকে। বললেন, "লোটন সরকারকে তিনি ফোন করেছিলেন, কিন্তু লোটন সরকার জানিয়েছে—"

"কী?"

"সাহেব নাকি আর কেনার ব্যাপারে ইনটারেসটেড নয়, এবং সে চলে গিয়েছে।"

"হুঁ। ঠিক আছে।" বিরূপাক্ষ বললে, "কাল আপনি ঠিক সকাল সাড়ে এগারটায় এলিট হোটেলের তিনতলায় ১৪৫ নং ঘরে আসুন—"

"কিন্তু—"

"যা বলছি তাই করবেন, মনে রাখবেন, যেন আসতে ভুল না হয়।" বিরূপাক্ষ ফোন রেখে দিল।

পরের দিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বিরূপাক্ষ মিতুলকে নিয়ে হোটেলে এল সেই জার্মান সাহেবের ঘরে। এক প্রৌঢ় মুসলমান জহুরির ছদ্মবেশে। এক মুখ দাড়ি, জোব্বা ও পায়জামা পরনে, মাথায় জালি ফেজ, চোখে চশমা। কী করতে হবে, জার্মান সাহেবকে সব বলে বিরূপাক্ষ মিতুলের দিকে তাকিয়ে ডাকল, "মিতুল..."

"কাকু—"

"তুমি ওই জার্মান সাহেবের ঘরে বসে শুধু দেখে যাবে, একটা কথাও বলবে না। বুঝেছো? আর যা বলেছি, তাই করবে?"

"হ্যাঁ।"

ঠিক পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট মতো লোটন সরকার এলেন না, এলেন অন্য-এক ভদ্রলোক। মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরনে দামি স্যুট।

জার্মান সাহেব বললেন, "আপনি? মিঃ সরকার এলেন না যে?"

ভাঙা ভাঙা গলায় আগন্তুক বললেন, ''হ্যাঁ তিনি আসেননি, কারণ আমিই ক্যাটস আই দুটো বেচবো, তিনি নন।''

''আপনি বেচবেন?'' জার্মান সাহেব বললেন।

''হ্যাঁ, পাথর দুটো আমার কাছেই আছে। কিন্তু দাম দিতে হবে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ক্যাশ।''

''সে তো কালই মিঃ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি রাজি আছি।''

''তবে টাকা বের করুন।''

''কিন্তু পাথরদুটো আমি একটু যাচাই করে নিতে চাই।''

''ভয় নেই, ঠিক পাথরই পাবেন।''

''সেটাই আমি এই জুয়েলারটিকে দিয়ে যাচাই করে নিতে চাই!''

''বেশ, দেখুন।'' আগন্তুক জামার বুক-পকেট থেকে পাথরদুটো বের করলেন।

বিরূপাক্ষ পাথরদুটো হাতে নিয়ে পকেট থেকে একটা লেন্স বের করে, ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করবার জন্য—হঠাৎ ওই সময় একটা বিড়াল ডেকে উঠলো মিঁযাও।

''আরে হোটেলের মধ্যে বিল্লি এল কোথা থেকে?''

আবার মিঁয়াও।

সামনের ঘর থেকেই আসছে বিড়ালের ডাকটা। সবাই ওই দিকে তাকায়।

সেই মুহূর্তেই বিরূপাক্ষ আসল ক্যাটস্ আই দুটোর সঙ্গে নকল দুটো ক্যাটস্ আই বদল করে বলে ''এটা তো ঝুটা পাথর।''

''ঝুটা? কী যা তা বলছেন!'' আগন্তুক চিৎকার করে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আগরওয়ালা এসে ঘরে ঢুকলেন।

বিরূপাক্ষ বললে, ''আসুন আসুন মিঃ আগরওয়াল! আপনার আসল ক্যাটস্ আই দুটো পাওয়া গিয়েছে।''

''গিয়েছে পাওয়া?''

''হ্যাঁ, সে-দুটো সেদিন এই লোটন সরকার আপনার বাড়িতে হাত-সাফাই করেছিল।'' বলে বিরূপাক্ষ এক হেঁচকা টানে আগন্তুকের মুখ থেকে দাড়ি খসিয়ে আনল।

মিতুল খিল খিল করে হেসে ওঠে, তারপরই ডেকে ওঠে—''মিঁয়াও।''

লোটন সরকার আধোবদন।

''মিঃ সরকার, আপনাদের বনেদী ফ্যামিলির একটা প্রেস্টিজ আছে, তাই আপনাকে এবারে ছেড়ে দিলাম।''

লোটন সরকার মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে যেন চোরের মতোই।

বিরূপাক্ষ পকেট থেকে তখন ক্যাটস্ আই দুটো বের করে মিঃ আগরওয়ালার হাতে দিতে দিতে বললে, মিঃ আগরওয়াল, একটা অনুরোধ করবো, যদি সম্ভব হয় এই জার্মান ভদ্রলোককে ক্যাটস্ আই দুটো বিক্রি করে দিন। নচেত কে জানে আবার হয়তো আপনাকে বিপদে পড়তে হবে ওই চোখদুটোর জন্য, হয়তো তাতে প্রাণহানিও ঘটতে পারে।''

পথে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশে উপবিষ্ট মিতুলের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, ''চমৎকার মিমিক্রি' হয়েছিল আজ মিতুলবাবু তোমার। লোটন সরকার একা নয়, সবাই আমরা তোমার বিড়ালের ডাক শুনে চমকে উঠেছিলাম এবং লোকটা ওই ভাবে চমকে না উঠলে আমি অত সহজে বোধ হয় হাত সাফাই করতে পারতাম না।''

বাঁ-হাত দিয়ে মিতুলের পিঠটা চাপড়ে দিল বিরূপাক্ষ।

সামান্য একটি পোস্টকার্ড

চিরঞ্জীব সেন

ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। রানিনগরের রাজার অবিলম্বে মোটা টাকার প্রয়োজন। সে টাকা এখনি জোগাড় করতে না পারলে বাজারে মানসম্ভ্রম সব ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। টাকা জোগাড় করতে হবে অত্যন্ত গোপনে, কেউ যেন জানতে না পারে, এমনকি কাক-পক্ষীতেও যেন টের না পায়, তা হলেই সর্বনাশ।

রাজার নিজস্ব পুঁজি নেই, জমিজায়গা সম্পত্তি সব আগেই অন্যত্র বাঁধা পড়েছে, নিজস্ব সোনাদানাও। এখন সম্বল জমিদারি এবং দেবোত্তর খাতে যেসব অলঙ্কার আর হিরে-জহরত আছে সেইগুলিই। সেইগুলি বন্ধক রেখে এখন টাকা ধাব করতে হবে। রাজা পলিটিক্যাল এজেন্টের মারফত ভারত সরকারকে না জানিয়ে ওইসব গহনা বা জহরত বন্ধক দিতে, বিক্রি বা দান করতে পারেন না; সেই জন্যই কাজটা গোপনে সারতে হবে।

ভাগ্যিস মাইকেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাই তো সে টাকার ব্যবস্থা করে দিল, এখন টাকাটা ঘরে এসে উঠলেই হয়।

মাইকেলের সঙ্গে রাজার আলাপ হয়েছিল কলকাতায় কোন এক হোটেলে। মাইকেলকে যেন সব লোকেই চেনে। বড় বড় দোকানদারেরা, হোয়াইটওয়ে লেডল, আর্মি নেভি স্টোর্স, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, হ্যামিলটন কোম্পানি, স্টুয়ার্ট কোম্পানি, সকলেই মাইকেলকে চেনে। মাইকেল বড় বড় খরিদ্দার জোগাড় করে আনে, তারা নগদে মোটা টাকার মাল কেনে। পরে এক সময়ে এসে মাইকেল অবিশ্যি তার কমিশনটা নিয়ে যায়। চোস্ত ছোকরা এই মাইকেল। দরকার হলে গভীর রাত্রে মাইকেল বাঘিনীর দুধও জোগাড় করে দিতে পারে, আর সামান্য কয়েক লাখ টাকার ব্যবস্থা সে করতে পারবে না?

রানিনগরের মহারাজার টেলিগ্রাম পেয়েই মাইকেল রানিনগরে গিয়ে পৌঁছল। স্টেশনে মহারাজার নিজস্ব মোটর অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভারের ওপর আদেশ ছিল মাইকেলকে সোজা লাইব্রেরিতে নিয়ে আসবে। মহারাজা অপেক্ষা করছিলেন। মাইকেল ঘরে ঢুকতেই মহারাজ বিপদের কথা বললেন। মাইকেল হেসে হেসেই অস্থির। বলল, বন্ধক দেবার গহনা যখন মজুত রয়েছে, তখন আবার টাকার ভাবনা কলকাতা শহরে! মহারাজা হুকুম করলে সে কী-না করতে পারে?

যাক, ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। মহারাজা মাইকেলের সঙ্গে দু'বাক্স ভর্তি সোনার গহনা আর হিরে-মুক্তো সেট-করা জড়োয়া গহনা দিলেন। সে-সবের মোট দাম পনেরো লক্ষ টাকা। বাক্স দুটি মাইকেলের সামনে সিল করা হল। তারপর মহারাজা বাক্স দুটি নিজস্ব দু'জন দেহরক্ষীর জিম্মায় দিলেন। তারা মাইকেলের সঙ্গে বাক্স দুটি নিয়ে কলকাতায় যাবে। মাইকেল তাদের হাতে দশ লক্ষ টাকা দিলে তারা বাক্স দুটি মাইকেলকে দিয়ে রানিনগরে ফিরে আসবে। এই দুজন দেহরক্ষী অত্যন্ত বিশ্বাসী। ধরা যাক, তাদের নাম রাম আর লক্ষ্মণ।

রাম আর লক্ষ্মণ আগে কখনও কলকাতায় আসেনি, এই প্রথম তাদের কলকাতা দর্শন। মাইকেল সাহেব তাদের এনে এক ফ্লাটে তুলল। শহরটা যেন আজব। এখানে সব কাজ যেন কলে হয়ে যাচ্ছে। লোকজন সকলেই ব্যস্ত, কেউ কারও খবর রাখবার সময় পায় না। মাইকেল সাহেব রাম-লক্ষ্মণের যত্নের ত্রুটি করলেন না, তাদের খাওয়া-শোয়ার যাতে কোনও কষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কলকাতার যা কিছু দেখবার সবই তাদের দেখালেন, কালীঘাটের কালীমন্দির, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথ মন্দির সবকিছু। কলকাতার ঘোর কাটতেই রাম-লক্ষ্মণের পাঁচ-সাত দিন কাটল। মাইকেলসাহেব তাদের টাকার কথা তুলতেই দিলেন না। আরও দুচার দিন কাটল। টাকার জন্যে তারা এবার মাইকেলকে একটু চাপ দিল। আরও দুদিন কাটল। রাম-লক্ষ্মণ এবার অধৈর্য হল, তারা মাইকেলকে এবার দু চারটে শক্ত শক্ত কথা বলল।

মাইকেলও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলল, দশ লাখ টাকা অত সহজে আসে না। আরও দু'দিন সবুর করতে হবে।

বেশ, দুদিন তারা সবুর করবে। দুদিন পরে টাকা না পেলে তারা বাক্স নিয়ে দেশে ফিরে যাবে।

দুদিন পার হল। টাকা পাওয়া গেল না। অতএব রাম-লক্ষ্মণ ঠিক করল যে, তারা বাক্স নিয়ে গিয়ে মালিককেই ফিরিয়ে দেবে, তিনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন। মাইকেলও আর আপত্তি করল না। তখন বাক্স বার করা হল। সিল যে ঠিক, মাইকেল তা তাদের দেখিয়ে দিল। তারা মালসমেত বাক্স ফিরে পেয়েছে, এই মর্মে মাইকেল সাহেব তাদের কাছ থেকে রসিদ লিখিয়ে নিল।

রাম আর লক্ষ্মণ একদিন বাক্স নিয়ে রানিনগরে ফিরে এল। মহারাজ অবশ্য আশ্বস্ত হলেন, সেই সঙ্গে নিরাশও। টাকার ব্যবস্থা তো হল না।

কী আর করা যাবে। দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠানো হল! সকলে মিলে দেখলেন, সিল ঠিক আছে, ভাঙাই হয়নি, এমনকি কেউ নাড়াচাড়া করেছে বলেও মনে হল না। তখন সিল ভাঙা হল, তালা খোলা হল, বাক্সের ডালা তোলা হল। হ্যাঁ, ভেলভেটের বাক্সগুলি ঠিক ঠিক সাজানো রয়েছে। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রাম-লক্ষ্মণের প্রশংসা হল। বাহাদুর বটে, চোর জোচ্চোরের আড্ডা থেকে তারা বাক্সগুলো তো অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে।

তাদের এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হল।

দেওয়ানজি কৌতূহলবশে একটা ভেলভেটের বাক্স তুলে নিয়ে খুললেন। একদম ফাঁকা। বাক্সে কিছু নেই। আরও একটা, আরও একটা, পর পর সব কটা বাক্সই খোলা হল

কিন্তু সব কটাই ফাঁকা। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। মহারাজ একেবারেই ভেঙে পড়লেন, তাঁর সব গেল। এখন ব্যাপারটা বড়লাটের কানে গেলে তাঁকে গদিচ্যুত হতে হবে। কল্পনায় তিনি দেখলেন রাস্তায় তিনি ভিক্ষা করছেন। তাঁর কী-ই বা যোগ্যতা আছে!

দেওয়ানজি সেই দিনই রাম আর লক্ষ্মণকে নিয়ে কলকাতা ছুটলেন। মাইকেলের ঠিকানাও কেউ জানে না। রাম-লক্ষ্মণ আগে কোনওদিন কলকাতায় আসেনি। কোন্ দিকেই বা ভবানীপুর আর কোন্ দিকেই বা শ্যামবাজার, সে ধারণাও তাদের নেই। তারা শুধু বলতে পারে একটা বড় বাড়ি, কাছেই পার্ক আছে, চৌমাথা দূরে নয়। রাস্তা দিয়ে ট্রামগাড়ি চলে। এমন জায়গা তো কলকাতায় অনেক আছে, কিন্তু সেই বিশেষ চৌমাথার কাছে পার্কটি কোথায়?

দেওয়ানজি যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই ফিরে এলেন একদিন। কলকাতার পুলিশকে পর্যন্ত ঘটনাটা জানালেন না।

শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা রানিনগরের পলিটিক্যাল এজেন্টের কানে উঠল। তিনি কালবিলম্ব না করে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিলেন। ভারত সরকার মহারাজাকে দোষী সাব্যস্ত করে চিঠি দিলেন, সেই সঙ্গে কলকাতার পুলিশকে একখানা কড়া টেলিগ্রাম পাঠালেন। কলকাতা পুলিশ কোনও কাজের নয়, তারা একেবারে অযোগ্য। এতবড় একটা জোচ্চোর কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এমন জোচ্চুরি সে আরও কত করেছে, কে জানে, তার সন্ধান কলকাতার পুলিশ জানে না? তাজ্জব ব্যাপার! অথচ এত বড জোচ্চুরিটা যে ঘটল তা কলকাতা পুলিশকে কেউ জানায়নি।

টেগার্টসাহেব তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তিনিও হয়তো ভাবলেন যে, তাঁর রাজত্বে জোচ্চোরেরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে সাহস করে কী করে!

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার বার্ডসাহেবকে তিনি তখনি ডেকে পাঠালেন। বার্ডকে বললেন, এখনি রবার্টসনকে নিয়ে এসো। তিনদিনের মধ্যে সেই জোচ্চোরকে ধরতে হবে। না পারলে..। কথাটা টেগার্টসাহেব শেষ করলেন না। বার্ড সাহেব যখন রবার্টসনকে টেগার্টসাহেবের কিড স্ট্রিটের বাড়িতে আনলেন তখন রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। শীতের শেষ রাত্রি, কনকনে শীত, হাওয়াও বইছে জোরে। রবার্টসন ও বার্ড শীতে যত না কাবু, উদ্বিগ্ন তার চেয়ে বেশি। অপরাধীকে যদি তাঁরা ধরতে না পারেন তাহলে অপদার্থ বলে তাঁদের কোনও জেলায় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট করে দেবেন কি না কে জানে?

টেগার্টসাহেব অবিশ্যি বিশেষ কিছু বললেন না বা বলতেও পারলেন না। শুধু একটি নাম 'মাইকেল', তা তার আসল নাম কি নকল নাম কে জানে? এই নামটিকে ভিত্তি করে পনেরো লাখ টাকার হিরে-জহরত-সোনা উদ্ধার করতে হবে।

অন্ধকার ঘর থেকে একটা ছুঁচ বের করা আরও সোজা। কিন্তু এই কথা ভেবে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না, দোষীকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বুক ফুলিয়ে অপকর্ম করে যাবে, তা তো চলতেই পারে না। কে জানে এতক্ষণে নতুন কি অপকর্ম করে সে বসে আছে, কিংবা হয়তো কলকাতা ছেড়ে নতুন শিকারের সন্ধানে বোম্বাই চলে গেছে। টেগার্টসাহেবের কড়া হুকুম, দোষীকে ধরতে না পারলে বার্ড আর রবার্টসন যেন লালবাজারে আর মুখ না দেখায়।

রবার্টসন মহা-সমস্যায় পড়লেন। যাই হোক, তিনি নিরুৎসাহ না হয়ে একটি সূত্র পেয়ে কড়েয়া অঞ্চলের কয়েকটি বাড়িতে খোঁজ করতে লাগলেন। সেখানে কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে একজন লোক বলল যে, অমুক জায়গায় অমুক লোকের বাড়িতে রানিনগর অঞ্চলের রাজারা যাওয়া-আসা করেন। রবার্টসন সেইটুকু তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেই বাড়ি হাজির হলেন। অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়লেন রবার্টসন, দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মাইকেল কোথায়? তাকে আমার এখনি দরকার।''

রবার্টসনকে মাইকেলের কোন ইয়ার মনে করে সে লোকটি বলল, মাসখানেকের মধ্যে সে মাইকেলকে দেখেনি। তবে ওয়েলেসলি স্ট্রিট আর কর্পোরেশন স্ট্রিটের (এখন নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) মোড়ে একটা ফ্ল্যাটে সে উঠে গেছে বলে শুনেছে।

রাত্রি তখন দশটা বেজে গেছে। রবার্টসন বার্ডসাহেবকে টেলিফোনে ডাকলেন। তারপরে দুজনে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে কর্পোরেশন স্ট্রিটের মোড়ে হাজির হলেন। সত্যিই সেখানে বেশ বড় একটা বাড়ি আছে, বাড়িটাতে ফ্ল্যাটও আছে অনেকগুলো। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, মাসখানেক আগে নতুন একজন সাহেব একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তিনি এখন ঘরেই আছেন।

দারোয়ান তাঁদের নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটটি দেখিয়ে দিল। দরজা বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিলেন রবার্টসন, কোনও সাড়া নেই। জোরে ধাক্কা দিলেন, তবুও কোনও সাড়া নেই। রবার্টসন দরজায় সবুট লাথি লাগালেন। আশ্চর্য। কেউ দরজা খুলল না। গোলমাল আর আওয়াজে অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বিরক্ত হয়ে পুলিশকে গালাগাল দিতে লাগল। দড়াম দড়াম করে আরও বেশ কয়েকটা লাথি লাগাবার পর একজন দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করল। দরজা ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবার্টসন আর বার্ড ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

যে দরজা খুলেছিল সে একজন পাঞ্জাবি, কিন্তু আর একজন খাটে শুয়েছিল, সে পুলিশকে দেখে উঠে দাঁড়াল। যেটুকু বর্ণনা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাতে বুঝলেন এই লোকটাই মাইকেল।

রবার্টসন বললেন, ''মাইকেল, তোমার খেলা শেষ হয়েছে, এবার আমাদের সঙ্গে শ্রীঘরে চল।''

মাইকেলের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল সে রবার্টসনসাহেবকে চিনতে পেরেছে এবং সে নিজে ধরা পড়ে গেছে। সে ভাঙল, কিন্তু মচকাল না। চিৎকার করে উঠল, ''কে তুমি? কী চাও? এত রাত্রে হল্লা করছ কেন!''

রবার্টসন আর বার্ড তাকে বেশি কথা বলবার সুযোগ দিলেন না। তাকে ও তার সঙ্গীকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এলেন।

লালবাজারে বার্ডসাহেব মাইকেলকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, ''রানিনগরের হিরে-জহরত কোথায় রেখেছ?''

মাইকেল বুঝল, সব ব্যাপারটা এখন অস্বীকার করা চলে না। সে উত্তর দিল, ''হ্যাঁ হিরে-জহরত বন্ধক রেখে মহারাজা টাকা তোলবার ভার তাকে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু টাকা জোগাড় হয়নি। মহারাজার লোকেরা বাক্সের সিল পরীক্ষা করে বাক্স ফিরিয়ে নিয়ে

গেছে। আমাকে তারা রসিদ দিয়ে গেছে যে, তারা মাল বুঝে পেয়েছে। তারপর মহাবাজা বা তার লোকেরা হিরে-জহরত নিয়ে কী করেছে, তা জানবার কথা আমার নয়।''

ঠিক। আইনত পুলিশ মাইকেলের কিছুই করতে পারে না। তবুও বার্ডসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ''রসিদ কোথায়?''

''রসিদ কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই নাকি? সে আমার ফ্ল্যাটে আছে।''

—''দেখাতে পারো?''

—''হ্যাঁ, পারি, চলো আমার ফ্ল্যাটে।''

বার্ড ও রবার্টসন মাইকেলকে নিয়ে তার ফ্ল্যাটে এল। মাইকেল একটা ছবির পেছন থেকে রসিদখানা বের করে দেখাল। মাইকেলের কথাই ঠিক। রসিদে কোন গোলমাল নেই। তবে পুলিশ মাইকেলের স্বভাবের একটা পরিচয় পেল। মাইকেল প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র এমন জায়গায় রাখে যে, কোনও লোক সন্দেহ পর্যন্ত করে না।

তবুও পুলিশ তাকে ছাড়ল না। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাইকেলকে ছাড়বে না।

মাইকেলের ফ্ল্যাট থেকে ফেরবার সময় একখানা পোস্টকার্ড পাওয়া গেল। বলতে গেলে এই পোস্টকার্ডখানাই মাইকেলকে ধরিয়ে দিল।

আসানসোল থেকে কোনও এক বারবারা হিগিন্‌স মাইকেলকে পোস্টকার্ডখানা লিখেছে। বারবারা শুধু জানতে চেয়েছে, মাইকেল কেমন আছে। হাতের লেখা দেখে বোঝা যায়, বারবারার বয়স বেশি নয়। মাইকেল বলল, ''ও আমার মায়ের মামাতো বোনের মেয়ে, আমার কাজিন!''

বার্ড পোস্টকার্ডখানি পকেটস্থ করল।

মাইকেলকে লালবাজার লক-আপে রাখা হল। সে কিছুই স্বীকার করে না। ইতিমধ্যে রানিনগর থেকে রাম-লক্ষ্মণকে আনানো হয়েছিল। তারা মাইকেলকে সনাক্ত করল, হ্যাঁ, এই সেই সায়েব।

যখন কোনও দিক থেকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না, অথচ ওদিকে টেগার্টসাহেব জোর তাগাদা দিচ্ছেন। তখন এক দিন রবার্টসনসাহেব বারবারা হিগিন্‌সের উদ্দেশে আসানসোল যাত্রা করলেন। আসানসোলে বারবারা হিগিন্‌সকে খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বারবারার বাবা লেঃ কঃ হিগিন্‌স কলকাতার একটি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। রবার্টসনের প্রশ্নের উত্তরে বারবারা বলল, ''না, মাইকেল কখনও তাকে কোন অলঙ্কার দেখায়নি।''

রবার্টসন তবুও প্রশ্ন করলেন, ''মাইকেল কি কখনও তার নিজের কোনও জিনিসপত্তর এনেছিল?''

নাক সিঁটকে বারবারা বলল, ''হ্যাঁ, এই তো কিছুদিন আগে একটা ছেঁড়া চামড়ার ব্যাগে করে কতকগুলো পুরানো ছেঁড়া জামাকাপড় এনে আমাদের কলকাতার বাড়ির একটা বাথরুমের ওপরে যে তাকটা আছে, সেখানে রেখে গেছে!''

চট্ করে রবার্টসনের মনে পড়ল, অমন দরকারি রসিদখানাও মাইকেল ছবির পেছনেই রেখেছিল।

রবার্টসন আসানসোলে আর দেরি করলেন না। বারবারাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরের এক্সপ্রেস ট্রেনেই কলকাতা ফিরলেন।

কলকাতায় ফিরেই রবার্টসন লেঃ কঃ হিগিন্‌সের সঙ্গে দেখা করলেন।

প্রশ্নের উত্তরে হিগিন্‌স বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, হতভাগাটা কী-একটা ব্যাগ ওধারের ওই বাথরুমটার তাকে রেখে গেছে। ও বাথরুমটা এমনি পড়ে থাকে, কেউ ওখানে যায়ও না।''

হিগিন্‌সে যখন শুনলেন যে, রবার্টসন ওখানে রানিনগরের মহারাজার হারানো হিরে-জহরতের সন্ধান করতে চান, তখন তিনি এমন হো-হো করে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন যে, প্রথমটায় রবার্টসন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কিন্তু যখন তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন যে, তবুও তিনি একবার খোঁজ করতে চান, তখন হিগিন্‌সসাহেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাথরুমটা দেখিয়ে দিলেন।

রবার্টসন বার্ডসাহেবকে টেলিফোনে ডাকলেন। ইতিমধ্যে রবার্টসন, বাথরুমে ঢুকে তাক থেকে ব্যাগটা পেড়ে এনেছেন। ব্যাগটা বেশ ভারি, একটা তালাও লাগানো রয়েছে। ব্যাগটা এতই জীর্ণ যে পুরানো জিনিস-বিক্রিওয়ালারাও কিনবে না।

বার্ড এলেন। রবার্টসনসাহেব সেই ব্যাগটি সঙ্গে নিলেন, বার্ডসাহেব ও হিগিন্‌সসাহেবও তাঁর সঙ্গে লালবাজারে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে এলেন। দারুণ উত্তেজনায় রবার্টসনের বুক দুরু দুরু করছে। শেষপর্যন্ত ব্যাগ থেকে যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তাহলে তিনি হাস্যাস্পদ তো হবেনই, ভবিষ্যতে কেউ তাঁর কথায় হয়তো কোন গুরুত্বই দেবে না।

লালবাজার থানার ওয়েটিং রুমে যে বড় গোলটেবিলটা ছিল, তার ওপরে ব্যাগটা রাখা হল। টেগার্টসাহেব এলেন, মাইকেলকেও লক-আপ থেকে আনা হল। তার চাবির রিং সংগ্রহ করা হয়েছিল। একটা চাবি ব্যাগের তালায় লাগাল। টেগার্ট সাহেব স্বয়ং সেই ব্যাগ খুললেন। দু চারটে ছেঁড়া পোশাক বের করতে না করতেই বেরিয়ে এল রানিনগরের মহারাজার হারানো যাবতীয় অলঙ্কার। হিরা-জহরতের দ্যুতিতে সকলের চোখ ঝলসে উঠল। রবার্টসনের মুখ জয়ের আনন্দে উল্লসিত হল।

ডিটেকটিভ পরশুরাম

অজিতকৃষ্ণ বসু

খানিকটা আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাটির গন্ধ মৃদু হাওয়ায় ভাসিতেছে। আকাশের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টি আর হইবে না এমন ভরসা করা যায় না। বৃষ্টি আবার হইবেই, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে বৃষ্টি আবার হইতেও পারে।

সন্ধ্যাবেলা। সারাটা পৃথিবী যেন উদাস হইয়া রহিয়াছে। একেই তো সন্ধ্যার দিকে মানুষের মন সাধারণতই একটু উদাস হইয়া থাকে; তাহার উপর আবার কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে, এবং আকাশের বুকের সমস্ত কান্না এখনও শেষ হয় নাই।

অনেকের মনই উদাস, কিন্তু উদাস হয় নাই পরশুরাম হালদারের মন। সে তাহার একলা ঘরে কি যেন একটা গভীর গবেষণায় মন দিয়াছিল। কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে সে খেয়াল তাহার ছিল না; এবং একটু আগেই যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে সে কথাও হয়তো তাহার জানা ছিল না। কাঁচের শারসিগুলি সব বন্ধ।

পাছে কেহ বিঘ্ন জন্মায় এই ভয়েই বোধ হয় পরশুরাম দরজাটা বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গবেষণায় বসিয়াছে। তাহার সামনের টেবিলের উপর নানা রকম বিভিন্ন প্রকারের জিনিস ছড়ানো রহিয়াছে —কয়েকটা বড় বড় তামার মাদুলি, কয়েকটা চিঠি, একটা বহু পুরাতন মরিচা-ধরা ছুরি, কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো,...ইত্যাদি।

কয়েকখানা চিঠি পরশুরাম খুব মনোযোগ দিয়া পরীক্ষা করিতেছিল—ললাটে গভীর চিন্তার রেখা। কয়েকখানা চিঠির খাম আছে, কয়েকখানার নাই। চিঠিগুলি খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করিযা সে তাহার নোটবুকে কি যেন কতকগুলি কথা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিল। ধীরে ধীরে কহিল, ''এই চিঠিগুলো পাওয়াতে সমস্যাটা অনেকটা সোজা হয়ে এসেছে। এ কেসটা এবার কিনারা করবই করব, যেমন করেই হোক। এইবার সিগারেটের টুকরোগুলো দেখা যাক।''

এমন সময় দরজাতে কয়েকটা মৃদু টোকা শোনা গেল। পরশুরাম দরজা খুলিতেই বিরিঞ্চি প্রবেশ করিল। কহিল, ''পঞ্চাশ নম্বর মেন্টন স্ট্রিটে অরিন্দম পাকড়াশী নামে কোন লোক নেই।''

''বলো কি?'' পরশুরাম বলিল। ''তবে তো ব্যাপারটা ভারি জটিল হয়ে দাঁড়াল। ভালো করে খবর নিয়েছ তো?''

বিরিঞ্চি বলিল, ''আমি যে কাজ করি তা কি কখনও খারাপ করে করি?—ও বাড়িতে থাকে বনশীলাল আগরওয়ালা নামে এক ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক! খোঁজ নিয়ে জানলুম,

অরিন্দম পাকড়াশী নামে কোন লোক এখন তো দূরের কথা—পনেরো বছরের ভেতরও ও-পাড়ায় ছিল না। পনেরো বছর আগে ওই রাস্তার এগারো নম্বর বাড়িতে থাকত এক পাকড়াশী; কিন্তু সে ধূম্রলোচন পাকড়াশী—অরিন্দম পাকড়াশী নয়।''

''এ-হে-হে? এ যে ঘাটের কাছে এসে নৌকোডুবি বিরিঞ্চি!'' ব্যথিতস্বরে পরশুরাম কহিল। ''কেসটা প্রায় কিনারা করে এনেছিলুম আর তুমি কি না—এঃ!''

বিরিঞ্চি কহিল, ''আমার কি অপরাধ বলুন। অরিন্দম পাকড়াশী ও-পাড়ায় না থাকলে আমি কি জোর করে থাকাতে পারি? এতো আর মগের মুলুক নয়।'' খানিকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া পরশুরাম কহিল, ''আচ্ছা, তুমি কি করেছ সব ঠিক ঠিক বলে যাও তো।''

বিরিঞ্চি বলিতে লাগিল, ''আপনার কথামতো তো গেলুম মেন্টন স্ট্রিটে। একটু যেতেই নামল বৃষ্টি। সামনে একটা দোকানে উঠে দাঁড়ালুম। বৃষ্টি থামতেই আবার হাঁটা শুরু করলুম। পঞ্চাশ নম্বর বাড়ির দরজায় পৌঁছে আপনার কথামতো কড়া নাড়লুম। নাড়তেই এক আধাবুড়ো ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলুম, তিনিই অরিন্দম পাকড়াশী কিনা। চিঠিখানা দিতে গেলুম। তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, তাঁর নাম বনশীলাল আগরওয়ালা, অরিন্দম পাকড়াশী নামে কেউ ও-তল্লাটে থাকে বলে তাঁর জানা নেই।''

''তার মুখের ভাব কি রকম দেখলে, বলো তো? তার মুখে বিস্ময় ছিল?—ভয় ছিল?''

একটু ভাবিয়া বিরিঞ্চি বলিল, ''একটু একটু ছিল যেন।''

''বিস্ময় বেশি ছিল, না ভয় বেশি ছিল?''

''আজ্ঞে দুটোই যেন বেশি ছিল বলে মনে হচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছিল বিস্ময় বেশি, কখনও মনে হচ্ছিল ভয় বেশি।''

''নাঃ, তুমি কেসটাকে ভারি জটিল করে তুলছো। ও-রকম এ-ও হতে পারে ও-ও হতে পারে বললে হবে না। ঠিক করে বলা চাই। ডিটেকটিভগিরি তো আর খেলা নয়। এ একেবারে ম্যাথামেটিকসের মতন, একটু এদিক ওদিক হলেই রেজাল্ট ভুল হয়ে যাবে।''

বিরিঞ্চি বলিল, ''আজ্ঞে, লোকটার চেহারাটা এমন অদ্ভুত ধরনে তৈরি যে, তার মুখের ভাবটা ঠিক করে বোঝা অসম্ভব।''

''তাই নাকি? তাহলে তো এ-কথাটা নোট করে রাখতে হচ্ছে। ভারি ইমপরট্যান্ট।'' বলিয়া পরশুরাম এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটা নোটবুকে লিখিয়া রাখিল। তারপর বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, ''আচ্ছা, তারপর?''

''তারপর চিঠিটা তাঁকে না দিয়েই চলে এলুম। উনিও দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।''

''আস্তে আস্তে, না ঝপ করে?''

এ প্রশ্নের জবাব বিরিঞ্চি চট করিয়া দিতে পারিল না। কারণ দরজা কিভাবে বন্ধ করিলে আস্তে আস্তে বন্ধ করা বলা চলে, এবং কতটা জোরে বন্ধ করিলে তাহাকে ঝপ করিয়া বন্ধ করা বলা যায়— এ-সম্বন্ধে তাহার সঠিক ধারণা থাকিলেও বনশীলালের কার্যকলাপের কি ব্যাখ্যা করা যায় বিরিঞ্চি ভাবিয়া পাইল না। তাই বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বলিল, ''তার দরজা বন্ধ করার ভেতর এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তাকে আস্তে বন্ধ করাও বলা যায়, ঝপ করে বন্ধ করাও বলা যায়।''

''না, আরো জটিল। তার মুখের ভাবেও বিশেষত্ব, দরজা বন্ধ করাতেও বিশেষত্ব। ভারি মুস্কিলের কথা! আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে বিরিঞ্চি! ওই বনশীলাল লোকটাই আসলে অরিন্দম পাকড়াশী নয় তো?''

বিরিঞ্চি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না। উনি যদি অরিন্দম পাকড়াশী হতেন, তাহলে সে-কথা উনি নিজে কি আর জানতেন না? উনি তো স্পষ্টই বললেন..

হতাশ হইয়া চেয়ারে হেলান দিয়া পরশুরাম বলিল, "তুমি দেখছি একেবারে মাথার মাথাটি খেয়েছ বিরিঞ্চি! উনি অরিন্দম পাকড়াশী হলেই যে সে-কথা উনি স্বীকার করবেন সে-কথার কোনও মানে আছে? এ বুদ্ধিটি তোমার মগজে ঢুকল না হে?"

মাথা চুলকাইয়া বিরিঞ্চি বলিল, "তা ছাড়া আপনি বলেছিলেন পাকড়াশীর ভুঁড়ি নেই! কিন্তু বনশীলালের যে দেখলুম দিব্বি ভুঁড়ি।"

"ছদ্মবেশ ধরবার জন্যে অনেকে পরচুলোও মাথায় পরে। ওর ভুঁড়িটিও সেই রকম কিছু নয় তো? ভালো করে ভেবে দেখ!"

"আজ্ঞে না। ও পরভুঁড়ি-টরভুঁড়ি নয়—একেবারে আসল ভুঁড়ি। এতটা বয়স হল, এখনও ভুঁড়ির আসল-নকল চিনি না? তাছাড়া লোকটিকে একেবারে খালি গায়ে দেখলুম কিনা! একেবারে জাজ্বল্যমান ভুঁড়ি।"

ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া পরশুরাম কহিল "দেখি চিঠিখানা দাও দেখি একবার।"

খপ করিয়া বিরিঞ্চির হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া পরশুরাম পড়িল, "অরিন্দমবাবু, সমস্তই জানিয়াছি। এই পত্র পাইবামাত্র পত্রবাহকের সহিত আসিয়া গোপনে আমার সহিত দেখা করিবেন। আমি আপনার যথাসাধ্য উপকারই করিব। এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ তাহাতে আপনারই বিপদ। জালে পড়িবেনই। ইতি—

শ্রীপরশুরাম হালদার

চিঠিখানার পিঠে ঘস ঘস কি যেন লিখিয়া পরশুরাম দেরাজে রাখিয়া দিল। তারপর একটা মোটা বাঁধানো খাতা হইতে অরিন্দম পাকড়াশীর কল্পিত বর্ণনা পড়িল "কালো, বেঁটে, বয়স ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, শরীর রোগা—গ্রেহাউন্ড ধরনের হাতের আঙুল সরু ও লম্বা..."

"আপনি পাকড়াশীর যে চেহারা আন্দাজ করেছেন, তাতে তো ভুলও হতে পারে। সে... একবার আপনার ঘর থেকে চিরুণিটা হারিয়ে গেল, আপনি গবেষণা করে বল...—সেটা যে চুরি করেছে তার গোঁফ কামানো, হাতের আঙুল মোটা, মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। পরে জানা গেল, মা ঠাকরুণ সেটা আঁচড়াতে নিয়েছিলেন।"

রাগ করিয়া পরশুরাম কহিল, "তোমার ওই একটা মস্ত দোষ বিরিঞ্চি যে অতীতকে নিয়ে তুমি বড় ঘাঁটাঘাটি কর। এ মোটেই ভালো নয়।—একটু 'সিরিযাস' হও হে—একটু 'সিরিয়াস' হও—তোমারই ভালোর জন্যে বলি—রাগ কোরো না, তবে সত্যি কথাটা বলি—তোমার মতন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে কোন ডিটেকটিভের সাধ্য নেই যে কাজ করে। দেখি আমি নিজেই একবার বরং যাই।"

বলিয়া পরশুরাম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া রওনা হইল, অরিন্দম পাকড়াশীর খোঁজে। তাহার প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, বনশীলালের নকল ভুঁড়িকেই বোকা বিরিঞ্চি আসল ভুঁড়ি বলিয়া ভুল করিয়াছে, বনশীলালই আসলে অরিন্দম পাকড়াশী।

কিন্তু ডিটেকটিভ পরশুরাম একটু আপন-ভোলা ধরনের লোক। পঞ্চাশ নম্বর মেন্টন স্ট্রিটে যাইতে সে ভুল করিয়া উপস্থিত হইল পঞ্চাশ নম্বর ফেন্টন স্ট্রিটে। দরজায় কড়া নাড়িতেই একজন বৃদ্ধ আসিয়া হিন্দিতে প্রশ্ন করিল, "কাহাকে চান?"

পরশুরাম কহিল, "চাই বনশীলাল আগরওয়ালাকে।"

বৃদ্ধ লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওই নামে কেহ এখানে থাকে না।"

একটু আগেই বিরিঞ্চি দেখিয়া গিয়াছে এখানে বনশীলাল থাকে, আর এই লোকটা তাহা অস্বীকার করিতেছে! ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয় রহস্য আছে। তাহার সন্দেহ হইল

এই লোকটাই হয় তো বনশীলাল আগরওয়ালা। ইহার ভুঁড়ি দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। লোকটা নকল ভুঁড়িটা সরাইয়া ফেলিয়াছে মাত্র।

পরশুরাম প্রশ্ন করিল, ''আপনি কি অরিন্দম পাকড়াশী ?''

লোকটি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, ''হুরোবিন্দু না আছে—হামে 'মাণেকচাঁদ ভূতুড়িয়া' আছি—।''

পরশুরাম জোর গলায় কহিল, ''ধাপ্পা মারবেন না। আমি জানি আপনিই অরিন্দম পাকড়াশী।''

কিছুদিন আগে পাড়ায় কয়েকটা চুরি রাহাজানি হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধের মনে তাই পরশুরামের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া কেমন যেন একটু খটকা লাগিয়া গেল। সে পুত্র বনোয়ারিলালকে ডাক দিল। বিশাল চেহারার শক্তিশালী যুবক বনোয়ারিলাল আসিয়াই এক হুঙ্কার ছাড়িয়া হই-চই বাধাইয়া তুলিল, বিষম ভয়ে ডিটেকটিভ পরশুরাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। বনোয়ারিলাল দরজায় দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। পরশুরাম ভাবিল, ষণ্ডা পালোয়ানটা পিছু পিছু তাড়া করিয়াছে, ধরিয়া ফেলিলে আর আস্ত রাখিবে না। কি কুক্ষণেই অরিন্দম পাকড়াশীর খোঁজে আসা গিয়াছিল!

ছুটিতে ছুটিতে অবসন্ন হইয়া একটি বাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়া পরশুরাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছা ভাঙিতেই সে দেখিল একটি সুসজ্জিত ঘরে সুন্দর বিছানায় সে শুইয়া আছে। তাহার পাশে বসিয়া আছেন এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, তাঁকে যেন চেনা-চেনা লাগিতেছে।

ভদ্রলোক চশমার পুরু কাঁচের মধ্য দিয়া চাহিয়া কহিলেন, ''তুমি পরশুরাম না ?''

পরশুরাম কহিল, ''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' ভদ্রলোককে পরশুরাম চিনিতে পারিল। বছর দশেক আগে স্কুলে ইঁহারই কাছে পরশুরাম ভূগোল পড়িয়াছিল। তারপরে আজ এই প্রথম তাঁহার সঙ্গে দেখা। পৃথিবীটা সত্য-সত্যই গোল।

ভূতপূর্ব ভূগোল-শিক্ষক ত্রৈলোক্যবাবু কহিলেন, ''কি হয়েছিল বলো তো বাবা ?''

''উঃ! গুণ্ডা তাড়া করেছিল স্যার। আরেকটু হলেই প্রাণটা যেত আর কি।''

এমন সময় ত্রৈলোক্যবাবুর স্ত্রী একবাটি গরম দুধ নিয়া আসিলেন। বলিলেন, ''এটুকু খেয়ে ফেল। তাহলে গায়ে জোর পাবে।''

দুধ খাইয়া চাঙ্গা হইয়া তারপর গুণ্ডার তাড়া সম্বন্ধে একটা বিষম রোমাঞ্চকর কাহিনী বানাইয়া পরশুরাম বলিতে লাগিল। তাঁহারা দুজনে স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন। ত্রৈলোক্যবাবুর স্ত্রী কহিলেন, ''কি সর্বনাশ! আর কখ্‌খনো এভাবে সন্ধ্যার পর একা বেরিও না। গুণ্ডাদের জ্বালায় আজকাল পথেঘাটে বেরোবার জো নেই।''

সে রাত্রে বিনা ট্যাকসিতে কিছুতেই পরশুরামকে বাড়ি ফিরিতে দেওয়া হইল না।

বাড়ি ফিরিতেই বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, ''কি হল অরিন্দম পাকড়াশীর ?''

পরশুরাম কহিল, ''নাঃ ও ব্যাটার পাত্তা পাওয়া গেল না।...

....তা যাক্‌গে, —তার জন্যে ভাবনা নেই, সে আমি ঠিক করে নেব—কিন্তু তুমি যে বললে, —মেড়োটার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দেখে এলে—আমি গিয়ে স্রেফ প্লেন সহজ মানুষটি দেখে এলুম...এ কোন-দেশী ম্যাজিক বল তো বিরিঞ্চি।''

বিরিঞ্চি বলিল—''তবে বোধ হয় 'পরচুলো'র মত 'পরভুঁড়ি..কিছু...''

পরশুরাম সাগ্রহে টেবিলে টোকা মারিয়া বলিল—''ঠিক ওই রকম সন্দেহটা আগেই করেছি কি-না দেখ। বিরিঞ্চি! উপস্থিত বুদ্ধি আর প্রবল সন্দেহ প্রবণতা না থাকলে ওস্তাদ গোয়েন্দা হওয়া যায় না, —তাই বলি 'সিরিয়াস' হও হে, —বুঝলে ?''

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

ধীরেন্দ্রলাল ধর

বাত তখন দুটো।

বাজাবাজাবেব মোড়ে এক পুলিশ পাহাবা দিচ্ছিল, অর্থাৎ একটি দোকান-ঘবেব বোযাকে আধশোযা অবস্থায চোখ বুজে বসে ছিল। চোখ বুজে বসে ছিল, কাবণ মাঝবাতে কলকাতাব বাজপথে চোখ চেযে দেখাব মতো কিছু নেই। দৈবাত একখানা মোটব ছুটে যায, অমন ছুটন্ত মোটব দিনেব বেলায ছোটেলাল অনেক দেখেছে।

হঠাৎ কযেকটা কুকুব সমস্ববে চিৎকাব কবে উঠল। পথে পুলিশ দেখলেই অমন চেঁচায। 'লালপাগড়িব ভয চোবেব চেযে তাদেব বেশি। তবে কাছাকাছি এলে কামড়ে দিতে পাবে। লাঠিটা হাতে নিযে ছোটেলাল চোখ মেলল।

চোখ মেলেই সে চমকে উঠল। কুকুবগুলোব কাছেই ওপাশেব ফুটপাতে একটা মানুষ পড়ে আছে না? লাইট-পোস্টেব নীচে অমনভাবে কেউ পড়ে থাকাব কথা নয। মাতাল না-কি?

উঠতে হল। লাইট-পোস্টটাব নীচে এসে তাব চোখ বড় হযে গেল। এ কী! লোকটাব গলা কাটা, জামায বক্ত! পকেট থেকে বাঁশিটা বেব কবে তখনই সে বাজিযে দিলে।

পুলিশেব বাঁশি। ওদিকের মোড়ে মিঠেলাল পাহাবায ছিল, অর্থাৎ সেও এক বাড়িব বোযাকে চোখ বুজে বসে ছিল। ধড়মড় কবে উঠে বসেই সে বাঁশিটা কোন দিক থেকে আসছে ঠাহর কবে নিলে, তাবপর এগিযে এল ছোটেলালেব দিকে।

মিঠেলালকে দেখে ছোটেলাল ভবসা পেল, বলল—খুন হুযা।

খুন হুযা! আদমি খুন!...ব্যাপাব দেখে মিঠেলালেব মাথা ঘুবে গেল। তাড়াতাড়ি বলল—ঠিক আছে, আমি এখনি গিযে থানায খবর দিচ্ছি।

ছোটেলালেব একটু ভূতের ভয আছে, বলল—আমি এখানে একা খাড়া থাকবো, তার চেযে বাঁশি বাজাই, আর কেউ আসুক।

মিঠেলাল বলল—আরে, ভয কিসেব? একটু তফাতে গিযে দাঁড়াও, বড়-সাহেবের গাড়িব আওযাজ পেলে কাছে আসবে।

গোঁফে চাড়া দিযে ছোটেলাল বলল—আদমিকে আমি ডবি না, কিন্তু ভূত!

—একশো হাত তফাত থাকো।

—ভূত একশো হাত তফাতে আসবে না?

—সে একশো হাত আসতে আসতে তুমি আবার একশো হাত হটে যাবে।

কথাটা ঠিক ছোটেলালের মনে লাগল না। তার মুখের পানে তাকিয়ে মিঠেলাল সে-কথা বুঝল—পুলিশের মনের কথা পুলিশই ভালো বোঝে। বলল—আরে, ঔর এক বুদ্ধি আছে, আগ দেখলে ভূত আসবে না, বিড়ি খাও, সাথে আগ থাকবে।

নেহাত খারাপ কথা নয়। ছোটেলাল বলল—বেশ, দেশলাই দাও!

মিঠেলাল হেসে বলল—আমরা কখনও দেশলাই কিনি?

হঠাৎ নজরে পড়ল, বিড়ির দোকানের পোড়া দড়িটা তখনও দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। ছোটেলাল বিড়ি ধরাল। মিঠেলাল বলল—আমি যাই।

মিঠেলাল চলে গেলে ছোটেলাল নিহত মানুষটির পানে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে একটু তফাতে সরে গেল। মিঠেলাল বলেছিল, একশো গজ, ছোটেলাল সরে গেল পাঁচশো গজ। পুলিশে চাকরি করছে বলে কি রাত-দুপুরে একটা খুন-হওয়া লোকের কাছে একা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? তার ওপর খুনি যদি কাছাকাছি লুকিয়ে থাকে তাহলে তারই বা খুন হতে কতক্ষণ? এখানে কে-ই বা আছে বাধা দেবার?

ছোটেলাল একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে চলল, সঙ্গে আগুন থাকা ভালো। খুন-হওয়া মানুষ নিশ্চিত ভূত হয় সবাই জানে, তবে কখন সেই ভূতের আবির্ভাব হয় তা কেউ জানে না। আগুনটা সঙ্গে থাকলে তবু নিরাপদ।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। ছোটেলাল এগিয়ে গেল লাশটির কাছে।

গাড়ি থামল। ইনসপেকটার পরেশবাবু, সাব-ইনসপেক্টার নরেশবাবু ও চারজন সিপাই নামল। পরেশবাবু টর্চ ফেলে ভালো করে দেখলেন। শার্লক হোমসের সমস্ত বই তিনি পড়েছেন। ক্রাইম ক্লাব ও আগাথা ক্রিস্টিও বাদ দেননি। ভালো করে দেখে নিয়ে তিনি বললেন—এখানে গলা কাটলে, এতো কম রক্ত এখানে থাকত না। পথ রক্তে লাল হয়ে যেত। অন্যত্র হত্যা করে এখানে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে গাড়ি করে। এমনি বয়ে আনলে পথে রক্ত থাকত। আশেপাশে রক্তের চিহ্ন নেই। টাকাপয়সার জন্য সে খুন করেনি, কারণ লোকটির হাতে হাতঘড়ি, পকেটে দামি কলম, জামায় সোনার বোতাম রয়েছে। খুন করা হয়েছে অতর্কিতে। জামা-কাপড়ের ইস্ত্রি ঠিক আছে, ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন নেই। লোকটি যখন খুন হয়েছে তখন সে শুয়ে ছিল, অন্য-অবস্থায় থাকলে জামায় রক্তের দাগ থাকত। অবস্থাপন্ন লোক, বেশভূষা সেইটাই প্রমাণ করছে।

নরেশবাবু একমুখ হেসে বললেন—আপনি স্যার যুক্তি যা দেন, একেবারে অকাট্য!

—মানুষটিকে সনাক্ত করা যায় কিনা দেখি,...বলে পরেশবাবু নিহত লোকটির পকেটের মধ্যে হাত ভরে দিলেন। কোন পকেটেই কিছু নেই! বললেন—না, আসল জিনিসটিই পকেটে রাখেনি। ফোটো ছাড়া উপায় নেই।

নরেশবাবু বললেন—কিন্তু ফোটোগ্রাফারকে তো সকালের আগে পাওয়া যাবে না। সকাল-অবধি পথে লাশ পড়ে থাকা কি ঠিক হবে?

—না। আমি ক্যামেরা এনেছি। এখনি দুখানা ফোটো তুলে নিয়ে লাশ 'মর্গে' পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নরেশবাবু বললেন—আপনি স্যার সবদিক ভেবে কাজ করেন, আপনার মতো বিচক্ষণ লোক পুলিশে খুব কমই আছে।

পরেশবাবু ক্যামেরা বের করলেন। ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ লাগিয়ে পরপর দুখানি ছবি নিতে মিনিট পনেরোর বেশি গেল না, তারপর সিপাইদের আদেশ দিলেন—লাশ তুলে নিয়ে মর্গে পৌঁছে দাও গে।

এবার পরেশবাবু ছোটেলালকে প্রশ্ন করলেন—এই লোকটিকে কখন এখানে পড়ে থাকতে দেখেছ?

ছোটেলাল বিশ বছর কলকাতা পুলিশে চাকরি করছে। বাংলা সে ভালোই বোঝে। এতক্ষণ সে সব কথা শুনছিল, এবার বলল—হুজুর, আমার কাছে তো ঘড়ি নেই, ঠিক সময় বলতে পারব না, তবে আপনারা আসার প্রায় আধঘন্টা আগে। ওদিকে ওই বিড়িওলা দোকান খুলেই ঘুমুচ্ছিল, তাকে ডেকে দোকান বন্ধ করালাম। সেই সময় মনে হল যেন একখানা ছোট গাড়ি এখানে এসে একবার থেমেছিল, আমি তো পথের ওদিকে ছিলাম, কিছুই দেখতে পাইনি। তবে একখানা মোটর চলে যাবার শব্দ পেয়েছিলাম। এদিকে এসে দেখি এই ব্যাপার। তখনই বাঁশি বাজিয়ে মিঠেলালকে ডাকলাম।

—বলেছি মোটর থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছে, —বলে পরেশবাবু নরেশবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে একটু গর্বের হাসি হাসলেন।

তারপর দুজনে হেঁটেই থানায় ফিরলেন। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে গিয়েছিলেন, আবার যে যার কোয়ার্টার্সে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঘুম থেকে উঠতে আটটা বাজল। নীচে নেমে এসে খবর শুনেই পরেশবাবু চমকে উঠলেন। লাশ উধাও। মর্গের দারোয়ান ঘুমুচ্ছিল, তাকে ডেকে তুলে দরজা খোলাতে পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর লাশ তুলতে গিয়ে দেখে গাড়ির মধ্যে লাশ নেই। অতবড় দেহটা কোথায় যেন উবে গেছে! তারপর অনেক তল্লাস করা হল কিন্তু লাশের কোন হদিস মিলল না।

পরেশবাবু বললেন—আমায় তখনি খবর দিলে না কেন?

আপনি সেই মাত্র শুয়েছেন স্যার, আপনাকে বিরক্ত করতে আর সাহস হল না।

পরেশবাবু গুম্ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন—বুঝলে নরেশ, কাছাকাছি কোন লোক মোটর নিয়ে তৈরি ছিল, যেই অবসর পেয়েছে অমনি লাশটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। খুব দুঃসাহসী লোক।

নরেশবাবু বললেন—আমারও তাই মনে হয় স্যার।

—এখন কি রিপোর্ট লিখি বল তো? ডেপুটি-কমিশনার এই রিপোর্ট দেখলেই তো আগুন হয়ে উঠবেন।

—কোন রিপোর্ট লেখার দরকার নেই স্যার। যখন লাশ পাওয়া যাবে তখন রিপোর্ট দেওয়া যাবে।

—কিন্তু লোকটার ঘড়ি, পেন, সোনার বোতাম যে নিয়ে এসেছি।

—বোতাম আর পেনটা আপনি ব্যবহার করুন স্যার, আর ঘড়িটা আমায় দিন, আমার কাজে লাগবে।

—কিন্তু পরে যখন.....

—তখন দিয়ে দিলেই হবে। আর না দিলেই বা কে জানছে?

এমন সময় এক ভদ্রলোক আপিস ঘরে এসে ঢুকলেন, বললেন।

—স্যার, ডায়েরিতে একটু নোট করে নেবেন?

—কি হয়েছে? ...পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—কাল রাতে বাসে আমার হাতঘড়ি কেটে নিয়েছে, কিছু টের পাইনি, কলমটাও কখন তুলে নিয়েছে। জেনিথ ঘড়ি, ঘড়ির ভিতরের ঢাকনায় আমার নাম লেখা আছে, জি. এস. অর্থাৎ গোরাচাঁদ সেন। পেনটা পেলিক্যান, তারও গায়ে লেখা আছে জি. এস.।

গোরাচাঁদ কাগজখানি দিলেন। পরেশবাবু একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন—ঠিক আছে, সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাব।

গোরাচাঁদ বেরিয়ে যাবার পর সহসা যেন পরেশবাবুর ঘুম ভাঙল, ড্রয়ার থেকে একটা ঘড়ি আর পেন বের করলেন। ঘড়ি খুলে দেখলেন ভিতরের ডায়ালে জি. এস. লেখা, কলমের গায়েও জি. এস. লেখা। তখনই তিনি বলে উঠলেন—দেখো তো নরেশ, লোকটা কোথায় গেল, ওই সেই লোক; শিগগির পাকড়াও করো!

নরেশবাবু ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু সে-মানুষটিকে আর দেখতে পেলেন না। রাজপথের চলতি-মানুষের মাঝে সে হারিয়ে গেছে।

পরেশবাবু বললেন—এক চিঠিতে ওর ঠিকানা দেওয়া আছে। ওইখানেই আমরা যাব।

নরেশবাবু ও দুজন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে পরেশবাবু তখনই বেরিয়ে পড়লেন। বরাবর গেলেন সেই চিঠির ঠিকানায়। পথের উপর সুন্দর একখানি দোতলা বাড়ি। এক প্রবীণ ভদ্রলোক বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পরেশবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন—আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

ভদ্রলোক হকচকিয়ে উঠলেন, বললেন—অ্যাঁ?

—আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

—কেন?

—খুন করা ও মৃতদেহ গুম করে রাখার জন্য।

—কে খুন করল? কাকে খুন করল?

—খুন করেছেন আপনি, কিন্তু কাকে খুন করেছেন তা জানার আগেই তার লাশ গুম করেছেন।

—কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। এখন লাশটি কোথায় সরিয়েছেন বলুন তো গোরাচাঁদবাবু?

—গোরাচাঁদবাবু? আমার নাম গোবিন্দ সরকার।

—ওই হল জি. এস.; গোরাচাঁদ সেন, ওরফে গোবিন্দ সরকার।

—আপনারা ভুল করছেন, খুন-খারাবির ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।

—জানবেন ফাঁসির হুকুম হলে।

—ফাঁসি? আমার ফাঁসি!

ভদ্রলোক থরথর করে কেঁপে উঠলেন, চোখ-মুখ লাল হয়ে মূর্ছা যাবার মতো হল। কিন্তু পরেশবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, বললেন—খুন করার সময় মনে ছিল না যে ফাঁসি হতে পারে? আবার থানায় ডায়েরি লেখাচ্ছেন পেন পিকপকেট হয়েছে, হাতঘড়ি কেটে নিয়েছে, ভাবছেন আমরা বুঝি এতই কাঁচা, না?

পরেশবাবু গোবিন্দবাবুকে থানায় নিয়ে এলেন।

পরদিন উকিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করল,—আমার মক্কেল অসুস্থ, পুলিশ বিনাকারণে তাকে আটক করেছে, তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হোক।

পুলিশ বলল—হুজুর, নরহত্যা ও নিহতের লাশ গুম করার অপরাধে গোবিন্দবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে এখন ছেড়ে দিলে পুলিশের অনুসন্ধান কাজে বিশেষ বিঘ্ন হবে। প্রতিপত্তিশালী লোক, বাইরে গিয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবেন। আমাদের অনুসন্ধানের অসুবিধা হবে, অন্তত পনেরো দিন তাঁকে হাজতে রাখার অনুমতি দিন।

ম্যাজিস্ট্রেট নতুন লোক, অল্প দিন এই পদে এসেছেন, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে বলুন তো? সম্প্রতি কোন হত্যাকাণ্ডের খবর তো কাগজে পড়িনি।

কোর্ট ইনসপেকটারের সঙ্গে ছিলেন পরেশবাবু, ঘটনাটি আগাগোড়া তিনি সংক্ষেপে বললেন। শেষে বললেন—অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য কাগজের খবরটা প্রকাশ করা হয়নি স্যার।

—কিন্তু এই সম্পর্কে গোবিন্দবাবুকে আপনারা সন্দেহ করছেন কোন কারণে—ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন।

—ও যে স্যার জি. এস. অর্থাৎ গোবিন্দ সরকার।

গোবিন্দবাবুর উকিল বলল—হুজুর, আমার এইখানেই আপত্তি আছে। খুনের কেসটাই বাজে, কেউ খুন হয়নি, গোবিন্দবাবু কাউকে খুন করেননি।

পরেশবাবু হেসে বললেন—হুজুর, এই কথা বলার জন্যই লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে কোন প্রমাণ না থাকে।

উকিল বলল—হুজুর যদি অনুমতি দেন তো আমার সাক্ষী আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দিলেন। উকিল একজন লোককে ডেকে আনল।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আপনি কি বলতে চান বলুন।

সাক্ষী বলল—আমি একজন ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিক দেখিয়ে খাই। আমি গোবিন্দবাবুর ভাড়াটে। ওঁর অনেকগুলি বাড়ি আছে, তারই একখানায় আমি বিশ বছর ভাড়া আছি। আমার অসুখ করেছিল বলে এবার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে। আমি বলি, কিছু টাকা হাতে এলেই ভাড়াটা চুকিয়ে দেব। উনি তবু আমাকে উচ্ছেদ করার জন্য মামলা করেন। আদালতের সমন পেয়ে আমি আবার ওঁর কাছে যাই। উনি তখন বলেন যে, আমি উঠে গেলে অনেক বেশি ভাড়ায় উনি ভাড়াটে পাবেন। তাছাড়া ম্যাজিশিয়ান বলে আমাকে অনেক কথা শুনিয়ে দেন, আমি অসুস্থ দেহে গিয়েছিলাম, উনি আমাকে একবার বসতেও বলেন না। কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে খেদিয়ে বের করে দেন বলা চলে। আমি সেইজন্য ম্যাজিকে কি হয় তাই ওঁকে দেখিয়ে দিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তাহলে এই খুনের ব্যাপারটা ম্যাজিক?

পরেশবাবু ফোটো দেখালেন—এই দেখুন হুজুর, ফোটো।

ম্যাজিশিয়ান বলল—এটা আমারই ফোটো হুজুর। আমিই খুনের ভান করেছিলাম, আমাকেই গাড়িতে করে পুলিশ 'মর্গে' নিয়ে গিয়েছিল। মর্গের সামনে আমিই গাড়ি থেকে নেমে চলে আসি। এটা হুজুর, যাকে বলে 'ম্যান হিপনোটিজম', যা দিয়ে আমরা জ্যান্ত লোকের জিভ কেটে ফেলি, চাবিবদ্ধ বাকসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসি, এও স্যার ঠিক তাই। তবে নরেশবাবু কাল রাতে আমার ঘড়ি, পেন ও বোতাম খুলে নিয়েছিলেন, সেইগুলি যেন ফেরত পাই, হুজুর সেই হুকুমটা দিয়ে দিন জি. এস. আমারই নাম, গোরাচাঁদ সেন। অবশ্য গোবিন্দবাবুর নামের সঙ্গেও তার মিল আছে, জি. এস. গোবিন্দ

সরকার, তাইতেই আমার সুবিধা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট অনেক মামলা করেছেন, অনেক মামলা দেখেছেন, কিন্তু এমন অভিনব খুনের মামলা কখনও দেখেননি। কি করা উচিত, তিনি একটু দ্বিধায় পড়লেন। তারপর পরেশবাবুকে বললেন—খুনের কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে?

—হুজুর, এই ফোটো।

—ফোটো দেখেছি, কিন্তু ওতে কে খুন করল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়? একজনের হাতঘড়ি আর পেনে জি. এস. লেখা আছে সেই জি. ধরে আপনি গোকুল, গজেন, গদাই, গণেশ, গোপেন, গোবর্ধন যত পাবেন সব ধরে আনবেন? তার উপর আপনি ধারণা করে নিলেন খুনি এসে থানায় নাম ঠিকানা দিয়ে যাবে? আপনার বুদ্ধি তো খুব!

—হুজুর, পাকা খুনি অনেক সময় এমন করে। অপরাধতত্ত্বের অথরিটি স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বইয়ে এইরকম অনেক কেস পাওয়া যায়।

—স্যার আর্থার কোনান মানে শার্লক হোমস?

—হ্যাঁ, হুজুর!

—ডিটেকটিভ গল্প পড়ে আপনি খুনের মামলার সমাধান করবেন? আপনার মতো ইনসপেকটার পুলিশে আর ক'টি আছে? আপনার লিটারেট কনস্টেবল হওয়া উচিত। দেখি আপনার ফোটোখানা।

পরেশবাবু ফোটো দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ফোটোর সঙ্গে গোরাচাঁদ বাবুর মুখখানি মিলিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—এ ফোটো আপনার?

—হ্যাঁ, হুজুর!

—পুলিশের সঙ্গে আপনি এরকম গুরুতর রসিকতা করতে সাহসী হলেন কি করে?

—হুজুর, কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে জানি, কিন্তু একাজ না করলে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হত। ওই বাড়িতে বাইশ বছর আছি হুজুর, পঁচিশ টাকা ভাড়ায় এসেছিলাম, এখন পঞ্চাশ টাকা দিই, কিন্তু ছাড়তে হলে ওই ভাড়ায় আর বাড়ি পাব না হুজুর। আর পুরানো ঠিকানা বদল করলে আমাদের ব্যবসার বড় ক্ষতি হয়। কাজেই বাধ্য হয়ে হুজুর...

—এই ধরনের গুরুতর তামাশা আর করবেন না, আমি নিষেধ করছি।

আর পরেশবাবুকে বললেন—এই মামলার বিবরণ যখন কাগজে বেরুবে, তখন সাধারণ লোক কি ভাববে বলুন তো? ডিটেকটিভ গল্প পড়ে কখনও খুনের কিনারা করা যায় না, সাবধান হয়ে ভবিষ্যতে কাজ করবেন, যান। এখনি গিয়ে গোবিন্দবাবুকে ছেড়ে দিন গে—গোরাচাঁদ একখানি কার্ড পকেট থেকে বের করে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়ে বললেন—এই আমার নাম-ঠিকানা স্যার, আপনার কোন অনুষ্ঠান হলে জানাবেন, আমি দেখিয়ে আসব।

আর নরেশবাবু থানায় ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। নরেশবাবু বললেন—যাক একটা মস্ত গোলমেলে খুনের কেস থেকে বাঁচা গেল।

পরেশবাবু বললেন—তুমি একটা গাধা!

নরেশবাবু হেসে বললেন—আপনি শার্লক হোমস আর আমি ডাক্তার ওয়াটসন। আমি গাধা হলে, আপনি শার্লক হোমস হবেন কি করে?

পরেশবাবু তর্জন করে উঠলেন—তোমাকে জবাই করব।

নরেশবাবু বললেন—গাধা জবাই হয় না স্যার।

পরেশবাবু এবার হেসে ফেললেন।

চুরির তদন্ত

প্রতিভা বসু

বাড়িতে একটা বিচ্ছিরি চুরি হয়ে গেল। রাত্রিবেলা নয়, একা বাড়িতে নয়, নির্জন ঘরে নয়, একেবারে কড়কড়ে দুপুরে জনাকীর্ণ শোবার ঘরের আলমারি থেকে। সবাই জিজ্ঞেস করলে হৈমন্তী দেবী তার সময়ও বলে দিতে পারলেন, "বেলা দুটো থেকে পৌনে পাঁচটার মধ্যে।" যাকে বলে ভোজবাজি। সাড়ে তিন হাজার টাকা। টাকাটা ছিল একটা তালা-দেওয়া পিতলের ঝাঁপির মধ্যে, ঝাঁপিটা ছিল দেওয়াল আলমারির মেজো তাকে। আলমারিতে তালা দেওয়া ছিল। বিলিতি তালা। আলমারি যেমন আটকানো থাকে তাই আছে, খুলে দেখা গেল ভিতরে ঝাঁপিটা নেই।

হৈমন্তী দেবীর মাথায় হাত। এখন কী করবেন তিনি? কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন শান্তিনিকেতনে, মাঝে-মাঝেই আসেন, এসে থেকে যান কয়েকদিন করে। এবার এসেছেন একটু বেশিদিনের জন্য। দু-একটা জরুরি কাজ আছে, সেরে যেতে হবে। সঙ্গে বরাবরের মতো তাঁর আয়া পদ্মা আছে, আর আছে এই বাড়িটি যে দেখাশুনো করে সেই আদিবাসী মেয়ে রঙ্গি। পদ্মা তার কাছে আছে বছর সাত-আট হয়ে গেল, রঙ্গিও আছে তিন বছর ধরে। এসেই এই কাণ্ড।

ঠিক মনে আছে, একটার সময় তিনি স্নান করতে গেলেন, ফিরে এসে দেখলেন মাছওলা দাঁড়িয়ে আছে টাকার জন্যে, ঝাঁপি থেকে তাকে টাকা দিলেন। পদ্মাকে বললেন, "শোন ঝাঁপিতে অনেক টাকা। এটা এক্ষুনি আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ।" তারপর হেসে বলেন, "সবাই বলে, দেখবেন আপনার এই ঝাঁপি একদিন ঠিক চুরি হয়ে যাবে। কেউ সুযোগ বুঝে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে যাবে।"

পদ্মাও হেসে বলে, "বুঝলে মা, যারা মতলব করে তারা তোমার আলমারি থেকেও চুরি করতে পারে। তুমি তো সকলকে দেখিয়ে এটা থেকে টাকা বার করো।"

"ঠিক আছে, তুই না করলেই হয়। এখন তো তুই-আমার গার্জেন, তোর হাতেই তো আমার সব।"

রঙ্গি এসে বলল, "পোদ্মা বুলছে, উর বিহাতে উ তোমার কাছ থেকে একটা সোনার হার লিবে।"

"সোনার হার! ওরে বাপরে। সোনার কত দাম জানিস? ভারি তো শখ দেখছি তোর।"

রঙ্গি বলল, "হামিও ছাড়বুনি, হামিও লিব। তুমি ঘোটা করে পোদ্মার বিহা দিবে আর আমাকে একটা রুপহার পৈছে গড়িয়ে দিবে না, সে হোবেনি।"

কুল খেতে-খেতে মুখ সাদা করে ছুটে এল অন্তু। সে যে কখন কোথায় থাকে ধরতেই পারেন না হৈমন্তী দেবী। সারাদিন বাইরে-বাইরে ঘুরছে। সারা শান্তিনিকেতন তার নখদর্পণে। কত বন্ধু যে জুটিয়ে নিয়েছে, তার ঠিক নেই। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "শোনো দিদা, আমি খেয়ে উঠেই সুমনকাকুর বাড়ি যাচ্ছি, কাকুর সঙ্গে আলমবাজার যাব। কাকুর ফরেস্টার বন্ধু দারুণ দাবা খেলে, আমি তাকে হারিয়ে দেব।"

অন্তু হৈমন্তী দেবীর নাতি। এখন তার ছুটি, তাই সে দিদার সঙ্গে এসেছে। মহা দুষ্টু, কিন্তু হাতে একখানা বই ধরিয়ে দিলে আর কথা নেই। বই তার নেশা। গোগ্রাসে গেলে। বই পেলে বিশ্বসংসার ভুলে যাবে। এখানে এসে বই পাচ্ছে না, যে দুটো নতুন বই নিয়ে এসেছিল, কোন জন্মে শেষ হয়ে গেছে। কেবল ডিটেকটিভ বই পড়বে। বয়েস এগারোর কাছাকাছি। হৈমন্তী দেবী ঠিক করেছেন, এবার থেকে ওর রুচিটা একটু বদলাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অন্তু যে বড় হয়ে ডিটেকটিভই হবে, এ বিষয়ে তাঁর নিজের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সুমন মুখার্জি এখানকার এস. ডি. পি. ও., হৈমন্তী দেবীর বন্ধুর ছেলে অন্তুর বেকার অবস্থার দুষ্টুমি দেখে একটা দাবার সেট কিনে এনে দিয়েছে। দুর্দান্ত বুদ্ধি। দুদিনেই চমৎকার শিখে নিয়েছে। এখন ডিটেকটিভ বই ভুলে সারাদিন শুধু দাবা আর দাবা। দাবা বিনে কথা নেই।

হৈমন্তী দেবী পদ্মার হাতে চাবি দিলেন, পদ্মা আলমারি খুলে দ্বিতীয় তাকে ঝালিটা রাখল, আলমারি বন্ধ করল, টেনে দেখল, তারপর চাবিটা আবার হৈমন্তী দেবীর হাতে দিল। হৈমন্তী দেবী সেই চাবি কোমরে গুঁজে অন্তুকে নিয়ে খেতে এলেন খাবার ঘরে। ঘড়িতে তখন ঠিক দুটো বাজতে সাত।

খেয়ে উঠে একটু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, মালির সাইকেল নিয়ে অন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করতে করতে চলে গেল সুমনের বাড়ি। অন্তুর সাইকেল চালানো দেখে হৈমন্তী দেবীর হাসি পেল। সিটে বসলে নাগাল পায় না, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে কী অদ্ভুতভাবে যাচ্ছে। এই অন্তুটার জন্যই তিনি কলকাতা ছাড়তে পারেন না, নইলে কবে এখানকার বাসিন্দা হয়ে যেতেন। শান্তিনিকেতন তাঁর খুব ভালো লাগে।

তিনি যতক্ষণ বারান্দায় বাগানে একটু ঘোরাঘুরি করলেন, ততক্ষণে পদ্মা আর রঙ্গি কাজকর্ম গুছিয়ে স্নান করে খেতে বসল। রঙ্গি বলেছিল, আজ একবার বাড়ি যাবে। খেয়ে উঠে বলল, "আজ আর যাবুনি।"

তিনি বললেন, "সেই ভালো। রোজ-রোজ কার জন্য ঘরে যাস? কেউ তো নেই।"

তা ঠিক। রঙ্গির কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল, খুব নাকি সুন্দর ছিল। এন. সি. সি-র সাহেব বিয়ে করে দিল্লি নিয়ে গেছে। রঙ্গি তার ঠিকানা জানে না, কেবল একে-ওকে জিজ্ঞেস করে। শেষে কী ভেবে ফাঁকা ঘরে গিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। লেপেপুঁছে পরিষ্কার করে ফেলে ঘরটা।

হৈমন্তী দেবী ঘরে এসে কোমর থেকে চাবি খুলে বালিশের কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙে দেখলেন, বেলা পড়ে এসেছে। মালির ছেলে দাশু বলল, "আমি দোকানে যাচ্ছি। সর্ষের তেল আর চাল আনতে দেবেন বলেছিলেন।"

হৈমন্তী বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁড়া। টাকা নিয়ে যা

ঘরে এসে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন, অবধারিতভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিলেন, তারপরেই তাকিয়ে তাঁর চোখ কুঁচকে গেল। ঝালিটা সেখানে নেই। অন্যান্য তাক হাতড়ালেন, নেই। কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সব ঘেঁটে সরিয়ে দেখলেন, নেই। বিস্মিত হয়ে ভয়ের গলায় ডাকলেন ''পদ্মা, পদ্মা।''

পদ্মা খাবার জল ধরছে বাইরের কল থেকে, ছুটে এসে সে বলল, ''কী হয়েছে মা?''

''নেই।''

''কী নেই?''

''দ্যাখ তুই, আমি তো পাচ্ছি না।''

''কী পাচ্ছ না?''

''ঝালিটা।''

''ও ঝালিটা? সে তো আমি মেজো তাকে রেখেছি।'' পদ্মা এগিয়ে এল। তারপর সে-ও আলমারি তছনছ করে ফেলল, ঝালিটা সত্যি নেই।

গেল কোথায়? নেবে কে? আলমারি তো তালা দেওয়া। চাবি তো তাঁর কাছে। রঙ্গিও তন্ন-তন্ন করল, নেই তো নেই। আলমারি ছেড়ে তখন সারা বাড়ি খোঁজা শুরু হল। রান্নাঘর, বাথরুম পর্যন্ত। অবস্থা দেখে দাশু বলল, ''এখন আমি যাই মা, কাল সব এনে দেব।''

হৈমন্তী স্তম্ভিত।

আলাদা করে এবার তিনি পদ্মা আর রঙ্গির সঙ্গে কথা বললেন, ''দ্যাখ, তোরা ছাড়া তো বাইরের কেউ নেই, কে নেবে? যদি হঠাৎ কোনও লোভবশত করে থাকিস আমাকে বল, আমি এ-নিয়ে আর কাকে কিছু বলব না।''

ওরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ''বিশ্বাস করো, আমরা নিইনি মা। আমরাও অবাক হয়ে যাচ্ছি ঝালিটা গেল কোথায়! অতগুলো টাকা। এদিকে আলমারি বন্ধ।''

বেলা পাঁচটা থেকে সন্ধে সাতটা হয়ে গেল, ঝালি তো খুঁজে পাওয়া গেল না, কে চোর তাও বোঝা গেল না। ভোম্বল এল। ভোম্বল তাঁদের কলকাতার প্রতিবেশী, অবসরপ্রাপ্ত জজবাবুর নাতি, অবিনাশ-ব্যারিস্টারের ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো না হোক, দেখতে বড় সুন্দর ছেলেটা। হৈমন্তী দেবী খুব ভালোবাসেন। ভোম্বল বলল, ''দিদা, আমি কিছুতেই দুপুরে আসতে পারলাম না। আমার এক মামাতো ভাই আমাকে জোর করে সিনেমায় নিয়ে গেল, রেস্টুরেন্টে খাওয়াল, বলল কলকাতায় এই দিদার কাছে তো বারোমাস-ই থাকিস, বারোমাস-ই খাস, আজ আমি খাওয়াব। তুমি রাগ করোনি তো?''

ভোম্বলও কয়েকদিন হল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসেছে। সকালের দিকে প্রায়ই আসে। আজও এসেছিল। হৈমন্তী দেবী বলেছিলেন, ''দুপুরে এসে আমার সঙ্গে খাস।'' আসেনি। এল এখন। তিনি বললেন, ''আজ বাড়িতে বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়েছে।''

ভোম্বল উদ্বিগ্নভাবে বলল, ''কী?''

হৈমন্তী দেবী বললেন, ''আমার ঝালিটা চুরি হয়ে গেছে।''

''তোমার ঝালিটা? ওই সুন্দর ঝালিটা। বেশি টাকা পয়সা ছিল না তো?''

''তা ছিল।''

"ছিল? কত?"

"সে-কথা বলে আর কিছু লাভ নেই। কিন্তু কী করে গেল সেটাই তাজ্জব ব্যাপার।"

সতেরো বছরের ভোম্বল, ষাট বছরের বুড়োর মতো পাকা গলায় বলল, "এ যে একদিন হবে তা আমি জানতাম। কলকাতায় হয় না, সেখানে অনেক লোক। এখানে আর অসুবিধে কী? আমি তো সকালেও দেখে গেলাম, ঝালি খুলে রঙ্গিকে তুমি বাজারের পয়সা দিচ্ছ।"

"সকালে কেন, দুপুরেও ছিল। আলমারির ভিতরে চাবি দেওয়া ছিল।"

"তা সেখান থেকে কী করে যাবে? তালা ভাঙল কে?"

"তালা তো ভাঙেনি। সেটা যেমনকে তেমনই আছে। শুধু ভিতরে ঝালিটা নেই।"

"চাবি কোথায় ছিল?"

"যেমন থাকে, বালিশের তলায়।"

ভোম্বল ঠোঁট ভ্যাটকাল, "দেখলে তো, তোমার অত আদরের অত ইয়ে, কীরকম বিশ্বাসী। আরে বাবা, ওই পথের মানুষকে পথেই মানায়। ঘেঁটুফুল ফুলদানিতে মানায় না।"

বোঝা গেল ঘেঁটু ফুলটা কে। পদ্মাকে হৈমন্তী দেবী বলা যায় পথের থেকেই কুড়িয়ে এনেছেন। সাত-আট বছর আগে পদ্মা বালিকাই ছিল। মিষ্টি চেহারার সরল নিষ্পাপ মুখ একটা মেয়ে। পথে বসে কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কোথাও যেতে-যেতে তাকে দেখতে পেয়ে তিনি থামলেন, পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "কাঁদছিস কেন রে?" আদরে যদিও ফোঁপানিটা বেড়ে গেল, কিন্তু ছোট্ট জীবনের ইতিহাসটি ও বলল—মা-বাবা নেই, জ্যাঠা-জেঠিমার কাছে থাকত, আজ তারা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই শহরে এসেছে খেটে খাবে বলে। কিন্তু যাদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে তারা ফেলে যে কোথায় গেল আর খুঁজে পাচ্ছে না, তাই পথ হারিয়ে কাঁদছে। হৈমন্তী দেবী তক্ষুনি তাকে রিকশাতে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। সেই থেকে সে আছে এতদিন। বলা যায় প্রায় বাড়িরই মেয়ে। তেমনই আদরেই তাকে তিনি রাখেন। বাড়ির সব্বাই তাকে ভালোবাসে। বিশেষত অন্তু। অন্তু একেবারে পদ্মাদি-অন্ত প্রাণ।

একটা বিয়ে ঠিক করেছেন। তাঁদেরই ড্রাইভারের ছেলে। টেন পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে এখন কোন গ্যারেজে কাজ শিখে মেকানিক হয়েছে, ভালো রোজগার করে, ছেলেও খুব ভালো। ভোম্বলের কথায় হৈমন্তী দেবী দুঃখিত হলেন, কিন্তু প্রতিবাদও করতে পারলেন না। কে জানে কার মনে কখন কী পাপ ঢোকে, কী দুর্মতি হয়। সোনার হার করে করে যা অস্থির! তিনি যতই দিন সোনার হার তো দেবেন না? সারা দুপুর তিনি নিজে আর পদ্মা রঙ্গি ছাড়া তো কেউ ছিলও না। সুযোগও ছিল। পদ্মা জানত ঝালিতে কত টাকা আছে। ম্লান মুখে চুপ করে রইলেন।

ভোম্বল এরপরে সাঙ্ঘাতিক চোটপাট করল ওদের পরে। উত্তেজিত হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজিও করল। তারপর বলল, "বাবা বলে দিয়েছেন, আমাকে আজই বাড়িতে ফিরতে হবে। এখন সিউড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে চলে যাব। ওই কথাই বলতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার যা অবস্থা দেখছি, এভাবে একা রেখে যাই কী করে? আজ না গেলেও তো

নয়।''

ব্যস্ত হয়ে হৈমন্তী দেবী বললেন, ''না, না, তুই থেকে কী করবি? যা হবার তা তো হয়েইছে। ওরা আছে।''

''ওরা আছে!'' রাগে গরগর করল, ''দুটো ডাকাত। তোমার অতিরিক্ত সাহস। তুমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দাও। রিটন কমপ্লেইন দাও, নয়তো কাজ হবে না। তুমি লিখে দাও, আমি বরং যাবার পথে দিয়ে যাই।''

হৈমন্তী দেবী বিষণ্নভাবে বললেন, ''এখানকার এস. ডি. পি. ও. সুমন মুখার্জি আমার খুব চেনা। এক্ষুনি এসে যাবে অন্তুকে নিয়ে। তারপর দেখি কী হয়।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্তু কই? চুরির খবরে অন্তুর কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।''

সুমনের আসতে বেশ দেরি হল। অন্তু টগবগ করে লাফাচ্ছে, সুমনকাকার সঙ্গে সে একটা খুনের জায়গায় গিয়েছিল। একজন বড় গোয়েন্দাও সঙ্গে ছিল। সুমন বলল, ''আর বলবেন না মাসিমা, গিয়েছি বন্ধুর কাছে ছুটির দুপুর কাটাতে, গিয়েই এই সংবাদ। ছুটতে হল গাঁওহরিদ্রায়, পথ কি কম নাকি? উঁচু-নিচু গ্রামের মাঠ দিয়ে যাওয়া, পুলিশ নিয়ে, জিপ নিয়ে—ওই জন্যই দেরি হয়ে গেল ফিরতে। আপনি চিন্তা করেননি তো?''

হৈমন্তী দেবী হাসলেন, ''অন্তু তবে একটা জলজ্যান্ত গোয়েন্দা চোখে দেখে এল? তার উপরে খুনের তদন্ত? কিন্তু বাড়িতেও যে একটি তদন্তের ব্যাপার ঘটে গেছে সুমন, তার কী করি বলো তো?''

''কী হল?''

''তুমি তো দেখেছ, ব্যবসাদারদের যেমন একটা হাত-বাক্স থাকে, আমার ঠিক তেমনই একটা ঝালি থাকে পাশে। শুধু এটা আনতে হবে, সেটা আনতে হবে—সারাদিন পঞ্চাশবার উঠে-উঠে আলমারি খোলা মহাঝামেলা। ওই ঝালির তালা খুলেই পয়সা-টাকা যে যা চায় দিই।''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো আমি বরাবর দেখে আসছি।''

''ওই ঝালিটি চুরি গেছে।''

''মানে?''

''কিছু বেশি টাকা ছিল তার মধ্যে, সেজন্য বেশি সাবধান হয়ে ওটাকে আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে রেখেছিলাম।''

''অর্থাৎ ঝালিতেও তালা ছিল, আলমারিতেও চাবি ছিল?''

''হ্যাঁ।''

''তারপর?''

''আলমারি খুলে দেখি ঝালিটা নেই।''

''সে কী। কত টাকা ছিল?''

''সাড়ে তিন হাজার।''

''সাড়ে তিন হাজার?''

''হ্যাঁ।''

''সেই টাকাসুদ্ধ ঝালিটা নেই? অথচ আলমারি বন্ধ আছে।''

'হ্যাঁ।''

''আশ্চর্য, কখন টের পেলেন?''

''বেলা দেড়টা নাগাদ ওটা খুলে আমি টাকা বার করেছি, তারপর তালা বন্ধ করেছি, তারপর আমার সামনে পদ্মা আলমারি খুলে ঝালি রেখে আলমারি বন্ধ করে চাবি আমার হাতে দিয়েছে।''

''সেই থেকে চাবি আপনার কাছে?''

''হ্যাঁ।''

''আলমারিটা বন্ধ করেছে কি করেনি, তা কি আপনি নিজে টেনে দেখেছিলেন?''

''না।''

'ওই তো আপনাদের দোষ। সকলকে এত বিশ্বাস করেন? বাড়িতে তখন আর কে ছিল?''

''আমি, রঙ্গি আর পদ্মা।''

''কেউ এসেছে তার মধ্যে?''

''না।''

''তাহলে আর তদন্তের প্রয়োজন কী? চোর তো আপনার ঘরেই রয়েছে। কাকে সন্দেহ করেন? পদ্মা, না রঙ্গি? নাকি দুজনেরই সাঁট আছে, এত টাকা যখন।''

''আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না সুমন। এদের সন্দেহ করতে আমার খুব খারাপ লাগছে, অ্যাদ্দিন ধরে আছে...''

''দাঁড়ান দেখছি। পদ্মা...'' সুমনের পুলিশি গলা বেরিয়ে এল।

পদ্মা ভয়ে জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়াল।

''দুপুরবেলা তুমি আর রঙ্গি ছাড়া আর কেউ বাড়িতে ছিল?''

''না দাদাবাবু।''

''শুধু তোমরা দুজন ছিলে?''

''হ্যাঁ।''

''কী করছিলে?''

'ঘুমোচ্ছিলাম।'

''রঙ্গি কী করছিল?''

''ও-ও ঘুমোচ্ছিল।''

''মাসিমাও ঘুমোচ্ছিলেন?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

''দরজা বন্ধ রইল, আলমারি বন্ধ রইল, তোমরা ঘুমিয়ে রইলে, ঘরে আর কেউ ঢুকল না, তবে ঝালিটা গেল কোথায়?''

''আমি কিছু জানি না, আমি কিছু করিনি, আমি নিইনি দাদাবাবু।''

সুমন প্রচণ্ড গলায় ধমক দিয়ে বলল, ''ন্যাকামি কোরো না। বলো টাকা কোথায় গেল। ও-সব মেকি-কান্না ঢের দেখেছি।''

''আমি জানি না, দাদাবাবু।'' হাউমাউ করে উঠল পদ্মা আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্তুও কেঁদে ফেলে বলল, ''পদ্মাদিকে কেন বকছ, পদ্মাদি নেয়নি।''

অন্তুর অবস্থা দেখে হৈমন্তী দেবী বললেন, "আজ বরং থাক সুমন, কাল যা হয় হবে।"

"তা তো হবেই। আমি কি ছাড়ব নাকি? টাকা তো এরাই নিয়েছে। সাড়ে তিন হাজার টাকা কি কম? কী দুর্জয় সাহস। সাব-দারোগাকে পাঠিয়ে দেব কাল। দু-চারটে রুলের গুঁতো না খেলে কি সিধে আঙুলে ঘি উঠবে?"

"না না, না।" অন্তু পদ্মাকে জড়িয়ে ধরল।

চলে গেল সুমন। বলে গেল এক্ষুনি গিয়ে একটা পুলিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি, এদের চোখে-চোখে রাখা দরকার।

পরের দিন সুমন আবার সেই খুনের তদন্তে কোথায় চলে গেল, আসতে পারল না। কিন্তু পুলিশ-প্রহরায় রইল, দারোগাও এলেন। তিনি এসে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেললেন পদ্মা আর রঙ্গিকে। হৈমন্তী দেবীকে বললেন, "আপনার আদিবাসী মেয়েটি মক্রমপুরের। মক্রমপুর হচ্ছে এখানকার বিখ্যাত গুণ্ডা-বদমাশদের আড্ডা। যদ্দুর সম্ভব দুটোতে মিলে সাঁট করেই করেছে। ওই জন্যেই বাড়ি গেল না। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করানো যাচ্ছে না। আসলে পিছনে মস্ত গ্যাং আছে, তাই ভয় কম। জানে ওরাই রক্ষা করবে। আজ রোববার, কিচ্ছু করা যাবে না; কাল থানায় নিয়ে গিয়ে যা করব, তখন দেখা যাবে এত সাহস বাছাধনদের থাকে কোথায়।"

হৈমন্তী ভীত গলায় বললেন, "মারধর করবেন না তো?"

দারোগা বললেন, "প্রয়োজনমতো সবই হবে, দুটো-চারটে আঙুল ভেঙে দিলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে সব কথা।"

"না, না, না।" হৈমন্তী দেবী প্রায় আর্তনাদ করে বললেন. "যা বলবার বাড়িতে জিজ্ঞেস করুন। ওসব থানা-টানার দরকার নেই।"

সে-কথা গ্রাহ্য না করে চলে গেলেন দারোগাসাহেব।

পুরো দুটো দিন দুটো রাত কারও ঘুম নেই, খাওয়া নেই, কী অবস্থা! টাকার কষ্ট ভুলে এখন হৈমন্তী দেবীর পদ্মা আর রঙ্গির চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে। একথা ভেবেই বেশি কষ্ট বোধ করছেন, এই অপকর্মটি ওরা কেন করল? ধরা যে পড়বেই সে তো জানা কথা। এদিকে অন্তু সাঙ্ঘাতিক মনমরা হয়ে আছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না, বিশেষত দিদার উপরই তার রাগ বেশি। দারোগাবাবু এসে মারবার মতো করে কত বিশ্রী-বিশ্রী গালিগালাজ করে গেলেন, টেবিলে হান্টার মেরে-মেরে কত ভয় দেখালেন, অথচ দিদা একটুও প্রতিবাদ করল না। সেজন্য দিদাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

দুপুরবেলা খুব মন খারাপ করে শুয়ে ছিল। দিদা পাশে শুয়ে বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাকুম-বাকুম পায়রা ডাকছে বাইরে, শিরীষ গাছের শুকনো ফলগুলো বাতাসে নড়ে-নড়ে গানের মতো আওয়াজ করছে। শুনতে-শুনতে সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। খাট থেকে নামল, তারপর নরম পায়ে ঘুরতে লাগল ঘরের মধ্যে। সেই মুহূর্তে নিজেকে সে অন্তু ভাবছিল না, কোনও বইয়ের কোনও বড় ডিটেকটিভের সঙ্গে একাত্ম বোধ করছিল। কচি মুখের চেহারা। তাদের মতোই পাশ করে রীতিমত গম্ভীর। আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করবেই করবে, এই তার পণ। তার দৃঢ় ধারণা, যে-কোনও ভাবে হোক, একটা চোর

ঘরে ঢুকেছিল। পদ্মাদি কক্ষনো চুরি করেনি। রঙ্গিদিও না।

সব ঘর ঘুরে রান্নাঘরে এল। দেখল দরজাটা আধো-খোলা, সংলগ্ন চাতালের রোদে পদ্মাদি আর রঙ্গি শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা রোজই এরকম ঘুমোয়। তাদের পাশ কাটিয়ে সে বাইরে এল। কিন্তু তারা জেগে গেল না, আর তক্ষুনি মনে হল চোর এভাবেই ঢুকেছিল। সে আবার পাশ কাটিয়ে যেন চোর ঢুকছে সেভাবেই ঘরে ঢুকল, এখনও তারা টের পেল না। এবার অন্তু সন্তর্পণে দিদার মাথার কাছে এসে আস্তে চাবিটা নিল। তবু দিদা টের পেলেন না। চাবি নিয়ে আলমারি খুলল। মজা তো! তবে তো চোর এই পথেই এসে এইভাবেই আলমারি খুলে চুরি করেছে; যেখানে ঝালিটা ছিল হাত দিল সেখানে। কোণের দিকে কী একটা হাতে লাগতে টেনে এনে দেখল একটা ছোট্ট গোল, চারপাশে সোনালি কাজ করা আয়না। বুকের ভিতর বিদ্যুৎ চমকে উঠল। চকচক করল চোখ, বুঝে ফেলল চোর মশায়টি কে।''

তক্ষুনি চাবি ছুঁড়ে ফেলে আলমারি খোলা রেখে ধাক্কা মেরে দিদাকে জাগিয়ে গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, ''দিদা, আমি চোর ধরেছি, এই যে তার চিহ্ন। কেমন করে কীভাবে ঘরে ঢুকেছে, তাও আমি দেখিয়ে দিতে পারি। তুমি পুলিশ পাঠিয়ে ওকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসো।''

অন্তুর মুখ লাল, উত্তেজনায় সে থর-থর করে কাঁপছে।

ঘুম-চোখে কিছুক্ষণ নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দিদাও উত্তেজিতভাবে উঠে বসলেন, ''কী বলছিস তুই? কে চোর? কোথায় চোর।''

''এই দ্যাখো, এই দ্যাখো।''

''কী এটা?'' তারপরেই আয়নাটা দেখে অবাক হয়ে বললেন, ''ওমা, এটা তুই কোথায় পেলি? এ-আয়নাটার কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কী সুন্দর আয়নাটা, তোর ছোট-পিসি দিয়েছিল আমাকে। সব সময়ে আমার ব্যাগে থাকত, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি নেই।''

''এটা তোমার আয়না?''

''পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেও তো আয়নাটার কথা আমার মনে পড়েনি।—কী লক্ষ্মী ছেলে, কেমন আমার আয়নাটা খুঁজে পেয়েছে।''

হাত বাড়িয়ে আদর করতে গিয়েছিলেন, অন্তু সবেগে সরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলল, ''এটা মোটেও তোমার আয়না নয়। এ-আয়না ভোম্বলদার, সব সময় ভোম্বলদার পকেটে থাকে। এ-আয়না আমি আলমারিতে পেয়েছি? ওই ঝালি ভোম্বলদা চুরি করেছে। ভোম্বলদার পকেট থেকে এ-আয়না পড়ে গেছে সেখানে।''

''ভোম্বলদা!'' অন্তুর কথা শুনে হৈমন্তী দেবী অবাক।

''হ্যাঁ, ভোম্বলদা। ভোম্বলদা মিছে কথা বলেছে, দুপুরে এসে নিজে চুরি করে সন্ধেবেলা এসে পদ্মাদির নাম বলেছে।''

''অন্তু!'' তিরস্কারের গলায় নামটা উচ্চারণ করে হৈমন্তী দেবী বললেন, ''তুমি কাকে কী বলছ, তা জানো না।''

''জানি। ভোম্বলদা ভালো না। একটুও ভালো না। আমি একদম দেখতে পারি না ভোম্বলদাকে। আমি ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হই বলে একা পেলেই আমার মাথায় টকাটক

চাঁটা মারে, আর বাড়ির কাছে দেখলে আদর করে।''

''যা বলেছো আমার কাছে বলেছো, আর যেন কখনও এ-কথা কেউ তোমার মুখ থেকে না শোনে। ছি ছি ছি, নিজের দাদার মতো কত ভালোবাসে, চকোলেট এনে দেয়, ক্যারম খেলে বসে-বসে!''

লজ্জায় মরে গেলেন হৈমন্তী দেবী। ভোম্বলকে কেন যে অন্তু দেখতে পারে না, কে জানে। ভোম্বলের বাবা অবিনাশ যদি শোনে এ-কথা? ছি ছি। ওর দাদু জজবাবু যদি শোনেন। কত সম্ভ্রান্ত লোক—ছি ছি—''

দিদার গরম গলা শুনে অন্তু ধড়াস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। এতখানি বয়সে কোনও দিন তো দিদার গলায় এরকম গরম শোনেনি। মা বকেন বলে কত রাগ করেন। আর আজ কিনা সে ওই দুষ্টু ভোম্বলদাটার জন্য বকুনি খেল?

হৈমন্তী দেবী তক্ষুনি পদ্মা-রঙ্গিকে ডেকে সব গুছিয়ে নিতে বললেন। আর এখানে থাকা নয়। কাল ভোরের ট্রেনেই চলে যাবেন কলকাতা। সুমন সন্ধেবেলা এলে বললেন, ''টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করে দরকার নেই। যা গেছে গেছে। কারা নিয়েছে সে তো বোঝাই গেল। রঙ্গিকে ছাড়িয়ে দিয়ে যাব। ব্যবস্থা যা হয় কলকাতা গিয়ে হবে। এখানে থাকাটা অন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে।

রাত্রিবেলা সাড়ে নটার ট্রেনে এক অপ্রত্যাশিত অতিথি এসে হাজির। সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা, অন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে, পদ্মা-রঙ্গিও শুয়ে পড়েছে, হৈমন্তী দেবী জানালা দিয়ে দেখে দরজা খুলে অবাক হয়ে বললেন, ''তুমি। হঠাৎ। এখানে?''

''এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলেন?''

''আর কী? শান্তিনিকেতনে তো এখন গভীর রাত। আমার বাড়িতেই আলো। কী ব্যাপার? এসো, এসো। এই পদ্মা, ওঠ দ্যাখ কে এসেছে।'' অতিথি বলল, ''খুব একটা জরুরি কাজে এসেছি মাসিমা। কথাটা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই শুধু বলতে চাই।''

''বলো।''

অতিথি কোনও ভণিতা না করে বলল, ''আমার পুত্রটি গুণধর। নানারকম কু-অভ্যাস তো হয়েইছে, তাবলে তার অধঃপতন যে এতদূর এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যাই হোক, সংক্ষেপে ঘটনাটা এই, ভোম্বল চুপিচুপি দুপুরবেলা এসে আপনার আলমারি থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করেছে। সিনেমার হিরো হবে। ওই টাকা নিয়ে পালিয়ে বম্বে যাচ্ছিল আর-এক বন্ধুর সঙ্গে। ওর মা ধরে ফেলেছেন। আমার হাতে যথেষ্ট মার খেয়ে শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, এ-টাকা সে কোথায় পেল, কীভাবে চুরি করল। এই সেই টাকা।''

রাবার-ব্যাণ্ড আটকানো টাকার বাণ্ডিলটা ভোম্বলের বাবা অবিনাশ বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন।

হৈমন্তী দেবীর মুখে আর বাক্য সরল না। চকিতে একবার অন্তুর দিকে তাকালেন শুধু।

কাঠের পা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে খোঁজ পেল হরিয়া মালী।

বেশ বেলা হয়েছে। এ সময়ে প্রফেসর উঠে পড়েন। সোজা রাস্তা ধরে বাদামতলা পর্যন্ত বেড়িয়ে আসেন। তারপর বারান্দায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দেন।

হরিয়াই চা তৈরি করে দেয়। বিস্কুট কেনা থাকে।

হরিয়া উঁকি দিল। দরজা বন্ধ, জানালাগুলোও।

এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক; কারণ, এই পাহাড়ে-জায়গায় শীতের প্রকোপ বেশি। একটু পরে হরিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। কোনও সাড়া নেই।

আশ্চর্য কাণ্ড, এরকম তো হবার কথা নয়। হরিয়া দরজায় কান পেতে রইল। না, নিস্তব্ধ। ক্রাচের কোন শব্দ নেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকল না। হরিয়া বেরিয়ে গেল।

একটু দূরে দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি। অবসরপ্রাপ্ত নামজাদা সাবজজ। প্রফেসরের বিশেষ বন্ধু।

হরিয়া ডাকল, সরকার বাবু, সরকার বাবু।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দীনবন্ধু সরকার একটা বই পড়ছিলেন, হরিয়ার চিৎকারে এগিয়ে এলেন।

কি রে হরিয়া?

—আজ্ঞে, প্রফেসরকে এত করে ডাকছি, কোন সাড়া পাচ্ছিনা।

—সেকি? চল্, আমি যাচ্ছি। দীনবন্ধু সরকার কোট গায়ে দিয়ে হরিয়ার পেছন পেছন এ বাড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

হরিয়া আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

দীনবন্ধু সরকার চিৎকার করলেন, প্রফেসর, ও প্রফেসর।

কোনও সাড়া নেই। দীনবন্ধু সরকার চিন্তিত হয়ে বলেন।

—আমি তো ভালো বুঝছি না হরিয়া। তুই সাইকেল করে একবার থানায় চলে যা। আমার নাম করে ছোট দারোগাকে আসতে বল্।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে হরিয়া সাইকেলে বেরিয়ে গেল।

দীনবন্ধু দরজার একটা গাছের গুঁড়িতে বসলেন।

প্রফেসর এখানে আছেন দশ বছরেরও বেশি। কোন এক কলেজে পড়াতেন। বিপত্নীক। রিটায়ার করে এখানে আস্তানা বেঁধেছেন।

নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। হরিয়া দেখাশোনা করে। আদিবাসী একটি তোড়া দুবেলা রেঁধে দিয়ে যেত।

মাঝে মাঝে কিছু লোক আসত। প্রফেসর বলতেন, ছাত্রের দল মাঝে মাঝে জ্বালাতে আসে। আর বলেন কেন? কিছু কী আর মনে আছে। এখন কতরকম নতুন থিয়োরি বের হয়েছে।

প্রফেসর বোটানি পড়াতেন। মাঝে মাঝে কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যান। গাছপালা সংগ্রহ করে আনেন। প্রফেসরের একটা পা নেই! হাঁটু থেকে কাঠের পা লাগানো। বগলে ক্রাচ। এ-অসুবিধেয় প্রফেসর অভ্যস্ত। অবসর গ্রহণ করার আগেই এক দুর্ঘটনায় পা হারিয়েছিলেন। রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের তলায় পাটা থেঁতলে গিয়েছিল। যমে মানুষে টানাটানি। পা কেটে বাদ দিয়ে প্রফেসর বাড়ি ফিরেছিলেন।

প্রফেসর দীনবন্ধুবাবুর দাবার সঙ্গী। রোজ সন্ধ্যায় দুজনে দাবার বোর্ড পেতে বসেন। খেলা জমে উঠলে দুজনের কেউই উঠতে চান না।

হরিয়া ডেকে ডেকে প্রফেসরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত।

সাইকেলের শব্দ হতে দীনবন্ধুবাবু ফিরে দেখলেন। হরিয়া সাইকেলে ফিরছে।

—কিরে কী বলল?

—ছোট দারোগা জিপে করে আসছেন।

দীনবন্ধু রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই পথের বাঁকে জিপ দেখা গেল। শুকনো পাতার স্তূপ উড়িয়ে দুরন্ত বেগে আসছে। ঠিক দীনবন্ধুবাবুর সামনে এসে জিপ থামল।

জিপ থেকে ও. সি. মোহন সিং লাফিয়ে নামল।

—নমস্কার সরকার সাব, কি ব্যাপার?

—কিছু বুঝতে পারছি না। প্রফেসরের দরজায় ধাক্কা দিয়েও দরজা খুলতে পারছি না।

—চলুন, দেখি একবার।

মোহন সিংয়ের ইঙ্গিতে জিপ থেকে একজন কনস্টেবল নামল। বন্ধ দরজায় সজোরে পড়ল বুটের লাথি। দরজার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। মোহন সিং হরিয়ার দিকে ফিরে বলল, এ বাড়িতে শাবল আছে?

হরিয়া একটা শাবল এনে দিল। কনস্টেবল দরজার ফাঁকে শাবল দিয়ে চাপ দিল। কয়েকবার চাপ দেবার পরেই দরজার কব্জা খুলে পাল্লা কাত হয়ে দাঁড়াল। মোহন সিং চাপ দিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

আগে মোহন সিং, তারপর কনস্টেবল, সবশেষে দীনবন্ধু সরকার আর হরিয়া।

বিছানার ওপর প্রফেসর শুয়ে। শোবার ভঙ্গিটা কারোরই ভালো ঠেকল না।

কাছে গিয়ে দেখল, চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখের দুপাশে ফেনা।

মোহন সিং দেহের ওপর হাত দিয়ে বলল, অনেকক্ষণ সব শেষ হয়ে গেছে। দেহ বেশ শক্ত।

দীনবন্ধুবাবুর দিকে ফিরে মোহন সিং জিজ্ঞাসা করল, কত বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের?

—তা প্রায় বাষট্টি হবে! রিটায়ার করার বয়সের আগেই কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। —কী মনে হচ্ছে আপনার?

স্বাভাবিক মৃত্যু বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখছেন মুখ-চোখের ভঙ্গি, যেন কেউ দমবন্ধ করে মেরেছে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কে মারল? সে বের হল কী ভাবে? দরজা-জানলা সব তো ভেতর থেকে বন্ধ।

মোহন সিং একটু চিন্তিত হল। এগিয়ে গিয়ে জানালাগুলো পরীক্ষা করল। জানালাগুলো সব ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া।

কাঠের পা আর ক্রাচ কোণের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

তাহলে আততায়ী এল কী করে? মোহন সিং বলল, আজ ডেড বডি পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিই। রিপোর্ট কী বলে দেখি, তারপর কর্তব্য ঠিক করা হবে।

কনস্টেবল জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেল। মোহন সিং ঘরে তালা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

—লোক এসে হাতের ছাপ নিয়ে যাবে। কলকাতা এখান থেকে খুব দূর নয়। দরকার হলে ফোরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট থেকেও লোক আসতে পারে।

মোহন সিং দীনবন্ধু সরকারকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি শেষ কবে প্রফেসরকে দেখেছেন?

দীনবন্ধুবাবু শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল এত দ্রুত একটা পরিচিত মানুষ চিরদিনের মতো চলে যাবে।

মোহন সিংয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, কাল রাত্রেও প্রফেসর আমার সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন। তবু একটু যেন অন্যমনস্ক ছিলেন। উনি খুব পাকা খেলোয়াড়। কোনদিন ওঁকে হারাতে পারিনি। কাল কিন্তু দুবার মাত করে দিয়েছি। আমি বলেছিলাম, কী হল প্রফেসর, মনটা কোন্‌দিকে? প্রফেসর চমকে উঠেই বলেছিলেন মন ঠিক আছে। দুপুর থেকেই শরীরটা খুব ভালো নেই। আজ তাড়াতাড়ি উঠব। রাত সাতটার মধ্যেই প্রফেসর উঠে পড়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমাদের তো বয়স হচ্ছে। শরীর সব দিন কী আর একরকম থাকে?

হরিয়াও মোহন সিং-এর প্রশ্নের উত্তরে নতুন কোন আলোকপাত করতে পারল না। কেবল বলল, দুপুর বেলা দুটি লোক এসেছিল, বোধহয় ছাত্রই হবে। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল।

প্রফেসরের দেহ পোস্ট মর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। লোক এসে হাতের ছাপও তুলে নিল। নানাদিক থেকে ঘরের ফটো তোলা হল। কলকাতার ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে।

দীনবন্ধু সরকার যখন বাড়ি ফিরলেন তাঁর তখন বেশ ম্রিয়মাণ অবস্থা। বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতেন না, একমাত্র প্রফেসর ছাড়া। এই বয়সে নতুন কোন বন্ধু করাও সম্ভব নয়।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগা কী শুনছি?

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধু বাবু বললেন, প্রফেসর মারা গেলেন।

—হঠাৎ? মানুষ কি আর বলে কয়ে মারা যায়। —আমার কিন্তু বাবু সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?

—জলজ্যান্ত লোকটা তা বলে এভাবে মারা যাবে?

—দেখি ডাক্তারের রিপোর্ট আসুক।

অন্যদিন দীনবন্ধুবাবু একটু বেড়িয়ে আসেন, আজ বাড়ির মধ্যেই বসে রইলেন। মনটা খুব খারাপ। কে যেন বলেছিলেন, পরমায়ু যেন পদ্মপত্রে জল, ঠিক কথাই।

বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থানার দিকে গেলেন। মোহন সিং থানায় ছিল। অভ্যর্থনা করে বলল, আসুন, আসুন কী খবর?

—খবর তো আপনাদের কাছে।

এই একটু আগে রিপোর্ট এসেছে, অবশ্য লিখিত রিপোর্ট নয়, ডাক্তার সেন ফোনে জানিয়েছেন করোনারি অ্যাটাক। যাক নিশ্চিন্ত। নয়তো এই নিয়ে ঝামেলা হত।

—করোনারি অ্যাটাকে?

—তাই তো বললেন। প্রফেসরের হার্টের অবস্থার কথা কিছু জানেন আপনি? তিনি কোনদিন কিছু বলেছিলেন?

—না, হার্টের অবস্থা খারাপ এমন কথা বলেননি। তবে খুব সাবধানী লোক ছিলেন। তিনমাস অন্তর রক্তপরীক্ষা করাতেন। সুগার, কোলেস্টেরল, ইউরিয়া সব চেক করাতেন।

মোহন সিং দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, আরে মশাই, যত চেকই করান, মৃত্যু যখন থাবা বসায়, তখন কিছুর পরোয়া করে না। সব রিপোর্ট বানচাল করে দেয়।

—আচ্ছা চলি।

দীনবন্ধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

মোহন সিংও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। স্যার, এই খবরের জন্য আপনি এতটা পথ হেঁটে এলেন কেন? বাড়িতে ফোন রয়েছে, ফোন করে জেনে নিলেই পারতেন।

—একটু হাঁটতেও বেরিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে খবরটা নিয়ে গেলাম।

দীনবন্ধু সরকার বাড়ি ফিরে এলেন।

সামনের বাগানে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন, আমি একটা কাজ করেছি।

—কী কাজ?

—পারিজাত বক্সিকে ফোন করে দিয়েছি।

দীনবন্ধু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, পারিজাত বক্সি কে?

—পারিজাত বক্সির নাম শোননি? বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা।

দীনবন্ধুবাবুর মনে পড়ে গেল। পারিজাতবাবুর সম্বন্ধে চমকপ্রদ নানা কাহিনী এখানে ওখানে শুনেছেন। খবরের কাগজের পাতায় পড়েছেন। বিখ্যাত গোয়েন্দা। ব্যোমকেশ বক্সির ভাইপো।

আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল। গৃহিণীর সঙ্গে পারিজাতবাবুর লতায় পাতায় কী একটা সম্পর্কও আছে—কী বললেন পারিজাত বক্সি?

—আজ রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। দীনবন্ধুবাবু হাতঘড়ি দেখলেন প্রায় ছ'টা।

শীতের বিকেল। এর মধ্যেই সন্ধ্যার রূপ নিয়েছে।

—তাহলে স্টেশনে কাউকে পাঠাতে হয়?

—কাকে আর পাঠাবে? কেউ তো ওকে চেনে না। তাছাড়া উনি বলেছেন, কাউকে স্টেশনে থাকার দরকার নেই। উনি ঠিক চিনে আসতে পারবেন না।

দুজনে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সাড়ে আটটা বাজল। পারিজাতবাবুর দেখা নেই। স্টেশন খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের পথ। রিক্‌শায় মিনিট পাঁচেক। ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে। স্টেশনের শব্দ বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে, নটা বাজল।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কুইগো, তোমার পারিজাত বক্সির কী হল?

—কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাকে তো বললেন, নিশ্চয় আসব।

—আর এসেই বা লাভ কি। প্রফেসরের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

পৌনে দশ, দুজনে যখন শুতে যাচ্ছেন, বাড়ির সামনে রিক্‌শা এসে থামল।

স্যুটকেস হাতে নিয়ে পারিজাত বক্সি নামলেন।

দীনবন্ধুবাবু পারিজাত বক্সিকে কোনদিন দেখেননি। তিনি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে বললেন, খুব লোক যা হোক, এই আপনার সাড়ে সাতটা?

পারিজাত বক্সি হাতজোড় করে দুজনকে নমস্কার করে বললেন, দেরি করে আসার জন্য মাপ চাইছি। কতকগুলো কাজ সেরে এলাম।

কথা হল খাবার টেবিলে।

দীনবন্ধুবাবুর ঠিক সময়ে খাওয়ার অভ্যাস। তিনি আগেই খেয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী আর পারিজাত বক্সি একসঙ্গে খেতে বসলেন।

একটা চেয়ার নিয়ে দীনবন্ধুবাবু সামনে বসেছিলেন।

—আমি বডিটা দেখে এলাম। করোনারি অ্যাটাক কি না জানি না, তবে হার্টফেল করে আপনাদের প্রফেসর মারা গেছেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বিছানায় বিষ জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। সেহেতু বিষের কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

—কীভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে আপনাদের বিশ্বাস?

দীনবন্ধুবাবুর প্রশ্নের উত্তরে পারিজাত বক্সি বললেন, এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা মুশকিল। আমাকে দিন কয়েক সময় দিন।

খাওয়া দাওয়ার পর স্যুটকেস থেকে বালিশ আর একটা বিলিতি কম্বল বের করে পারিজাত বক্সি বললেন, আমি চলি।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক।

—এত রাত্রে আপনি আবার কোথায় যাবেন?

—আমি প্রফেসরের বাড়িতে শোব।

—কিন্তু সে-বাড়ি তো তালাবন্ধ।

—আমি থানায় গিয়ে মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে চাবি নিয়ে এসেছি। আচ্ছা গুড নাইট। কাল সকালে দেখা হবে।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ি খালি।

হরিয়া মালীও নেই। প্রফেসরের মৃত্যু হবার পর আর তার এখানে রাত কাটাতে সাহস হয়নি।

তালা খুলে পারিজাত বক্সি ভেতরে ঢুকলেন।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। তারপর এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ালেন?

দুটো মাত্র ঘর। একটা একটু বড়, আর একটা ছোট। শোবার ঘরে একটা শেলফ। তাতে কিছু বোটানির বই, কিছু হালকা নভেল। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। একটা খাট।

ভেতরের ঘরে একটা আলনা। তাতে কিছু জামাকাপড় ঝুলছে। একটা দেয়াল আলমারি। তাতে কয়েকটা ওষুধের শিশি।

সেগুলো পেড়ে মনোযোগ দিয়ে পারিজাত বক্সি দেখলেন। ঘুমের-বড়ি, মাথা ধরার অ্যানাসিন। শেষের ওষুধটা দেখে মনে হল প্রফেসরের ডায়াবিটিস ছিল। একদিকে একটা ফাইল। সেটা পেড়ে নিয়ে পারিজাত বক্সি বিছানায় বসলেন। পরপর রক্তের রিপোর্ট, যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করিয়েছিলেন। সবই স্বাভাবিক, শেষদিকে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রক্তের শর্করা ভাগ খুবই সামান্য, ওষুধ খেয়ে প্রফেসর সেরে গেছেন।

পারিজাত বক্সি এবার আলনায় ঝোলানো জামাকাপড়গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। লম্বা কোটের পকেটে কিছু গাছের পাতা, বোধ হয় তাঁর বোটানি চর্চার জন্য, একটা রুমাল, নস্যির কৌটো।

সব দেখা হলে পারিজাত বক্সি প্রফেসরের বিছানাটা তুললেন।

না, কিছু নেই।

এ ভদ্রলোকের বোধ হয় কেউ কোথাও ছিল না, কোন চিঠিপত্র নেই। এমন কি ছাত্ররা আসা যাওয়া করত, তারাও কোনদিন একলাইন লিখে খোঁজ নেয়নি।

রীতিমত আশ্চর্যজনক।

পারিজাত বক্সি হাত-ঘড়িতে সময় দেখলেন।

রাত বারোটা বেজে গেছে। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। পারিজাত বক্সি উঠে বসে ঘরের চেহারাটা আর একবার দেখলেন।

কোণের দিকে একটা ক্রাচ আর কাঠের পা।

তিনি আগেই শুনেছিলেন প্রফেসর একটা পা হারিয়েছিলেন। কাঠের পা ব্যবহার করতেন।

পারিজাত বক্সি উঠে গিয়ে ক্রাচ আর কাঠের পা-টা নিয়ে এলেন।

ক্রাচটা দামি, বিলিতি কোম্পানি থেকে কেনা। চকচকে পালিশ। দামি কাঠ। বগলে চেপে ধরলে জায়গাটা ব্যথা হতে পারে, সেটা মোটা রবারের।

অবশ্য এটা খুব স্বাভাবিক। সারা জীবনের জিনিস। কাজেই এই নিত্যদিনের সঙ্গীটির পেছনে প্রফেসর যে পয়সা খরচ করবেন এটাই আশা করা যায়।

ক্রাচটা নাড়াচাড়া করতে করতে পারিজাত বক্সির ভ্রূকুঞ্চিত হল।

ক্রাচটির মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্ক্রু।

এখানে স্ক্রু থাকবার তো কোন কারণ নেই।

স্ক্রুটি নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রাচটিও দুভাগ হয়ে গেল। ওপরের অংশ ছোট, নীচের অংশ ফাঁপা। কাগজপত্র গুটিয়ে কিংবা অন্য কোন জিনিস বেশ রাখা যায়। ক্রাচটি কোলে নিয়ে পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে রইলেন।

জীবনে ক্রাচ অনেক দেখেছেন, কিন্তু ঠিক এভাবের ফাঁপা ক্রাচ এর আগে আর দেখেননি।

গোপনীয় দলিল, নিষিদ্ধ জিনিসপত্র রাখার পক্ষে আদর্শ জিনিস।

কিন্তু প্রফেসর কি ধরনের লোক ছিলেন যে এই প্যাটার্নের ক্রাচ করতে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল!

রোদ পড়েছে। পারিজাত বক্সি ক্রাচ আর কাঠের পা কোণের দিকে সরিয়ে রেখে উঠে পড়লেন।

মুখ-হাত ধুয়ে দরজায় তালা দিয়ে দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি চলে এলেন।

দীনবন্ধুবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পোশাক দেখে মনে হয়, প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে অপেক্ষা করছেন।

পারিজাত বক্সিকে দেখে বললেন, কাল অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমচ্ছেন বলে আর ডাকতে পাঠাইনি।

পারিজাত বক্সি বললেন, আপনার সঙ্গে প্রফেসরের আলাপ কি এখানে আসার পর, না আগে?

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধুবাবু উত্তর দিলেন—না, আগে আলাপ ছিল না। এখানে আসার পর হয়েছিল।

—ভদ্রলোকের আসল নাম তো তারকনাথ রায়?

—হ্যাঁ। কলেজে প্রফেসরি করতেন বলে সবাই প্রফেসর বলত।

কোন্ কলেজে পড়াতেন জানেন?

—শুনেছিলাম মেট্রোপলিটন কলেজের বোটানির প্রফেসর ছিলেন।

—দুর্ঘটনায় একটা পা কাটা যায়?

—তাই শুনেছি।

—আচ্ছা, আপনি প্রফেসরের বাড়িতে গেছেন?

—হ্যাঁ, গেছি বৈ-কি। তবে উনিই আমার বাড়ি বেশি আসতেন।

—এমন কি কোনদিন হয়েছে, আপনার সামনে ওঁর ছাত্রের দল এসেছে?

—হ্যাঁ এসেছে।

—আপনার সামনে উনি তাদের সঙ্গে বোটানি নিয়ে আলোচনা করতেন?

—না, ছাত্রদের বলতেন, তোমরা একটু বসো, এঁর সঙ্গে কথা শেষ করে তোমাদের কথা শুনব।

চা জলখাবার শেষ করে পারিজাত বক্সি বললেন, দীনবন্ধুবাবু, আমি আজ একবার কলকাতায় যাব।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ, আমার কতকগুলো কাজ আছে। সম্ভব হলে আজ রাত্রেই ফিরব, নয়তো কাল। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি বলুন।

—আমি তালার ওপর আমার তালা দিয়ে যাচ্ছি। মোহন সিং যদি আসেন বলবেন, যেন প্রফেসরের বাড়ির মধ্যে ঢোকার ব্যবস্থা না করেন।

—আপনার কী মনে হচ্ছে পারিজাত বাবু?

দীনবন্ধুবাবু আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না।

—এখন কিছু বলতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে প্রফেসরের মৃত্যুর মধ্যে রহস্য আছে। সেই রহস্যের জট আমাকে ছাড়াতে হবে।

দীনবন্ধুবাবু চুপ করে শুনলেন।

হঠাৎ পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, হরিয়া মালী কেমন লোক?

—হরিয়া। হরিয়াকে তো ভালোই মনে হয়। বাড়িওয়ালার লোক। প্রফেসর আসবার আগে থেকেই ও বাড়ির দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া খায়, এছাড়া আর কোন দোষ নেই।

একটু পরেই পারিজাত বক্সি রওনা হয়ে গেলেন। মোহন সিং এদিকে এল না। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে দীনবন্ধুবাবুই থানায় গেলেন।

জিপ থেকে মোহন সিং নামছিল, দীনবন্ধুবাবুকে দেখে বলল, কি স্যার, কিছু বলবেন?

—না, কি আর বলব।

—কিছু মনে করবেন না স্যার। শখের গোয়েন্দাদের কাজই হল একটা সোজা কাজ আরও কঠিন করে তোলা। স্বাভাবিক একটা মৃত্যুকে নিয়ে বক্সি যা প্যাঁচ কষছেন। আমার অবশ্য কিছু বলার নেই। ডেপুটি কমিশনার ফোন করে আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, মিস্টার বক্সিকে সাহায্য করার জন্য। আমি সাহায্য করে যাব।

মোহন সিংয়ের কথায় মনে হল বাইরে থেকে পারিজাত বক্সি এসে এই কেসে হাত দেওয়াতে সে খুব সন্তুষ্ট নয়।

অবশ্য শখের গোয়েন্দা আর পুলিশ অফিসারের মধ্যে এই মানসিক সংঘর্ষ সব ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

পারিজাত বক্সিকে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন শুনলে হয়তো মোহন সিং মোটেই খুশি হবে না।

পারিজাত বক্সি ফিরলেন তারপরের দিন বিকেলে। মুখ চোখের চেহারা বেশ গম্ভীর। মনে হল গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

দীনবন্ধুবাবু নন, তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হদিশ হল?

—কিসের?

—প্রফেসরের কেসের?

—এখনও সব হয়নি, তবে এটুকু জেনে রাখুন, মেট্রোপলিটন কলেজে তারকনাথ রায় বলে বোটানির কেন, কোন বিষয়ের কোন প্রফেসর ছিল না।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, সে কি?

—হ্যাঁ, আর মোটর দুর্ঘটনায় প্রফেসরের সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার কথাও ঠিক নয়। আমি বড় বড় হাসপাতালের বেশ কয়েক বছরের রেকর্ড দেখেছি।

—তাহলে এ ধরনের মিথ্যা কথা বলে লাভ?

—লাভের কথা যিনি বলতে পারতেন তিনি তো আর আমাদের মধ্যে নেই। আচ্ছা, পুলিশের লোক কি প্রফেসরের বাড়িতে এসেছিল?

—না।

এবার দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন,

—তাহলে যেসব ছাত্ররা প্রফেসরের কাছে আসত?

—প্রফেসর যেমন ভুয়ো, ছাত্ররাও তেমনই ভুয়ো হতে পারে।

একটু থেমে পারিজাত বক্সি বললেন—এখন আর প্রশ্ন নয়, আগে আমাকে একটু চা দিন তো, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লজ্জিত হয়ে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, ছি, ছি, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

রাত্রে পারিজাত বক্সি প্রফেসরের বাড়িতে চলে এলেন।

ক্রাচটা নিয়ে আবার বসলেন। ঘর অন্ধকার। বক্সির হাতে জোরালো টর্চ। উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

না, আর কোথাও কিছু নেই।

এবার কাঠের পা টেনে নিলেন।

সাধারণ কাঠের পা, বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

পায়ের সঙ্গে আটকানোর জন্য চামড়ার স্ট্র্যাপ রয়েছে।

স্ট্র্যাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো মেঝের ওপর পড়ল।

পারিজাত বক্সি কাগজের টুকরোটা কুড়িয়ে নিলেন।

সাধারণ একটা কাগজ। মাঝখানে কালো কালিতে দুটি অক্ষর লেখা।

শি-ত।

কথাটা শীত নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। কারণ শীত বানান যে শিত নয় সেটুক জানবার মতন বিদ্যা প্রফেসরের ছিল।

তাছাড়া মাঝখানে হাইফেনই বা কেন? শব্দটা মামুলিও নিশ্চয়ই নয়, তাহলে এত যত্ন করে কাঠের পায়ের স্ট্র্যাপের সঙ্গে বাঁধা থাকত না।

যদি কিছু রহস্য থাকে তাহলে তা এই কথাকে কেন্দ্র করেই।

এবারেও পারিজাত বক্সি মেঝের ওপর বিছানা পাতলেন।

চোখে ঘুম নেই। কেবল চিন্তা শি-ত কথাটার কী অর্থ হতে পারে।

যদি অন্য কোন ভাষায় কথা হয় তা হলেই মুশকিল। সে-ভাষা জানতে না পারলে জীবনে এর রহস্য বার করা যাবে না।

রাত অনেক। একটু তন্দ্রার মতন এসে থাকবে, হঠাৎ খুট করে শব্দ।

পারিজাত বক্সির ঘুম খুব সজাগ। মনে হল শব্দটা খাটের পাশের জানলার কাছ থেকে আসছে।

কে যেন জানলা খোলার চেষ্টা করছে।

ভয়ে ভয়েই পারিজাত বক্সি ভিতর দিকে সরে গেলেন। খাটের আড়ালে।

সব দরজায় কাঁচ দেওয়া। ভারি শক্ত কাঁচ। তার ওপর লোহার ক্রশকরা। কাঁচ ভেঙে গেলেও ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

খুট্, খুট্, খুট্।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পারিজাত বক্সি দেখতে লাগলেন। বাইরের দিকে জ্যোৎস্না। বড় অস্পষ্ট। একটা লোকের কালো কাঠামো দেখা গেল।

একটু পরেই কাঁচ খুলে গেল। লোহার ক্রশবারও বিচিত্র উপায়ে সরানো হল।

বিরাট আকারের একটা লোক ঘরে ঢুকল।

লম্বায় প্রায় ছ'ফিট। সবল চেহারা। নিগ্রো হওয়া আশ্চর্য নয়। মণিবন্ধে বাঁধা চ্যাপটা টর্চ। সেই আলোর সাহায্যে লোকটা সোজা ক্রাচ আর কাঠের পা নিয়ে খাটের ওপর বসল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রাচের প্যাঁচ খুলে ফেলল।

কাঠের পায়ের স্ট্র্যাপও।

তারপর ভেতরে হাত দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিছু না পেয়ে হতাশায় একটা শব্দ করল।

বাইরে শেয়াল ডেকে উঠতেই লোকটা চমকে উঠল। আস্তে আস্তে উঠে আবার জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানলার কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর আর দেখা গেল না।

পারিজাত বক্সি তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসলেন, জানলার কাঁচ ঠিক আটকানো রয়েছে। লোহার ক্রশবারও।

জানলার কাছে মুখ রেখে পারিজাত বক্সি দেখলেন, দীর্ঘ লোকটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

এবার পারিজাত বক্সি নিঃসন্দেহ হলেন।

লোকটা এই কাগজটার সন্ধানেই এসেছিল। কাগজটা কোথায় আছে সেটা তার জানা। কাগজটার মধ্যে লেখা শব্দ দুটো তাহলে নিশ্চয়ই কোন সঙ্কেত ছিল।

বাকি রাত পারিজাত বক্সি পায়চারি করেই কাটিয়ে দিলেন।

কী হতে পারে ওই শব্দ দুটোর অর্থ?

নিশ্চয় কোন নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারবারে প্রফেসর লিপ্ত ছিল। ছাত্র সেজে যারা আসত, তারা ছাত্র নয়, ওই কারবারের অংশীদার।

এসব ব্যবসায় যা হয়ে থাকে, ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি। একজন আর একজনকে পৃথিবী থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

দীনবন্ধুবাবুর শরণ নিতে হবে। এখানে শি-তে বলে কোন সাঁওতালি ভাষা আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। কিংবা এ দুটো অক্ষর কোন লোকের আদ্যক্ষর নয়তো!

ভেবে পারিজাত বক্সি কিছু কূলকিনারা পেলেন না, ভোর হল। পারিজাত বক্সি আগে জানলাটা পরীক্ষা করলেন। অন্য কাঁচগুলো ঠিক আছে। একটা কাঁচ কেবল আলগা বসানো। ক্রশবারের স্ক্রুগুলোও খোলার ব্যবস্থা আছে।

তার মানে, সদর দরজা না খুলে, জানলার কাঁচ সরিয়ে প্রফেসরের নিজের পক্ষে বাইরে আসা-যাওয়ার সুবিধে ছিল। দরকার হলে রাতবিরেতে বাইরের আগন্তুককেও বাড়ির মধ্যে আনা চলত।

সকালে পারিজাত বক্সিকে দেখে দীনবন্ধুবাবু চমকে উঠলেন।

—কী ব্যাপার? চেহারা এমন হয়েছে কেন? সারারাত ঘুমোননি?

পারিজাত বক্সি হাসলেন। —ঘুমোব কি? আপনাদের দেশে প্রহরে প্রহরে যা শেয়ালের ডাক।

চা-পানের পর পারিজাত বক্সি বললেন—দীনবন্ধুবাবু, আপনার ফোনটা ব্যবহার করব?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এর জন্য আপনি আবার জিজ্ঞাসা করছেন! আচ্ছা, আপনি তো আছেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী একটু হাটে যাব। আজ হাটবার।

পারিজাত বক্সি গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বাড়িতে ফোন করলেন।—আমাকে একটা খোঁজ দিতে হবে।

—বলুন।

—সাড়ে ছ'ফুট লম্বা লোক, বিদেশি হওয়াও বিচিত্র নয়, একটু খুঁড়িয়ে চলে। জাহাজের খালাসি হলেও হতে পারে।

—গালের কাছে খুব বড় কাটা দাগ?

—কি জানি অন্ধকারে দেখেছি অতটা লক্ষ করিনি।

—ফোটো দেখলে চিনতে পারবেন?

—বোধ হয় পারব।

—ঠিক আছে, আমার লোক গোটা চার পাঁচ ফোটো নিয়ে আপনার কাছে যাবে। মোটরে পাঠাব। ঘণ্টা আড়াই তিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আপনি দেখে বলবেন।

ঘণ্টাখানেক পর দীনবন্ধু-দম্পতি হাট থেকে ফিরলেন। দীনবন্ধুবাবুর হাতে ঝুড়িতে তরিতরকারি, দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীর হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর রাখা রেকাবিতে ঠোঙাটা উপুড় করে দিলেন। একরাশ শিউলি ফুল পড়ল।

বসে বসে পারিজাত বক্সি দেখছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, —এ ফুলও কি হাট থেকে কিনলেন?

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়লেন। —না, না এসব পয়সা দিয়ে কেনা নয়, প্রফেসরের বাগানে শিউলিতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।

পারিজাত বক্সি চমকে সোজা হয়ে বসলেন। মনে মনে বিড়বিড় করলেন, শিউলি তলা মানে শি-ত। তাইতো.... এই সহজ কথাটাতো মনে আসেনি।

দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন। —কী বললেন?

—না, কিছু নয়। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পারিজাত বক্সি প্রফেসরের বাড়িতে চলে এলেন।

একটা খাটিয়ার মধ্যে হরিয়া দড়ি পাকাচ্ছিল।

পারিজাত বক্সি তার সামনে গিয়ে বলল, —হরিযা একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন বাবু।

—একটা চিঠি থানার অফিসারকে দিয়ে আসতে হবে।

—দিন।

পারিজাত বক্সি একটা চিঠি আর পাঁচ টাকার একটা নোট হরিয়ার হাতে দিলেন।

—টাকা কি হবে বাবু?

—রেখে দাও তোমার কাছে। এতটা পথ যাবে।

হরিযা বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য পারিজত বক্সি নিশ্চিন্ত। সাঁওতালের হাতে টাকা এলে সে হাঁড়িয়া না খেয়ে ফিরবে না। শিউলি গাছটা বাড়ির পিছন দিকে।

তখনও শিউলি তলায় অনেক ফুল পড়ে রয়েছে। মনে হয় কে যেন সাদা আসন বিছিয়ে রেখেছে।

কোমরে বেল্টে বাঁধা যন্ত্র বের করে পারিজাত বক্সি কাজে লেগে গেলেন।

প্রায একঘণ্টা এদিক ওদিক খোঁড়ার পব একটা কাঠের বাক্সের সন্ধান মিলল। চন্দন কাঠের ছোট বাক্স। তালা বন্ধ।

তালা খুলতে অসুবিধে হল না। ওপরে কাগজের ফালি, সেগুলো সরাতেই পারিজাত বক্সিব চোখ ধাঁধিয়ে উঠল।

গোটা দশেক হীরা। ঔজ্জ্বল্যে চকচক করছে।

আসল কী নকল পারিজাত বক্সির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যদি আসল হয়, তবে দাম অনেক।

এবার বোঝা গেল প্রফেসর হিরের চোরাকারবারে লিপ্ত ছিলেন। বাইরে থেকে হিরে আসত, কিংবা এখান থেকে বাইরে চালান যেত।

এসব ব্যবসায শেষপর্যন্ত যা হয় প্রফেসরেরও তাই হয়েছিল। পযসাকড়ির ভাগ-বাঁটোয়ারা, কিংবা দলপতি হবার স্পৃহা, একজন আর একজনকে খতম করার চেষ্টা। পারিজাত বক্সি বাক্সটা সাবধানে নিয়ে আবার ভালো করে মাটি চাপা দিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি ফেরার একটু পরেই একটা মোটর এসে দাঁড়াল।

একটা লোক কয়েকটা ফোটো পারিজাত বক্সির হাতে দিল।

পারিজাত বক্সি গভীর মনোযোগ সহকারে ফোটোগুলো দেখলেন। প্রতিটি ফোটোর পিছনে নাম আর বিশেষত্ব লেখা। বিশেষত্ব অর্থাৎ লোকটা কী ধরনের ব্যবসায় লিপ্ত।

একটা ফোটো চোখে লাগল। লম্বা চেহারা। সাড়ে ছ'ফুটের কাছাকাছি। গালে কাটা দাগ। পেছনে নাম লেখা আফজল ইরানী। বাঁ পায়ে গুলি লাগার পর একটু খুঁড়িয়ে চলে।

পাথরের কারবার। পেশায় জাহাজের খালাসি।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটা কোথায় আছে এখন?

—একবার জেল হবার পর খালাসির চাকরি আর নেই। কোথায় আছে রেকর্ড নেই।

—জেল হয়েছিল কেন?

—একটা লোককে ছোরা মেরেছিল। কী ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল।

—ঠিক আছে, এই ছবিটা আমি রাখলাম। বাকিগুলো আপনি নিয়ে যান।

লোকটা চলে যেতে পারিজাত বক্সি হিরেগুলো বাক্স থেকে বার করে নিজের স্যুটকেসের গোপন পকেটে রেখে দিলেন। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে বাক্সর মধ্যে রেখে দিলেন।

এবার প্রফেসরের ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো বইয়ের মাঝখানে বাক্সটা রেখে দিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর বাড়িতে যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন স্বামী-স্ত্রী বললেন, —কি ব্যাপার আপনার? দুপুরে ঘুমোননি?

পারিজাত বক্সি একটু থেমে উত্তর দিলেন, —যে কাজের ভার দিয়েছেন, ঘুম চোখ থেকে পালিয়েছে।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু কিনারা হল?

মনে তো হয়, অদ্য শেষ রজনী। দেখা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই তিনজন কনেস্টবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল। পারিজাত বক্সি তাদের সঙ্গে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে অন্য কথা বললেন।

তারপর রাত আর একটু গভীর হলে চারজন বেরিয়ে পড়লেন।

খুব সুবিধে। অন্ধকার রাত। কোথাও একটা তারার ইশারাও নেই। বেশ শীত।

চারজনে প্রফেসরের বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

সময় যেন আর কাটে না। কোণে কোণে জোনাকির ঝাঁক। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের চিৎকার। কনকনে পাহাড়ে-ঠাণ্ডা।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে দীর্ঘাকৃতি এক ছায়ার আবির্ভাব। খুব ধীর পদক্ষেপে একটা লোক এগিয়ে এল।

একটু দাঁড়াল। দেখল এদিক ওদিক। তারপর প্রফেসরের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

পারিজাত বক্সি খুব সাবধানে লোকটাকে অনুসরণ করলেন।

জানলা খুলে লোকটা ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। জোরালো টর্চের বাতি জ্বেলে সারা ঘর দেখল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বইয়ের ফাঁকে কাঠের বাক্সটা দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল আনন্দের চিৎকার।

—বাইরে পা দিতেই পারিজাত বক্সির গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল

লোকটা চমকে উঠে পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই দেখল পুলিশ-বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলেছে। টর্চ লাইটের উজ্জ্বল আলো পড়েছে তার মুখের ওপর।

—আফজল বলো, তারক রায় তোমার কী ক্ষতি করেছিল? ভেসে এল পারিজাত বক্সির গম্ভীর কণ্ঠ।

দু'এক মিনিটের দ্বিধা, তারপর লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, —লোকটা বেইমান, আমার সঙ্গে নেমকহারামি করেছে।

আফজল বাকি কথা বলল থানার মধ্যে।

তারক রায়ের সঙ্গে আফজলের অনেকদিনের পরিচয়। সুদূর বর্মায়। ক্রমে অন্তরঙ্গতা হল। দুজনে ব্যবসা শুরু করে। আফজল দেশ-বিদেশ থেকে দামি পাথর নিয়ে আসে, তারক রায় সে-সব পাথর জহুরিদের কাছে বিক্রি করে পয়সা ভাগ করে নেয়। বর্মা থেকে তারক রায় এদেশে আসার পরও ব্যবসা চলে। খুব বড় শহরে আসা-যাওয়া করার একটু অসুবিধে। পুলিশের নজরে পড়ার ভয় ছিল। তাই তারক রায় এইরকম জায়গায় ডেরা বাঁধে।

বেশ চলছিল ব্যবসা, কিন্তু তারক রায় নিমকহারামি শুরু করে। একবার গোটা ছয়েক নীলা আফজল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তারক রায় সেগুলো ঝুটো বলে তাকে ফেরত দেয়। তারপর দশটা পোখরাজের বেলাতেও তাই করে।

আফজলের সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে আসল পাথর সরিয়ে ঝুটো পাথর আফজলকে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তারপর বিদেশে আফজল একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিল। তাতে তার জেল হয়। তাও জেল থেকে বেরিয়ে একটি লোককে দিয়ে সে কিছু হিরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারক রায়ের কাছে। লোকটিকে বলতে বলেছিল, আফজল মারা গেছে। তার স্ত্রী-পুত্র খুব কষ্টে আছে। হিরে বাবদ টাকাগুলো হাতে হাতে দিতে।

তারক রায় দেয়নি। বলেছে, ইদানিং আমি নাকি তাকে ঝুটো পাথর দিচ্ছিলাম, কাজেই হিরেগুলো যাচাই না করে সে একটি পয়সাও দিতে পারবে না।

লোকটাকে তারপর অনেকবার পাঠিয়েছি। তারক রায় এড়িয়ে গেছে।

আমি খবর পেয়েছিলাম, তারক রায় আর একটা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা নানা জায়গা থেকে পাথরের যোগান দিচ্ছে।

আমি একদিন রাত্রে তারক রায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। জানলা আলগা ছিল, সেটা জানা ছিল। ওই পথেই আগে যাওয়া-আসা করেছি।

কী আশ্চর্য, সেদিন আমাকে দেখে কথা বলবার আগেই তারক রায় আর্তনাদ করে শক্ত হয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেল।

তার ধারণা হয়েছিল আমি মারা গেছি। সেই মরা মানুষকে চোখের সামনে দেখে বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

আমি জানতাম ক্রাচের কোটরে পাথরগুলো থাকে। কিন্তু সে-রাত্রে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস হয়নি। তারপর আবার এসেছিলাম, খুঁজে পাইনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি তারক রায় মারা গেছে। ভালো হয়েছে। হারামজাদাটা দোজাখে যাক। আমি জিনিসগুলো পেয়েছি। এই চন্দনের বাক্সসুদ্ধই আমি তাকে দিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ গভীর মমতায় চন্দনের বাক্সটা বুকে চেপে ধরল আফজল।

পারিজাত বক্সি মোহন সিংয়ের দিকে ফিরে বললেন, আমার কাজ শেষ। এবার আপনাদের কাজ শুরু। যা করবার করুন। আফজল, একটা কথা শুধু তোমাকে বলে যাই,—আজও তুমি আসল জিনিস পাওনি। আসল জিনিসের মালিক সরকার। এগুলো সেখানেই পৌঁছে দেওয়া হবে।

—সে কি! আফজলের কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি চন্দনের বাক্সটা খুলে দেখেই বাক্সটা মেঝের ওপর আছড়ে ফেলল। পাথরের নুড়িগুলো থানার মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

অম্লের জন্য

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

অভিজাত হোটেলের একটা পর্দা ঘেরা মনোরম কেবিনে দুপুরের আহার শেষ করে দামি ফরাসি গ্লাসের মধ্যে ভাসমান বরফের টুকরোর দিকে চেয়ে দেখছিল বহুখ্যাত ধনী শিল্পপতি মিঃ এস ভাট।

মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো ঢুকল উর্দিধারী বেয়ারা--হাতে ছুরির মতো চকচকে ট্রে, তার ওপরে একখানা কার্ড।—কার্ডখানা পড়ল ভাট—ক্রাইম ডিটেকশান ডিপার্টমেন্টের ইন্‌সপেকটর মিঃ জি. ঠাকুর—লালবাজার।

—কী চায়?

বেয়ারা বলল—দেখা করতে চায়।

—কীজন্য--কিছু বলেছে?

—না স্যার।

—আচ্ছা ভিজিটার্স রুমে বসাও। আমি একটু পরে আসছি।

ধীরে সুস্থে ভাট এলাচি চিবুতে চিবুতে ভিজিটার্স রুমে এল।

ইন্‌সপেকটর পুলিশ হলেও ভদ্রতায় নির্ভেজাল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল---আসুন মিঃ ভাট। আপনাকে লাঞ্চের পরে একটু বিশ্রাম করতে দিলাম না, এজন্য বিশেষ দুঃখিত।

ভাট একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল—বসুন। কিন্তু কেন এই দুঃখিত হবার কারণটা ঘটল—বলুন।

—নিশ্চয়ই, মিঃ পাল-এর কিছু খোঁজ-খবর জানতে এসেছি।

ভাট বিস্মিত হল—পাল? কোন্ পাল?

গ্র্যান্ড ইনটারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ কিউ. পাল।

—কেন, সে কী করেছে—অথবা বলা ভালো তার কী হয়েছে?

—তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন পরশু রাত থেকে। ওর পি এ বলেছে পরশু রাতে আপনার সঙ্গে ডিনার খাবেন একথা বলেছিলেন। কাল উনি ব্যাঙ্কে যাননি—আজও না।

এবার ভাট সোফায় ঠেস দিয়ে হেসে উঠল—নিরুদ্দেশ!

—না, মিঃ পালের মতো চৌখস মানুষ নিরুদ্দেশ হতে পারেন না।

—হ্যাঁ, সে পরশু রাতে এই হোটেলেই আমার সঙ্গে ডিনার খেয়েছে। নাঃ, কোনও অসুখ-বিসুখের লক্ষণ তো ওর মধ্যে দেখিনি।

—হ্যাঁ, সেটাই তো খবর। মিঃ পাল পরশু রাতে বাড়ি ফেরেননি। দুদিন অফিসে যাননি।

ভাটকে এবার চিন্তিত দেখাল। বলল—আমার মনে হয় ও ঘুরে আসবে। না আসবার কী কারণ থাকতে পারে? যখন এখান থেকে আমরা বের হই ও বেশ ভালো মুডে ছিল।

—আপনারা কখন বেরিয়েছিলেন এখান থেকে?

ভাট একটু ভেবে বলল—রাত দশটা বা ওই রকম সময় হতে পারে। ঠিক সময় দেখিনি।

ঠাকুর বলল—উনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলেছিলেন?

—না, তবে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ও ওর ফ্ল্যাটেই চলে যাবে।

ঠাকুর এবার ওর গোঁফে একটু তা দিল—এটা ওর একটা মুদ্রাদোষ। বলল—উনি তখন বেশ স্বাভাবিকই ছিলেন?

—একেবারে। বরং বলা যায় একটু স্ফূর্তিতেই ছিল। ও হ্যাঁ—ও যেন বলেছিল ওর স্ত্রী কোথায় বেড়াতে গিয়েছে—দীঘা না কোথায়।

ঠাকুর বলল—হ্যাঁ উনি হঠাৎ ফিরে এসেছিলেন পরশু রাতেই। এসে পালকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। পরে রাতের শেষের দিকে নিজেই লালবাজারে এসে ডায়েরি করে যান।

তাইতো—ভাট ধীরে ধীরে বলল—আগামী রবিবারটা আমরা গ্রামের দিকে এক ভদ্রলোকের পুকুরে মাছ ধরতে যাবার প্ল্যানও করেছিলাম। কিন্তু কেমন যেন গোলকধাঁধায় পড়ে গেলাম।

ঠাকুর এবার প্রশ্নের মোড় ঘোরাল—আচ্ছা আপনাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল—তাই না?

ভাট সায় দিল—হ্যাঁ, স্কুল-জীবন থেকে আমরা বন্ধু। কাজকর্মেও বন্ধু—বিলেত গেছি দুজনেই চেষ্টা করে! —ভাগ্য-উন্নতি—তাও একসঙ্গেই। আচ্ছা ইন্‌সপেকটর, কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো? মানে ও একলা বেরিয়ে গেল।

—না, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা সব হাসপাতাল, নার্সিং হোম, এমনকি প্রাইভেট ডাক্তারদের চেম্বারেও তন্নতন্ন করে খোঁজ করেছি। আচ্ছা মিঃ ভাট—কিছু মনে করবেন না, আমাদের পুলিশদের অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়—আমি গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন।

—ও নিশ্চয়, নিশ্চয়—এতে আর মনে করবার কী আছে?

—ওই দিন অর্থাৎ পরশু রাতে ডিনারের পর আপনারা দুই বন্ধু কী করলেন, কী আলাপ-করলেন সে সব কি আপনার মনে আছে? যদি মনে থাকে তবে একটু বিস্তারিত করে বলুন।

ভাট বলল—মনে থাকবে না কেন? আমি বেহেড হই না। ডিনারের পর একটা ট্যাকসি নিয়ে চললাম আমার ফ্ল্যাটে। বললাম, পাল তোমার স্ত্রী তো বাড়িতে নেই—একটু দেরি হলেও শাসন করবার লোক নেই। চলো আমার ফ্ল্যাটে, খুব উঁচুদরের একটা পানীয় জোগাড় করেছি—নেপোলিয়ন এটা খেয়ে নাকি যুদ্ধে যেতেন—একটু চেখে দেখে আসবে চলো।

—তারপরে?

—তারপরে দুজনে খুব তারিয়ে তারিয়ে তাতে চুমুক দেওয়া গেল। আর অনেক পুরানো কথা আলাপ হল। সঙ্গে খুব ভালো ব্র্যান্ডের সিগার। কন্টিনেন্টে থাকাকালীন পাল একবার নাজেহাল হয়েছিল সে-সবও আলাপ হল—। তারপর ও বলল বিদায় হই এবার।

ঠাকুর বলল, কতক্ষণ চলল আড্ডা—

—তা ঘণ্টাখানেক হবে—। রাত হচ্ছে দেখে ও বলল—এবার ওঠা যাক।

—আপনার ফ্ল্যাট তো দোতলায়।

হ্যাঁ, আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। পাল বলল—এত রাতে লিফটম্যানকে পাওয়াও মুশকিল; আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়েই নেমে যাই। আমি আবার ঠাট্টা করে বললাম—পড়ে যাবে না তো। ও হেসে বলল—নেপোলিয়ান এ খেয়ে যুদ্ধে যেতেন আর আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারব না? তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল।

—তাহলে আপনি আর নীচে যাননি।

—না, আমি কিছুক্ষণ বই পড়ে পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠাকুর ডায়েরিতে নোট করছিল। বলল, আপনিই ওঁকে শেষবার দেখেছেন।

ভাট একটু থেমে থেমে বলল—এমনিতে তা মনে হয়—কিন্তু রাতের পাহারাদার যে একতলার সিঁড়ির কাছে টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে থাকে...সে হয়তো পালকে শেষ দেখেছে। ওর আবার খাতায় লিখে রাখা অভ্যাস আছে। আর এ বাড়িতে যাঁরা প্রায়ই আসে তাদের ও চেনে।

ঠাকুর এবার উঠল—অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ ভাট। সাহায্যের জন্য।

ভাট বলল—পাল যেমন চৌখস লোক, ও নিরুদ্দেশ হয়নি। আশা করছি দু-একদিনেই ফিরে আসব।

ঠাকুর যেতে যেতে বলল, তাহলে আমরাও বাঁচি—আর আপনারা বন্ধু-লোকেরাও আনন্দ পান।

কেটে গেল কয়েকদিন। অতবড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিরুদ্দেশ—সব ব্যাঙ্কেই সংবাদ গেল। খবরের কাগজেও ছাপা হল বেশ রসাল হেডিং দিয়ে। কিন্তু না, ব্যাঙ্কের কোনও টাকা তছরুপ করে নয়। স্রেফ নিরুদ্দেশ, রহস্যজনক। অবশ্য ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ঠিক যন্ত্রের মতোই চলল। অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ম্যানেজারের কাজ চালাতে লাগলেন। এর মধ্যে ভাট ব্যাঙ্কে গিয়ে দু-একবার পরিস্থিতি আলোচনা করে এসেছে। ভাটের মোটা টাকা ওই ব্যাঙ্কে আছে। সবার কাছে তার খাতির।

দিন পনের বাদে খুব কাছের মানুষ ছাড়া সবাই পালের হারিয়ে যাওয়াটাকে ভুলে গেল। ওরকম কত মানুষই হারিয়ে যায়। ভাট এখন বিশেষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে না: কয়েকটা বড় বড় ব্যবসায় শেয়ার আছে, আর ব্যাঙ্কের মোটা টাকার সুদ থেকে ফেলে ছড়িয়েই তার চলে যায়।

হঠাৎই তার মনে হল সামনে গরম কাল আসছে এসময় নৈনিতাল গিয়ে নিরিবিলিতে দুমাস কাটিয়ে এলে ভালোই হয়। টেলিগ্রাম করে সেখানে ভালো হোটেলে সিট বুক করে ট্রেনের এ-সি কারের টিকিট কিনে ফেলল। নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে দুমাসের ছুটি দিয়ে দিল। নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলাতেই একটা ট্যাকসি করে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে একটা বড় ট্রাঙ্ক, বড় স্যুটকেস আর একটা ছোট স্যুটকেস লাগেজ রুমে রেখে দিয়ে এল। টুকিটাকি

সামান্য কিছু জিনিস কেনার ছিল তা কিনে একটা ছোট চামড়ার কেসে রাখল। দুপুরে হোটেলে এল লাঞ্চ করতে। সেই পর্দাঘেরা কেবিনটাই ওর প্রিয়, বেশ ভালো রকমের খাবারের অর্ডার দিল।

খাবার সার্ভ করা হল, কাঁটা চামচ নিয়ে যেই প্রস্তুত হয়েছে অমনই উর্দিপরা বেয়ারার প্রবেশ। হাতে চকচকে ট্রেতে কার্ড। ভ্রূ কুঁচিয়ে ভাট দেখল, মিঃ জি. ঠাকুর, ইন্‌সপেকটর, ক্রাইম ডিটেকসান ডিপার্টমেন্ট, লাল বাজার। তাই মনে মনে গাল দিল, আবার এসেছে বাঁদরটা। মুখে বলল, বসতে বলো, আমি খাওয়া শেষ না করে যাব না।

বেয়ারা চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভাট ধীরেসুস্থে খাওয়া-দাওয়া করল। ভিজিটারস্‌-রুমে গিয়ে দেখে ঠাকুর ধৈর্যের সঙ্গে একখানা পুলিশ জার্নাল পড়ছে।

ভাট গলা খাঁকারি দিল।

ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন মিঃ ভাট, আবার লাঞ্চের সময়ে এলাম..জাস্ট কয়েকটা কথা—সঠিক উত্তর জেনেই চলে যাব।

—আমি বিকেলের ট্রেনে রওনা দিচ্ছি—হাতে বেশি সময় নেই। দেরি করবেন না যেন। নৈনিতাল যাচ্ছি।

—নিশ্চয়ই যাবেন—নৈনিতাল খুব ভালো জায়গা। কতবার ভাবি সস্ত্রীক কিছুদিনের জন্য যাব—তা স্যাব এই চাকরির—যাকগে আমি এসেছি মিঃ পালের বিষয়টা আলাপ করতে।

ভাট বেশ বিরক্তির স্বরে বলল, আবার পাল—আমার সঙ্গে তার নিরুদ্দেশের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা বুঝতেই পারছি না। আপনারা দেখছি বুলডগের মতো যেখানে দাঁত বসাবেন ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত আর ছাড়া নেই।

—ঠিকই বলেছেন—কিন্তু একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় এখনও পৌঁছাতে পারিনি কিনা—তাই দাঁত ছাড়ি কী করে?

—এর আর মীমাংসা কী মশায়—সেদিন কোন এক কাগজে পড়েছিলাম অনেক বুদ্ধিমান লোকেরও হঠাৎ অ্যামনেশিয়া বলে একটা রোগের আক্রমণ হয়। সে সব ভুলে যায়। পালেরও হয়তো তাই হয়েছে—সেদিন বাড়ি না গিয়ে হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে বসে আছে।

ঠাকুর আবার গোঁফে হাত দিল, বলল—এরকম তো হতেই পারত। কিন্তু আমরা ওঁর পারিবারিক ডাক্তার ডাঃ ভীমরাজের কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ওঁর মানসিক রোগের সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন।

ভাট এবার বলল, তাহলে আমার আর কী বলবার আছে?

—আছে বৈ-কি—ঠাকুর একটু জোরের সঙ্গেই বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনার আরও কিছু বলবার আছে?

—কী রকম? ভাট একটু চটে উঠে বলল, —যা বলবার বলে ফেলুন, আমার ট্রেন ধরবার তাড়া আছে।

ঠাকুর আবার গোঁফে হাত দিল, বলল, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন—কিন্তু কী করব বলুন...আমার যা ডিউটি তা করতেই হবে। এর জন্যই আবার কিছু জিজ্ঞাসা করতে

হচ্ছে।

—বলুন—কী বলবেন।

—আচ্ছা হোটেল থেকে আপনার ফ্ল্যাটে আসা—তারপর পালের একা যাওয়া—আপনি নিজের গাড়ি ব্যবহার করেননি কেন?

—ওঃ, এই কথা! আমি মশাই—খুব দয়ালু মনিব। আমার ড্রাইভারকে সন্ধের সময় ছুটি দিয়ে দি। ঠিক আট ঘণ্টা ডিউটি। যেদিন হঠাৎ রাত্রে খাটাই সেদিন দিনে ছুটি দিই—রাতের জন্য আলাদা বকশিস্ পায়।

—খুব ভালো কথা। —ঠাকুর সায় দেয়। পাল রাস্তায় নেমে ট্যাকসি নিয়েই গিয়েছিলেন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আপনি তো সে-রাত্রে আপনার ফ্ল্যাটের বাইরে যাননি?

ভাট বিরক্ত হল, —আঃ, আবার সেই পুরানো কথা! উত্তর তো আগেই দিয়েছি—। নাঃ, আমি বাইরে যাইনি—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ জিজ্ঞাসার মোড় ঘুরিয়ে দিল ঠাকুর, —বাইরে কত দিন থাকবেন?

—তা মাস দুই হবে।

—কী কী লাগেজ নিলেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—না, পারেন না—এর সঙ্গে পালের নিরুদ্দেশ হবার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

—থাক বা না থাক—আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আশা করছি। ঠাকুরের গলার আওয়াজে পুলিশি দৃঢ়তা।

—বেশ দিচ্ছি—একটা বড় ট্রাঙ্ক, একটা বড় আর একটা ছোট স্যুটকেস, আর টুকিটাকি জিনিসের জন্য ছোট চামড়ার কেস। কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

—দেখুন মিঃ ভাট—কোনও না কোনও দিন আমরা মিঃ পালের অন্তর্ধান রহস্য খুঁজে বের করবই। তার আগে লুকিয়ে থাকার মতো যত ঝোপঝাড় আছে তা পিটিয়েই যাব। অনেক ঝোপ খুঁজেছি—আর দু-একটা বাকি আছে, আপনি সাহায্য করলে তা দেখা হয়ে যাবে। তারপর—মানে আপনিও ভুলে যাবেন আমরা তো ভুলবই।

ভাট যেন হাল ছেড়ে দিল—বলল, বলুন।

—আপনার লাগেজগুলো কোথায়?

—হাওড়ার লাগেজ রুমে—

—তাহলে হাওড়ার লাগেজ রুমে একবার যেতে হয়।

—কী হাস্যকর আপনার তদন্ত মিঃ ঠাকুর—আমি এই লাগেজের সঙ্গে পালকে নিয়ে যাচ্ছি? অ্যাঁ, আপনি কী ভেবেছেন মশাই?

—কিছু না, ওটা একটা নিয়মমাফিক তদন্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভাট একটু চিন্তা করল—পরে বলল, তা ভালোই, আমাকে তো হাওড়ায় যেতেই হবে। ওখানে লাগেজ দেখে আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?

—আমি তো আপনাকে ধরিনি, শুধু আপনার সাহায্য নিচ্ছি। তা আমার তদন্ত শেষ হলেই বিদায় নেব।

—চলুন।

পুলিশের ভাড়া করা ট্যাকসি, যাতে ঠাকুর এসেছিল, বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠাকুর ভাটকে নিয়ে ট্যাকসিতে উঠল। হাওড়ায় এসে লাগেজরুমে গিয়ে ঠাকুর বলল, চাবিটা একবার দিতে হয় স্যার।

—তার মানে?

ট্রাঙ্কটা একটু খুলে দেখব।

ভাট রেগে গিয়ে বলল, —আঃ, কী তদন্তের ছিরি! নিন দেখুন, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। বলে চাবি ছুঁড়ে দিল। ঠাকুর একটুও না রেগে চাবিটা দিয়ে ট্রাঙ্কটা খুলল—একবার একটু ভেতরে উঁকি মেরে বন্ধ করে দিল। বলল, উৎপাত করিনি তো!

—না ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি সন্তুষ্ট তো?

—একটা ঝোপ বাকি—আচ্ছা এই কয়েকটা লাগেজই কি আপনি সকাল বেলা আপনার ফ্ল্যাট থেকে বের করেছিলেন?

—হ্যাঁ—

—নিশ্চয় বলছেন—

—আশ্চর্য লোক আপনি, বলছি হ্যাঁ তবু আপনি জেরা করবেন? আমি অপমানিত বোধ করছি।

ঠাকুর খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল,—স্যার, আপনি বড় ভুলো মন নিয়ে চলেন কিনা, তাই এক কথাই বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে হয়। আপনি সকালে ফ্ল্যাট থেকে দুটো বড় ট্রাঙ্ক, দুটো ছোট বড় স্যুটকেস বের করেছিলেন বললেন না একটু আগে?

—না-না এই কটা জিনিসই ছিল।

ঠাকুর এবার বেশ জোর দিল কথায়, —না স্যার, আমার ওয়াচার ছিল—সে দেখেছে আপনি দুটো ট্রাঙ্ক, দুটো স্যুটকেস ট্যাক্সিতে তুলেছেন। দূর থেকে টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে তার দু-তিনখানা ফটোও নিয়েছে। এবার দেখুন তো আপনি ভুলে গেছেন কিনা।

ভাট একটু ভাবল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল, ঠিক ঠিক—ওই ট্রাঙ্কটার কথা একটু ভুলে যাই। আমার অনেকগুলো দামি দামি সংগ্রহ আছে। ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবার আগে ওই ট্রাঙ্কে রেখে যাই। এর আগেও যতবার কোথাও বেরিয়েছি ওগুলো ওই ট্রাঙ্কেই রেখে গিয়েছি। ব্যাপারটাও এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না।

ঠাকুর সায় দিল—ঠিক কথা—তাছাড়া তাড়াহুড়োর সময় ভুল হতেই পারে। তা ওটা কোথায়? এখানে তো দেখছি না।

—কি যে বলেন, অত দামি জিনিস কি সঙ্গে নেওয়া যায়? ওটা আমার ব্যাঙ্কের স্ট্রং রুমে রেখে দিয়েছি। এর আগেও যতবার বাইরে গিয়েছি ওখানেই রেখে গিয়েছি। অবশ্য তখন পাল ছিল।

ঠাকুর দুঃখিত হয়ে বলল, এবার গিয়ে বন্ধুর অভাবটা নিশ্চয়ই মনে লেগেছে। তা মিঃ ভাট আর একটু সাহায্য। এবার একটু ব্যাঙ্কে যেতে হয়।

—কী বলছেন আপনি? আমি ট্রেন মিস করব নাকি আপনার জন্য? ওদিকে হোটেল বুক করা হয়ে গেছে—টিকিট...রিজারভেসন—

ঠাকুর আবার বলল, কী করব বলুন, আমার ডিউটি।

ভাট পকেট থেকে চাবি বের করে বলল, এই নিন স্ট্রং রুমের চাবি।—আপনি ব্যাঙ্কে গিয়ে পরীক্ষা করুন। আমি ট্রেন ধরি।

ঠাকুর বলল, ট্যাকসিতে যেতে আসতে আর কতটুকু সময় লাগবে—ওই ট্রাঙ্কটা দেখেই আপনাকে ছেড়ে দেব! দয়া করে চলুন।

ভাট বলল—কী আর করি, আপনার পাল্লায় পড়ে ট্রেন না মিস হয়।

ঠাকুরের সেই ট্যাকসির দিকে দুজনে যেতে যেতে হঠাৎ ভাট বলল, ওঃ, আমাকে কিছু সিগার নিতে হবে। ওই দোকানটায় ভালো ব্র্যান্ডের সিগার পাওয়া যায়।

ঠাকুর বলে উঠল, কী আশ্চর্য! আমারও সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, চলুন।

ঠাকুর ভাটের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ভাট ঠাকুরের পায়ের উপরে পা চেপে ধরে মারল এক ধাক্কা—তারপরই দৌড়। ঠাকুর মাটিতে পড়ে টাল সামলে উঠে দাঁড়াল, তারপরই ভাটের পেছনে দৌড়ল। ট্যাকসি ড্রাইভারও নেমে এসে ঠাকুরের সঙ্গে দৌড়োতে লাগল। কিছু দূর ছুটে ভাটকে ওরা ধরে ফেলল! ওরা পুলিশের লোক, দৌড়ঝাঁপ ভালো অভ্যাস আছে, আর ভাট আয়েসী ধনী লোক। ড্রাইভার হাতকড়া এগিয়ে দিতেই ঠাকুর ভাটের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। ট্যাকসির দিকে আসতে আসতে ঠাকুর বলল, এর দরকার ছিল না। মিছিমিছি আপনি পালাবার চেষ্টা করলেন। ব্যাঙ্কে গিয়ে ট্রাঙ্কটা দেখেই আপনাকে ছেড়ে দিতাম।

ভাট বলল বেশ হতাশভাবেই—এখনও কি তাই করবেন?

ঠাকুর উদাসীনভাবে বলল, —আমি যা ভেবেছি সে জিনিস যদি ট্রাঙ্কের ভেতর না থাকে তবে আবার আমিই আপনাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেব।

ভাট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, —নাঃ, দেখছি আর নৈনিতাল যাওয়া হল না। একটা সিগারেট দিতে পারেন?

—আমি তো ধূমপান করি না—

—তবে তখন যে বললেন সিগারেট ফুরিয়েছে।

—আপনার মতলব বুঝেই।—

ভাট এবার পেছনে হেলান দিয়ে বলল, —তাহলে আপনি প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিলেন। আপনি সত্যিই প্রতিভাবান পুলিশ একজন—

ঠাকুর বিনয়ের সঙ্গে বলল, না স্যার—প্রতিভা নয়—শুধু কার্যকারণটা খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণ করলে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ে। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং নিয়েছিলাম—সে সময়ে এটার ওপর খুবই জোর দেওয়া হত।

ঠাকুর বলতে লাগল, —পাহারাদারের খাতায় পেলাম, সে রাত্রে রাতের শেষে আপনি ফ্ল্যাটে ঢুকলেন—অথচ ফ্ল্যাট থেকে বেরোলেন কখন, এটা ভাবতে ভাবতে মিঃ পালের একখানা ফোটোর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে চিন্তা করলাম। তাতেই রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। স্যার আর্থার কোনান ডোয়েলকে অজস্র ধন্যবাদ, তিনি আমাদের জন্য চিন্তার কৌশল অনেক রেখে গেছেন।

ভাট বলল, —আমার সত্যি কৌতূহল হচ্ছে আপনার বিশ্লেষণটা শুনতে।

এই সময়ে ট্যাকসি যানজটে থেমে গেল! ঠাকুর বলল—এ জট খুলতে খুলতে হয় তো সময় লাগবে, ততক্ষণ আপনার কৌতূহল মেটাই। দেখুন মিঃ ভাট, আপনি প্রায় নিখুঁত কাজ করেছিলেন। পেশাদার খুনি না হয়েও এতটা নিখুঁত কাজ যে করে সে নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। কিন্তু আপনার দুটি ভুল ছিল যা আমার বিশ্লেষণী চোখে ধরা পড়ে গেল। আপনি আর মিঃ পাল সমান লম্বা, মুখের আদলও অনেকটাই একরকম! পালের গোঁফ ছিল—আপনার গোঁফ নেই। যে কারণেই হোক আপনি পালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য কিছুদিন হল প্ল্যান তৈরি করছিলেন। ওই রাতে সে প্ল্যান কার্যকরী করতেই ভালো খাবার লোভ দেখিয়ে তাঁকে আপনার ফ্ল্যাটে এনেছিলেন! পালের স্ত্রী কলকাতায় না থাকার সময়টা বেছে নিয়েছিলেন যাতে দু-একদিন পালের নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদটা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এটা আপনার বরাতের দোষ যে ওঁর স্ত্রী সেই রাতেই ফিরে এসে ভোরে লালবাজারে ডায়েরি করলেন। পরদিনই আমি আপনার কাছে এলাম। আপনি লাশ পাচার করতে ভয় পেলেন। যাই হোক, মদের সঙ্গে বিষ দিয়েই হয়তো পালকে শেষ করলেন। পরে পালের কোটটা পরে তার টুপিটা মাথায় দিয়ে আগে

থেকে বানানো নকল গোঁফ লাগিয়ে আপনি মিঃ পাল সেজে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। পাশাপাশি কিছুক্ষণ দেখে যদি লিফটম্যান চিনে ফেলে সেজন্য আপনি সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। আপনি জানতেন যে রাত্রের পাহারাদার কে ঢুকছে কে বেরুচ্ছে তা খাতায় লিখে রাখে। সেজন্য তার সামনে দিয়ে চলে গেলেন, সে লিখে রাখল। তারপর আপনি পালের টুপি, কোট আর নকল গোঁফ কোথাও ফেলে দিয়ে ফিরে এলেন রাত চারটেয়। পাহারাদার লিখেছে মিঃ এস ভাট ফিরে এলেন, কোট নেই বা টুপি নেই। খালি প্যান্ট আর সার্ট। একটু ক্লান্ত! কিন্তু উনি বেরিয়েছিলেন কখন? খুনের পাঁচদিন পরে আমি ওর এই খাতা পরীক্ষা করি। তখনই আস্তে আস্তে বুঝতে পারি পাল ওই রাতেই খুন হয়েছেন। আচ্ছা মিঃ ভাট, পালকে খুনের মোটিভটা কী ছিল এখনও বুঝতে পারছি না।

ভাটের মনে পড়ল খুনের দিনকয়েক আগে হোটেলের বারে পাল ওকে নিভৃতে বলেছিল—ভাট, আমি ব্যাঙ্কের দুলাখ টাকা তছরুপ করেছি। ওটা পূরণ করে না রাখলে অডিটে ধরে ফেলবে। বিলেতে থাকতে তুমি দারুণ ধনী লুসিকে বিয়ে করেছিলে। তাকে বিয়ে করে কলকাতা এনে তার পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের হিরে জহরত গয়না বাগিয়ে নিয়ে গুন্ডা লাগিয়ে তাকে খুন করিয়েছিলে—আমি সব জানি! কিছু বলি না তাই। তুমি আমার এই বিপদে দু'লক্ষ টাকা দাও, নচেৎ তোমার কীর্তি আমি ভালো ভালো কাগজে ফাঁস করে দেব। ভাট সেই দিনই ওকে সরিয়ে ফেলবার প্ল্যান করে। —মনে মনে ভাবে মোটিভ বলে দিলে তো স্বীকার করাই হল। তা করবে, না ব্যারিস্টার লাগিয়ে চেষ্টা করবে বাঁচবার। কাজেই বলল—আপনি যখন এতই বিশ্লেষণ করেছেন—তো মোটিভটাও ভেবে দেখুন।

মনে মনে ভাট ভাবে পালের দেহ দুমড়ে মুচড়ে পলিথিনের ব্যাগে প্রচুর ন্যাপথলিন পুরে খুব ভালোভাবে ট্রাঙ্কে রেখেছিলাম। থাক ওটা ওই স্ট্রংরুমে। মাস দুই পরে ফিরে আসতে আসতে সব থিতিয়ে যাবে। তা এই শয়তান ইন্‌সপেকটরটা সব ভেস্তে দিল।

ঠাকুর বলল, স্ট্রংরুমের ওই ট্রাঙ্কে যে পালের দেহ আছে তা জানি। মিঃ ভাট, আপনি রেহাই পাবেন না। কারণ ওই ট্রাঙ্ক নিজে হাতে রেখে এসেছেন। হ্যাঁ, আপনি প্রায় নিখুঁত ক্রাইম করেছিলেন, কিন্তু দুটো ভুল ছিল।

—কী ভুল?

ঠকুর বলল, আপনি ভেবেছিলেন রাতের পাহারাদার শেষরাতে হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর লিখবে না। কিন্তু আপনার মন্দ-ভাগ্য, ও জেগেই ছিল। আপনি যদি দিনে ফিরতেন তবে কেউ লিখত না। কারণ দিনে এই বিরাট বাড়িতে এত লোক চলাচল করে যে লেখা যায় না। এই এক নম্বর ভুল। দ্বিতীয় ভুল, আগে ওই ট্রাঙ্কটা নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেই পারতেন। আমরা ইতস্তত করে আপনার ফ্ল্যাটটা সার্চ করিনি। কদিন হল ক্যামেরা দিয়ে ওয়াচার নিয়েছিলাম। পৃথিবীতে দেখা যায় যত নিখুঁত ক্রাইমই হোক না কেন, এমন দু-একটা ভুল থাকে যার ফাঁক দিয়ে পুলিশের ছড়ি ঢুকে যেতে পারে।

হঠাৎ ভাট সোজা হয়ে বসল—বলল, নাঃ, আর ব্যাঙ্কে গিয়ে লাভ নেই। আমাকে লালবাজারে নেবেন তো, নিয়ে যান। ট্রাঙ্ক যেদিন ইচ্ছে আনবেন। কর্মচারিদের কাছে আর অপমানিত হতে চাই না।

ঠাকুর বলল, আপনার যখন ইচ্ছে তাই হবে। ড্রাইভার, লালবাজার চলো।

ট্যাকসি ঘুরে লালবাজারের দিকে চলল।

সিগারেট কেস

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার বন্ধু সত্যসিন্ধু পাকড়াশি মস্ত ডিটেকটিভ। কে না তাঁর কথা জানে! কিন্তু তাঁকে আমার বন্ধু বললে কমিয়ে বলা হবে। তিনি আমার গুরু। এবং তিনি আমাকে দয়া করে তাঁর বাড়িতে যেতে দেন, আমার সঙ্গে কথা বলেন—এ সবই তাঁর নিজের মহত্ত্ব এবং উদারতার পরিচয় ছাড়া আর কী? আমার মতো নিতান্ত সাধারণ লোকের প্রতি তাঁর এই করুণা এবং দয়ার কথা এক-একবার যখন গভীরভাবে ভাবি তখন বিস্ময়ে গলার কাছটা আমার আটকে আসে।

প্রায়ই আমি সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে যাই। তাঁর বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। সেদিন সন্ধেতেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি সেই পরিচিত ইজিচেয়ারটায় শুয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না ভেবে তাঁর কাছের চেয়ারটায় আমি চুপচাপ বসে পড়লুম।

কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে কে যেতে পারে?

আমি বসবার পরেই সেই শান্ত গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।'

বৃষ্টি অবশ্য বাইরেই পড়ে। সেটা কোনও আশ্চর্য খবর নয়। কিন্তু তিনি জানলেন কেমন করে? তবে কি তিনিও এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরলেন?

'আপনি বাইরে গিয়েছিলেন তাহলে?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'না,' তিনি বলে চললেন, 'তোমার জামাটা খানিক ভিজেছে, তোমার জুতোটাও ভেজা দেখছি, তোমার ছাতা দিয়েও টপটপ করে জল পড়ছে।'

তাঁর এই গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে আবার আমি নতুন করে বিস্মিত হলুম। বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল! আবার তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরেই বললেন, 'তাছাড়াও বৃষ্টির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তুমিও চেষ্টা করলে পাবে। শোনো।'

অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম। সত্যি বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে: ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম। বাস্তবিক সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।—কী পর্যবেক্ষণ শক্তি, কী অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি!

'আপনাকে যেন খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে?' আমি তাঁর গম্ভীর হালচাল দেখে প্রশ্ন করলুম, 'আবার কোনও জটিল রহস্যভেদের ভার নিয়েছেন নাকি?'

বাঁ পায়ের উপর ডান পা তুলে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মানে তেমন কিছু নয়। খঞ্জনগড়ের মহারাজের হিরের মুকুটটা চুরি গেছে, কোটিপতি শিলাদিত্যের স্ত্রীর গলার সতেরো লক্ষ টাকার মুক্তোর নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না, বোম্বাই-এর টোপিওলাকে কে বা কারা খুন করে গেছে—এই সব নানা তুচ্ছ তদন্তের ভার আমার ঘাড়ে সবাই চাপিয়েছে।' একটু থামলেন সত্যসিন্ধুবাবু, তারপর অকস্মাৎ ইজিচেয়ারের হাতল থেকে তাঁর পা দুটো নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে বসে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী জানো? আমার বাড়ি থেকে আমার সিগারেট কেসটা চুরি গেছে! কে এই দুঃসাহসের কাজ করতে পারে ভেবে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হচ্ছ! কিন্তু কথা হল সত্যিই সিগারেট কেসটা আর নেই—একেবারে উবে গিয়েছেও বলতে পারো।''

'চুরি? আপনার বাড়ি থেকে চুরি?' আমার চেয়ারের হাতলটা মুঠো করে ধরে বিস্ময়ে আমি হাঁ হয়ে গেলুম।

'হ্যাঁ। মন দিয়ে শোনো। পৃথিবীতে একমাত্র তোমার কাছেই আমার কথা বলি। একমাত্র তুমিই আমাকে কতকটা জান। একমাত্র তুমিই বছরের পর বছর নিজের ডাক্তারি প্র্যাকটিস অবহেলা করে আমার সঙ্গে সর্বদা থাক। তুমি নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার জীবনকে কেবল আমার জন্যে উৎসর্গ করেছ বলেই তোমাকে আজ সব কথা খুলে বলছি।'

কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সত্যসিন্ধুবাবু তা লক্ষ করে বললেন, 'এই নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

কুণ্ঠিত স্বরে বললুম, 'ও আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

কেন? কী করে বলি তাঁর কাছে সময়ে-অসময়ে আসার জন্য লোকে ডাকতে এসে আমাকে বাড়িতে পায় না। পরে আমার আশা ছেড়ে দিয়ে সবাই অন্য ডাক্তারের কাছে যায়। আমার আর ডাক একেবারেই পড়ে না। এক পয়সাও তাই আজকাল আমি রোজগার করতে পারি না। এ অবস্থায় সিগারেটের পিছনে কী করে আমি খরচ করতে পারি?

'এমনি,' উত্তর দিলুম, 'ও-সব আর আমার ভালো লাগে না। —কিন্তু চুরির কথা তো বললেন না? কী চুরি গেছে?'

সত্যসিন্ধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে খানিক পায়চারি করলেন তিনি। তারপর হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে খানিক আমাকে যেন বিধঁতে চেষ্টা করলেন। তারপর নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার সেই সোনার সিগারেট কেসটা হারিয়ে গেছে। কোন্‌টা জানো? ঘুটেখালির মহারাজার বেড়ালের বিয়ের দিন সেই অসম্ভব গোলমালের মধ্যে পাত্রী হঠাৎ উধাও হওয়ায় আমাকে টেলিগ্রাম করে স্পেশ্যাল ট্রেনে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার মনে আছে কি না জানি না—আমি পৌঁছেই পাত্রীকে আবিষ্কার করেছিলুম; রাজপ্রাসাদের পিছনের মজা-ডোবার বাঁশবনের পাশে পাত্রী তখন মাছের কাঁটা চিবোচ্ছিলেন।—মহারানি খুশি হয়ে এক ছড়া মুক্তোর মালা দিয়েছিলেন, পরে অবশ্য জানা যায় মুক্তোগুলো ঝুটো। তার পরে মহারাজা গড়িয়ে দিয়েছিলেন সোনার সিগারেট কেস। কে জানে, পাছে সেটা সোনা না হয়ে পেতল বলে প্রমাণিত হয়, এই ভয়ে যাচাই আর করাইনি। সেই সোনার সিগারেট কেস আমার

বাড়ি থেকে উধাও। ভাবো একবার!'

'খুব চিনি সেই সিগারেট কেসটা,' আমি বললুম। 'তার ওপর আপনার নামের প্রথম অক্ষর তো বেগুনি রঙের মিনে করা?'

ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'তোমার মনে আছে দেখছি!'

'মনে থাকবে না? কতবার সেটা হাতে করে আপনার সেই আশ্চর্য শক্তির কথা আমি ভেবেছি! মনে থাকবে না? কিন্তু সেটা আর নেই, অর্থাৎ আপনি সেটা হারিয়ে ফেলেছেন—এ-কথা নিশ্চয়ই বলছেন না!'

'নিশ্চয়ই নয়। হারাবো কেন? সেটা চুরি গেছে।'

সিগারেট ফুরিয়ে গেলে সত্যসিন্ধুবাবু ইজিচেয়ারে ফিরে এসে বসলেন, পকেট থেকে বার করলেন একটা নোটবই আর পেনসিল, তারপর গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'তোমরা, মানে—ডাক্তাররা —নিজেদের অসুখ হলে অন্য ডাক্তার ডাকো। নিজেরা নিজেদের চিকিৎসা কখনও করো না। ওইখানে তোমাদের সঙ্গে আমার তফাত। আমি নিজেই কিন্তু নিজের বাড়ির এই চুরির তদন্ত করব। তার আগে তোমাকে যে কতটা বিশ্বাস করি—মানে তোমার ক্ষমতায় আমি যে কতটা আস্থাবান সেটা দেখাবার জন্যে তোমার মতামত নিতে চাই। মানে তুমি হলে কী করতে তাই বলো—কী ভাবে তদন্ত করতে?'

এও কি সত্যি? কানদুটো আমার ঠিক আছে তো? স্বয়ং সত্যসিন্ধু পাকড়াশি আমার মতামত চান? আমার উপদেশ কামনা করেন? মন্ত্র-চালিতের মতো গড়গড় করে বলতে লাগলুম, 'প্রথমেই আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতুম, একটা পুরস্কার ঘোষণা করাও আমার অসম্ভব ছিল না। শুধু খবরের কাগজে নয়—হ্যান্ড বিল ছাপিয়ে সর্বত্র ছেয়ে ফেলতুম—খেলার মাঠ, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, বিয়েবাড়ি, শ্মশান, ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল—সর্বত্র। মানে মানুষ যেখানে যায়, ফুর্তি করতে কিংবা মরতে কিংবা পুড়তে—সেই সমস্ত জায়গাতেই। তারপর একটা লিস্টি তৈরি করে খবর নিতুম শহরের সমস্ত সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসের দোকানগুলোয়। পুলিশকেও একটা খবর দিতুম, থানার ইন্‌সপেকটর সায়েবকে দু'প্যাকেট সিগারেট আর চার পয়সার পান তো গোড়াতেই খাওয়াতে হত। তারপর চাকর-বাকরদের সিনেমা যাবার টিকিট নিজে কিনে এনে তাদের ছবি দেখাতে পাঠিয়ে, নিজের হাতে তাদের বাক্স-প্যাঁটরা পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাতড়ে পরীক্ষা করে দেখতুম; তারপর সেখানে না পেলে নিজের বাড়িটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজতুম, নিজের সব জামার সব পকেটগুলোও উলটে বাইরে বার করে দেখতে কসুর করতুম না।—অবশ্যই এক্ষেত্রে নিজের বাড়ি আর নিজের পকেট বলতে আপনার বাড়ি আর আপনার পকেটের কথাই আমি বলছি।'

আমার সমস্ত কথাগুলি গম্ভীর মুখে নোটবইতে টুকে নিলেন তিনি।

আবার হেসে আমি বললুম, 'খুব সম্ভব এ-সব কিছুই আপনি করেননি?'

রহস্যময় কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'সম্ভবত না।—কিন্তু বন্ধু, তুমি একটু বোসো। একটা কাজ সেরে এখনি ফিরছি।' বলেই ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আজ আবার নতুন দৃষ্টিতে আমি এই অতি-পরিচিত ঘরটিকে যেন নতুন করে দেখতে লাগলুম। সামনের দেয়ালের খাঁজকাটা তাকে সারিসারি কাঁচের শিশি রয়েছে। প্রত্যেকটির

গায়ে লেবেল আঁটা। লেবেলগুলো এই ধরনের: 'চৌরঙ্গির রাস্তার ধুলো,' 'বাসের পা-দানির ছেঁড়া টিকিট', 'ট্রামের (বেহালা লাইনের) পা-দানির ছেঁড়া টিকিট', 'মেট্রো সিনেমার সিগারেটের শেষ অংশ', 'লাইটহাউসের কারপেটের রোঁয়া,' 'কাফে ডি ক্যালকাটার বেতের চেয়ারের ভাঙা টুকরো'—এই ধরনের নানা সব আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ জিনিসে ভরা কাচের শিশিগুলো। কিন্তু জগতে কিছুই তুচ্ছ নয়। এই ধুলোবালি, সিগারেটের টুকরো, কারপেটের রোঁয়াই সত্যসিন্ধু পাকড়াশিকে আজ উন্নতির চরম শিখরে তুলেছে।

এইসব কথা গভীরভাবে যখন ভাবছি হঠাৎ সামনের দরজাটা খুলে গেল। চমকে দেখলুম এক প্রৌঢ় জাহাজের খালাসি ঘরে ঢুকেছে। একমুখ অপরিষ্কার তার দাড়ি। একটা চোখে ঠুলি-পরা, সবুজ হাফ-প্যান্টটা অতিশয় নোংরা, দাঁতগুলো খয়েরি। উত্তেজিত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠতেই লোকটা ভাঙা গলায় বলল, 'হুজৌর, গলতি হো গিয়া।' বলেই দরজা খুলে সে আবার বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার পিছন-পিছন নীচে নেমে এলুম। ততক্ষণে লোকটা কিন্তু বাড়ির সামনের একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু চিন্তিতভাবেই ফিরে এলুম। চুরির পরেই এই ধরনের খালাসির আবির্ভাব একটু সন্দেহজনক বৈ-কি। সত্যসিন্ধুবাবুকে বহুদিন আমি চিনি। এমন কাজ-পাগলা লোক দুনিয়াতে আর দুটি নেই। কাজের কথা ভাবতে-ভাবতে এতই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যে প্রায়ই বেরুবার সময় বাড়িতে তালা দিতে ভুলে যান, বাক্স-প্যাঁটরা খোলাই পড়ে থাকে। ড্রয়ারের মধ্যে ঘড়ি, টাকা-পয়সা রাখার অভ্যেস। সেই ড্রয়ারও প্রায়ই খোলা থাকে। তাঁর আসতে দেরি দেখে ভাবলুম নিজেই একবার খুঁজে দেখি না ঘরটা। হয়তো সিগারেট কেসটা এখানেই কোথাও পড়ে আছে। প্রথমেই তাঁর টেবিলের ড্রয়ারটা ধরে টান মারলুম। এই ড্রয়ারে বহুবার ওই সিগারেট কেসটা দেখেছি। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। ড্রয়ারে চাবি দিতে তিনি ভুলে গেছেন। টানতেই খুলে গেল। কিন্তু সবটা খুলল না। ভিতর দিকে কিসে যেন বাধা পেয়ে আটকে গেল। থাকগে, যতটা খুলেছি ততটাই যথেষ্ট। ভিতরে বাস্তবিক নানা সব জিনিসপত্রের ভিড়: মানি-ব্যাগ, হাত-ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন, র‍্যাশন কার্ড, রেডিও লাইসেন্স, চেক-বই ইত্যাদি। কিন্তু সিগারেট কেসটা নেই। ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলুম। তার হাতলটা কিন্তু ভারি নোংরা। হাতটা চ্যাটচ্যাট করছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চ্যাটচেটে আঙুলগুলো মুছে ফেললুম। তারপর আর কোনও করার মতো কাজ নেই দেখে সেই ইজিচেয়ারটায় ফিরে এসে অপেক্ষা করতে-করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনেই নেই।

হয়তো আমি স্বপ্নই দেখছিলুম। কিন্তু ইজিচেয়ারের মধ্যে অস্পষ্ট যেন আমার মনে হয়েছিল কে যেন খুব সাবধানে আমার জামার পকেটগুলো হাতড়াচ্ছে! কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। জেগে উঠে দেখি সামনের চেয়ারে পাইপ ধরিয়ে সত্যসিন্ধুবাবু বসে রয়েছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, 'তুমি ঘুমুচ্ছিলে তাই আর জাগাইনি।'

'কিন্তু কী খবর? এই রহস্যের কোনও কিনারা হল?'

'হল বৈ-কি! আশাতীত রকম ভালো ফল পেয়েছি। আর পেয়েছি তোমারই জন্যে।' বলে তিনি নোটবইতে টোকা দিতে লাগলেন। আমি আরও বিশদ বিবরণের জন্যে অপেক্ষা

করে রইলুম। কিন্তু আর কোনও কথা তিনি বললেন না। বরঞ্চ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সিন্দুকের সবচেয়ে কড়া তালা খুলে ফেলা সহজ, কিন্তু সত্যসিন্ধু পার্কড়াশি একবার কথা বলতে না চাইলে তাঁর মুখ খোলানো সম্ভব নয়।

উঠে পড়লুম। পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, 'আবার এসো কিন্তু।' কিন্তু তাঁর সেই চাপড়ানিটা একবার পিঠে পড়েই আমার বুক-পকেট এবং পাশের পকেটের উপরেই বারকতক যেন পড়ল। অবশ্য এটা আমার ভুল হতে পারে।

এর পর সংসার চালাবার জন্যে সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস যারা কেনাবেচা করে সেই রকম কয়েকটি দোকানে আমাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়। সেই রকম কয়েকটি দোকানেই একজন অদ্ভুত আলখাল্লাপরা মানুষ একাধিকবার আমার নজরে পড়ে। সেই বেশ-ভুষা, চোখের চাউনি আর চলার ধরনের সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবুর কিন্তু অনেকখানি মিল আছে। ইতিমধ্যে যতবারই তাঁর বাড়িতে গিয়েছি কোনওবারেই তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি।

তাই, দিনচারেক পরে তিনি যখন চাকর মারফত আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন এই আশ্চর্য শক্তিমান পুরুষের সাক্ষাৎ পাবার আশায় উল্লসিত না হয়ে পারিনি।

তাঁর ঘরে ঢোকবার পর আমাকে আশ্চর্য করে তিনি দরজাটা ভিতর থেকে তালা দিয়ে ভালো করে বন্ধ করলেন, একটিও কথা না বলে বারকয়েক পায়চারি করলেন ঘরের মধ্যে। তারপর অকস্মাৎ পকেট থেকে একটা পিস্তল ঝট করে বের করে একেবারে আমার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে চাপা-কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার সিগারেট কেসটা ফিরিয়ে দাও! শিগগির দাও!'

আমার গলার কাছটা আঠা-আঠা হয়ে এল। কোনও রকমে বলতে পারলুম, 'আমার কাছে সেটা নেই।'

তিক্ত হাসি হেসে তিনি বলে চললেন, 'এই উত্তরই আমি আশা করেছিলুম। কিন্তু একে-একে মন দিয়ে আমার কথা শুনে যাও—'

'কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি তামাসা করছেন? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে অবি—'

'চুপ। একটি বাজে কথা নয়।' বলে সেই নোটবই বার করে তিনি বলতে লাগলেন, 'নিজেই নিজেকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ।—তুমি প্রথম যে-দিন সিগারেট-কেসটা দেখেছিলে সেদিনের ঘটনা থেকেই শুরু করা যাক। সেটা দেখেই তুমি বলেছিলে, তোমার মনে নিশ্চয়ই আছে—বাঃ, কী চমৎকার! আমাকে কেউ ও-ধরনের একটা 'কেস' দেয় না।—পাপের পথে সেই তোমার প্রথম পদক্ষেপ। 'আমাকে কেউ দেয় না' ওই কথাটাই তোমার মনে ঘুরতে-ঘুরতে ক্রমশ রূপান্তরিত হল এইভাবে: 'আমাকে ওটা বাগাতেই হবে।' তারপর তোমার মনে প্রশ্ন এল, 'কী করে ওটা বাগানো যায়?' —চুপ, একটি বাজে কথা নয়—তার ওপর মনে রেখো নিজেও তুমি একটি সিগারেট-খোর।—'

'কিন্তু ওই বদ্‌-অভ্যেস আমি তো ছেড়ে দিয়েছি!'

'গর্দভ! ওই কথা বলেই তো নিজেকে তুমি আবার নিজেই ধরিয়ে দিয়েছ। যাতে সহজেই আমার মনে হয় তুমি যখন সিগারেট ছেড়েছ তখন নিশ্চয়ই সিগারেট-কেসের ওপর তোমার কোনও লোভ নেই, সেইজন্যই ও-কথা তুমি বলেছিলে! —চুপ, একটি

বাজে কথা নয়—কয়েকদিন আগেই ওই চুরি তুমি কর। সেই রাত্রেই কর যখন তোমার সামনের ড্রয়ারের মধ্যে সিগারেট-কেসটা আমি রাখি। তুমি ড্রয়ারের পাশের ওই চেয়ারটায় বসে ছিলে। আমি একবার উঠেছিলুম শেলফ থেকে একটা জিনিস আনতে। যেই পিঠ ফিরিয়েছি অমনি তুমি ড্রয়ার থেকে বাগিয়ে নিয়েছ। তোমার হাতের মাপ কয়েকদিন আগেই তোমার পিঠ চাপড়াবার সময় সংগ্রহ করেছি। কতটা জানো ওই চেয়ার থেকে ড্রয়ারের দূরত্ব যতটা ঠিক ততটা। তারপর সেদিন আবার তুমি ড্রয়ারটা খুলেছিলে। পাশের ঘরের ফুটো দিয়ে আমি সব লক্ষ করেছি। তা ছাড়া ড্রয়ারের হাতলে আমি আগে থেকেই একটু আঠা লাগিয়ে রেখেছিলুম। সেই আঠায় তোমার আঙুলের ছাপও স্পষ্ট পড়েছে। তারপর সেই খালাসিকে মনে আছে? হঠাৎ যে এ-ঘরে ঢুকেছিল। সে আর কেউ নয়—স্বয়ং আমি। কিন্তু ওকি! চুপ করে বসে থাকো। নইলে—নইলে—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি বিদ্যুৎবেগে উঠে এক টানে ড্রয়ারটা খুলে ফেললুম। আগেকার মতোই সবটা খুলল না, কিসে যেন আটকে যাচ্ছে। সাবধানে হাত ঢুকিয়ে সেই বাধা-দেওয়া জিনিসটাকে টেনে বার করলুম। সেটা আর কিছুই নয়: সেই সিগারেট-কেসটা।

'একী—একী!' বলতে-বলতে সত্যসিন্ধুবাবুর হাত থেকে পিস্তলটা মেঝেয় পড়ে গেল।

'তা হলে, তা হলে জীবনে এই কি প্রথম আমার অনুমান ভুল হল! জিনিসটা ড্রয়ারেই ছিল আর আমি চোর খুঁজে বেড়াচ্ছি?'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু জীবনে এই আমার শেষ ভুল। আর কখনও হবে না।' বলে গটগট করে বেরিয়ে সোজা আমার ডাক্তারখানায় ফিরে এলুম।

ক্রমশ এখন ডাক্তার হিসেবে আমার পসার বাড়ছে, কয়েকজন রোগী সত্যিই আমার হাতে বেঁচে উঠেছে—সত্যসিন্ধু পাকড়াশির বাড়ি কিংবা পুরোনো জিনিসের দোকানে আর আমি যাই না।

টর্চ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইনস্‌পেকটর রাজেশবাবু এসে দেখলেন, নন্দবাবুর হাত-পা মুখ কষে কাপড় দিয়ে বাঁধা। চোখের তারা কপালে তুলে তিনি গোঁ গোঁ করছেন।

সঙ্গের কন্‌স্টেবল তাঁর বাঁধন খুলে দিল। নন্দবাবু তখনও কথা বলতে পারছেন না—হাঁপাচ্ছেন।

রাজেশবাবু একটু জিরিয়ে নেবার সময় দিলেন। ঢক-ঢক করে পুরো এক ঘটি জল খেয়ে নন্দবাবু ধাতস্থ হলেন একটু। তারপর হঠাৎ গোঙিয়ে উঠলেন, 'আমার ভাই মুকুন্দ? তার—তার কী হয়েছে?'

একটু বিষণ্ণ মুখে রাজেশবাবু বললেন, 'আপনাকে দুঃসংবাদ দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না। তিনি খুন হয়েছেন। তাঁর বুকে ছোরা বেঁধানো!'

'অ্যাঁ!'—একটা চিৎকার করে নন্দবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ পুলিশের সামনে অজ্ঞান হয়ে থাকা যায় না, কাজেই উঠে বসতে হল একটু পরে। রাজেশবাবু পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বের করলেন তখন।

'দেখুন, লোক ধরবার সময় পরে অনেক পাবেন। কিন্তু হত্যাকারীকে আগে ধরবার চেষ্টা করা দরকার। সুতরাং দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করুন।'

ধরা গলায় নন্দবাবু বললেন, 'বলুন।'

'আপনি তো পাটের দালালি করেন আর আপনার ছোট ভাই মুকুন্দবাবু?'

'ওর একটা জুয়েলারি দোকান আছে রাধাবাজারে। মাঝে মাঝে দু'একটা হিরে-টিরে সঙ্গে করে বাড়িতে আনত—কী সব পরীক্ষা করত এনে। আমি অনেকবার বলেছি—মুকুন্দ, বাড়িতে আমরা দু'ভাই মোটে থাকি, ও-সব সর্বনেশে জিনিস আনিসনি, তা—' বলতে বলতে নন্দবাবু আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন: 'আমি বুঝেছি, কালও ওই রকম একটা কিছু বাড়িতে এনেছিল, আর কেউ তাকে ফলো করে—'

বাধা দিয়ে রাজেশবাবু বললেন, 'তাই সম্ভব। কিন্তু ও-সব পরে হবে। তার আগে বলুন, কাল রাত্রে কী হয়েছিল?'

'তখন রাত সাড়ে ন'টা। খেয়ে-দেয়ে আমরা দু'ভাই শুতে গেলাম। আমরা বরাবরই তাড়াতাড়ি শুই, ভোরে উঠি।'

'বাড়িতে আর কে থাকে?'

'কেউ না। আমরা ব্যাচেলর।'

'থানায় যে খবর দিয়ে এল—দরজা হাট করে খোলা, আপনি মুখ বাঁধা পড়ে, আপনার ভাই খুন হয়েছেন—আপনাদের সেই চাকরটি কোথায় থাকে?'

'খ্যাংরাপটিতে। আমাদের রান্নাবান্না করে দিয়ে, ন'টার মধ্যেই ও খেয়ে বাড়ি চলে যায়। আমি কাল ঠিক ন'টায় ও চলে গেলে সদর বন্ধ করেছি।'

'ঠিক ন'টা? খেয়াল থাকল কী করে?'

'তখুনি কোথায় একটা পেটা-ঘড়িতে ন'টা বাজছিল।'

'ঠিক আছে। তারপর বলুন।'

'তখন দশটা সাড়ে-দশটার বেশি নয়। আমার ঘুম এসেছিল। হঠাৎ পাশে মুকুন্দর ঘর থেকে যেন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি—গোঁ গোঁ আওয়াজ কানে এল। উঠে আলো জ্বালতে গেলাম—জ্বলল না, মেন অফ্ করে দিয়েছে কেউ। দিনকাল তো জানেন, যখন-তখন কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। আমার বালিশের নীচে ছোট্ট একটা দু'সেলের টর্চ থাকে, সেইটে জ্বেলে আমি মুকুন্দর ঘরের দিকে ছুটে গেলাম।'

'একটু দাঁড়ান। মুকুন্দবাবুর ঘরের দরজা খোলা ছিল?'

'বরাবরই থাকে। আমরা দু'ভাই-ই দরজা খুলে ঘুমোই।'

'মারাত্মক অভ্যেস, এ-কাজ কখনও করা উচিত নয়। সে যাক, তারপরে কী দেখলেন?'

টর্চ ফেলে দেখি, একটা মুসকো জোয়ান লোক মুকুন্দর বুকে চেপে বসেছে, আর মুকুন্দ গোঁ গোঁ করছে। আমি কিছু করবার আগেই অন্ধকারে কারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হাত-মুখ বেঁধে ফেলল, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান হল, কত রাত জানি না, টের পেলাম—বারান্দায় পড়ে আছি। উঠতে পারলাম না, কিছু করতে পারলাম না—ছটফট করলাম সমানে। আবার জ্ঞান হারালাম। সকালে কখন যে বনমালী, মানে, আমাদের চাকরটা এসেছে, সব দেখেছে, আপনাদের খবর দিয়েছে—'

'ভালো কথা, আপনার টর্চ কী হল?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আমার হাত থেকে ঠিকরে পড়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত টর্চটা। ওই ঘরেই কোথাও আছে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, সেটাকে আমরা ও ঘরের একটা কোণায় পেয়েছি। এখন আর দু'একটা কথার জবাব দিন। বাইরে থেকে আপনাদের বাড়িতে লোক ঢুকল কী করে? সদর তো আপনি নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওরা নয় খুলেই বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ঢুকল কোন্ রাস্তা দিয়ে?'

'পাশেই তো কানাগলি। বাড়ির রেন-ওয়াটার পাইপ সেখানে। সেটা বেয়েই ডাকাতরা ছাতে উঠেছে। ছাতের দরজা বন্ধ করা হয়নি। আমরাও তো ঘর খুলেই রাখি।'

'ঠিক। তা হলে মুকুন্দবাবু হিরে এনেছিলেন কাল?'

'সেই রকমই বলছিল। কোন্ রানির হিরে—খুব দামি। যাচাই করতে দিয়েছিল বোধ হয়। সেই লোভেই—'

'হ্যাঁ, সেই লোভেই।'—মৃদু হেসে রাজেশবাবু বললেন, 'সেই লোভেই নিজের ভাইকে আপনি খুন করেছেন নন্দবাবু। তারপর চাকর বনমালীকে দিয়ে হাত-মুখ বাঁধিয়ে নিতে বেশি অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

নন্দবাবুর মুখটা ঝুলে পড়ল হঠাৎ। তারপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বলছেন আপনি পাগলের মতো? নিজের ভাই মুকুন্দকে আমি খুন করব?'

'লোভ নন্দবাবু, লোভ। লোভে মানুষ পশু হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন আপনি। টর্চের কায়দাটা না করলেই পারতেন।'

'অ্যাঁ?' —নন্দবাবু হাঁ করে রইলেন।

'নন্দবাবু, ঘটনাটা রাত-সাড়ে দশটার। বেলা সাড়ে সাতটা এখন। আপনার টর্চ এখনও পুরো তেজে জ্বলছে। কোনও ছোট্ট দু'সেলের টর্চে অমন অলৌকিক ব্যাটারি থাকে না নন্দবাবু! অতএব দয়া করে উঠুন এবং থানায় চলুন। আপনার বনমালীকেও সহযাত্রী করতে হচ্ছে, কারণ সেও আপনার সহযোগী—হিরে বিক্রির ভাগ সেও পেত নিশ্চয়ই।'

মাথায় শিকড়-পড়া সাপের মতো নন্দবাবুর ঘাড় নুয়ে এল।

ইঁদুরের খুট খুট

সমরেশ বসু

অনেককাল ধরে বড়দের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে, আমি নিজেও যেন কেমন হাঁপিয়ে পড়েছি। অথচ যাদের সঙ্গে গল্প করতে পেলে আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে, তাদের একটা গল্প নিজে থেকে শোনাতে পারি না। শোনাবার খুব সাধ। কিন্তু সাধ থাকলেই তো আর সাধ্যে কুলোয় না। বড়দের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে, মনটা কেমন যেন মরচে ধরে গিয়েছে। মনের সেই তাজা টাটকা ভাবটা যেন হারিয়েই ফেলেছি, যা না থাকলে, তোমাদের আসরে এসে বসবার কোনও মানেই হয় না।

এসব কথা বলতে হল, কারণ, আজ ঠিক করেছি, তোমাদের আমি একটি গল্প শোনাব। সম্প্রতি আমি এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর লেখা পড়ছিলাম। তিনি একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। তিনি মানুষের মন নিয়ে অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন, মাত্র ছ'বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মনে যে-সব ভাবনা-চিন্তা কল্পনা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির প্রসার ঘটে, পরবর্তীকালে—অর্থাৎ ভবিষ্যতে—মানুষ যত বড় হয়, সেই ছ'বছরের ভাবনা-চিন্তা কল্পনা জ্ঞান-বুদ্ধিই নানা রূপে, নানা ভাবে বিকাশ লাভ করে। তার মানে হল, সেই বিজ্ঞানী এ-কথাই বলতে চেয়েছেন, ছ'বছর বয়স পর্যন্তই মানুষের যা কিছু অনুভূতির পূর্ণতা ঘটে, পরে তা নানা রূপে বিকাশ লাভ করে। তা তিনি বিজ্ঞানী হন, কবি বা সাহিত্যিক হন, রাজনৈতিক নেতা বা ডাক্তার হন।

আমি অবিশ্যি তোমাদের সেই বিজ্ঞানীর কথা শোনাতে বসিনি। তাঁর গবেষণায় যথেষ্ট যুক্তি আছে বটে, অনেক তর্কও আছে। সে-সব নিয়ে আমাদের আপাতত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমি যার বিষয় নিয়ে, তোমাদের একটি আশ্চর্য অথচ ভয়ঙ্কর গল্প শোনাতে যাচ্ছি, তার বয়স মাত্র ছয়। নাম গোগোল। গোগোল নামটা ওর বাবা রেখেছিলেন। রাশিয়ার এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম ছিল গোগোল, আর আমাদের গোগোলের বাবা সেই রাশিয়ার সাহিত্যিক গোগোলের ভারি ভক্ত। সেই জন্যই ছেলের নাম রেখেছেন গোগোল।

গোগোলের কথা শুনলেই তোমাদের মনে হবে, সে জানে না, এমন বিষয় নেই। আসলে সে হয়তো অনেক কিছুই এখনও জানে না, জানা সম্ভবও না। কিন্তু ভাবভঙ্গি, স্পষ্ট উচ্চারণের কথাবার্তা শুনলে, একটু যেন থমকেই যেতে হয়। এই যেমন ধরো, গোগোলের বাবাকে কোনও ভদ্রলোক ডাকতে এলেন, বাড়ির চাকর এগিয়ে যাবার আগেই, গোগোল তার ঝকঝকে কালো চোখে, ভদ্রলোকের আপাদমস্তক একবার দেখবে। কপালের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের নীচের ওর সরু টানা ভুরু কুঁচকে উঠবে। জিজ্ঞেস করবে, ‘জানতে পারি, আপনি কাকে চান?’

স্বভাবতই ভদ্রলোক অচেনা হলে একটু হকচকিয়ে যাবেন, অবাক চোখে গোগোলের ফরসা মুখ আর টুকটুকে লাল ঠোঁটের দিকে, ওর রঙচঙে জামা আর প্যান্টের দিকে দেখবেন, এবং গোগোলের বাবার নামটা বলবেন। তখন গোগোল গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করবে, ‘আপনার নামটা জানতে পারি?’

ওর জিজ্ঞেস করবার ভঙ্গিটাই এমন, ভদ্রলোককে তাঁর নামটি বলতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে গোগোলের পরের জিজ্ঞাসা, ‘কোথা থেকে আসছেন, কী দরকার?’

ভদ্রলোকের তখন মনে হতে পারে, গোগোল একটি ডেঁপো ছেলে। তখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে হয়তো বাড়ির ভৃত্য সেসব কথা শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে। সেও একই কথা, অন্যরকম ভাবে জিজ্ঞেস করবে, ‘বাবু আপনি কোথা থেকে আসছেন, বাবুকে কী বলব?’

গোগোল তখন ভৃত্যকে ধমক দিয়ে বলবে, ‘আহ্, তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে, দেখছ আমি কথা বলছি।’

বলে সেই ভদ্রলোককেই গোগোল বলবে, ‘দেখছেন তো কী রকম দুষ্টু ছেলে, কিছু মনে করবেন না। আপনি আসুন, বাইরের ঘরে বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।’

ভদ্রলোককে বাইরের ঘরে বসিয়ে, সে কিন্তু বাবাকে ডাকতে যাবে না। জানে বাবার কাছে খবর চলে গিয়েছে। বরং ও নিজে বাইরের ঘরে চেয়ারে লাফ দিয়ে উঠে বসবে। জিজ্ঞেস করবে, ‘আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না কেন?’

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলবেন, ‘আমি তো সিগারেট খাই না।’

গোগোল বলবে, ‘আমার বাবা খায়। বাবাকে ডাক্তারবাবু সিগারেট কম খেতে বলেছেন। আমিও খুব কম খাই।’

ভদ্রলোক চমকে উঠে জিজ্ঞেস করবেন, ‘তুমি সিগারেট খাও নাকি?’

গোগোল গম্ভীর মুখে বলবে, ‘হ্যাঁ, যখন আমি কাজ করি। পড়ার সময় নয়। আর আমার সিগারেটগুলো আমি নিজেই বানিয়ে খাই। মায়ের চিঠি লেখার কাগজ দিয়ে বানাই। আচ্ছা ও কথা যাক, আপনি কি সেই বাঘের গল্পটা জানেন, যে ছাগলছানার গা চেটে দিয়েছিল?’

ভদ্রলোক বলবেন, ‘না তো।’

গোগোল চোখ বড় বড় করে বলবে, ‘সে কি, আপনি জিম্ করবেটের নাম শোনেন নি? তিনিই তো লিখেছেন। আচ্ছা, আপনাকে আমিই গল্পটা বলছি।

একদিন বিকালবেলা জিম করবেট একটা গাছে মাচা—মাচা মানে জানেন তো? মাচা হল, গাছের ডালে বসবার জায়গা, যেখান থেকে বাঘকে গুলি করে মারা হয়। তা একদিন বিকেলে জিম করবেট একটা গাছের ওপরে মাচায় বসে আছেন, তখন কিন্তু আকাশটা লাল ছিল। উনি দেখলেন, কাছেই যে গ্রাম আছে না, সেই গ্রামের একটা ছাগলছানা বাড়ির পথ ভুলে, জঙ্গলের কাছে এসে পড়েছে। উনি ভাবলেন, ছাগলছানাটা বাঘের পেটে যাবে। ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল, প্রকাণ্ড বড় একটা বাঘ একটা উঁচু ঢিবিতে এসে দাঁড়াল। সেই বাঘটা অনেকগুলো মানুষ খেয়ে ফেলেছে, ওকে মারবার জন্যই মাচায় বন্দুক নিয়ে বসেছিলেন মিঃ করবেট। উনি বন্দুক তোলবার আগেই দেখলেন, ছাগলছানাটা ম্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ করতে করতে একেবারে বাঘটার মুখের কাছে

গিয়ে দাঁড়াল। কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক হয় তো সত্যি জানেন না, তাই বললেন, 'জানি না তো?'

গোগোল হাত নেড়ে নিজেই খুব অবাক হয়ে বলবে, 'ছাগলছানাটা তো কোনওদিন বাঘ দেখেনি। ও তো শিশু, তাই বাঘ যে কী ভীষণ জানোয়ার, ও তার কিছুই জানে না। ভেবেছিল, ওটাই বুঝি ওর মা, তাই বাঘের মুখের কাছ থেকে, একেবারে তার পেটের নীচে চলে গেল। জিম করবেট তখন ভাবলেন, বাঘটা এবার ছাগলছানাটাকে এক গরাসে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু বাঘটা কী করল বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানি না তো।'

গোগোল বলবে, 'বাঘটা ওকে খেল না। একটু যেন বিরক্ত হল, একবার ছাগল ছানাটাকে শুঁকে, আস্তে আস্তে ঠ্যাং তুলে ছাগলছানাটাকে সরিয়ে দিল, তারপর টিবির নীচে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্যাপার দেখে, জিম্ করবেট বাঘটাকে মারবার কথাই ভুলে গেলেন। তাঁর মনে হল, জীবনে এমন ঘটনা মানুষ আর কখনও হয়তো দেখবে না। এটা নিশ্চয় ভগবানের কোনও লীলা। কিন্তু বাঘটা কেন ছাগলছানাটাকে খেল না, বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানি না তো।'

গোগোল ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বললে, 'আসলে বাঘেরা খিদে না পেলে, কাউকে মারে না। আমাদের যেমন দুষ্টু খিদে আছে না, খিদে না পেলেও খাবার জন্য বায়না করি, ওরা সেরকম নয়।'

ভদ্রলোক তখন জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার বুঝি দুষ্টু খিদে পায়?'

গোগোলের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে। বলবে, 'একটু একটু। আচ্ছা আপনি কি সেই বাহাদুরের কথা জানেন?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'কোন্ বাহাদুর?'

গোগোলও ভদ্রলোকের এত কম জানা আছে দেখে, খুব অবাক হয়ে বলবে, 'যূথপতি বাহাদুর?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, 'যূথপতিটা কী?'

গোগোল এবার ঠোঁট আর জিভ্ দিয়ে একটা শব্দ করবে, যেন ও ভদ্রলোককে করুণা করছে। বলবে, 'যূথপতি জানেন না? জঙ্গলে হাতিদের যে দল থাকে, তার যে সর্দার থাকে, তাকে বলে যূথপতি।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলবেন, 'ও, তাই নাকি? তা সে-সব বই কি তুমি পড়েছ নাকি?'

গোগোল বলবে, 'আমি এখনও এতটা ভালো করে পড়তে শিখিনি। মা আমাকে পড়ে শোনায়, আমার সব মনে থাকে। অবিশ্যি আমারও একটা গল্প লেখার খাতা আছে, তাতে অনেক গল্পই লিখি। তবে বানান একটু ভুল হয়, মা ঠিক করে দেয়। তারপরে শুনুন, বাহাদুর নামে একজন যূথপতি ছিল, ছোট নাগপুরের জঙ্গলে—'

এসময়ই হয়তো গোগোলের বাবা এসে পড়বেন, এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা আরম্ভ করবেন, 'ওহো, আপনি এসেছেন? আমার একটু দেরি হয়ে গেল।'

গোগোল তাড়াতাড়ি বলবে, 'বাবা, আমি আগে বাহাদুরের গল্পটা বলে নিই।'

গোগোলের বাবা বলবেন, 'না গোগোল, লক্ষ্মী বাবা, এঁর সঙ্গে আমার অনেক জরুরি দরকারি কথা আছে। তুমি এখন ভেতরে যাও।'

গোগোল চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামবে, হতাশ মুখখানি ভারি করে বলবে, 'তোমাদের খালি দরকারি আর জরুরি কথা। বাহাদুরের গল্পটা বুঝি কিছু না?'

ভদ্রলোক তখন বলবেন, 'দরকারি কথা সেরেই, আমি তোমার বাহাদুরের গল্প না শুনে যাচ্ছি না।'

গোগোল একটু চোখ পাকাবার ভঙ্গি করে বলবে, 'ঠিক তো? মিথ্যা কথা বলবেন না, পাপ লাগবে।'

গোগোলের বাবা বলবেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ তোমাকে মিথ্যা কথা বলছেন না। তুমি এখন ভেতরে যাও তো।'

গোগোল তখন চলে যাবে।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, বাড়িতে গোগোল ভারি নিঃসঙ্গ। মা রান্নাবান্না আরও দশ রকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। চাকরও তা-ই। ও ইস্কুলে যায় বটে। তারপরে যে ওর আর সময় কাটতে চায় না। সেই দুপুরে মা কখন একটু গল্প পড়ে শোনাবেন। তারপরেও বিকেল আছে, সন্ধে আছে। রোজ রোজ ওকে বেড়াতে নিয়েও যাওয়া যায় না। বাবা থাকেন বাড়ির বাইরে কাজে। সেজন্যই ও কাউকে পেলে ছাড়তে চায় না। আর সত্যি সত্যি ও চমৎকার গল্প বলতে পারে। লেখেও। লেখাগুলো অবিশ্যি মায়ের কাছে শোনা গল্পগুলোরই মতো প্রায়, একটু এদিক ওদিক থাকে। সেটা ওর নিজের বানানো।

তা ছাড়া গোগোল প্লাস্টার দিয়ে নানারকম মূর্তি তৈরি করে। বাড়ির যাবতীয় ফেলে দেওয়া ইলেকট্রিকের তার, নষ্ট হয়ে যাওয়া সুইচ, সে-সব দিয়েও সে অনেক কিছু তৈরি করে, জিজ্ঞেস করলে বলে, 'মাইক তৈরি করা হচ্ছে। আলো জ্বলছে না, সুইচ ঠিক করা হচ্ছে।'

মোটের ওপর গোগোল একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ, অন্যদিকে আবার তেমনিই ব্যস্ত। তখন ওকে দশবার ডেকেও চান করানো কি খাওয়ানো যাবে না।

যাই হোক, যে অদ্ভুত আর ভয়ংকর গল্পটা বলতে যাচ্ছি, এবার সেটাই বলি।

জুন মাসে গোগোল বাবা-মায়ের সঙ্গে কাশ্মির বেড়াতে গেল। মনে মনে তার যত আনন্দ তত উত্তেজনা। ও ওর বাবার কাছে আগেই শুনে নিয়েছে, হিমালয়ের অভ্যন্তরে, চল্লিশ মাইল চওড়া, আশি মাইল লম্বা এক অপূর্ব সুন্দর উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকাভূমিই হল কাশ্মির।

গোগোলরা সকালবেলা যখন পাঠানকোটে এসে পৌঁছুল, দেখা গেল, সেখানে বেশ একটা উত্তেজনা আর পুলিশ মিলিটারি টহল দিচ্ছে। লোকজনকে ডেকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে। সন্দেহবশত অনেকের ট্রাংক স্যুটকেস খুলেও দেখছে। এমনকী গোগোলের বাবাকেও একজন পুলিশ অফিসার ইংরেজিতে কী সব কথাবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। বাবা পকেট থেকে রেলের টিকেট, তাঁর অফিসের কার্ড, সবই দেখালেন। মাকে আর গোগোলকেও দেখিয়ে পরিচয় দিলেন।

পাঠানকোট স্টেশনের ক্যাটারিং-এর খাবার ঘরে, সকালের খাবার খেতে খেতে গোগোল বাবার মুখে সব ঘটনাটা শুনল। গতকাল পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতেরা তিনজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এক

ধরনের লোহার কেস্ আছে, যার মধ্যে কোটি কোটি টাকা থাকে। এই কেস্গুলো যে-সে খুলতে পারে না। প্রত্যেকটা কেসের আলাদা আলাদা ধরনের চাবি আছে, আর চাবিগুলো, বাঁ-দিকে বা ডান-দিকে কতবার কীভাবে পাক দিতে হবে, তা জানা আছে শুধু একজনের। তিনি হলেন ব্যাংকের ম্যানেজার। চাবিও তাঁর কাছেই থাকে।

যেখানে নোট ছাপানো হয়, তাকে বলে মিন্ট। মিন্ট থেকে রিজার্ভ ব্যাংকে টাকা যায়। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে, সেই রকম কয়েকটি কেস্-ভর্তি টাকা নিয়ে যখন একটা গাড়ি চণ্ডীগড় স্টেট ব্যাংকের দিকে যাচ্ছিল, তখনই একটা নির্জন জায়গায়, ডাকাতরা সেই গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাড়িতে ড্রাইভার নিয়ে সব সুদ্ধ চারজন লোক ছিল। তিনজনের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু ডাকাতরা এমনই দুর্ধর্ষ, তারা তিনজনকে মেরে ফেলেছে, একজন এখন হাসপাতালে আছে, বাঁচবে কি-না সন্দেহ। তার মানে, ডাকাতরা প্রায় পনের কুড়ি কোটি টাকার কেস্ নিয়ে পালিয়েছে। চারদিকেই সেই ডাকাত দলের সন্ধান চলেছে। কেউ কেউ অনুমান করছে, ডাকাতদল হয়তো কাশ্মিরে ঢুকে, ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে, পাকিস্তানে পালিয়ে যাবে।

সেইজন্য সমস্ত লরি ট্রাক প্রাইভেট গাড়ি বাস, পুলিশ আর মিলিটারি খুঁজে খুঁজে দেখছে। সবথেকে মুশকিল হয়েছে, ডাকাতদলকে কেউ চেনে না। বা তারা কী গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে, তাও কেউ বলতে পারে না। যারা পারত, তাদের তিনজন তো মারাই গিয়েছে। একজন এখন অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে।

গোগোল খাবার খেতে খেতে, বাবার মুখে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর, মনে মনে কেবলই কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগল, ডাকাতগুলো চেহারা কী রকম হতে পারে। খাবার খেয়ে, বাইরে বেরিয়ে, ও প্রত্যেকটা লোকের মুখের দিকে ভালো করে দেখতে লাগল। লম্বাচওড়া চেহারা আর বড় গোঁফ দেখলেই, ওর মনটা যেন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠতে লাগল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাদের হাসি আর কথাবার্তা শুনে, অন্যরকম মনে হল। এদিকে ওর মা তাড়া দিলেন, পাঠানকোট থেকেই চান করে নিতে হবে। তা-ই নিতে হল। তারপরে বেশ একটা ঝকমকে সুন্দর বাসে উঠে ওরা কাশ্মির যাত্রা করল।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে যেতে যেতে, নানারকম দৃশ্য দেখে, ডাকাতির কথাটা গোগোল প্রায় ভুলেই গেল। খাতা আর পেনসিল নিয়ে, হঠাৎ হঠাৎ একটা করে কথা লিখতে লাগল। গাড়ির মধ্যে ভারতের নানা প্রদেশের মহিলা-পুরুষরা রয়েছেন। তাঁদের ভাষা গোগোলের জানা না থাকলেও, সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব হয়ে গেল। সকলেই তাকে গাল টিপে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদরও করল। এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা তলোয়ারধারী শিখ ওকে চুমো খেতেই ওর ভীষণ সুড়সুড়ি লেগে গেল।

রাত্রিবেলাটা ওদের কাটাতে হল কুঁদ বলে একটা জায়গায়। পরদিন ভোরবেলা আবার যাত্রা শুরু হল।

গোগোল আর বাইরে থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। দুপুরের দিকে ওরা যখন কাশ্মিরে পৌঁছুল, সমতলের মতো সেই উপত্যকায়, গোগোল একেবারে মুগ্ধ। হিমালয়ের বুকে যে এরকম সুন্দর হ্রদ আছে, ভাসমান বাগান আছে, ও ভাবতেই পারেনি। ঝিলম নদীর দিকে তাকিয়ে ওর চোখ চকচক করে উঠল। বাবা ওকে চিনিয়ে দিলেন, চিনার গাছ। যেমন বিশাল গাছ, তেমনই ওর পাতা। সব থেকে ওর আনন্দ হল, যখন বাবা একটা বোট ভাড়া করলেন। কোন হোটেলে ওরা থাকল না। হাউসবোটটাই একটা বাড়ি। তার

মধ্যে বসবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বাথরুম, সব আছে। এমনকি ইলেকট্রিকের আলোও আছে।

কয়েকদিন হাউসবোটে থেকে, গোগোলরা বেড়াতে গেল পহেলগাঁও বলে একটা জায়গায়। কাশ্মির শহর থেকে, ষাট পঁয়ষট্টি মাইল দূরে পহেলগাঁও। জায়গাটা লিডর নদীর ধারে। পাহাড়ী নদী, পাথরে ধাক্কা খেয়ে, গর্জন করে বহে চলেছে। নদীর ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে পাইন বন, আর বনের মাথায়, পাহাড়ের চূড়া বরফে সাদা ধবধব করছে। গোগোল এসব ছবিতেই দেখেছে। চোখে এই প্রথম দেখল। এখানেও ছোট ছোট হোটেল আছে। কিন্তু হ্রদে যেমন হাউস বোট থাকে, পহেলগাঁওয়ে তাঁবু আছে। গোগোলের বাবা তাঁবুতে থাকাই ঠিক করলেন। সবুজ ঘাসওয়ালা উঁচুনিচু এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু খাটানো হয়েছে। গোগোলের বাবা তাঁবুওয়ালাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁবুওয়ালা একটা বেশ বড় খাটানো তাঁবু দেখাল, যার ভিতরে তিনটে ভাগ আছে। সামনের ভাগে কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিলে আবার কয়েকটা ইংরেজি ম্যাগাজিনও আছে। তার পরের ভাগটা বেশ বড়। সেখানে দুটো বড় বড় খাটিয়া আছে। গোগোল বুঝে গেল, এটাই তাঁবুর ভেতরে শোবার ঘর। তার পিছনে বাথরুম। সেখানেও কাঠের পাটাতন পাতা আছে। বালতি ঘটি, আর গোগোল জানে, বাকি দুটো জিনিসকে বলে কমোড। হাউস বোটেই বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এসব জায়গায় তো পায়খানা নেই, তাই কমোডের ব্যবস্থা। তাঁবুওয়ালাই জানিয়ে দিল, তারা খাবারও দেবে, যা গোগোলদের খেতে ইচ্ছা হয়।

সত্যি, কী মজা! বেড়াবার জন্য যে এত ব্যবস্থা আছে, আগে গোগোল জানত না। ওর সঙ্গে তাঁবুওয়ালার খুব ভাব হয়ে গেল। সে আবার ভাব করিয়ে দিল টাট্টু ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে। গোগোলের বাবা টাট্টুওয়ালাকে গোগোলকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বেড়িয়ে আনতে বললেন। টাট্টুওয়ালা গোগোলকে টাট্টুতে চাপিয়ে মাঠ আর পাইন বনের দিকে বেড়াতে নিয়ে গেল। পাইন বন আর ফাঁকে ফাঁকে মাঠেও তাঁবু পড়েছে অনেক। আশেপাশে অনেক গাড়ি দাঁড় করানো। যাদের গাড়ি আছে, তারা অনেকে গাড়ি নিয়েও বেড়াতে এসেছে। কয়েকটা গাড়ির পিছনে আবার আলাদা করে ভ্যান জুড়ে দেওয়া রয়েছে। ঠিক যেন গাড়ির পিছনে একটা মালগাড়ির ওয়াগন। গোগোল টাট্টুওয়ালাকে ওগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কী?'

টাট্টুওয়ালা বাংলা কথা না বুঝলেও, গোগোলের প্রশ্নটা বুঝে নিল। জবাব দিল, 'উসমে সাব লোগকো শামান হ্যায়।'

গোগোল জিজ্ঞেস করল, 'শামান কী?'

টাট্টুওয়ালা হেসে বললে, 'শামান নহি জানতা খোকাবাবু? মাল মাল, বাক্সা বিস্তারা।'

গোগোল বুঝে নিল, বললো, 'বাক্সো আর বিছানা! তার জন্য এত বড় মালগাড়ি?'

টাট্টুওয়ালা হাসল, কোনও জবাব দিল না। গোগোল বেশ খানিকক্ষণ টাট্টুতে চেপে বেড়াল। জায়গাটা ওদের তাঁবুর কাছেই।

দুপুরবেলা খেয়েই গোগোল ওর খাতা আর পেন্সিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবা বললেন, 'বেশিদূরে কোথাও যেও না, কাছে পিঠেই থেকো।'

গোগোল মাঠ আর পাইন বন দেখিয়ে বলল, 'আমি ওদিকটায় থাকব।'

গোগোল মাঠ আর পাইন বনের দিকে গিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরল। ওর মনে হল, ওর বয়সী ছেলেরা সকলেই বোধ হয় পাঞ্জাবি। কয়েকজনের সঙ্গে অল্প দু'চারটি ইংরেজিতে কথা হল। কিন্তু তেমন জমল না। তখন গোগোল খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে গেল। বড় বড় করে লিখল, 'পাইন বন অতি সুন্দর। লোকেরাও সুন্দর!'

গোগোল ওর বাবার কাছে দুপুরবেলা জেনে নিয়েছে, গাড়ির পিছনে জোড়া ওগুলোকে নাকি অটোভ্যান বলে। ও ঘুরে ঘুরে, হঠাৎ একটা অটোভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। অটোভ্যানের সামনে কোন গাড়িও নেই, শুধু ভ্যানটা রয়েছে। গোগোলের মনে হল, ভ্যানটার মধ্যে যেন ঠুং ঠুং করে একটা শব্দ হচ্ছে। ও খুব অবাক হল। ভ্যানটার পিছনে গিয়ে দেখল, তার দরজায় মস্ত বড় বড় দুটো তালা ঝুলছে। অথচ শব্দটা কীসের? ভ্যানটা যেখানে রয়েছে, সেখানে পাইন বন একটু ঘন, সামনে কোনও তাঁবু নেই, নিরিবিলি মতো।

শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। গোগোল ভ্যানটার চারপাশে ঘুরল। উঁচুতে এক জায়গায় একটা বড় ফুটো রয়েছে। সেখানে উঠে দেখবার উপায় নেই।

গোগোলের মনে হল, ও বোধ হয় ভুল শুনছে। আসলে ভিতরে বোধ হয় ইঁদুর রয়েছে, ইঁদুর ঠুক ঠুক করছে। ও সেখান থেকে আবার অন্যদিকে সরে গেল। যেদিকে লোকজন আছে, সেদিকে বেড়াতে বেড়াতে বাবা-মাকে পেয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গে লিডর নদীর ধারে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা গেল না। আকাশে মেঘ করে এল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। গোগোল বলল, 'বাবা, আমাদের তাঁবু ভিজে গেলে থাকব কেমন করে?'

বাবা হেসে বললেন, 'দূর বোকা, তাঁবুর ভিতরে আবার জল পড়ে নাকি? ওয়াটার প্রুফ দেখনি, যেমন কী-না রেনকোট বা ছাতা, তার নীচে কি জল পড়ে? তাঁবুর কাপড়ও সেইরকম। ভেতরে জল পড়ে না।'

গোগোল খুব গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল। সত্যি, ব্যাপারটা ও ভাবেনি। ওরা তাঁবুতে ফিরতে না ফিরতেই বৃষ্টি নামল, আর দারুণ শীত করতে লাগল। বাবা তাঁবুর মুখ ভালো করে বেঁধে দিলেন।

পরের দিন সকালবেলা ঝকঝকে রোদ উঠল। সব যেন নতুন হয়ে উঠেছে। গোগোল সেই মাঠ আর পাইন বনের দিকে গেল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে, ও সেই ভ্যানটার কাছে গেল। ভ্যানটার সঙ্গে এখন গাড়িটাও রয়েছে। এক ভদ্রলোক গাড়িতে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন, বাবারই বয়সী হবেন। তিনি গোগোলকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু ভ্যানের ভিতরে সেই ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে। গোগোল ভ্যানটার চারপাশে ঘুরে, গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সেই সময়েই ভদ্রলোক ওর দিকে তাকালেন। সামনে থেকে মনে হল, ভদ্রলোক বাবার থেকে যেন বয়সে ছোট। লম্বা জুলফি, সরু গোঁফ, গালে অল্প দাড়ি গজিয়েছে। গোগোলকে দেখেই, লোকটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে, গাড়ির হর্ন বাজিয়ে দিল। অমনি ঠুং ঠুং শব্দটাও থেমে গেল।

লোকটি গোগোলকে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া মাংতা বাচ্চো?'

গোগোল বলল, 'কিছু না। ইঁদুর—মানে র‍্যাট-র‍্যাট ঠুক ঠুক করছে।'

বলে ভ্যানের দিকে দেখিয়ে দিল। লোকটা হেসে বলল, 'হাঁ হাঁ, উস্‌কো অন্দর মে ইন্দুর হ্যায়, মার দেগা।'

গোগোলও হেসে সরে গেল। চলে যাবার সময়, হঠাৎ ভ্যানের উঁচু গায়ে, ফুটোর দিকে ওর চোখ পড়ল। পড়তেই দেখল, একটা চোখ ওকে দেখছে। যেই চোখোচোখি হল অমনি চোখটা সরে গেল। ওটা যে ইঁদুরের চোখ নয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হল মানুষের চোখ। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হবে? ভ্যানের মধ্যে মানুষ থাকবে কেমন করে? গোগোল কি গাড়ির লোকটাকে কিছু বলবে? না বলাই ভালো। ও চলে যেতে যেতে ভাবল, লোকটা তখন হঠাৎ হর্ন বাজাল কেন? আর তখনই ঠুং ঠুং শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে কী ব্যাপার থাকতে পারে?

গোগোল তাঁবুতে ফিরে বাবাকে ঘটনাটা বলল। বাবা বললেন, 'তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, ওটা কখনও মানুষের চোখ হতে পারে না। ভ্যানের কোনও জানলা দরজা থাকে না, ওর মধ্যে মানুষ থাকলে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে।'

গোগোলের মনে হল, কথাটা ঠিক। কিন্তু ও কি এতই ভুল দেখেছে? ও অন্যদিকে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগল। দেখল, এখানেও পুলিশ আব মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই সেই ব্যাংক ডাকাতির ডাকাতদের ধরবার জন্য। তাঁবুওয়ালা ওর বাংলা কথা বুঝতে পারে। সেও বেশ ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। ও গিয়ে তাঁবুওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে এত পুলিশ আর মিলিটারি টহল দিচ্ছে কেন? সেই ডাকাতদের ধরবার জন্য?'

তাঁবুওয়ালা বলল, 'হাঁ খোঁখাবাবু, ডাকাতলোগ্ ইধারেও আসতে পারে। পুলিশ বাতলাচ্ছে কি, ডাকাতলোগ্ নাকি ইধারে কোথায় এসেছে।'

'পুলিশ খবর পেয়েছে?'

তাঁবুওয়ালা বলল, 'তা জানি না। তবে উ লোগ ডাকাত খুঁজছে।'

গোগোল বলল, 'কিন্তু এখানে তো সবাই বেড়াতে আসে। ডাকাতরা কি এখানে আসবে?'

তাঁবুওয়ালা বলল, 'আসতে ভি পারে, উলোগ্ হার জাগা যেতে পারে।'—

গোগোল চিন্তিত হয়ে তাঁবুতে ফিরে গেল।

গোগোল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে, বাবার পাশে একটু শুয়ে রইল। তারপরে বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল, খাতা-পেনসিল নিয়ে। এক জায়গায় বসে লিখল, 'ভ্যানের মধ্যে ইঁদুরের ঠুক ঠুক।' তারপরে পাইন বনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভ্যানটা রয়েছে, গাড়িটা নেই। গোগোল ভ্যানটার কাছে গেল। কোন শব্দ হচ্ছে না। ও সেই ফুটোটার দিকে তাকাল। না, কোন চোখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ভিতরে যেন খুট করে একটা শব্দ হল, একবারই। গোগোল ভ্যানটার গায়ে কান ঠেকিয়ে শোনবার চেষ্টা করল, কোন শব্দ হচ্ছে কি না। ও চমকে উঠল। খুব অস্পষ্ট হলেও, গোগোল মানুষের কথা বলার শব্দ পেল। কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক মানুষের গলা।

গোগোল সরে এসে পিছনে গিয়ে দেখল, তালা দুটো ঠিক ঝুলছে। ও তাঁবুতে ফিরে গিয়ে, বাবাকে ঘটনাটা বলল। বাবা বললেন, 'তুমি তো অনেক কিছুই শুনতে পাও। কী শুনতে কী শুনেছ, তার ঠিক নেই। ও ভ্যানটা তোমাকে পেয়ে বসেছে।'

বাবা তেমন আমল দিলেন না। গোগোল তখন তাঁবুওয়ালার কাছে গেল, তাকে সব কথা বলল। তাঁবুওয়ালার চোখে-মুখে একটু চিন্তা দেখা দিল। সে গোগোলকে নিয়ে, পাকা রাস্তার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বন্দুক পিস্তল নিয়ে অনেক পুলিশের

লোকেরা ছিলেন। তাঁবুওয়ালা তাঁদের হিন্দিতে গোগোলের বলা ঘটনাটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন। একজন লম্বা চওড়া অফিসার, কোমরে পিস্তল গোঁজা, গোগোলের হাত ধরে বললেন, 'চল্ বাচ্চো, মুঝে ও ওয়াগন দেখা দো।'

তাঁবুওয়ালা বলল, 'খোঁখাবাবু, ভ্যানটা ই সাবলোগকো দেখিয়ে দাও।'

গোগোল বলল, 'চলুন।'

গোগোলের সঙ্গে সেই অফিসার, এবং আরও কয়েকজন বন্দুক নিয়ে চললেন। কাছে গিয়ে দেখা গেল, ভ্যানের গাড়িটা তখন ফিরে এসেছে, আর সেই লোকটিই গাড়িতে বসে আছে। অফিসার এগিয়ে গিয়ে, সেই লোকটিকে কী বললেন। লোকটিও কী সব বলল। তারপরে একটা চাবির গোছা নিয়ে, লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এল। নেমে এসে, ভ্যানের পিছন দিকে না গিয়ে, লোকটা হঠাৎ অন্যদিকে দৌড়ুতে লাগল। অফিসার তৎক্ষণাৎ কোমর থেকে পিস্তল বের করে, লোকটার দিকে ছুঁড়লেন। কিন্তু লোকটা যেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে, পাইন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে ভিড় জমতে লাগল। অফিসার হুকুম দিলেন, 'ভ্যানকা তালামে গোলি চালাও।'

দুজন বন্দুকধারী গুলি করে, তালা ভেঙে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের ভিতর থেকেও গুলি ছুটে এল। তাঁবুওয়ালা গোগোলকে কোলে তুলে নিয়ে সরে গেল। একজন পুলিশের লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল। তখন বন্দুকধারী মিলিটারিও এসে গিয়েছে। ভ্যানের চার পাশ ঘিরে গুলি ছোঁড়া শুরু হল। যেন একটা যুদ্ধ চলছে। ভ্যানের ভিতর থেকে খানিকক্ষণ গুলি ছুটে এল, তারপরে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতরে যেন কেউ আর্তনাদ করছে।

সেই পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, 'জিন্দা রহনে মাংতা তো জল্‌দি নিকালো।'

একটু পরে, ভ্যান থেকে একটি লোক দুহাত তুলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজন ধরে ফেলল। আর একজনকে নামানো হল, তার ঘাড়ের কাছে রক্ত। তারপর কয়েকজন ভ্যানের ভিতরে ঢুকল। ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এল, ব্যাংকের সেই ভাঙা লোহার কেস্, আর বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকার নোট।

তাঁবুওয়ালার চোখ ছানাবড়া। সে গোগোলকে বলল, 'খোঁখাবাবু, তুমি বহোত বড়িয়া লেড়কা আছো, তোমার জন্যই ডাকাতলোগ ধরা পড়েছে, তামাম রুপেয়া ভি মিলে গেছে।'

সেই লম্বা-চওড়া ফরসা পুলিশ-অফিসার এসে, তাঁবুওয়ালার কোল থেকে, গোগোলকে নিজের কোলে তুলে নিলেন, আদর করে চুমো খেয়ে অনেক কথা বলতে লাগলেন। গোগোল তা বুঝতে পারল না। শত শত লোক, পুলিশ, মিলিটারি, পুরুষ-মহিলা সবাই তখন গোগোলকে দেখছে, আর হাসছে, কেউ কেউ হাততালিও দিচ্ছে।

এ সময়েই গোগোলের বাবা-মা ছুটে এলেন। বাবা ইংরেজিতে অফিসারকে ভয়ে ভয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন, আর বললেন। অফিসার অমনি বাবাকেও এক হাতে জড়িয়ে ধরে ইংরেজিতে কী যেন বললেন। গোগোল দেখল, বাবা-মা হাসছেন, কিন্তু তাঁদের চোখে যেন জলও এসে পড়েছে। মা হাত বাড়াতেই গোগোল মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা ওকে চুমো খেয়ে বললেন, 'আমার সোনা মানিক।'

গোগোল বলল, 'কাঁদছো কেন মা?'

মা বললেন, 'আনন্দে, তুমি যে আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছ।'

গোগোল লজ্জা পেয়ে মায়ের কাঁধে মুখ লুকোল।

এবার এখানেই ইতি। পরে আবার তোমাদের গোগোলের নতুন গল্প শোনাব।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

বিমল কর

আমার নাম জীবনলাল; জীবনলাল দত্তগুপ্ত। ওটা আমার আসল নাম। একটা নকল নামও রয়েছে। লালা দত্ত। আমার আসল নাম যত লোক জানে, নকল নামটা তার চেয়েও বোধ হয় বেশি লোক জানে। হয় তো আপনিও জানেন, বা শুনেছেন। না শুনলেও ক্ষতি নেই। আমি মোটেই কেষ্টবিষ্টু গোছের লোক নই। একেবারে সাধারণ চুনোপুঁটি। তবু যে বলছি, শুনলেও শুনে থাকতে পারেন নামটা, তার কারণ আমি একজন গোয়েন্দা-গল্পের লেখক। লালা দত্ত এই নামে শিহরণ সিরিজের গোয়েন্দা-বই লিখি। না না করেও আমার বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি।

নিজের কথা এখানে সামান্য বলে নেওয়া দরকার। গোয়েন্দা-গল্প লেখাটা আমার পেশা নয়, শখ। আমার পেশা কেরানিগিরি। ট্রাম কোম্পানিতে চাকরি করি। আমাদের মেসবাড়িকে কোলে বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হট্টখানা। ওরই মধ্যে কোনও রকমে থাকা খাওয়া—এই আর কি!

আমার বাবা নেই। মা থাকেন দেশের বাড়িতে। ছোট ভাই—সেও দেশের বাড়িতে থাকে, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। নিজের ঘরবাড়ির কথা বেশি বলে লাভ নেই। একসময় একরকম ভালোই কেটে যাচ্ছিল, বাবা মারা যাবার পর বড় কষ্টে পড়েছিলাম। তখন আমি কলেজে পড়তাম। আট-দশ বছর লড়ালড়ি করে এখন খানিকটা থিতু হয়েছি। আমার বয়েস হয়েছে তিরিশ।

গোয়েন্দা-গল্প লেখার শখ আমার আগে ছিল না। তবে হ্যাঁ—দেদার গোয়েন্দা-গল্প পড়তাম। আমার বন্ধু পশুপতি আমার চেয়েও গোয়েন্দা-গল্পের পোকা ছিল। একবার সে একটা গল্প লিখতে শুরু করে আর শেষ করতে পারল না। আমাকে দিয়ে শেষ করাল লেখাটা। সেই লেখাটা 'কালসর্প' নামে ছাপা হল পানুবাবুর প্রেস থেকে। কিছু বিক্রিও হল।

তখন থেকেই আমার শখ চাপল গোয়েন্দা-গল্প লেখার। পশুপতি আমায়, যাকে বলে মদত, তাই দিতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে গোয়েন্দা-গল্পের লেখক হয়ে উঠলাম।

পশুপতির কথা এখানে একটু বলতে হয়। পশুপতি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা বর্ধমানের লোক। কাছাকাছি গ্রামের ছেলে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কলেজেও পড়েছি। পশুপতির বরাবর সাধ ছিল সে উকিল হবে। গ্রহের ফেরে তার উকিল হওয়া হল না।

তার মামা, আমরা যাঁকে বলি সদানন্দ মামা, পশুপতিকে হোটেলের ব্যবসায় ঢুকিয়ে নিজে চলে গেলেন মনসা গ্রামে আশ্রম খুলতে। মামার নিজের বলতে এক পশুপতিই ছিল। আমার তো মনে হয়, এতে শাপে বর হয়েছে। পশুপতির যে-ধরনের মাথাগরম ধাত, তাতে তার উকিল হওয়া চলত না।

শিয়ালদা হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি যত হোটেল আছে তত হোটেল আর কোথায় আছে আমি জানি না। পশুপতি হল দয়াময়ী হোটেলের ম্যানেজার। মালিকও বলা যায়। খাতাপত্রে মামা এখনও মালিক, কিন্তু মামার অবর্তমানে পশুপতিই মালিক হবে।

আগেই বলেছি, আমি যে-মেসে থাকি সেটা একটা জঘন্য জায়গা। হইচই, গলাবাজি, লাঠালাঠি লেগেই থাকে। একটু নিশ্চিন্তে শোওয়া-বসার উপায় নেই। দু'দণ্ড আপনমনে থাকব—তার জো নেই।

এইসব কারণে আমি একটা অভ্যেস করে নিয়েছিলাম। যখন কোনও লেখা শুরু করতাম, তখন আর মেসে থাকতাম না, পশুপতির হোটেলে এসে ডেরা বাঁধতাম। সাত দিন আট দিন, এমনকি দিন দশেকও একটানা হোটেলে থেকে লেখা শেষ করে, বেশির ভাগ প্রুফটা দেখে দিয়ে তবে হোটেল ছাড়তাম। এ-ব্যাপারে পশুপতির ঢালাও হুকুম ছিল, আমি যখনই আসব পুব দিকের ছোট ঘরটা পাব হোটেলের, দোতলার ঘর। আমার খাওয়া-দাওয়া, ফাইফরমাস খাটা, চা-পান-সিগারেটের ব্যবস্থা করে দেবার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

পশুপতি এই রকমই। আমায় যতটা ভালোবাসে ততটাই তার দাপট দেখানোর পাত্র করে তুলেছে। ওর কথা না মেনে আমার উপায় নেই। আমার কাছে টাকাপয়সা নেবে না। এ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছে খুব। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে গিয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমি এক জায়গায় জিতেছি। ও আমাকে মেস ছাড়িয়ে তার হোটেলে এনে রাখতে পারেনি।

ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়িয়েছিল ; আমি দু-তিন মাস অন্তর একবার করে পশুপতির হোটেলে এসে উঠতাম। আট-দশ দিন থাকতাম একটানা। একটা বই লিখে, তার প্রুফ দেখে আবার ফিরে যেতাম আমার মেসে। তার মানে এই নয় যে, পশুপতির কাছে আমি অন্য সময়ে আসতাম না। তা আসতাম। হপ্তায় বার দুই এসে তার খোঁজখবর করে যেতাম। পশুপতিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—তার কাছে না এসে থাকব কেমন করে?

আর মাত্র দুটো কথা বলে আমার গল্প শুরু করব।

আমি সাত-আট দিনে একটা বই লিখতে পারি ভেবে আপনারা হয় তো অবাক হচ্ছেন। এতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই। প্রথমত, আমি যা লিখব, মানে গল্পটা, মনে মনে আগেই সাজিয়ে নিতাম। দু'তিন মাস ধরে এটা চলত। তারপর ঝপ করে একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসতাম। চলে আসতাম পশুপতির হোটেলে। আমি তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। তা ছাড়া, বসতাম যখন ঘাড় গুঁজে টানা লিখে যেতাম সকাল দুপুর। আমি শখের গোয়েন্দা-গল্পের লেখক—আমার হুড় হুড় করে লিখতে আটকাবে! কেন! আর লেখা তো বড়জোর সোয়া শ' পাতা। ছাপা হলে দাঁড়াবে নব্বই ছিয়ানব্বই। পানুবাবু তাকে শ'খানেক পাতায় দাঁড় করাবেন। পানুবাবু আমাদের পুরনো চেনাজানা লোক। তাঁর প্রেসে আমার বইয়ের কাজ হয় বরাবর। তিনি অন্য কাজ সরিয়ে আমার কাজটা করে দিতেন।

কখনও অন্যথা করেননি।

গত চার-পাঁচ বছর এইভাবেই আমার বই লেখা চলছিল। লালা দত্ত এই নামে 'শিহরণ' সিরিজের পনেরো-কুড়িটা বইও লিখলাম। প্রতি বই পিছু সাতশো টাকা পাই এখন। আগে পাঁচশো পেতাম। আমার এতে দুঃখ ছিল না। 'তারিণী লাইব্রেরি'র মহিমবাবুর যতই বদনাম থাক, আমার সঙ্গে কোনও গোলমাল করেননি। উনিই 'শিহরণ সিরিজ'-এর প্রকাশক।

শেষপর্যন্ত কিন্তু একটা অঘটন ঘটল। সেটাই বলি।

দিনটা ছিল শনিবার।

সেই সকাল আটটায় কলম নিয়ে বসেছিলাম। উঠলাম যখন তখন দুপুর দেড়টা। লেখা শেষ। নিশ্চিন্ত।

স্নান খাওয়া শেষ করে যখন পান মুখে বিছানায় শুতে এলাম, তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লেখার শেষটা মনে মনে ভাবছিলাম। মনে হল, মন্দ হয়নি। গত রবিবার লেখা শুরু করেছিলাম। ঠিক সাত দিনে শেষ হল। অবশ্য এই লেখাটা একটু ছোট। আশি পঁচাশি পাতা হতে পারে। গত সোমবার থেকেই আমি পানুবাবুকে কপি দিচ্ছি। মঙ্গলবার থেকেই প্রুফ পাচ্ছি। মঙ্গলবারে পেয়েছি সামান্য। বুধবারে খানিকটা। শেষ বারো-চোদ্দো পাতা বাকি ছিল লেখার। আজ থেকে আমি কোনও প্রুফ পাইনি। গতকাল হোটেলের বলাইকে দিয়ে পানুবাবুর প্রেসে কপি পাঠিয়েছি। পানুবাবুর প্রেস থেকে নিধু বলে এক ছোকরা সন্ধের মুখে কালিঝুলি মাখা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে এক বান্ডিল প্রুফ আমায় দিয়ে যায়। সে বৃহস্পতিবার আসেনি, গতকালও নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। পানুবাবুর প্রেসে কি কম্পোজ হচ্ছে না? নাকি নিধুর অসুখবিসুখ হল? বলাইকে বলেছিলাম খোঁজ আনতে! সে হোটেলে কাজ করে, প্রেসের ব্যাপার বোঝে না। ফিরে এসে কিছুই বলতে পারল না।

ভাবলাম, আজ সন্ধেবেলায় নিধু আসবে। প্রুফ আনবে। তার হাতেই শেষ কপিটা দিয়ে দেব। কাল অবশ্য রবিবার। প্রেস বন্ধ। দেখা যাক নিধু কী বলে!

সন্ধেবেলায় পশুপতির সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে আটটা বেজে গেল। নিধু এল না।

পশুপতি বলল, ''পুজোর পর তো! পানুবাবুর হাতে স্কুলের বইয়ের কাজ। বোধ হয় আটকে গেছেন। সোমবার নিশ্চয় পাঠাবেন।''

''সোমবার আমি থাকব না। কাল বিকেলেই মেসে ফিরে যাব।''

''সোমবার সন্ধেবেলায় এসে খোঁজ করে যাস।''

এ-রকম হামেশাই হয়। আমি মেসে ফিরে যাবার পর পশুপতির কাছে পানুবাবু প্রুফ পাঠিয়ে দেন। আমি পশুপতির হোটেলে এসে প্রুফটা দেখে দিয়ে যাই। মেসে বসে এ-সব কাজ করি না আমি। মেসের দু' একজন ছাড়া কেউ জানেই না আমি শখের লেখক।

পশুপতির অফিসঘরে বসেই গল্পগুজব হচ্ছিল। পানুবাবুর কথা তুলে রেখে আমরা অন্য কথাবার্তা বলতে লাগলাম। পশুপতি তেতলায় একটা ঘর বাড়াবার কথা ভাবছে। তার হোটেলটা দোতলা। নীচে রান্নাবান্না, ঠাকুর-চাকর, খাবার ঘর—এই সব। দোতলায় ছোট আর মাঝারি মিলিয়ে গোটা বারো ঘর। হোটেলের ঘর বলতে যা বোঝায়। তেতলায় একটা মাত্র ঘর। সেই ঘরে পশুপতি নিজে থাকে। আর একটা ঘর, না বাড়ালে চলছে

না। হোটেলের স্টোর রুমটা সে তেতলায় করবে।

ন'টা বেজে গেল।

পশুপতি বলল, ''চল্, ওপরে যাই। গজলের একটা নতুন রেকর্ড কিনেছি—তোকে শোনাব।''

পশুপতির আবার গানবাজনার ওপর খানিকটা টান আছে।

আমরা উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি পানুবাবু। কলকাতায় ঠান্ডা পড়েনি, তবু পানুবাবুর গায়ে একটা সুতির চাদর। ঘরে এলেন এমন ভঙ্গিতে মনে হল যেন অসুস্থ। মুখ থমথমে।

আমি ভাবলাম পানুবাবু বুঝি নিজেই প্রুফের তাড়া বয়ে এনেছেন।

''আসুন পানুবাবু! বসুন। বৃহস্পতিবার থেকে আমি প্রুফ পাচ্ছি না! কী ব্যাপার?''

পানুবাবু চেয়ারে বসলেন। বললেন, ''আর প্রুফ? আপনারা কিছু শোনেননি?''

আমরা মাথা নাড়লাম। কিছুই শুনিনি।

পানুবাবু বললেন, ''মহিমবাবু আর নেই।''

আমরা চমকে উঠলাম। মহিমবাবু মারা গিয়েছেন। সে কী! তাঁর তো বেশি বয়েস হয়নি। কোনও অসুখ-বিসুখ তাঁর ছিল বলে জানি না। শুধু চোখের ব্যাপারে তাঁর একটা অসুখ ছিল। কম দেখতেন। সন্ধের দিকে একরকম রাতকানাই হয়ে যেতেন।

পশুপতি বলল, ''মারা গিয়েছেন? কবে?''

''কাল,'' পানুবাবু বললেন, ''শুক্রবারে। কাল মহিমবাবু রোজকার মতন তাঁর দোকানে এসেছিলেন। কাজকর্মও করেছেন। স্কুল সিজনের কাজ চলছে বলে দোকান থেকে উঠতে উঠতে আটটা বেজে যায়। কর্মচারিরা দোকান বন্ধ করার পর মহিমবাবু রোজকার মতোই তাঁর চেনা এক রিক্‌শাঅলাকে ডেকে রিক্‌শায় ওঠেন। চেনা রিক্‌শাঅলাদের কিছুই বলতে হত না। তারা মহিমবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিত। হাত ধরে নামিয়ে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিত।

কাল যে রিক্‌শাঅলা মহিমবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল সে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যখন মহিমবাবুকে নামাতে গেল, দেখল রিক্‌শার একদিকে গা-মাথা হেলিয়ে তিনি পড়ে আছেন। কোনও সাড়া শব্দ দিচ্ছেন না।''

আমি আঁতকে উঠে বললাম, ''সে কী? রিক্‌শাতেই?''

''হ্যাঁ। লোকজন, ডাক্তার-বদ্যি সবই এল। কিন্তু সব শেষ। বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করা গেল না।....আগেই মারা গিয়েছেন।'

পশুপতি যেন হায় হায় করে উঠল। ''ইশ্! এভাবে মানুষ মারা যায়? হার্টফেল?''

''মহিমবাবুর হার্টের কোনও অসুখ ছিল বলে শুনিনি। উনি তো আমার অনেক পুরনো খদ্দের। বছর পনেরো ওঁর সঙ্গে কারবার করছি। বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের কথাও বলতেন। ওঁর দোষের মধ্যে দেখেছি একটু তিরিক্ষে ধরনের, ঠোঁটকাটা, আর খানিকটা কৃপণ। এ-ছাড়া ওঁর কোনও দোষ দেখিনি। বিয়ে-থা করেননি, ভাইপো ভাগ্নেদের মানুষ করেছেন।''

আমার ভালো লাগছিল না। পানুবাবুর কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না সব। মহিমবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালোই ছিল।

পানুবাবু বললেন, ''সবচেয়ে বড় কথা হল মহিমবাবুর ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। ডাক্তার দিতে রাজি হয়নি। ফলে.......।''

কথাটা আর শেষ করতে হল না পানুবাবুকে, পশুপতি আর আমি দুজনেই আঁতকে উঠে বললাম, ''পোস্ট মর্টেম?''

"হ্যাঁ। আজ বডি দেয়নি। কাল রবিবার, কাল যদি দেয়। কী জানি!"

"গোলমেলে কেস নাকি?" পশুপতি বলল।

"কেমন করে বলব?" পানুবাবু বললেন, "সুস্থ লোক, রিক্শায় করে বাড়ি ফিরছে। রাস্তার মধ্যে হুট করে মারা যাবে কে ভাবতে পারে? ডাক্তারও পারেনি। শুনলাম ডাক্তার নাকি বলেছেন, তিনি যখন পেশেন্টকে দেখেছেন তখন পেশেন্ট ডেড। কাজেই তিনি কোনও সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না।"

আমরা কোনও কথা বললাম না। আবহাওয়াটা কেমন পালটে গেল পানুবাবুর মুখে দুঃসংবাদ শোনার পর থেকেই। মহিমবাবুর মুখ মনে পড়ছিল। তাঁর সেই সাদামাটা পোশাক, খদ্দরের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি। চশমা পরতেন সাবেকি ধরনের।

পানুবাবু বললেন, "আজ সারাটা দিনই ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম, আপনারা হয়তো খবরটা জানেন না। খারাপ খবর, তবু জানিয়ে যাই।"

পশুপতি বলল, "ভালো করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না। জানলে মহিমবাবুর বাড়িতে যেতাম। কাল একবার যাব।"

পানুবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন।

পশুপতি জল আর চায়ের জন্যে হাঁক মারল।

মাথা নাড়লেন মহিমবাবু, "না, চা আর খাব না। অনেকবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।" বলে উনি আমার দিকে তাকালেন।

"আপনার কাজকর্ম এখন বন্ধ রাখব কি না বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় বইটা শেষ করে দিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আবার ভাবছি, সামান্য দুটো ফর্মা আটকে রেখেই বা কী হবে। শেষ হয়ে গেলে তবু অন্তত ছাপা ফর্মাগুলো থাকবে। আপনি কী বলেন জীবনবাবু?"

আমি বললাম, "লেখা আমি আজ শেষ করে দিয়েছি। ভাবছিলাম নিধু এলে তার হাতে শেষ কপিটা দিয়ে দেব।"

"নিধু? কোথায় সে?" পানুবাবু বললেন, "সে তো আসছে না ক'দিন?"

"বুধবার এসেছিল। আমি তাকে বসিয়ে রেখে খানিকটা প্রুফ দেখে দিয়েছিলাম। কপিও দিয়েছিলাম পাতা-কুড়ি।"

"সে কী! সেই প্রুফ তো সে ফেরত দেয়নি। কপিও না।" পানুবাবু কপাল চুলকোলেন। "আপনাকে প্রেস থেকে বোধ হয় বারো-চোদ্দো গেলি প্রুফ পাঠানো হয়েছিল দ্বিতীয় বারে। সে প্রুফ আমরা ফেরত পাইনি।"

জল এসেছিল।

পানুবাবু জল খেলেন।

"আমি তাহলে উঠি পশুপতিবাবু।" পানুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "মনে মনে একটা ভয় হয়ে গেছে, মশাই। কে জানে এই হয়তো শেষ জল খাওয়া! না না, অবাক হবেন না। এইরকম হয়। মহিমবাবু রিক্শায় উঠে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন খাবেন বলে! সিগারেটটা আর খেতে পারেননি। মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল কোলে। শুনলাম জামাটা সামান্য পুড়ে গিয়েছিল। এই তো মানুষের জীবন। এক মুহূর্ত আগে আছে, পরের মুহূর্তে নেই।"

হঠাৎ যেন আমার বুকের ওপর বিরাট কোন ঘা লাগল। মাথার মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। গলা বন্ধ-বন্ধ হয়ে আসছিল।

"কী বললেন? কোলের ওপর সিগারেট? পোড়া সিগারেট?"

"হ্যাঁ। শুনেছি প্রায় গোটা সিগারেট।"

আমি যেন ভূত দেখার মতন চোখ করে পানুবাবুকে দেখতে লাগলাম।

পানুবাবু আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

পানুবাবু চলে গেলে আমি বেহুঁশের মতন বসে থাকলাম। সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি হয় নাকি? গল্পের ঘটনার সঙ্গে জীবনের ঘটনা মিলে যায়? আশ্চর্য!

"পশুপতি!"

"বল।"

"এ কেমন করে হল? আমি যে বইটা সবে শেষ করলাম, তাতে একেবারে এই জিনিস?"

পশুপতি কিছুই বুঝতে পারল না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"অদ্ভুত ব্যাপার। স্ট্রেঞ্জ! আমি ভাবতেই পারছি না। একেবারে এক ধরনের মার্ডার।" আমার গলার স্বর নিজেরই কানে লাগল। ভয় পেয়েছি, না উত্তেজিত হয়ে উঠেছি! চোখকান জ্বালা করে উঠছিল।

পশুপতি বলল, "কী বলছিস পাগলের মতন! একই ধরনের মার্ডার মানে!"

"একই ধরনের। সেম। আমি একটা খুনের কথা লিখেছিলাম। একটা সত্তর বছরের বুড়ো, অগাধ তার সম্পত্তি, হাড়কেপ্পন। তাকে তার ভাইপো এইভাবে খুন করবে। সিগারেটের পাতার মধ্যে বিষ মেশানো থাকবে। বুড়ো দুটো তিনটে টান মারার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।"

পশুপতি আমার দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "বুঝলাম না!" পশুপতি বলল, "তোর গল্পের বুড়ো যেমন-ভাবেই মরুক—তার সঙ্গে মহিমবাবুর সম্পর্ক কী!"

"তুই বুঝতে পারছিস না। তুই কী রে! মহিমবাবুকেও তো একইভাবে মারা হয়েছে।"

পশুপতি হেসে উঠল, "তোর মাথা! কোথায় তোর বইয়ের গল্প আর কোথায় রিয়েল ব্যাপার!"

"তুই বিশ্বাস করছিস না! আমি সত্যি বলছি, আমার গল্পে আমি একটা নতুন ধরনের মার্ডার ঢুকিয়েছিলাম। মানে, এমনভাবে খুন করা হবে যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মনে হবে হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেল। তুই ভেবে দ্যাখ, এখানেও তাই করা হয়েছে। মহিমবাবু সুস্থ অবস্থায় রিক্‌শায় উঠে বাড়ি ফিরছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। দু'চারটে টানও দিতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে! হাত থেকে সিগারেট গড়িয়ে পড়ল, তিনিও ঢলে পড়লেন রিক্‌শায়।"

পশুপতির এতক্ষণে যেন মাথায় গেল আমি কী বোঝাতে চাইছি। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "তোর এই নতুন বইটায় এরকম ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তুই কি বলতে চাইছিস তোর বইয়ের গল্পের সঙ্গে মহিমবাবুর মারা যাবার সম্পর্ক আছে?"

"তা জানি না, ভাই। তবে বড় অদ্ভুত লাগছে। আমার লেখার প্রুফ আজ তিন দিন ধরে পাচ্ছি না। নিধু বেপাত্তা। অথচ এই রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল!"

পশুপতি হাত তুলে আমায় চুপ করতে বলল। বলে কী যেন ভাবতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল, "দাঁড়া, ব্যাপারটা বুঝতে দে। তুই কি বলতে চাস তোর গল্পের খুন দেখে,

বা ধর পড়ে, কেউ একজন মহিমবাবুকে খুন করেছে?''

''তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।''

''দাঁড়াচ্ছে বললেই হবে নাকি? যুক্তি কোথায়?''

আমি বললাম, ''তুই ভেবে দেখ্ না!.....পানুবাবুর মুখেই শুনলি—আমার দেখে-দেওয়া প্রুফ তাঁর প্রেসে পৌঁছয়নি। নিধু পৌঁছে দেয়নি। সে প্রেসে যাচ্ছে না।''

''এ-থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। তোর কাছে যে কপি আর প্রুফ এসেছিল, তুই দেখে দিয়েছিস বলছিস, সেটাতে কী ছিল?''

''এইরকম খুনের কথা।''

''একেবারে গোড়াতেই ছিল?''

''হ্যাঁ। গোড়ার দিকেই।''

''তুই কি লেখায় বিষের নাম দিয়েছিলি?''

''হ্যাঁ।''

''পুরো নামটা আমার নোটবইয়ে লেখা আছে। এক ধরনের শ্যাওলার মতন জিনিস। দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সমুদ্রের কাছে সাধারণত। এখানে এ বিষ পাওয়া যাবে কেমন করে? একটা ইংরেজি বইতে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। দেখে নোটবইয়ে টুকে নিয়েছিলাম।''

''এই বিষে কাজ হয়?''

''তার আমি কী জানি! বইয়ে দেখেছিলাম, টুকে নিয়েছিলাম। হাতেকলমে তো পরীক্ষা করে দেখিনি। তাছাড়া গল্পের বইতে লেখা বিষ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়!''

পশুপতি মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল। কী ভাবছিল কে জানে। সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, ''তোর খানিকটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে জীবন। আমার মনে হয় না, তোর গল্পের বই থেকে কেউ খুন করার ব্যাপারটা শিখে নিয়েছে। এ-রকম কখনও শুনিনি। তাই যদি হত তবে শয়ে-শয়ে হাজারে হাজারে গোয়েন্দা-বই যা বেরোয় বাজারে—তার থেকে লোকে খুনখারাপি শিখে নিত। গল্পের গোরু কি আর গেছো হয়!''

পশুপতি যা বলছিল তা আমিও বুঝি। গোয়েন্দা-বই পড়ে কেউ খুন শেখে না। কিন্তু এই ব্যাপারটায় এমন আশ্চর্য মিল ঘটে গেল বলেই আমার আতঙ্ক হচ্ছিল।

পশুপতি বলল, ''শোন্, কতকগুলো সহজ যুক্তি সাজিয়ে নে। প্রথম যুক্তি হল, মহিমবাবু আচমকা মারা গিয়েছেন এটা ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কি বলেছে ওঁকে খুন করা হয়েছে? হুট্ করে মানুষ মরতেই পারে। মহিমবাবুর হয় তো হার্টের রোগ ছিল, বা হয়েছিল, তিনি জানতেন না, আমরাও জানতাম না।''

''ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেয়নি।''

''না দেওয়াই স্বাভাবিক। না জেনে কোন্ ডাক্তার সার্টিফিকেট দেয়!'

''পোস্ট মর্টেম হচ্ছে—শুনলি তো?''

''অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেটা হয় বলেই শুনেছি। তুই একটা দিন অপেক্ষা কর না। কালকেই হয় তো জানতে পারবি। রিপোর্ট পেলেই সব শোনা যাবে।''

''অপেক্ষা তো করতেই হবে। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, পশুপতি। ভালো লাগছে না।''

''দুশ্চিন্তা করছিস! যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।''

হয় তো পশুপতির কথাই ঠিক। যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। এমনও হতে পারে,

আমি যা ভাবছি ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। মহিমবাবু হার্টের রোগেই মারা গিয়েছেন। এ-রকম হামেশাই হয় আজকাল, অফিসে কাজ করতে করতে মানুষ মারা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে লুটিয়ে পড়ে, চায়ের কাপ মুখে তোলার অবসর পায় না, চিরকালের মতন চোখ বোজে। হ্যাঁ, এ-রকম হয়। তবু আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?

পশুপতি বলল, কথা ঘোরাবার জন্যেই, "তোর গল্পে কী ছিল রে?"

"গল্পে?"

"হ্যাঁ।"

"বললাম তো! একটা বুড়োকে তার ভাইপো খুন করবে।"

"একটু ছড়িয়ে বল। কেমন করে করবে, মানে কী ভাবে?"

"বুড়োকে বিষ-মেশানো সিগারেট দেবে খেতে। বুড়ো বুঝতে পারবে না। আসলে একটা প্ল্যান করা হয়েছিল বুড়োকে মারার জন্যে। বুড়ো সব ব্যাপারেই খুব সাবধানী ছিল, সন্দেহও করত এক ভাইপোকে। কিন্তু যখন সে খুন হয়—তার কিছু ভুল হয়েছিল।"

"কী ভুল হয়েছিল?"

"প্রথম ভুল, সে ধরতেই পারেনি—তার চশমাজোড়া যে ভেঙে ফেলল—মানে তার চাকর ভেঙে ফেলেছিল, সেটার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার ভাইপো বুড়োর চাকরকে দিয়ে এটা করেছিল। চশমা না থাকায় বুড়ো বুঝতে পারেনি, কখন তার সিগারেটের প্যাকেট বদল করে অন্য প্যাকেট রাখা হয়েছে। তৃতীয় ভুল, বুড়ো হাড় কিপ্‌টে বলে বাড়ির বারান্দায় প্রায়-অন্ধকারেই বসে ছিল। আলো জ্বালেনি। রাস্তার আলোতেই বসে বসে আরাম করছিল।"

পশুপতি বলল, "মহিমবাবুর চশমা কিন্তু কেউ ভাঙেনি।"

"হ্যাঁ। তবে মহিমবাবুর চোখের দোষ ছিল বড় রকমের। তিনি একরকম রাতকানা ছিলেন।"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে তাঁকে তো দোকানের কর্মচারিরাই সিগারেট কিনে এনে দিত। তারা সকলেই পুরনো কর্মচারি। বিশ্বস্ত।"

"বিশ্বস্ত লোক কি অবিশ্বাসের কাজ করে না?"

"টাকাপয়সা খেয়ে করতে পারে।"

"অনায়াসে পারে। তাছাড়া, মহিমবাবুর দোকানের কর্মচারিরা সবাই ধর্মপুত্তুর একথা কে বলল? আমরা তাদের কতটুকু জানি?"

পশুপতি অস্বীকার করল না।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা মহিমবাবুর দোকানে মাঝে মাঝে গিয়েছি, চা খেয়েছি, কথাবার্তা বলেছি সামান্য। ভদ্রলোক যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তবে সদালাপী ছিলেন না। বসে বসে গল্প করার মতন মানুষও নন। কাজের কাজটুকু সেরে তিনি আমাদের বিদায় জানাতেন।

মহিমবাবুর দোকানে চার-পাঁচজন কর্মচারি দেখেছি। মুখে সকলকেই চিনি। কারও নাম জানি, কারও শুধু পদবিটা। কর্মচারিদের মধ্যে গৌরাঙ্গবাবু সবচেয়ে পুরনো। তিনি বয়স্ক লোক। বিক্রিবাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। গৌরাঙ্গবাবু আর রায় বলে এক ছোকরা। অন্য দুজনের মধ্যে ছিল কানু বলে এক লম্বা সিড়িঙে আধবয়েসী লোক আর মল্লিক নামের এক জোয়ান ছেলে। মাঝে-সাঝে দাশু বলে একজনকে দেখেছি।

এদের কারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন গভীর ছিল না। গৌরাঙ্গবাবু অবশ্য সজ্জন মানুষ।

আমি বললাম, ''খারাপ না হলেই ভালো। তবু বলছি, নিধুর ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। সে বেপাত্তা হবে কেন?''

''খোঁজ করবি?

''ভাবছি।''

''বেশ, কর। আমি তোর সঙ্গে থাকব।''

সকালের দিকেই পশুপতির ঝামেলা বেশি থাকে। বাজার-হাট, মুদিখানা, কয়লা-ঘুঁটে, কে এল কে গেল—টাকা পয়সার হিসেব, আদায়পত্র, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেলা পর্যন্ত।

আমার তর সইছে না দেখে পশুপতি বারো আনা কাজ দশটা নাগাদ মিটিয়ে দিয়ে বলল, ''নে চল্। আমি তৈরি।''

রাস্তায় বেরিয়ে পশুপতি বলল, ''তোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাত্তিরে ঘুমোতে পারিসনি?''

সত্যিই রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মাথার মধ্যে ওই একই চিন্তা জট পাকিয়ে গিয়েছিল! মহিমবাবুর মুখ বার বার মনে পড়েছে। বেচারি! পানুবাবু, প্রেস, নিধু—প্রত্যেকের কথাই ভেবেছি কাল।

পানুবাবুর প্রেস বিবেকানন্দ রোডের দিকে। বড় রাস্তায় নয়, গলির মধ্যে।

আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। কলেজ স্ট্রিটের মুখে এসে ট্রাম ধরব।

পশুপতি বলল, ''তুই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিস যেন!''

''না।'' মিথ্যে কথাই বললাম পশুপতিকে। আসলে আমায় ভয়ে ধরেছিল।

''তোর মুখ বলছে তুই ভয় পেয়েছিস,'' পশুপতি বলল, ''তোর ভয়, পুলিশ তোকে ধরবে! বলবে, জীবনলালবাবু, আপনি মশাই মহিমবাবুকে খুন করার পথটা দেখিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া হবে না।...সত্যি তুই জীবন একটা গাধা। পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোকে ধরতে আসবে।'' পশুপতি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, ''বাঘে ছুঁলে আঠাবো ঘা। পুলিশ যদি ছোঁয়—আমায় নাজেহাল করে ছাড়বে। আমি ভাই পুলিশকে ভয় পাই।''

''তাহলে আর ডিটেকটিভ-বই লিখিস না। ভূতের গল্প লেখ।''

কথা বলতে বলতে আমরা মোড়ে এসে পড়েছিলাম। ট্রাম আসছিল।

রবিবার। প্রেস বন্ধ। আমরা ভেবেছিলাম, এখন কাজের চাপ চলছে—হয়তো খোলা থাকতে পারে।

দারোয়ান রামলাল বলল, ''গত রবিবার কাজ হয়েছে। এ-রবিবার কেউ আর কাজ করতে চায়নি, তাই ছুটি।''

পশুপতি বলল, ''নিধুর ঠিকানাটা জেনে নে, জীবন!''

দারোয়ান আমাদের চেনে। আমাকে হামেশাই দেখে প্রেসে আসতে।

''রামলাল, ওই নিধু কোথায় থাকে? ঠিকানা জানো?''

রামলাল একটু ভাবল। মাথা নাড়ল। বলল, ''পাত্তা আমি জানি না, বাবু! মগর ও মেটিয়া কলিজের পাস থাকে।''

''গলির নাম?''

''মালুম নেহি।'

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, ''কাল পানুবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হত।''

''তখন আমার এত কথা মনেও আসেনি।....তা ছাড়া, এখনও পানুবাবুকে ব্যাপারটা না বলা ভালো। আগে থাকতে রটিয়ে লাভ কী! দেখা যাক—কী হয়!''

রামলাল নিজেই বলল, ''আপলোগ দাশুবাবুসে পুছে লিন, দাশুবাবু জানেন।'

''কোথায় থাকেন দাশুবাবু!''

''নাগিচ, এহি গলিসে চলে যান। বাঁয়া মোড় লেবেন। সাত লম্বর।''

''আচ্ছা!''

আমরা আর দাঁড়ালাম না, দাশুবাবুর খোঁজে চললাম।

যেতে যেতে পশুপতি বলল, ''তুই দাশুবাবুকে চিনিস!''

''হ্যাঁ, হেড কম্পোজিটার।''

''চল্ দেখি।'

বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হল না, দাশুবাবুকে খুঁজে পেতেই দেরি হল। সেকেলে এক বৃহৎ বাড়ি, তারই খোপে খোপে অজস্র ভাড়াটে।

দাশুবাবু বললেন, ''মেডিকেল কলেজের মেন গেটের উলটো দিকে যে গলিটা—ওই গলি দিয়ে ঢুকে যাবেন। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। বাড়ির নম্বর মনে পড়ছে না। জানি না। বছরখানেক আগে একবার গিয়েছিলাম। একটা মুদির দোকান দেখবেন। জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।'' বলে দাশুবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''নিধুর নাকি কোন্ মাসি মারা গিয়েছে। খবর পাঠিয়েছিল। ওর মা-মাসি কেউ আছে বলে আমি জানি না। কামাই করার অজুহাত। ছেলেটা দিন দিন বদ হয়ে যাচ্ছে জীবনবাবু। নেশাভাঙ করে বেড়ায় শুনেছি।''

আমি আসল কথাটা ভাঙলাম না। বললাম, ''যাই, একবার খোঁজ করে দেখি গে। পানুবাবু কাল গিয়েছিলেন। বললেন, আমার প্রুফ আটকে পড়ে আছে। প্রুফ তো আমার কাছে নেই, নিধুর কাছে। সে যে কী করল, কাগজপত্র হারাল না বাড়িতেই ফেলে রেখেছে—একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।''

দাশুবাবু বললেন, ''গিয়ে দেখুন কী করল প্রুফগুলোর! দায়িত্ব বলে কিচ্ছু নেই ওর। ওদের দিয়ে কাজ হয় না। কী বলব বলুন! বাবু ভালো মানুষ চাকরিটা তো খাবেন না। আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে।...মহিমবাবুর কথা শুনেছেন?''

''শুনেছি। পানুবাবুই বলেছেন।''

''নিয়তি। কপালে কার কী আছে কে জানে!''

আমরা আর দাঁড়ালাম না।

ফিরে এসে আবার ট্রাম ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, পশুপতি বলল, ''নিধুকে দেখেছিস!''

''ছেলেটাকে তো খারাপ দেখিনি, তবে চেহারাটা কেমন চোয়াড়ের মতন হয়ে গেছে আজকাল।''

''নেশাটেশা করে বলল!''

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

ট্রাম এল। বেশ ফাঁকা।

আমরা পাশাপাশি বসলাম। ট্রাম চলতে শুরু করলে আমি বললাম, ''তুই মহিমবাবুর ফ্যামিলির খবর রাখিস?''

''না। ওপর ওপর যা শুনেছি।''

''আমি ভাবছি, মহিমবাবুকে খুন করলে কার কী লাভ হতে পারে! কার স্বার্থ?''

পশুপতি বলল, ''আমার কিন্তু একবারও মনে হচ্ছে না, এটা খুনের ব্যাপার। ভদ্রলোক হার্টের রোগেই মারা গেছেন।''

''তোর কথা সত্যি হলেই ভালো।'' বলে আমি রাস্তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম, আমাদের মেসের বিজনদা, রিক্শায় চেপে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আজই আমার মেসে ফেরার কথা ছিল।

নিধুকে পাওয়া গেল না। সে নাকি সকালের দিকে বেরিয়ে গিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ জানে না।

নিধু যে-বাড়িটায় থাকে তাকে বাড়ি বলা যায় না। দপ্তরিখানা বললেই ঠিক বলা হয়। ছোট ছোট দুখানা ঘর, সামান্য বারান্দা। কাগজ-ছাঁটাই মেশিন, রাজ্যের ছাঁট কাগজ, পেস্ট-বোর্ড, কাঠের ডেস্ক, দুর্গন্ধে ভরা লেই—আরও কত কী পড়ে আছে।

দুটো লোক কাজ করছিল। বলল, তারা কিছু জানে না।

মুদির দোকানের লোকটাকেই ধরতে হল আবার। বলল, ''রাত আটটা নাগাদ আসুন। ওই সময় দেখা পেতে পারেন।''

''ও কি বাড়িতে থাকে?''

''থাকে। তবে আজ ক'দিন দেখছি রাত করে ফেরে।''

''বাঁধাইখানাটা কার?''

''মণ্ডলবাবুর।''

পশুপতি আমার হাত ধরে টানল। বলল, ''চল্ এখন। পরে দেখা যাবে।''

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরটাও।

পশুপতি বলেছিল, ''চল্ বিকেলে একবার মহিমবাবুর বাড়ি থেকে দেখা করে আসি।''

আমি রাজি হইনি। কেমন একটা ভয় করছিল। ও-বাড়িতে গিয়ে কী দেখব, কী শুনব কে জানে! যদি পোস্ট মর্টেম হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলে মন্দ খবরও তো শুনতে পারি। আমি বললাম, ''আগে নিধুকে ধরি, দেখি ব্যাপারটা কী, তারপর যাব।''

বিকেল শেষ হল। আজকাল তাড়াতাড়ি বিকেল ফুরোচ্ছে। ছ'টা নাগাদ একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

এক এক সময় মনে হচ্ছিল, আমি পাগলামি করছি। মহিমবাবুর মারা যাবার সঙ্গে প্রেসের এক সাধারণ কর্মচারি নিধুর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি অকারণ এক অসম্ভবের সঙ্গে নিধুকে জড়াতে চাইছি।

আবার মনে হচ্ছিল, যতই অসম্ভব হোক—একবার নিধুর খোঁজ নিতে আপত্তি কোথায়? নিধুর আচরণে সন্দেহ করার মতন বিশেষ কিছু নেই হয় তো, তবু দু' একটা জিনিস থেকে সামান্য সন্দেহ হয়। নিধু কেন ক'দিন প্রেসে যাচ্ছে না? কেন সে মিথ্যে কথা বলে কামাই করছে? আজ ক'দিন সকালের দিকে সে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? কী জন্যে রাত করে ফিরছে? সে কবে থেকে নেশাভাঙা শিখল?

খুঁটিয়ে ভাবলে সন্দেহটা বাড়ে বই কমে না। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে, প্রেসের নিধুর সঙ্গে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুর কোনও সম্পর্কই খুজে পাওয়া যায় না।

আটটা বাজার খানিক আগেই পশুপতি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম।

পশুপতি বলল, ''মহিমবাবুদের বাড়িতে একটা ফোন করলে হত। তুই নম্বর জানিস?''

''না। আমি দোকানের নম্বর জানি।''

''টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়ে যেতাম। ফিরে গিয়ে করব।''

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের কাছাকাছি পৌঁছলাম যখন, তখন আটটা বেজে গিয়েছে।

মুদির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দপ্তরিখানার দরজাও।

আমি কড়া নাড়লাম।

কোন সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছিল।

আবার কড়া নাড়তে ভেতর থেকে সাড়া এল, ''কে?''

গলার স্বরটা নিধুর বলে মনে হল না।

পশুপতি নিচু গলায় বলল, ''আমার নাম বল।''

কারও নাম বলতে হল না, দরজা খুলে গেল।

জায়গাটা অন্ধকাব মতন, তবু যে দরজা খুলল—তাকে চিনতে পারলাম না। লোকটার বয়েস বেশি নয়। মনে হল, আমাদের বয়সী। লোকটা আমাদের দেখল। বলল, ''কী চাই?'' ওর গলার স্বর রুক্ষ।

''নিধু আছে?''

''কে? কে নিধু?''

পশুপতি আমার গায়ের পাশে গা দিয়ে দাঁড়াল। লোকটা বলল, ''এ বাড়িতে নিধু বলে কেউ থাকে না।''

''নিধু এ-বাড়িতেই থাকে। আমরা প্রেস থেকে ঠিক না নিয়ে ও-বেলা দেখা করতে এসেছিলাম।''

''প্রেস!...ও আপনারা নিমাইসাধনের কথা বলছেন! সে তো আজ ক'দিন হল দেশে চলে গিয়েছে।''

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। আমি পশুপতিকে দেখলাম।

লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। ডাহা মিথ্যে।

পশুপতি বলল, ''ক'দিন মানে। সকালে এসে শুনলাম, নিধু ভোর-ভোর বেরিয়ে গেছে আর আপনি বলছেন সে নেই?''

''হ্যাঁ নেই। যান, ঝামেলা পাকাবেন না।''

''আপনি এ-বাড়িতে থাকেন?''

''না।'' লোকটা বিরক্ত হল। তার চেহারাটা ষণ্ডামার্কা। মাথা-ভর্তি চুল। গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি।

পশুপতি একসময় মারকুটে ছেলে ছিল। রাস্তাঘাটে চড়চাপড় ঘুষি চালাত। আজকাল তার ওসব দোষ নেই। লোকটার বেয়াড়াপনা, তাচ্ছিল্যের ভাব, মস্তানি দেখে পশুপতি ভেতরে ভেতরে চটছিল। সে যে চটছিল, আমি বুঝিনি। বুঝলাম—পশুপতি যখন দ্বিতীয় কোন কথা না বলে আচমকা দরজা ঠেলে নিজের শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল।

লোকটা এ-রকম আশা করেনি, থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

পশুপতি ভেতর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ''নিধু, আমি আর জীবনবাবু তোমার কাছে এসেছি। দরকারি কথা আছে। তুমি যদি না বেরিয়ে এসে দেখা করো, আমরা কিন্তু সোজা থানায় যাব। মহিমবাবু মারা গেছেন।''

লোকটা আচমকা পশুপতিকে ধাক্কা মারল। পশুপতি সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। আমি দরজার পাশে, তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পশুপতিকে ধাক্কা মেরে মাটিতে

ফেলে দিয়েই লোকটা ছুটল। পালাল।

এত দ্রুত এবং সহসা সব কিছু ঘটে গেল যে, আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না, করতেও পারলাম না।

পশুপতি উঠে দাঁড়াল।

"লোকটা পালিয়ে গেল," আমি বললাম, "লেগেছে তোর?"

"না। তুই বেটাকে ধরতে পারলি না?"

"বুঝতেই পারিনি।"

"যাক গে।" পশুপতি ছোট্ট উঠোনটুকু পেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "দরজা বন্ধ করে দে। ভেতরে আয়।"

দরজা বন্ধ। দপ্তরিখানার মেশিনপত্র যেমন ছিল পড়ে আছে বারান্দায়। সকালের তুলনায় সামান্য সাফ-সুফ।

পশুপতি আবার ডাকল, "নিধু বাইরে এসো।"

কোনো সাড়া নেই।

দুটো ঘরের একটা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে, অন্যটা ভেতর থেকে। দুটো ঘরই অন্ধকার।

এবার আমি নিধুকে ডাকলাম। ধাক্কা দিলাম দরজায়। তবু কোন সাড়াশব্দ দিল না নিধু।

শেষে পশুপতি বলল, "তোমাকে এই শেষবার বলছি নিধু। বাইরে এসো। যদি না বেরিয়ে আসো, আমরা কিন্তু এবার সোজা থানায় যাবো। আমি এখানে তোমাকে আটকাব। জীবনবাবু থানায় যাবেন।"

আমরা সামান্য অপেক্ষা করতেই ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ এল। তারপর নিধু বেরিয়ে এল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল তার চেহারা, পোশাক সবই যেন কেমন নোংরা বিশ্রী দেখাচ্ছে।

নিধু বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলল না।

পশুপতি বলল, "তুমি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে কেন? আমরা ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিলে না?"

কোন জবাব দিল না নিধু।

আমি বললাম, "তোমার কাছে আমরা কেন এসেছি জানো?"

মাথা নাড়ল নিধু। জানে না।

"মিথ্যে বোলো না, তুমি জানো।"

"না বাবু।"

"তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ। তুমি জানো, মহিমবাবু মারা গেছেন?"

"শুনেছি।"

"কে বলেছে?"

"ফুলুবাবু।"

"ও কে? কী করে? কোথায় থাকে?"

নিধুর যে ভয় ধরে গিয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। নিধু বলল, "ফুলুবাবু এই দপ্তরিখানার মালিকের বন্ধু। মালিক হলেন মণ্ডলবাবু। এই দপ্তরিখানায় মহিমবাবুর দোকানের তিন-চারটে বই বাঁধাই হয়। আমি এখানে থাকি। মণ্ডলবাবু আমায় থাকতে দিয়েছেন। রাতে দপ্তরিখানা পাহারা দিই।"

"ফুলুবাবু কী করে?"

"জানি না বাবু, শুনেছি ফুলুবাবু ট্যাকসি কিনেছে। ...ফুলুবাবু মাঝেমাঝেই এখানে আসেন। মণ্ডলবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করেন।"

পশুপতি বলল, ''ও!....তা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কাজ কর পানুবাবুর প্রেসে। ফুলুবাবু ট্যাকসির মালিক? তোমাদের মধ্যে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুকে নিয়ে কথা হবে কেন হে? ও কেন তোমাকে মহিমবাবুর মারা যাবার খবর শোনাবে?''

নিধু চুপ। জবাব দিতে পারছিল না।

আমি হঠাৎ বললাম, ''নিধু, তুমি কথা লুকোচ্ছ। সত্যি করে সব কথা বল। নয়তো তোমার বিপদ হবে।''

নিধু প্রথমে চুপচাপ। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''বাবু, ফুলুবাবু মহিমবাবুর নিজের লোক। বড় বোনের ছেলে। ভাগ্নে। ফুলুবাবু আগে তাঁর মামার দোকানে বসতেন। দোকানের টাকাপয়সা চুরি করার জন্যে মামা ফুলুবাবুকে একদিন নাকি জুতোপেটা করে দোকান থেকে বার করে দেন। সেই থেকে ফুলুবাবু মামার ওপর খাপ্পা।''

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, ''ব্যাপারটা একটু ধরা যাচ্ছে যেন রে। কিন্তু মহিমবাবুর ভাইপো-ভাগ্নে শুনেছি বেশ কয়েকজন। মামা মরলে ফুলুর লাভ কী?''

কী লাভ তা আমিও জানি না। মামার অবর্তমানে কী পাবে ফুলু?

আমি নিধুকে বললাম, ''ফুলুবাবুর কথা থাক। এবার তুমি অন্য কথার জবাব দাও।'' বলে আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকটা দেখলাম, ''তুমি ক'দিন কাজে কামাই করছ কেন?''

নিধু জবাব না দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

''তুমি নাকি বলে পাঠিয়েছ, তোমার মাসি মারা গেছে। দাশুবাবু বললেন, তোমার মা-মাসির কথা উনি শোনেননি। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ।''

নিধুর আবার কান্না এসে গেল। বলল ''হ্যাঁ বাবু।''

''কেন?...

''ফুলুবাবু আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছিলেন!''

''কী কাজ।''

''আমাকে তিনি একটা চাবি দিয়ে দিতেন। আর বলতেন রাজাবাজারে অমুক জায়গায় যাবে, খিদিরপুরে তমুক জায়গায় যাবে। আমি রোজ ফুলুবাবুর কথামতন রাজাবাজার, খিদিরপুর, ট্যাংরা, চেতলা, যাদবপুর যেতাম। উনি আমায় পঞ্চাশটা করে টাকা দিতেন।''

পশুপতি বলল, ''চাবি দিতেন কেন? তুমি কাদের কাছে যেতে?''

''যাদের কাছে যেতাম বাবু, তারা ভালো লোক নয়। তারা খারাপ খারাপ নেশা বিক্রি করে লুকিয়ে। অচেনা লোককে তারা কিছু দেয় না কথাও বলে না। চাবি দেখলে তারা বুঝতে পারত, কোনও চেনা খদ্দের-লোক পাঠিয়েছে। তবু তারা সন্দেহ করত। ঘোরাত।''

''তুমি কি কোনও বিষ এনেছিলে? না, ফুলুবাবুর নেশা আনতে?''

নিধু চুপ। তারপর ডুকরে উঠল। বলল, ''আমায কেউ কিছু দিত না। সন্দেহ করত। একটা লোক শুধু হোমিওপ্যাথির ছোট্ট শিশিতে কী-একটা জিনিস দিয়েছিল। বলেছিল সাবধানে রাখতে। প্রথম দিন দেয়নি। বলেছিল, দুশো টাকা নিয়ে যেতে। ফুলুবাবু টাকা দিলে আমি পরের দিন নিয়ে এসেছিলাম।''

''সেটা কী?''

''জানিনা বাবু।''

''কেমন দেখতে?''

''কালচে মতন। গুঁড়ো।''

''ফুলুবাবু সেটা নিয়ে কী করেছিল?''

''আমি জানি না।''

"তুমি কবে ওটা এনেছিলে?"

"শুক্কুরবার দুপুরে।"

"ফুলুবাবুকে কখন দিলে?"

"ফুলুবাবু কলেজ স্ট্রিটে বাজারের ভেতর চায়ের দোকানে বসেছিলেন। আমায় বলে দিয়েছিলেন যেতে। আমি গিয়ে তাঁকে জিনিসটা দিয়ে দিই।"

"তারপর?"

"আমি আর কিছু জানি না বাবু।"

"তুমি কাল্ কেন প্রেসে যাওনি?"

"ফুলুবাবু আমায় যেতে বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন তুমি এখন প্রেসে যাবে না। দপ্তরিখানাতেও দিনের বেলায় থাকবে না। তোমায় অন্য একটা ভালো কাজ জোগাড় করে দেব।"

পশুপতি আমার গা টিপল।

আমি বললাম, "নিধু, তুমি আমার দেখা প্রুফ আর তার সঙ্গে যে কপি ছিল তা প্রেসে ফেরত দাওনি। কেন?"

"আমি তো প্রেসে যাইনি, বাবু।"

'সেগুলো কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে?"

"ওগুলো কেউ দেখেছিল? পড়েছিল?"

"না, না বাবু," মাথা নাড়ল নিধু। "আমি যেভাবে এনেছিলাম সেইভাবেই রেখে দিয়েছি। বান্ডিলটা এখনও ঘরে পড়ে আছে।"

পশুপতি আর আমি একই সঙ্গে বললাম, "তুমি ঠিক বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। .....আপনারা ঘরে আসুন—আমি দেখাচ্ছি।"

নিধু আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বেলে দিল। চতুর্দিকে বাঁধাইখানার নোংরা। তারই মধ্যে থাকে নিধু। একটা কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে সত্যিই নিধু প্রুফের বান্ডিল বার করে দিল।

আমি একবার দেখলাম।

তাহলে?

পশুপতিও ভাবছিল, তাহলে?

আমি আবার বললাম, "নিধু, তুমি ঠিক জানো, এই প্রুফ কেউ পড়েনি?"

"হ্যাঁ বাবু, কেউ পড়েনি।"

"তা হলে মহিমবাবুকে কেমন করে মারা হল?"

নিধুই হঠাৎ বলল, "বাবু, আমি একটা কথা শুনেছি। আমার কানে গিয়েছিল। মহিমবাবু বাড়ি ফেরার আগে জল আর এক কাপ পাতলা চা খেতেন। জল দোকানেই থাকত। চা আসত দোকান থেকে। কী যেন নাম দোকানটার। ফুলুবাবুর ওই দোকানে আসা-যাওয়া ছিল। চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন কিনা ফুলুবাবু, বলতে পারব না।"

আমরা যেন চমকে উঠলাম। মনে হল, এটা হতে পারে। একেবারেই অসম্ভব নয়। মহিমবাবু বিষ-মেশানো চা খেয়েই রিক্শায় উঠেছিলেন। হয়তো দশ-বিশ মিনিট সময় গিয়েছে বিষের ক্রিয়া হতে। তারপর তিনি জানতেও পারেননি কেমনভাবে মৃত্যু এসে তাঁকে এ জীবনের মতন ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি বললাম, "পশুপতি! নিধুই ঠিক বলেছে বোধ হয়।"

পশুপতি মাথা নাড়ল।

যমালয়ের টিকিট

মনোরঞ্জন ঘোষ

পারিজাতের কাকা হরেনবাবু সকালেই সমরের কাছে ছুটে এলেন। দেখে ভদ্রলোককে বেশ বিচলিত বলেই মনে হল।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি বললেন, 'সমরবাবু, পারিজাতের মুখে নিশ্চয়ই আপনি চিঠির কথা শুনেছেন। আপনার সঙ্গে আগে আলাপ না থাকলেও—'

'—তাতে কোনও ক্ষতি নেই।' মৃদু হেসে সমর বলল। 'আপনি যখন পারিজাতের কাকা, তখন অসঙ্কোচেই আমার কাছে আসতে পারেন। কিন্তু আপনি আগে স্থির হয়ে বসুন। আমি একটু চা করতে বলি। চা খেতে-খেতে সব শুনব।'

চেয়ারে গা এলিয়ে হরেনবাবু বললেন, 'আপনি আমায় স্থির হতে বলছেন! কিন্তু তা কি সম্ভব? এক জল্লাদের খাঁড়া আমার মাথার ওপর ঝুলছে। যে-কোন মুহূর্তে যার মৃত্যু হতে পারে, সে কি স্থির থাকতে পারে?'

হরেনবাবুকে আশ্বাস দিয়ে সমর বলল, 'অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। এটা কলকাতা শহর, মগের মুল্লুক নয়। বিশে-ডাকাত, রঘু ডাকাতদেরও দিন শেষ হয়ে গেছে। উড়ো-চিঠি লিখে কাউকে খুন করব বললেই খুন করা সহজ নয়। থানা-পুলিশ কী করতে রয়েছে? তাছাড়া ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি-কমিশনার আমার বন্ধু। প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্য নেয়া যাবে।'

'সেই জন্যেই আপনার কাছে এলাম। আমাকে বাঁচাবার যা-হোক ব্যবস্থা আপনি একটা করতে পারবেন। ডিটেকটিভ গল্প লেখায় আপনার এতো সুনাম। কত রহস্যের সমাধান আপনি করেছেন। পুলিশ পর্যন্ত অনেক শক্ত মামলায় আপনার পরামর্শ নেয়, এ-কথাও আমি শুনেছি। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই আপনার অন্ধ ভক্ত!'

প্রশংসা চাপা দেবার জন্য চায়ের ফরমাশ করতে গেল সমর।

অবশ্য হরেনবাবু যে-কথাগুলি বললেন তা খুবই সত্য। সমর গোয়েন্দা না হয়েও গোয়েন্দার বাড়া। সারা বাংলাদেশে গোয়েন্দা-কাহিনী লেখায় তার জুড়ি নেই। তার উপর সে সর্বদা লেখক-সুলভ নিছক মনগড়া কাহিনী বানিয়ে পাঠকদের কাছে কৌশলে অপরাধীকে আড়াল করে বোকা বানাবার চেষ্টা করে না। অনেক সময় সে সত্য যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংবাদপত্র বা পুলিশ-দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধানে স্বেচ্ছায় পুলিশকে সাহায্য করে। ডিটেকটিভ

গল্পের প্রতি আবাল-বৃদ্ধবনিতার আগ্রহ থাকার ফলে সমর পাড়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। তার বিনয়-নম্র আচরণ ও মিষ্টি ব্যবহারের জন্য পাড়ার যাবতীয় সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানে তার জন্য এক সম্মানের আসন নির্দিষ্ট আছে। তাই সে পল্লীর দুর্গোৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ, ইয়ংমেনস ফুটবল টিমের প্রেসিডেন্ট, ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরেনবাবু এ-পাড়ায় নবাগত। পাড়ার দক্ষিণদিকের খালি প্লটটা চড়া দামে কিনে এক সুন্দর বড় বাড়ি করে গত বছর গৃহ-প্রবেশ করেছেন। তাঁর বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় পয়সার অভাব নেই।

হরেনবাবুর ভাইপো পারিজাতের সঙ্গে সমরের পরিচয় হয়েছিল হঠাৎ। পুজোর ছুটিতে পাড়ার ছেলেরা 'কেদার রায়' নাটক অভিনয়ের তোড়জোড় করে, সমরের উপর তারা পরিচালনার ভার দেয়। কিন্তু মুশকিল হয়, রাজা কেদার রায়ের কিশোর পুত্রের ভূমিকার জন্য মনমতো কাউকে না-পাওয়ায়। সকলেই যখন চিন্তিত, তখন একজন খবর দিল, সে এই পাড়ার বুকস্টলে একটি ছেলেকে হরেনবাবুর চাকর মধুর সঙ্গে এসে কিছু পুজো সংখ্যা কিশোর-পত্রিকা কিনতে দেখেছে। ছেলেটিকে সুন্দর দেখতে, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। রাজপুত্রের ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। খবর নিয়ে জানা গেছে, ছেলেটি হরেনবাবুর ভাইপো। দার্জিলিঙে মিশনারিদের স্কুলে পড়াশোনা করে এবং সেখানে হোস্টেলে থাকে। পুজোর ছুটিতে তার একমাত্র অভিভাবক কাকার কাছে এসেছে।

ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যরা সেইদিনই হরেনবাবুর পাশের বাড়ির বাসিন্দা পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম শৈলেনবাবুর মারফত হরেনবাবুর কাছ থেকে তাঁর ভাইপোর অভিনয় করার অনুমতি আদায় করে নেয়। অভিনয়ের মহলার সময় সমরের সঙ্গে পারিজাতের পরিচয় হয়েছিল।

পারিজাতকে সমরের ভালো লেগেছিল, বেশ বুদ্ধিমান সপ্রতিভ ছেলেটি। কথায়-কথায় সমর জেনেছিল, পারিজাতের বাবা ছিলেন আসাম অঞ্চলের এক চা-বাগানের মালিক। তাঁর ছিল শিকারের নেশা। বছর-তিনেক আগে শিকার করতে গিয়ে এক নরখাদক বাঘের কবলে পড়ে তিনি মারা যান। পারিজাত মাকে শৈশবেই হারিয়েছে। নাবালক পারিজাতের ভার নিয়েছেন তার বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, হরেনবাবু। পারিজাতের বাবার ব্যবসা ও বিষয়-সম্পত্তি তিনিই দেখাশোনা করছেন। হরেনবাবু বিয়ে করেননি। ভাইপোকে তিনি ছেলের মতনই ভালোবাসেন।

বড়দিনের সময় পারিজাত কলকাতায় এলে সমরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যায়। একদিন সকালে পারিজাত যখন সমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন সমর সেদিনের ডাকে-আসা কয়েকটি বিদেশি পত্র-পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পারিজাত অবাক হয়ে বলল, 'সমরদা, আপনি দেখছি অনেক বিলাতি ম্যাগাজিনের গ্রাহক।'

সমর হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ভাই। আজকালকার দিনে খুব পড়াশোনা না করলে লেখক হওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকরা কী চিন্তা করছেন, কী ধরনের লিখছেন, তা জানা দরকার।'

কয়েকটি খামের ডাক-টিকিট লক্ষ করে পারিজাত জিগ্যেস করল, 'নানা দেশে আপনার পেন-ফ্রেন্ডস আছে বুঝি?'

'—তা, পেন-ফ্রেন্ডস এদের বলা যেতে পারে। বর্তমানে বহু বাঙালি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছেন—বিভিন্ন কাগজে আমার লেখা বা প্রকাশিত বই পড়ে মাঝে-মাঝে

তাঁদের অনেকে চিঠি লেখেন, মতামত জানিয়ে।'

পারিজাত সাগ্রহে বলল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব লাভ হয়েছে দেখছি।'

'—কেন বলো তো?'

'—ডাক-টিকিট জমানো আমার হবি। এবার আপনার কাছ থেকে নানা দেশের টিকিট আমি সংগ্রহ করতে পারব। টিকিটগুলো দিতে আপনার আপত্তি আছে?'

সমর হেসে বলল, 'বিন্দুমাত্র নয়।'

পারিজাত খুব খুশি হয়ে খাম ও ম্যাগাজিনের কভারগুলি নিয়ে চলে গেল।

তারপর থেকে রোজ ডাক আসার সময় পারিজাত একবার করে সমরের কাছে আসে নতুন টিকিটের সন্ধানে। সমর পরিহাস করে বলে, 'নতুন দেশের টিকিট কি আর আমার কাছে রোজ-রোজ পাবে? মঙ্গল বা শুক্র গ্রহের সঙ্গে যেদিন পৃথিবীর চিঠিপত্রের লেনদেন হবে, সেদিন সেখানে আমার কোনও অনুরাগী পাঠক থাকলে হয় তো তোমায় নতুন টিকিট দিতে পারব।'

পারিজাত সগর্বে জানাল, 'পরশু আমি কিছু দামি দুষ্প্রাপ্য টিকিট পাবো।'

'—তাই নাকি? কার কাছ থেকে?'

'—পরশু আমার জন্মদিন। কাকা বলেছেন, সেদিন নিউ মার্কেটের দোকান থেকে কয়েকটা টিকিট কিনে এনে আমায় উপহার দেবেন।'

'—খুব আনন্দের কথা!'

সেই দিনই সন্ধ্যার পর সমর যখন একটা ছোট গল্পের প্লট নিয়ে ব্যস্ত, তখন পারিজাত আবার এল।

অসময়ে তাকে দেখে সমর একটু অবাক হয়ে হেসে বলল, 'কী ব্যাপার? রাতে তো পিওন চিঠি দিয়ে যায় না।'

'—স্ট্যাম্পের সন্ধানে আসিনি। কাকা এক ভয়ানক চিঠি পেয়েছেন, তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'—তোমার কথার মধ্যে দেখেছি রহস্যের গন্ধ রয়েছে। তোমার কাকা কী এমন চিঠি পেলেন, যার জন্যে ভর-সন্ধেবেলাতেই লেখাপড়া ছেড়ে তোমাকে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে হল?'

'—কাকাকে একজন খুন করবে বলে শাসিয়ে চিঠি দিয়েছে।'

সমর সাগ্রহে বলল, 'তাই নাকি? চিঠিটা কি তুমি সঙ্গে এনেছ?'

'—হ্যাঁ। এই যে।' পারিজাত পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল।

সমর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখল। ছোট ছেলের লেখার মতন আঁকা-বাঁকা অক্ষর। স্পষ্ট বোঝা গেল, লেখক হস্তাক্ষর গোপন রাখতে চায়। তার মানে, সে পত্র-প্রাপকের অপরিচিত নয়। চিঠিটা খুবই ছোট, মাত্র তিনটি বাক্য। তার মধ্যে একটি আবার প্রবাদবাক্য—'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ! কারও জন্মদিন, কারও মৃত্যুদিন। পরশুর জন্য প্রস্তুত হও!'

চিঠিটা উলটে-পালটে দেখে সমর জিগ্যেস করল, 'পরশু তোমার জন্মদিন?

'—হ্যাঁ, সেইজন্যে কাকা ভাবছেন যে, খুনি বলতে চেয়েছে সেদিন আমার জন্মদিন আর তাঁর মৃত্যুদিন।'

'—তোমার জন্মদিন উপলক্ষে কোনও পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে নাকি?'

'—আমার ইচ্ছে ছিল পাড়ার নতুন বন্ধুদের—মানে, যাদের সঙ্গে থিয়েটার করেছিলাম—তাদের সকলকে বলব। কিন্তু আজ বিকেলে কাকা অফিস থেকে ফিরতেই তাঁর সঙ্গে যখন এই নিয়ে কথা বলতে গেলাম তখন এই চিঠিটা দেখালেন। তিনি এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে, পার্টি উপলক্ষে কাউকে আর নিমন্ত্রণ করা চলবে না।'

সমর হেসে বলল, 'ভালোই হয়েছে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে খুনোখুনি মোটেই ভালো দৃশ্য নয়। রক্ত দেখলে অনেকের গা ঘুলিয়ে যাবে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, সমরদা! কাকা কী রকম বিচলিত হয়েছেন তা বুঝতে পারছেন না। আমার সঙ্গে তিনি এখুনি আপনার কাছে ছুটে আসতে চাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আগে ব্যাপারটা আপনাকে জানাই, তারপর আপনার কথামতো ব্যবস্থা করা যাবে। এখন কী করা যায় বলুন তো?'

'—বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোও।' সমর হেসে বলল।

'—সে কী?'

'—হ্যাঁ। আর তোমার কাকাকে কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। খুনি পরশুর জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছে। কাজেই কালকের দিনটা আমাদের হাতে আছে; তার মধ্যে আমার এই গল্পটা শেষ করতে দাও, নইলে সম্পাদকমশাইয়ের কাছে কথার খেলাপে মিথ্যেবাদী হয়ে যাব।'

পারিজাত খুব ক্ষুণ্ন মনেই সমরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এমন একটা বাস্তব খুনের সম্ভাবনার ওপর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কল্প-জগতের খুনের কল্পনায় সমরদা ব্যস্ত থাকবে, এতখানি হৃদয়হীনতা সে বেচারা আশা করেনি।

চায়ে চুমুক দিয়ে সমর বলল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, হরেনবাবু। সেগুলোর যথাযথ উত্তরের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

চায়ের কাপ নামিয়ে হরেনবাবু বললেন, 'বলুন কী আপনার জিজ্ঞাস্য।'

'—যে-কোন খুনের পেছনে একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। আপনাকে খুন করার পেছনে কার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'—তা তো বলতে পারি না। আমাকে খুন করায় কার লাভ তা আমার জানা নেই।'

'—কারও সঙ্গে আপনার কোনও শত্রুতা নেই?'

'—একজন অবশ্য শত্রু বলে আমায় মনে করতে পারে, কারণ সম্প্রতি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। সে পয়সার হিসেবে গোলমাল করেছিল। চাকরি যাওয়ায় প্রতিহিংসার বশে সে হয়তো আমায় খুন করতে চায়।'

'—আচ্ছা, আপনি তো ধনী ব্যক্তি। আপনার মৃত্যুর পর আপনার বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে তার কোনও উইল করেছেন?'

হরেনবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন, 'না, কোনও উইল করিনি। তবে একটা কথা—আমি মোটেই ধনী নই। বিষয়-সম্পত্তি আমার কিছু নেই, আমি কেবল আছি মাত্র।'

সমর একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'তাহলে আপনার এই বাড়ি-গাড়ি—এ-সব কার?'

'—এ-সবের ভাবী মালিক পারিজাত। পারিজাত নাবালক বলে আমি পারিজাতের বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার তদ্বির-তদারক করি। পারিজাতের বাবার উইল অনুযায়ী আমি তার অভিভাবক হয়েছি। ও যখন সাবালক হবে তখন ওর পৈতৃক সম্পত্তি ওকে বুঝিয়ে

দিতে হবে।'

সমর আরও অবাক হয়ে বলল, 'সাধারণত অর্থই অনর্থের মূল হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের জন্যেও তো আপনাকে খুন করে লাভ নেই বুঝছি। চিঠিটা তাহলে তো খুবই রহস্যময়। ওটা কি আপনি ডাকে পেয়েছেন?'

'—হ্যাঁ, সকালের ডাকে বাড়িতে এসেছিল।'

'—হুঁ!' সমর একটু চিন্তিত হল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনার বাড়িতে লোকজন কে কে আছে?'

'—আমি বিয়ে-থা করিনি। অন্য আত্মীয়-স্বজন কেউ এ-বাড়িতে থাকে না। রান্নার জন্যে এক উড়ে-ঠাকুর, বাসন মাজার ঠিকে-ঝি, এক চাকর, ড্রাইভার, আর বহুদিনের বিশ্বাসী মধু।'

'—মধু কতদিন আছে?'

'—মধু আছে ছেলেবেলা থেকেই, বীরেনদা—মানে, পারিজাতের বাবার কাছে কাজ করেছে। মা-হারা পারিজাতকে মানুষ করেছে সে-ই। দাদা তাই ব্যবস্থা করে গেছে, যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন এখানেই কাজ করবে।'

সমর আর কোনও প্রশ্ন করল না। নিজের মনে কী যেন ভাবতে থাকল।

বিচলিত হরেনবাবু এবার তাকে প্রশ্ন করলেন, 'পরশু আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা করা যায়? আপনি কী পরামর্শ দেন? ভাবছি ঠাকুর চাকর ড্রাইভারকে সেদিন ছুটি দিয়ে দেব। কে জানে. ওরা খুনিরই কোনও অনুচর কি-না! পরশু রাতে বাড়িতে শুধু আমি, পারিজাত ও মধু থাকব। আরও ভরসা পাই, আপনি যদি দয়া করে সেই রাতটুকু আমার বাড়িতে কাটান।'

'—বেশ তো। আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ ভরসা দিচ্ছি, আপনার খুন হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'—তাহলে এই চিঠিটাকে আপনি বাজে বলতে চান?'

'—না। চিঠিটা গুরুতর ও রহস্যপূর্ণ। যা হোক, পরশু রাতে এই রহস্যের সমাধান করব। আপনি শুধু মধুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে দেখতে চাই।'

'—বেশ তো। আমি বাড়ি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তিনি উঠে পড়লেন।

সমর আবার তাঁকে আশ্বাস দিল, পারিজাতের জন্মদিনটা আপনার মৃত্যুদিন কিছুতেই হবে না। রহস্য আমি ইতিমধ্যেই অনেকটা ভেদ করে ফেলেছি। পরশু যদি খুনি হত্যার চেষ্টা করে, তাহলে হাতে-নাতে ধরতে পারব। আপনার অনুরোধ মতো সেদিন সারাক্ষণ আপনার পাশে আমি থাকব'

সমর চিঠির রহস্যভেদ করে ফেলেছে শুনে হরেনবাবু বেশ বিস্মিত হন।

মধু আসতে সমর তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করল না, বরং তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

মধু সমরকে অনেক পারিবারিক ইতিহাস শোনাল। ছেলেবেলায় অনাথ মধুকে পারিজাতের বাবা বীরেনবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন। কাজকর্মের গুণে মধু তাঁর খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যখনই তিনি শিকার করতে যেতেন মধু সঙ্গে থাকত। পারিজাত মধুর হাতেই মানুষ।

পারিজাত যাতে বড় হয়ে বিলেত গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, সে ব্যবস্থাও বীরেনবাবু করে গেছেন। সামনের বছর পারিজাত সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে বিলেতে যাবে। সেখানে বীরেনবাবুর পুরানো বন্ধু এক সাহেব শিকারী ও চা-বাগানের মালিক পারিজাতের দেখাশোনা করবেন। তারপর বিলেত থেকে ফিরে সাবালক পারিজাত সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবে।

সব শুনে শেষে সমর বলল, 'তুমি বীরেনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে? বন্দুক-টন্দুক ছুঁড়তে কখনও?'

'—কী যে বলেন, বাবু! কর্তার সব বন্দুক রাইফেল তো আমার হেপাজতে থাকত। বন্দুক ছুঁড়তে পারতাম, টিপও ভালো ছিল, তাই তো কর্তা সঙ্গে নিতেন।'

'—ভালোই হল। তোমার সেই টিপ পরশু আবার কাজে লাগতে পারে। খুনির চিঠির কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছ? আমার একটা রিভলবার আছে, সেটা রাত্রে তোমার কাছে লুকিয়ে রেখে দেবে। কাউকে বলবে না, —হরেনবাবু বা পারিজাতকেও নয়। আমি হরেনবাবুকে পাহারা দেব, আর তুমি পারিজাতকে।'

মধু চিন্তিতভাবে বলল, 'দাদাবাবুরও কি খুন হবার ভয় আছে?'

'—হ্যাঁ, খুব বেশি ভয়। তুমি দাদাবাবুকে মানুষ করেছ বলে এ কথা তোমায় বিশ্বাস করে বললাম। সেদিন রাত্রে তুমি দাদাবাবুর ঘরে শোবে। দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করবে। রাত্রে কোনও লোককে ঘরে ঢুকতে দেবে না। এমন কি, আমাকে বা হরেন-বাবুকেও নয়।'

'—বুঝেছি। খুনি আপনাদের বেশ ধরে আসতে পারে। কিন্তু বাবু, আমি শুনেছি, চিঠিতে কাকাবাবুকে খুন করার কথা আছে, দাদাবাবুকে নয়।'

'—চিঠি কে লিখেছে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি শুধু আমার কথামতো কাজ করো, তাহলে কোনও বিপদ হবে না।'

'—ঠিক আছে, বাবু।'

জন্মদিনের সকালেই এক কাণ্ড ঘটল।

হরেনবাবু নিজের ঘরে চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ জানলার বাইরে থেকে কে যেন তাঁকে লক্ষ করে একটা ছোরা ছুঁড়ে মারে। সৌভাগ্যক্রমে সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হরেনবাবুর কান ঘেঁষে গিয়ে চেয়ারের পিছনে ঠেসান দেবার কাঠে গেঁথে যায়।

হরেনবাবুর চিৎকারে সবাই ছুটে এল। হরেনবাবু পারিজাতকে বললেন, 'শিগ্‌গির সমরবাবুকে ডেকে আন। খুনি সাত-সকালেই আক্রমণ শুরু করেছে।'

সমর এসে চেয়ারে গাঁথা ছোরাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করল। চেয়ারের কাঠে ছোরার ফলার প্রায় আধখানা ঢুকে গেছে। সে প্রশ্ন করল, 'আক্রমণকারীকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'—না। কাগজটা মুখের কাছে তুলে পড়ছিলাম, তাই কাউকে দেখতে পাইনি।'

সমর গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ! খুনি প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছে বলে নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবে। ভয় নেই। আমি তখন তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলব।'

হরেনবাবু ভয়ে সেদিন আর কাজকর্মে বেরুলেন না। বিকেলে একবার নিজেই গাড়ি চালিয়ে মার্কেটে গেলেন, পারিজাতের জন্য ডাক-টিকিট কিনতে।

সমর সারাদিন হরেনবাবুর বাড়ি পারিজাতের সঙ্গে ক্যারাম খেলে কাটাল। বিকেলে হরেনবাবু যখন বার হন, তখন ওরা দুজনে বাগানেই ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যায় পারিজাতের

জন্মলগ্নে তাকে উপহার দেয়া হয়। হরেনবাবু দিলেন কিছু স্ট্যাম্প ও একটা দামি অ্যালবাম, সমর দিল একটা বই—গোয়েন্দা-গল্পের সঞ্চয়ন।

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে সবাই শোবার উদ্যোগ করে। হরেনবাবুর পাশের ঘর সমরের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, দুই ঘরের মাঝের যাতায়াতের দরজা সারারাত খোলা থাকবে, ঠিক হয়।

সমর হরেনবাবুকে নিজের রিভলবার দেখিয়ে বলল, 'কোনও ভয় নেই। আমার কাছে অস্ত্র আছে। তাছাড়া আমি আজ ঘুমোবো না, টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে সারারাত পড়ব-লিখব।'

হরেনবাবু রিভলভার দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার রিভলভার আছে জানতাম না তো!'

সমর হেসে বলল, 'কাল্পনিক মামলার চেয়ে অনেক সময় সত্যি মামলায় জড়িত থাকি বলে আমার ডেপুটি-কমিশনার বন্ধু এটার লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। আমি পারিজাতের ঘরটা একবার পরীক্ষা করে আসি।'

পারিজাতের ঘরে গিয়ে সমর দেখল, সে স্ট্যাম্প ও অ্যালবাম ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। মধু তার কাছে বসে আছে।

সমরকে দেখে পারিজাত বলল, 'কী মুশকিলে পড়েছি জানেন, সমরদা? স্ট্যাম্পগুলো অ্যালবামে সাঁটতে পারছি না। আজ সকালেই গঁদের শিশিটা কাকার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে। মধুকে বলেছি খানিকটা আঠার ব্যবস্থা করতে।'

সমর বলল, 'কাল সকালেই স্ট্যাম্প সাজিও, এখন শুয়ে পড়ো। ...মধু, একবার এদিকে শোনো তো।' মধুকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে চুপি-চুপি তার হাতে রিভলভার গুঁজে দিয়ে সমর বলল, 'যা বলেছি, মনে আছে?'

'—হ্যাঁ বাবু।'

সমর নিজের ঘরে এসে একটা বই খুলে বসতে-না-বসতেই পারিজাতের চিৎকার কানে এল, 'কাকাবাবু, সমরদা—শীগ্‌গির আসুন—মধু কেমন করছে।'

সমর ও হরেনবাবু ছুটে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পারিজাতের ঘরে পা দিয়ে তাঁরা দেখলেন, মধু আড়ষ্ট হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। পারিজাত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে।

সমর জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল?'

পারিজাত জবাব দিল, 'আপনার বইটা নিয়ে আমি বিছানায় শুয়েছি। মধু টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অ্যালবামে স্ট্যাম্প সাঁটছিল। হঠাৎ দেখি সে ছটফট করতে করতে দড়াম করে পড়ে গেল।'

হরেনবাবু সমরকে জিগ্যেস করলেন, 'মৃগীরোগের আক্রমণে মৃত্যু নাকি?'

'—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি ডাক্তারকে ফোন করুন। সেই সঙ্গে থানাতেও। অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন।'

হরেনবাবু ফোন করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সমর টেবিলের অ্যালবাম ও স্ট্যাম্প পরীক্ষা করে দেখল। লক্ষ করল, স্ট্যাম্পগুলোর পিছনে সাদা পাউডারের মতো গুঁড়ো মাখানো।

হরেনবাবু ফিরে আসতে তাঁকে বলল, 'ডাক্তার, পুলিশ না-আসা পর্যন্ত আপনি মৃতদেহের কাছে থাকুন। আমি পারিজাতকে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছি। বেচারা চোখের সামনে এই

রকম মৃত্যু দেখে ঘাবড়ে গেছে।'

ঘরের বাইরে এসেই পারিজাতকে সমর জিগ্যেস করল, 'টেলিফোনটা কোন্ ঘরে আছে?'

সমর তার বন্ধু ডিটেকটিভ-ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি-কমিশনারকে ফোন করল, 'হ্যালো! ভুজঙ্গ?.....আমি সমর...একটা খুন হয়েছে .....আমাদের পাড়ায়.....কে খুন করেছে আমি জানি....আমি সেখানেই আছি....তুমি ওয়ারেন্ট নিয়ে এসো....খুনির নাম ও খুনের প্রমাণ আমি তোমায় বলব।'

টেলিফোন রেখে পারিজাতকে সমর বলল, 'মধু প্রাণ দিয়ে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। নইলে মরার কথা ছিল তোমার।'

পারিজাত অবাক হয়ে বলল, 'আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না।'

'—এখন মুখ বুজে থাকো, এখুনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

পুলিশ ইন্‌সপেকটর ও ডাক্তার এলেন। তাঁরা যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন এমন সময় ভুজঙ্গ বাবু উপস্থিত হলেন। ইন্‌সপেকটর শশব্যস্ত হয়ে, এসে বলল, 'আপনি স্যর?'

'—মার্ডার কেস্ বলে আমি রিপোর্ট পেয়েছি।'

হরেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'মার্ডার! কিন্তু দেহে তো কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। তাছাড়া আমার ভাইপো মৃত্যুর সময় এর কাছে ছিল, সে তো বলছে হঠাৎ মারা গেছে। হার্ট ফেল করে বা মৃগী রোগে—'

সমর বাধা দিয়ে বলল, 'না, মার্ডারই। তবে আঘাতে মৃত্যু নয়, বিষক্রিয়ায়। পটাসিয়াম সায়নাইড দিয়ে মারা হয়েছে।'

হরেনবাবু আরও অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছেন আপনি!'

'—ঠিকই বলছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধরা পড়বে। তবে হত্যাকারীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। রামের বদলে শ্যাম মারা গেল।'

হরেনবাবু বললেন, 'তার মানে, আমার বদলে মধু?'

'—না, পারিজাতের বদলে মধু। আর হত্যাকারী হচ্ছেন আপনি। ভুজঙ্গ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় হরেনবাবুর নামটা বসিয়ে নাও। আমি যুক্তিগুলো দিচ্ছি, কোর্টে প্রমাণ করার ভার তোমাদের।'

হরেনবাবু সমরকে বললেন, 'গাঁজাখুরি গোয়েন্দাকাহিনী লিখে-লিখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় আমি আপনার সঙ্গে পাশের ঘরে ছিলাম। আমি কী করে ওকে বিষ খাওয়াবো?'

সমর বলল, 'আপনি পারিজাতকে উপহার দেয়া টিকিটের পেছনে পটাসিয়াম সায়নাইডের গুঁড়ো মাখিয়ে দিয়েছিলেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় পুলিশ সহজেই এটা প্রমাণ করতে পারবে। গঁদের শিশি আপনি ইচ্ছে করে ভেঙেছিলেন এবং ইচ্ছে করেই নতুন শিশি কিনে আনেননি। আপনি জানতেন, স্ট্যাম্পগুলো অ্যালবামে সাঁটার জন্যে পারিজাতের দেরি সইবে না। গঁদের অভাবে থুথু দিয়ে সাঁটতে যাবে এবং তার ফলেই মরবে। কিন্তু দুটো কারণে ও বেঁচে গেছে—প্রথম থুথু দিয়ে কিছু আটকানোর নোংরা অভ্যেস ওর নেই, দ্বিতীয় গোয়েন্দা গল্পের বই স্ট্যাম্পের চেয়ে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল বেশি, তাই স্ট্যাম্প সাঁটার ভার ও মধুর ওপর দেয়। উড়ো চিঠিটা আপনারই লেখা। আপনি বলেছেন, চিঠিটা সকালে বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু আমি এক সময় মধুকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম, সেদিন ডাকে আপনার নামে কোনও চিঠি আসেনি। তাছাড়া আপনার কথা মতো চিঠিটা সকালের ডাকে এলে আপনি যে পরিমাণ বিচলতি হয়েছিলেন, তাতে বিকেল পর্যন্ত এটার কথা পারিজাতকে

না বলা অস্বাভাবিক। আমি তখনই বুঝেছিলাম, বিচলিত হওয়ার ভাবটা আপনার ভান। আপনার হস্তাক্ষর পারিজাতের কাছে গোপন করার জন্য বাঁ হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে ওটা লিখেছিলেন।

'—আপনি বলেছিলেন অফিসের একজন হিসেবের গোলমাল করায় তাকে তাড়িয়েছেন। সে প্রতিহিংসার বশে খুন করতে চাইছে। কিন্তু মধুর মুখ থেকে আমি জেনেছিলাম, সেই কর্মচারিটি বীরেনবাবুর আমলের লোক, খুব বিশ্বাসী। আমার মনে হয়েছিল ব্যবসায় টাকাকড়ির গোলমাল হয়তো আপনি করেছেন, পাছে সে ধরে ফেলে সেই ভেবে তাকে আপনি সরিয়েছেন।

'—সকালে আপনাকে ছোরা ছুঁড়ে হত্যার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটাও আপনারই সাজানো ঘটনা। মুখের সামনে খবরের-কাগজ তুলে দু-হাত দিয়ে ধরে পড়লে ছোরা কিছুতেই আপনার কান ঘেঁষে যেতে পারে না, কাগজকে বিদ্ধ না-করে। তাছাড়া ছোরার আধখানা চেয়ারের কাঠে ঢুকে গিয়েছিল। আপনার জানলা থেকে চেয়ারের দূরত্ব প্রায় পনেরো ফুট। আততায়ী যদি বাগানের মধ্যে থেকে অর্থাৎ জানলা থেকে আরও ফুট-পাঁচেক দূর, অর্থাৎ মোট বিশ ফুট দূর থেকে ছোরাটা ছুঁড়ে থাকে, তাহলে অমানুষিক শক্তির অধিকারী না-হলে চেয়ারের শক্ত কাঠে ছোরার অতখানি গাঁথা সম্ভব নয়। আরও কাছ থেকে, মানে ঘরের মধ্যে থেকেই ছোরাটা চেয়ারে গাঁথা হয়েছিল। ঘরে তখন আপনি ছাড়া কেউ ছিল না।

তাছাড়া বিকেলে বাগানে বেড়াবার সময় আমি লক্ষ করেছিলাম, আপনার জানলার কাছের ফুলগাছগুলোর কোনটাই আততায়ীর পায়ের ভারে পিষ্ট হয়নি। আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যে, আততায়ীর আক্রমণ অলীক।'

ভুজঙ্গবাবু প্রশ্ন করলেন, 'হত্যা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কী, সমর?'

সমর বলল, 'অর্থ-লালসা। পারিজাতের মৃত্যু হলে হরেনবাবু নিশ্চিন্তে সব ভোগ-দখল করতে পারবেন। পারিজাত সামনের বছর পড়াশোনা করতে বিলেত যেতে পারে। দেশে যখন ফিরবে তখন সে সাবালক। হরেনবাবুর নাগালের বাইরে চলে যাবার আগেই তাকে মারা দরকার।'

'—কিন্তু হরেনবাবুর উদ্দেশ্য তুমি ধরলে কী করে?'

সমর হেসে বলল, 'কথায় বলে—অতি চালাকের গলায় দড়ি। হরেনবাবু সহজেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু একটু বেশি চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। পারিজাতের মুখে তিনি আমার কথা শুনে বুঝেছিলেন, পারিজাতের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে আমি হয়তো অনুসন্ধান করব। তাই আমার কাছে ভান করলেন যেন অজ্ঞাত কোনও ব্যক্তি খুনের চেষ্টায় আছে এবং তার লক্ষ পারিজাত নয়, হরেনবাবুই। পারিজাতের মৃত্যু ঘটলে আমি ভাবব, খুনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তাছাড়া উনি আর একটু বেশি চালাকি করে আমাকেও খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। পারিজাত আমার কাছ থেকে ডাক টিকিট নিত, এটা উনি জানতেন। পারিজাত মারা গেলে পুলিশ যদি ডাক টিকিটে বিষ পেতো, তাহলে আমাকে জড়াতে চাইতো খুনের সঙ্গে। কোন্ টিকিট আমি পারিজাতকে দিয়েছি, আর কোন্‌টা উনি দিয়েছেন তা পারিজাত ছাড়া আর কেউ জানে না। পারিজাতের অবর্তমানে ওঁর দেয়া টিকিটের কথা উনি অস্বীকার করতেন।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক লোক তো! তোমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার চেষ্টায় ছিলেন! এখন উনি যাতে ঝোলেন সে চেষ্টা আমরা করব।'

সমর পারিজাতকে বলল, 'তুমি নতুন দেশের টিকিট খোঁজ করো, তাই তোমার কাকা জন্মদিনে তোমাকে যমালয়ের টিকিট উপহার দিয়েছিলেন।'

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

সত্যজিৎ রায়

'কার্ডটা কীরকম হয়েছে দ্যাখ তো।'

ফেলুদা ওর মানিব্যাগের ভিতর থেকে সড়াৎ করে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে আমায় দেখতে দিল। দেখি তাতে ছাপাব অক্ষবে লেখা রয়েছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator। বুঝতে পারলাম ফেলুদা এবার তাব গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা বেশ ফলাও করে জাহির করছে। আর তা করবে নাইবা কেন। বাদশাহি আংটির শযতানকে ফেলুদা যে-ভাবে সায়েস্তা করেছিল, সে কথা ও ইচ্ছে করলে সকলকে বুক ফুলিযে বলে বেড়াতে পারত। তার বদলে ও শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছে—এই তো!

' ফেলুদার নাম আপনা থেকেই বেশ রটে গিয়েছিল। আমি জানি ও এব মধে দু'তিনটে রহস্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির অফার পেযেছে, কিন্তু কোনটাই ওর মনের মতো হয়নি ব'লে না কবে দিয়েছে।

· ·টা ব্যাগেব মধ্যে পুরে রেখে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'বড়দিনের ছুটিতে কিছুটা মাথা খাটানোর প্রযোজন হবে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নতুন কোন রহস্য বুঝি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল—কিন্তু বাইরে সেটা একদম দেখালাম না।

ফেলুদা তার প্যান্টের পাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা মাদ্রাজি সুপুরি নিযে মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'তোর খুব উত্তেজিত লাগছে বলে মনে হচ্ছে?'

সে কী, ফেলুদা বুঝল কী করে?

ফেলুদা নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। 'কী করে বুঝলাম ভাবছিস? মানুষ তার মনের ভাব যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, তার বাইরের ছোটখাটো হাবভাব থেকেই সেটা ধরা পড়ে যায়। কথাটা যখন তোকে বললাম, ঠিক সেই সময়টা তোর একটা হাই আসছিল। কিন্তু কথাটা শুনে মুখটা খানিকটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। তুই যদি আমার কথায় উত্তেজিত না হতিস, তাহলে কিন্তু যথারীতি হাইটা তুলতিস—মাঝপথে থেমে যেতিস না।'

ফেলুদার এই ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে অবাক করে দিত। ও বলত, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেকটিভ হবার কোন মানে হয় না। এ ব্যাপারে যা খাঁটি কথা বলার সবই শার্লক হোম্‌স বলে গেছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।'

আমি বললাম, 'কী কাজে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে বললে না?'

ফেলুদা বলল, 'কৈলাস চৌধুরীর নাম শুনেছিস? শ্যামপুকুরের কৈলাস চৌধুরী?'

আমি বললাম, 'না, শুনিনি। কত বিখ্যাত লোক আছে কলকাতা শহরে—তার ক'জনের নামই বা আমি শুনেছি। আর আমার তো সবেমাত্র পনেরো বছর বয়স।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরা রাজসাহীতে বড় জমিদার ছিল। কল্‌কাতায় বাড়ি ছিল; পাকিস্তান হবার পর এখানে চলে আসে। কৈলাসবাবুর পেশা হচ্ছে ওকালতি। তাছাড়া শিকারী হিসাবে নামডাক আছে। দু'খানা শিকারের বই লিখেছেন। এই কিছুদিন আগে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে একটা হাতি পাগল হয়ে গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করেছিল—উনি গিয়ে সেটাকে মেরে এলেন। কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার মাথা খাটাতে হচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের জীবনে কোন রহস্য আছে নাকি?'

ফেলুদা জবাব না দিয়ে, তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমাকে দিল।

'পড়ে দ্যাখ্।'

আমি চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলাম। তাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দেওয়া স্থির করিলাম। আপনি উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। কারণ সাক্ষাতে বলিব। আমি এক্সপ্রেস ডেলিভারি যোগে এই পত্র পাঠাইতেছি, সুতরাং আগামীকল্য ইহা আপনার হস্তগত হইবে। আমি পরশু অর্থাৎ শনিবার, সকাল ১০টায় আপনার আগমন প্রত্যাশা করিব। ইতি। —ভবদীয় শ্রীকৈলাশচন্দ্র চৌধুরী।'

চিঠিটা পড়ামাত্র আমি বললাম, 'শনিবার সকাল দশটা মানে তো আজই আর এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

ফেলুদা বলল, 'তোর দেখছি বেশ ইম্‌প্রুভমেন্ট হয়েছে। তারিখ-টারিখগুলো বেশ খেয়াল রাখছিস।'

আমার মনে এর মধ্যেই একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। বললাম, 'তোমাকেই যখন ডেকেছে, তখন কি আর সঙ্গে অন্য কেউ...'

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'তোর বয়সটা কম বলেই হয়তো তোকে সঙ্গে নেওয়া চলতে পারে। কারণ তোকে হয়তো মানুষ বলেই ধরবেন না ভদ্রলোক। কাজেই তোর সামনে কথাবার্তা বলতে আপত্তি করবেন না। যদি করেন, তাহলে তুই না হয় পাশের ঘরে-টরে কোথাও অপেক্ষা করিস, সেই ফাঁকে আমরা কথা সেরে নেব।'

আমার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছুটিটা কি করব কি করব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হয়তো দারুণ ইন্টারেস্টিং ভাবেই কেটে যাবে।

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা ট্রামে করে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট আর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছলাম। পথে একবার ট্রাম থেকে নেমে ফেলুদা দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি থেকে কৈলাস চৌধুরীর লেখা একটা শিকারের বই কিনেছিল, সেটার নাম 'শিকারের নেশা।' বাকি পথটা বইটা উলটে-পালটে দেখল। ট্রাম থেকে নামার সময় সেটা কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে রেখে বলল, 'এমন সাহসী লোকের কেন ডিটেক্‌টিভের দরকার পড়েছে কে জানে।'

একান্ন নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিট, একটা মস্ত পুরনো আমলের ফটকওয়ালা বাড়ি—যাকে বলে অট্টালিকা। সামনের দিকে বাগান, ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টেপার আধ মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলতে দেখি একজন ভদ্রলোক, যাকে দেখে কেন জানি মনে হল, তিনি কখনই কৈলাসবাবু ন'ন, কারণ বাঘমারা মানুষের এমন গোবেচারা চেহারা হতেই পারে না। মাঝারি সাইজের মোটা-সোটা ফর্সা ভদ্রলোক—বয়স ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের চাহনিতে কেমন জানি একটা সরল, ছেলেমানুষি ভাব। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের হাতে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা?' গলার আওয়াজ দেখলাম মানানসই রকমের মিহি ও নরম।

ফেলুদা একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোককে দিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা সিঁড়ি পেরিয়ে ভদ্রলোক একটা আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন।

'আপনারা একটু বসুন—আমি মামাবাবুকে খবর দিচ্ছি।'

বহুদিনের পুরনো একটা কালো টেবিলের সামনে দুটো পুরনো হাতলওয়ালা চেয়ারে আমরা বসলাম। ঘরের তিনদিকে আলমারি বোঝাই পুরনো বই। সামনে টেবিলের উপর নজর যেতে একটা মজার জিনিস দেখলাম। তিনখানা মোটা স্ট্যাম্প অ্যালবাম একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, আর আরেকটা অ্যালবাম খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, যাতে সারি সারি স্ট্যাম্প যত্ন করে আটকানো রয়েছে। কয়েকটা সেলোফেনের মধ্যে কিছু আলগা স্ট্যাম্পও রয়েছে, আর তাছাড়া রয়েছে স্ট্যাম্প-কালেক্‌টারদের অত্যন্ত দরকারি ও আমার খুব চেনা কয়েকটা জিনিস যেমন, হিঞ্জ, চিমটে, স্ট্যাম্পের ক্যাটালগ ইত্যাদি। এখন বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের হাতের ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটাও এই কাজেই ব্যবহার হয়, আর তিনিই এই সব স্ট্যাম্পের কালেক্‌টর।

ফেলুদাও ওই সবের দিকেই দেখছিল, কিন্তু ও নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা বৈঠকখানায় এসে বসুন, মামা এক্ষুনি আসছেন।'

মাথার উপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা দু'জনে সাদা খোলস দিয়ে ঢাকা একটা প্রকাণ্ড সোফার উপর বসলাম। ঘরের চারি-দিকে পুরনো বড়লোকী ছাপ। একবার বাবার সঙ্গে বেলেঘাটার মল্লিকদের বাড়িতে ঠিক এইরকম সব আসবাব, পেন্টিং মূর্তি আর ফুলদানির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। এছাড়া রয়েছে মেঝের উপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল, আর দেয়ালে চারটে হরিণ, দুটো চিতাবাঘ আর একটা

মহিষের মাথা।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর একজন মাঝবয়সী কিন্তু বেশ জোয়ান গোছের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর রং ফরসা, নাকের তলায় সরু গোঁফ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন।

আমরা দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন ভুরুটা একটু কপালে তুললেন। ফেলুদা বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফাতে বসে বললেন, 'আপনারা কি দু'জনে একসঙ্গে ডিটেকটিভগিরি করেন?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। তবে ঘটনাচক্রে আমার সব ক'টা কেসের সঙ্গেই তপেশ জড়িত ছিল। ও কোন অসুবিধা করেনি কখনও।'

'বেশ।.....অবনীশ, তুমি যেতে পারো। এদের জন্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা দেখো।'

স্ট্যাম্প-জমানো ভদ্রলোকটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাঁর মামার আদেশ শুনে চলে গেলেন। কৈলাস চৌধুরী ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আমার চিঠিটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমিই যে প্রদোষ মিত্তির সেটার প্রমাণ চাইছেন তো? এই যে আপনার চিঠি।'

ফেলুদা পকেট থেকে কৈলাসবাবুর চিঠিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। উনি সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'এ সব প্রিকশান নিতেই হয়, বুঝতেই পারছেন। যাই হোক্—শিকারী বলে আমার একটা নামডাক আছে জানেন বোধ হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঘরের দেয়ালে জানোয়ারের মাথাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এগুলো সব আমারই শিকার। সতেরো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখি। তার আগে অবিশ্যি এয়ার গান দিয়ে পাখি-টাখি মেরেছি। সম্মুখ সমরে জানোয়ার কোনদিন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। কিন্তু...যে শত্রু অদৃশ্য ও অজ্ঞাত—সে আমাকে বড় ভাবিয়ে তোলে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমার বুকের ভিতরটায় আবার টিপ্‌টিপ্ শুরু হয়েছে। জানি এক্ষুনি ভদ্রলোক রহস্যের কথাটা বলবেন, কিন্তু এত কায়দা করে আস্তে আস্তে আসল কথাটায় যাচ্ছেন যে তাতে যেন সাস্‌পেন্স আরও বেড়ে যায়।

কৈলাসবাবু আবার শুরু করলেন।

'আপনার বয়স যে এত কম তা জানা ছিল না। কত হবে বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'টুয়েন্টি এইট।'

'কাজেই, যে কাজের ভার আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা জানি না। পুলিশকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এর আগে আরেকটা ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিয়ে ঠকেছি। ওরা অনেক সময় কাজের চেয়ে অকাজটা করে বেশি, আর এটাও ঠিক যে আমি তরুণদের অশ্রদ্ধা করি না মোটেই। কাঁচা বয়সের সঙ্গে পাকা বুদ্ধির সমাবেশটা খুব জোরালো হয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবারে কৈলাসবাবুর থামার সুযোগ নিয়ে ফেলুদা গলা খাঁক্‌রিয়ে বলল, 'ঘটনাটা কী সেটা যদি বলেন...।'

কৈলাসবাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, ''দেখুন তো এটা পড়ে কী বোঝেন।''

ফেলুদা কাগজটা খুলে ধরতে আমি পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হয় এই—'পাপের বোঝা বাড়িও না। যে জিনিসে তোমার অধিকার নেই সে-জিনিস তুমি আগামী সোমবার বিকেল চারটার মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের বিশ হাত ভিতর দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে লিলি ফুলের প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচে রেখে আসবে। আদেশ অমান্য করার, বা পুলিশ-গোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার ফল ভালো হবে না—তোমার অনেক শিকারের মতোই তুমিও শিকারে পরিণত হবে একথা জেনে রেখো।'

''কী মনে হয়?'' গম্ভীর গলায় কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখে বলল, ''হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে, কারণ একই অক্ষর দু'তিন জায়গায় দু'তিন রকম ভাবে লেখা হয়েছে। আর, নতুন প্যাডের প্রথম কাগজে লেখা।''

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

'প্যাডের কাগজে লেখা হলে তার পরের কাগজে সে লেখার কিছুটা ছাপ থেকে যায়। এ কাগজ একেবারে মসৃণ।'

'ভেরি গুড। আর কিছু?'

'আর কিছু এ থেকে বলা অসম্ভব। এ চিঠি ডাকে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। পোস্টমার্ক পার্ক স্ট্রিট। তিনদিন আগে এ চিঠি পেয়েছি। আজ শনিবার ২০শে।'

ফেলুদা চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, ''এবার আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আপনার শিকারের কাহিনী ছাড়া আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।''

'বেশ তো। করুন না। মিষ্টি মুখে পুরে খেতে খেতে করুন।'

চাকর রুপোর প্লেটে রসোগোল্লা আর অমৃতি রেখে গেছে। ফেলুদাকে খাবার কথা বলতে হয় না। সে টপ্ করে একটা আস্ত রসোগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে বলল, ''চিঠিতে যে জিনিসটার কথা লেখা হয়েছে সেটা কি জানতে পারি?''

কৈলাসবাবু বললেন, ''ব্যাপারটা কি জানেন—যাতে আমার অধিকার নেই, এমন কোন জিনিস আমার কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। এ বাড়িতে যা কিছু আছে তা সবই হয় আমার নিজের কেনা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি। আর তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যেটা আদায় করার জন্য কেউ আমাকে এমন চিঠি দিতে পারে। তবে একটিমাত্র জিনিস আছে যেটা বলতে পারেন মূল্যবান ও লোভনীয়।''

'সেটা কী?'

'একটা পাথর।'

'পাথর?'

'প্রেশাস স্টোন।'

'আপনার কেনা?'

'না, কেনা না।'

'পৈতৃক সম্পত্তি?'

'তাও না। পাথরটা পাই আমি মধ্যপ্রদেশে চাঁদার কাছে একটা জঙ্গলে। একটা বাঘকে

ধাওয়া করে আমরা তিন-চার জন একটা জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মারা হয়। কাছেই একটা বহু পুরনো ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে একটা দেবমূর্তির কপালে পাথরটা লাগানো ছিল। ওটার অস্তিত্ব বোধ হয় আমাদের আগে কেউই জানত না।'

'ওটা কি আপনার চোখেই প্রথম পড়ে?'

'মন্দিরটা সকলেই দেখেছিল, তবে পাথরটা প্রথম আমিই দেখি।'

'সঙ্গে আর কে ছিল সেবার?'

'রাইট বলে এক মার্কিন ছোক্‌রা, কিশোরীলাল বলে এক পাঞ্জাবি, আর আমার ভাই কেদার।'

'আপনার ভাইও শিকার করেন?'

'করত। এখন করে কিনা জানি না। বছর চারেক হল ও বিদেশে।'

'বিদেশ মানে?'

'সুইজারল্যান্ড! ঘড়ির ব্যবসার ধান্দায়।'

'যখন পাথরটা পেলেন তখন ওটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়নি?'

'না। তার কারণ ওটার যে কত দাম সেটা কলকাতায় এসে জহুরিকে দেখাবার পর জানতে পারি।'

'তারপর সেখবর আর কে জেনেছে?'

'খুব বেশি লোককে বলিনি। এমনিতে আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। দু'একজন উকিল বন্ধুকে বলেছি, কেদার জানত, আর বোধহয় আমার ভাগনে অবনীশ জানে।'

'পাথরটা বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরেই থাকে।'

'এত দামি জিনিস ব্যাঙ্কে রাখেন না যে?'

'একবার রেখেছিলাম। যেদিন রেখেছিলাম তার পরের দিনই একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়—প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। তারপর থেকে ধারণা হয় ওটা কাছে না রাখলে ব্যাড লাক্ আসবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিই।'

ফেলুদার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম ও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি, আমার ভাগ্নে অবনীশ, আর তিনটে পুরনো চাকর। আর আমার বাবাও আছেন, তবে তিনি একেবারে অথর্ব, জরাগ্রস্ত। একটি চাকর তার পিছনেই লেগে থাকে সারাক্ষণ।'

'অবনীশবাবু কী করেন?'

'বিশেষ কিছুই না। ওর নেশা ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। বলছে একটা টিকিটের দোকান করবে।'

ফেলুদা একটু ভেবে মনে মনে কী জানি হিসাব করে বলল, 'আপনি কি চাইছেন আমি পত্রলেখকের অনুসন্ধান করি?'

কৈলাসবাবু যেন একটু জোর করেই হেসে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন এই বয়সে এ ধরনের অশান্তি কি ভালো লাগে? আর শুধু যে চিঠি লিখছে তা নয়—কাল রাত্রে একটা টেলিফোনও করেছিল। ইংরিজিতে ওই একই কথা বলল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। কী বলল জানেন? বলল, নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা

রেখে না এলে একেবারে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ঘায়েল করে দিয়ে যাবে। অথচ এ পাথর হাতছাড়া করতে আমি মোটেই রাজি নই। তা ছাড়া লোকটার যখন কোন ন্যায্য দাবি নেই, অথচ হুমকি দিচ্ছে—তখন বুঝতে হবে সে বদমাইশ, সুতরাং তার শাস্তি হওয়া দরকার। সেটা কী করে সম্ভব সেটাই আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

'উপায় তো একটাই। বাইশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকা। তাকে তো আসতেই হবে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। যে-ই এসে লিলি গাছের পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, সে যদি আসল লোক নাও হয়, তাকে ধরতে পারলে আসল লোকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। লোকটা ডেন্‌জারাস্‌ হতে পারে। সে যখন দেখবে লিলি গাছের তলায় পাথরটা নেই, তখন যে কী করতে পারে তা বলা যায় না। তার চেয়ে বাইশ তারিখের আগে—অর্থাৎ আজ আর কালের মধ্যে—এই লোকটি কে তা যদি জানা সম্ভব হত তাহলে খুবই ভালো হত। এই চিঠি, আর ওই একটা টেলিফোন কল—এই দুটো থেকে কিছু বার করা যায় না?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। ও বলল, 'দেখুন কৈলাসবাবু, চিঠিতে সে লিখেছে যে, গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল ভালো হবে না—সুতরাং আমি কিছু করি বা না করি, আপনি যে আমাকে ডেকেছেন, এতেই আপনার বিপদের একটা আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপনি বরঞ্চ ভেবে দেখুন যে আমাদের সাহায্য চান কিনা।'

কৈলাসবাবু ঠান্ডার মধ্যেও রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল মুছে বললেন, 'আপনি, এবং আপনার সঙ্গে আপনার ভাইটি—এ দুজনকে দেখলে কেউ মনে করবে না যে আপনাদের সঙ্গে গোয়েন্দার কোন সম্পর্ক আছে। এটা একটা অ্যাডভানটেজ। আপনার নাম লোকে জেনে থাকলেও, আপনার চেহারা জানে কি? মনে তো হয় না। সুতরাং সেদিকে আমার বিশেষ ভয় নেই। আপনি রাজি হলে কাজটা নিন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তবে যাবার আগে একবার পাথরটা দেখে যেতে চাই?'

'নিশ্চয়ই।'

কৈলাসবাবুর পাথর ওঁর শোবার ঘরে আলমারির ভিতর থাকে। আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা শানবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা লম্বা, অন্ধকার বারান্দায়। তার দু'দিকে সারি সারি প্রায় দশ-বারোটা ঘর, তার অনেকগুলো আবার তালাবন্ধ। চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব, আর লোকজন নেই বলেই বোধ হয় সামান্য একটু আওয়াজ হলেই তার প্রতিধ্বনি হয়।

বারান্দার শেষ মাথায় ডানদিকের ঘর হল কৈলাসবাবুর শোবার ঘর। আমরা যখন বারান্দার মাঝামাঝি এসেছি, তখন দেখি পাশের একটা ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আর ভিতর দিয়ে একজন ভীষণ বুড়ো লোক গলা বাড়িয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে দেখছে। আমার তো দেখেই কিরকম ভয় ভয় করতে লাগল। কৈলাসবাবু বললেন, 'উনিই আমার বাবা। মাথার ঠিক নেই। সব সময়েই এখান দিয়ে ওখান দিয়ে উঁকি মারেন।'

কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন বুড়োর চাহনি দেখে সত্যিই আমার রক্ত জল হয়ে গেল। আর সেই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন কৈলাসবাবুর দিকে।

বাবার ঘর পেরিয়ে কিছুদূর গেলে পর কৈলাসবাবু বললেন, 'বাবার সকলের উপরেই আক্রোশ। ওঁর ধারণা সকলেই ওঁকে নেগলেক্ট করে। আসলে কিন্তু ওঁর দেখাশোনার

ত্রুটি হয় না।'

কৈলাসবাবুর ঘরে দেখলাম প্রকাণ্ড উঁচু খাট, আর তার মাথার দিকে ঘরের কোণায় আলমারি। সেটা খুলে তার দেরাজ থেকে একটা নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে বললেন, 'সীতারামদাসের দোকান থেকে এই বাক্সটা কিনে নিয়েছিলুম এই পাথরটা রাখার জন্য।'

বাক্সটা খুলে নীল আর সবুজ রঙ মেশানো লিচুর সাইজের একটা ঝলমলে পাথর বার করে কৈলাসবাবু ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন—

'একে বলে ব্লু বেরিল। ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে খুব বেশি আছে তা নয়। অন্তত এত বড় সাইজের বেশি নেই সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

ফেলুদা পাথরটা হাতে নিয়ে এদিকে ওদিক নাড়িয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিল। এবার কৈলাসবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করলেন। তারপর তার থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটে আগাম। কাজটা ভালোয় ভালোয় উতরে গেলে বাকিটা দেব, কেমন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' ফেলুদা নোটগুলো পকেটে পুরে নিল। চোখের সামনে ওকে রোজগার করতে এই প্রথম দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে, আর অবনীশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

নীচে যখন পৌঁছলাম, ঠিক সেই সময় বৈঠকখানা থেকে টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করেছে। কৈলাসবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো।'

তারপর আর কোন কথা নেই। আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতেই কৈলাসবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ধপ্ করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, 'আবার সেই লোক, সেই হুমকি।'

'কী বলল?'

'এবার আর কোন সন্দেহ রাখেনি।'

'তার মানে?'

'বলল—কোন জিনিসটা চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়। চাঁদার জঙ্গলের মন্দিরে যেটা ছিল সেইটে।'

'আর কী বলল?'

'আর কিছু না।'

'গলা চিনলেন?'

'না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গলাটা শুনতে ভালো লাগে না। আপনি বরং আরেকবার ভেবে দেখুন।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, ''আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।''

কৈলাসবাবুর কাছ থেকে অবনীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের পর রাখা কি-একটা জিনিস খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমরা ঢুকতেই টেবিলের উপর হাতটা চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন, আসুন!'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ডাকটিকিটের খুব শখ দেখছি।'

অবনীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র নেশা। বলতে গেলে আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।'

'আপনি কি কোনও দেশ নিয়ে স্পেশালাইজ করেন, না সারা পৃথিবীর টিকিট জমান?'

'আগে সারা পৃথিবীরই জমাতুম, কিন্তু কিছুদিন হল ইন্ডিয়াতে স্পেশালাইজ করছি। আমাদের এই বাড়ির দপ্তরে যে কী আশ্চর্য সব পুরনো টিকিট রয়েছে তা বলতে পারি না। অবিশ্যি বেশির ভাগই ইন্ডিয়ার। গত দু'মাস ধরে হাজার হাজার পুরনো চিঠির গাদা ঘেঁটে টিকিট সংগ্রহ করেছি।'

'ভালো কিছু পেয়েছেন?'

'ভালো? ভালো?' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বললে বুঝবেন? আপনার এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে?''

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'একটা বয়সে তো সকলেই ওদিকটায় ঝোঁকে—তাই নয় কি? কেপ-অব-গুড-হোপের এক পেনি, মরিশাসের দু' পেনি আর ব্রিটিশ গায়নার ১৮৫৬ সনের সেই বিখ্যাত স্ট্যাম্পগুলো পাবার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। বছর দশেক আগে লাখ খানেক টাকা দাম ছিল ওগুলোর। এখন আরও বেড়েছে।'

অবনীশবাবু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'তাহলে মশাই আপনি বুঝবেন। আপনাকে দেখাই। এই দেখুন!'

ভদ্রলোক তার চাপা হাতের তলা থেকে একটা ছোট্ট রঙিন কাগজ ফেলুদাকে দিলেন। দেখি খাম থেকে খোলা রঙ প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা টিকিট।

'কী দেখলেন?' অবনীশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'শ'খানেক বছরের পুরনো ভারতবর্ষের টিকিট। ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকিট আগে দেখেছি।'

'দেখেছেন তো? এবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখুন!'

ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে লাগাল।

'এবার কী দেখছেন?' ভদ্রলোকের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'এতে তো ছাপার ভুল রয়েছে।'

'এগ্‌জ্যাক্টলি!'

'POSTAGE কথাটার G-এর জায়গায় C ছাপা হয়েছে।'

অবনীশবাবু টিকিট ফেরত নিয়ে বললেন, 'তার ফলে এটার দাম কত হচ্ছে জানেন?'

'কত?'

'বিশ হাজার টাকা।'

'বলেন কী?'

'আমি বিলেত থেকে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি। এই ভুলটার উল্লেখ স্ট্যাম্প ক্যাটালগে নেই। আমিই প্রথম এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম।'

ফেলুদা বলল, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। কিন্তু আপনার সঙ্গে টিকিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার মামা—কৈলাসবাবু—তাঁর যে একটা দামি পাথর আছে সেটা আপনি জানেন?'

অবনীশবাবুকে যেন কয়েক সেকেন্ড ভাবতে হল। তারপর বললেন, ''ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছিলাম বটে। দামি কিনা জানি না—তবে 'লাকি' পাথর সেটা একবার বলেছিলেন বটে। কিছু মনে করবেন না। আমার মাথায় এখন ডাকটিকিট ছাড়া কিচ্ছু নেই।''

'আপনি এ বাড়িতে কদ্দিন আছেন?'

'বাবা মারা যাবার পর থেকেই। প্রায় পাঁচ বছর।'

'মামার সঙ্গে আপনার গোলমাল নেই তো?'

'কোন মামা? এক মামা তো বিদেশে।'

'আমি কৈলাসবাবুর কথা বলছি।'

'ও। ইনি অত্যন্ত ভালো লোক, তবে...'

'তবে কী?'

অবনীশ ভুরু কুঁচকোলেন।

'কদিন থেকে—কোনও একটা কারণে—ওঁকে যেন একটু অন্যরকম দেখছি।'

'কবে থেকে?'

'এই দু-তিন দিন হল। কাল ওঁকে আমার এই স্ট্যাম্পটার কথা বললাম—উনি যেন শুনেও শুনলেন না। অথচ এমনিতে রীতিমত ইন্টারেস্ট নেন। আর তা ছাড়া, ওঁর কতগুলো অভ্যেস কীরকম যেন বদলে যাচ্ছে।'

'উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই যেমন, এমনিতে রোজ সকালে উঠে-বাগানে পায়চারি করেন, গত দু'দিন করেননি। ঘুম থেকে উঠেছেন দেরিতে। বোধ হয় রাত জাগছেন বেশি।'

'সেটার কোন ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো একতলায় শুই। আমার ঠিক উপরের ঘরটাই মামার। পায়চারি করার শব্দ পেযেছি মাঝ রাত্রে। গলার স্বরও পেয়েছি। বেশ জোরে মনে হল ঝগড়া করছেন।'

'কার সঙ্গে?'

'বোধ হয় দাদু। দাদু ছাড়া আর কে হবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করারও শব্দ পেয়েছি। একদিন তো সন্দেহ করে সিঁড়ির নিচটায় গিযে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম মামা ছাত থেকে দোতলায় নামলেন, হাতে বন্দুক।'

'তখন ক'টা?'

'রাত দুটো হবে।'

'ছাতে কী আছে?'

'কিছুই নেই। কেবল একটা ঘর আছে—চিলেকোঠা যাকে বলে। পুরনো চিঠিপত্র কিছু ছিল ওটায, সেসব আমি মাস খানেক হল বের করে এনেছি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। বুঝলাম তার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

অবনীশবাবু বললেন, 'এসব কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আপনার মামা কোনও কারণে একটু উদ্বিগ্ন আছেন। তবে সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্ট্যাম্প নিয়েই থাকুন। এদিকের ঝামেলা মিটলে একদিন এসে আপনার কালেকশান দেখব'খন।'

কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে ফেলুদা বলল, 'আপনাকে ষোলো আনা ভরসা দিতে পারছি না, তবু এটুকু বলছি যে আপনার ভাবনাটা আমায় ভাবতে দিন। রাত্রে ঘুমোতে চেষ্টা করুন, দরকার হলে ওষুধ খেয়ে। আর ছাতে যাবেন না দয়া করে। এ পাড়ার বাড়িগুলো যেরকম ঘেঁষাঘেঁষি, আপনার শত্রু পাশের কোনও বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়ে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ছাতে গিয়েছিলাম বটে, তবে সঙ্গে বন্দুক ছিল। একটা আওয়াজ পেয়েই গিয়েছিলাম, যদিও গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।'

'বন্দুকটা সব সময়ই কাছে রাখেন তো?'

'তা রাখি। তবে মানুষের মনের উদ্বেগ অনেক সময় তার হাতের আঙুলে সঞ্চারিত হয় সেটা জানেন তো? বেশিদিন এইভাবে চললে আমার টিপের কী হবে জানি না।'

পরের দিন ছিল রবিবার। সারা দিনের মধ্যে বেশির ভাগটা সময় ফেলুদা ওর ঘরে পায়চারি করেছে। বিকেলে চারটে নাগাদ ওকে পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরোচ্ছ?'

ফেলুদা বলল, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লিলি গাছগুলো একবার দেখে আসব ভাবছি। যাবি তো চ।'

ট্রামে করে গিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচটা নাগাদ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটটায় পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজন একটু কম আসে। বিশেষ করে সন্ধের দিকটায় যা লোক আসে সবই সামনের দিকে—মানে, উত্তরে—গড়ের মাঠের দিকে।

গেট দিয়ে ঢুকে বিশ হাত আন্দাজ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে সত্যিই লিলি গাছের কেয়ারি। তার প্রথম সারির প্রথম গাছটার নীচেই পাথরটা রাখার কথা।

লিলি গাছের মতো এত সুন্দর জিনিস দেখেও গা-টা কেমন জানি ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। ফেলুদা বলল, 'কাকার একটা বাইনোকুলার ছিল না—যেটা সেবার দার্জিলিং নিয়ে গেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আছে।'

মিনিট পনেরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরে আমরা একটা ট্যাকসি নিয়ে সোজা চলে গেলাম লাইটহাউসের সামনে। ফেলুদার কি সিনেমা দেখার শখ হল নাকি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমায় না ঢুকে ও গেল উল্টোদিকের একটা বইয়ের দোকানে। এ বই সে বই ঘেঁটে ফেলুদা দেখি একটা বিরাট মোটা স্ট্যাম্প ক্যাটালগ নিয়ে তার পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'তুমি কি অবনীশবাবুকে সন্দেহ করছ নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'এত যার স্ট্যাম্পের শখ, তার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতে পেলে সুবিধে হয় বই-কি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যখন দোতলা থেকে একতলায় এলাম, তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা তো আর অবনীশবাবু করেননি।'

'না। সেটা করেছিল মস্‌লন্দপুরের আদিত্যনারায়ণ সিংহ।'

'বুঝলাম ফেলুদা এখন ঠাট্টার মেজাজে রয়েছে, ওর সঙ্গে আপাতত আর এ-বিষয়ে কথা বলা চলবে না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ফেলুদা কোটটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি যতক্ষণ হাতমুখ ধুচ্ছি, তুই ডিরেক্টরি থেকে কৈলাসবাবুর টেলিফোন নম্বরটা বার কর তো।'

ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসামাত্র ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠে আমায় বেশ চমকে দিল। আমাকেই ধরতে হয়। তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'হ্যালো।'

'কে কথা বলছেন?'

এ কী অদ্ভুত গলা! এ গলা তো চিনি না! বললাম, 'কাকে চাই?'

কর্কশ গম্ভীর গলায় উত্তর এল, 'ছেলেমানুষ বয়সে গোয়েন্দার সঙ্গে ঘোরাফেরা করা হয় কেন? প্রাণের ভয় নেই?'

আমি ফেলুদার নাম ধরে ডাকতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার আগে শুনতে পেলাম লোকটা বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি—তোমাকেও, তোমার দাদাকেও। ফল ভালো হবে না!'

আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'ও কী—ওরকম থুম মেরে বসে আছিস কেন? কার ফোন এসেছিল?'

কোনমতে ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। দেখলাম ও-ও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'ঘাবড়াস না। লোক থাকবে—পুলিশের লোক। বিপদের কোন ভয় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একবার যেতেই হবে কালকে।'

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। শুধু যে টেলিফোনটার জন্য তা নয়; কৈলাসবাবুর বাড়ির ভিতরের অনেক কিছুই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই লোহার রেলিং দেওয়া ছাত পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি, দোতলায় মার্বেলবাঁধানো অন্ধকার লম্বা বারান্দা, আর তার দরজার ফাঁক দিয়ে বার করা কৈলাসবাবুর বাবার মুখ। কৈলাসবাবুর দিকে ওরকম ভাবে চেয়েছিলেন কেন তিনি? আর কৈলাসবাবু বন্দুক হাতে ছাতে গিয়েছিলেন কেন? কীসের শব্দ পেয়েছিলেন উনি?'

ঘুমোতে যাবার আগে ফেলুদা একটা কথা বলেছিল—'জানিস, তোপসে—যারা চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে হুমকি দেয়—তারা বেশির ভাগ সময়ই আসলে কাওয়ার্ড হয়।' এই কথাটার জন্যই বোধ হয় শেষপর্যন্ত ঘুমটা এসে গেল।

পরদিন সকালে ফেলুদা কৈলাসবাবুকে ফোন করে বলল তিনি যেন নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকেন; যা করবার ফেলুদাই করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে?'

ফেলুদা বলল, 'কাল যে সময় গিয়েছিলাম, সেই সময়। ভালো কথা, তোর স্কুলের ড্রইং-এর খাতা, পেনসিল-টেনসিল আছে তো?'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'কেন, তা দিয়ে কী হবে?'

'আছে কিনা বল না।'

'তা তো থাকতে হবেই।'

'সঙ্গে নিয়ে নিবি। লিলি গাছের উল্টো দিকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তুই ছবি আঁকবি—গাছপালা, মেমোরিয়াল বিল্ডিং—যা হয় একটা কিছু। আমি হব তোর মাস্টার।'

ফেলুদার আঁকার হাত রীতিমত ভালো। বিশেষ করে, মাত্র একবার যে-মানুষকে দেখেছে, পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে মোটামুটি তার একটা পোর্ট্রেট আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা ফেলুদার

আছে। কাজেই ড্রইংমাস্টারের কাজটা তার পক্ষে বেমানান হবে না।

শীতকালের দিন ছোট হয়, তাই আমরা চারটের কিছু আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পৌঁছে গেলাম। সোমবার ভীড়টা আরও কম। তিনটে পেরামবুলেটারে সাহেবের বাচ্চাদের নিয়ে নেপালি আয়ারা ঘোরাফেরা করছে; একটা পরিবারকে দেখে মারোয়াড়ি বলে মনে হল; আর তা ছাড়া দু'-একজন বুড়ো ভদ্রলোক। এদিকটায় আর বিশেষ কেউ নেই। কম্পাউন্ডের মধ্যেই, কিন্তু গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে চৌরঙ্গীর দিকটায় একটা বড় গাছের তলায় দুজন প্যান্টপরা লোককে দেখলাম, যাদের দিকে দেখিয়ে ফেলুদা আস্তে করে আমায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল। বুঝলাম ওরাই হচ্ছে পুলিশের লোক। ওদের কাছে নিশ্চয়ই লুকনো রিভলবার আছে। ফেলুদার সঙ্গে পুলিশের কিছু লোকের বেশ খাতির আছে এটা জানতাম।

লিলি ফুলের সারির উল্টো দিকে কিছুটা দূরে খাতা-পেনসিল বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। এ অবস্থায় কি আঁকায় মন বসে? চোখ আর মন দুটোই অন্য দিকে চলে যায়, আর ফেলুদা মাঝে মাঝে এসে ধমক দেয়, আর পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে হিজিবিজি এঁকে দেয়—যেন কতই না কারেক্ট করছে! আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে এদিকে ওদিকে দেখে।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাছেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। লোকজন কমে আসছে, কারণ একটু পরেই বেশ ঠান্ডা পড়বে। মারোয়াড়িরা একটা বিরাট গাড়িতে উঠে চলে গেল। আয়াগুলোও পেরামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে রওনা দিল। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে আপিসফেরতা গাড়ির ভীড় আরম্ভ হয়েছে, ঘন ঘন হর্নের শব্দ কানে আসছে। ফেলুদা আমার পাশে এসে ঘাসের উপর বসতে গিয়েও বসল না। দেখলাম তার চোখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের দিকে। আমি সেইদিকে চেয়ে গেটের বেশ কিছুটা বাইরে রাস্তার ধারে একজন ব্রাউন চাদর জড়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ফেলুদা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কিছুক্ষণ ওই দিকে দেখে বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল 'দ্যাখ্‌'।

'ওই চাদর গায়ে দেওয়া লোকটাকে?'

'হুঁ।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই লোকটা যেন দশ হাতের মধ্যে চলে এল, আর আমিও চমকে উঠে বললাম, 'একী—এ যে কৈলাসবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!'

'হ্যাঁ। চল—নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছেন।'

কিন্তু আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গেটের বাইরে এসে কৈলাসবাবুকে আর দেখা গেল না।

ফেলুদা বলল, 'চল শ্যামপুকুর। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দেখতে পাননি, আর না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

ট্যাকসি পেলে ট্যাকসিই নিতাম, কিন্তু আপিস টাইমে সেটা সম্ভব নয়, তাই ট্রাম ধরার মতলবে চৌরঙ্গীর দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা দিয়ে পর পর লাইন করে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে এসে একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেটা ভাবলে এখনও আমার ঘাম ছুটে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলুদা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রায় আমাকে ছুঁড়ে রাস্তার একেবারে কিনারে ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেও একটা

লাফ দিল। পরমুহূর্তে, দারুণ স্পীডে আর দারুণ শব্দ করে একটা গাড়ি আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল।

'হোয়াট দ্য ডেভিল!' ফেলুদা বলে উঠল। 'গাড়ির নাম্বারটা...'

কিন্তু সেটার আর কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্য গাড়ির ভীড়ের মধ্যে সে গাড়ি মিলিয়ে গেছে। আমার হাতের খাতা-পেনসিল কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, তাই সেটা খুঁজে আর সময় নষ্ট করলাম না। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা ঠিক সময় বুঝতে না পারলে আমরা দুইজনেই নির্ঘাত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতাম।

ট্রামে ফেলুদা সারা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর মুখ করে রইল। কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসা কৈলাসবাবুকে ফেলুদা প্রথম কথা বলল, 'আপনি দেখতে পেলেন না আমাদের?'

ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'কোথায় দেখতে পেলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'কেন, আপনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাননি?'

'আমি? সে কী কথা! আমি তো এতক্ষণ শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় ছটফট করছিলুম—এই সবে মাত্র নীচে এসেছি।'

'তাহলে কি আপনার কোন যমজ ভাই আছে নাকি?'

কৈলাসবাবু কীরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'সেকী, আপনাকে সেদিন বলিনি?'

'কী বলেননি?'

'কেদারের কথা? কেদার যে আমার যমজ ভাই।'

ফেলুদা সোফার উপর বসে পড়ল। কৈলাসবাবুরও মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কেদারকে দেখেছেন? সে ওখানে ছিল?'

'উনি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না।'

'সর্বনাশ!'

'কেন বলুন তো? কেদারবাবুর কি ওই পাথরটার উপর কোন অধিকার ছিল?'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন। সোফার হাতলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা ছিল...তা ছিল। কেদারই প্রথম পাথরটা দেখে। আমি মন্দিরটা দেখি, কিন্তু দেবমূর্তির কপালে পাথর কেদারই প্রথম দেখে।'

'তারপর আর কী। একরকম আবদার করেই পাথরটা আমি নিই। অবিশ্যি মনে জানতুম ওটা আমার কাছে থাকলে থাকবে, কেদার নিলে ওটা বেচে দেবে, দিয়ে টাকাটা নষ্ট করবে। আর ওটার যে কত দাম সেটা আমি জেনেও কেদারকে জানাইনি। সত্যি বলতে কি, কেদার যখন বিদেশে চলে গেল, তখন আমার মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব এল। কিন্তু ওখানে হয়তো ও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তাই ফিরে এসেছে। হয়তো পাথরটাকে নিয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন কিছু ব্যবসা ফাঁদবে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফেলুদা বলল, 'এখন উনি কী করতে পারেন সেটা বলতে পারেন?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'জানি না। তবে আমার মুখোমুখি তো একবার তাকে আসতেই হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোই না, আর লিলি গাছের নীচে পাথর যখন রাখিনি, তখন

সে আসবেই।'

'আপনি কি চান আমি এখানে থেকে একটা কোন ব্যবস্থা করি?' .

'না। তার কোন প্রয়োজন হবে না। সে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর কথা যদি বলতে আসে, তাহলে ভাবছি পাথরটা দিয়েই দেব। আপনার কর্তব্য এখানেই শেষ। আপনি যে লাইফ রিস্ক করে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন, তার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনি বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, একটা চেক আমি দিয়ে দেব।'

ফেলুদা বলল, 'লাইফ রিস্কই বটে। একটা গাড়ি তো পিছন থেকে এসে প্রায় আমাদের শেষ করে দিয়েছিল!'

আমার কনুইটা খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা এতক্ষণ হাত দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ফেলুদা সেটা দেখে ফেলল।

'ওকী রে, তোর হাতে যে রক্ত!' তারপর কৈলাসবাবুর দিকে ফিরে বলল, কিছু যদি মনে না করেন—আপনার এখানে একটু ডেটল বা আয়োডিন হবে কি? এই সব ঘাগুলো আবার বড্ড চট্ করে সেপ্টিক হয়ে যায়।'

কৈলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ইস্—যা হয়েছে কলকাতার রাস্তাঘাট! দেখি, অবনীশকে জিজ্ঞেস করি।'

অবনীশবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডেটলের কথা জিজ্ঞেস করতেই উনি কেমন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যে এই দিন সাতেক আগেই আনলে। সে কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?'

কৈলাসবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওহো, তাই তো! এই দ্যাখ, খেয়ালই নেই। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে?''

ডেটল লাগিয়ে কৈলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ফেলুদা কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ট্রামের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, 'গণপতিদা'র কাছে একবার টেস্টম্যাচের টিকিটের কথাটা বলে যাই। এত কাছেই যখন এসেছি...'

কৈলাসবাবুর দুটো বাড়ি পরেই গণপতি চ্যাটার্জির বাড়ি। আমি ওর নাম শুনেছি ফেলুদার কাছে, কিন্তু দেখিনি কখনও। রাস্তার উপরেই সামনের ঘর, টোকা মারতেই গেঞ্জির উপর পুলোভার পরা একজন নাদুসনুদুস ভদ্রলোক দরজা খুলল।

'আরে, ফেলু মাস্টার যে—কী খবর?'

'একটা খবর তো বুঝতেই পারছেন।'

'তা তো বুঝছি, তবে সশরীরে তাগাদা না দিতে এলেও চলত। তোমার রিকোয়েস্ট কি ভুলি? যখন বলিচি দেবো তখন দেবোই।''

'আসার কারণ অবিশ্যি আরেকটা আছে। তোমার বাড়ির ছাত থেকে শুনিচি উত্তর কলকাতার একটা খুব ভালো ভিউ পাওয়া যায়। একটা ফিল্ম কোম্পানির জন্য সেইটে একবার দেখতে চাইছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দে! সটান সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি এদিকে চায়ের আয়োজন করছি।'

চারতলার ছাতে উঠে পুব দিকে চাইতেই দেখি—কৈলাসবাবুদের বাড়ি। একতলার বাগান থেকে ছাত অবধি দেখা যাচ্ছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আর তার ভিতরে

একজন লোক খুট্‌খুট্‌ করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালি চোখেই বুঝতে পারলাম সেটা কৈলাসবাবুর বাবা। ছাতের ওপর ওই যে চিলেকোঠা—তার জানালার দিকে দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা বোধহয় উল্টো দিকে।

দোতলার একটা বাতি জ্বলে উঠল। বুঝলাম সেটা সিঁড়ির বাতি। ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগাল। একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কে? কৈলাসবাবু। এতদূর থেকেও তার লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা দেখেই বোঝা যায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কৈলাসবাবুকে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ দেখি উনি ছাতে উঠে এসেছেন। আমরা দুজনেই চট্‌ করে একসঙ্গে নিচু হয়ে শুধু চোখদুটো পাঁচিলের ওপর দিয়ে বার করে রাখলাম।

কৈলাসবাবু এদিক ওদিক দেখে চিলেকোঠার উল্টোদিকে চলে গেলেন। তারপর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। কৈলাসবাবুকে জানালায় দেখা গেল। উনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভিতরে ভীষণ জোরে টিপ্‌ টিপ্‌ আরম্ভ হয়ে গেছে। কৈলাসবাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কৈলাসবাবু আবার ঘরের বাতি নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে গেলেন।

ফেলুদা শুধু বলল, 'গোলমাল, গোলমাল।'

ফেলুদার এরকম অবস্থায় আমি ওকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। অন্য সময় মাথায় চিন্তা থাকলে ও পায়চারি করে, কিন্তু আজ দেখলাম ও সটান বিছানায় শুয়ে সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রাত সাড়ে ন'টায় দেখলাম ও নোট বইয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। ও আবার এসব লেখা ইংরিজি ভাষায় কিন্তু গ্রীক অক্ষরে লেখে, আর সে অক্ষর আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু বুঝতে পারছিলাম যে, কৈলাসবাবুর বারণ সত্ত্বেও এই পাথরের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোতে রাত হয়েছিল বলেই বোধ হয় সকালে নিজে থেকে ঘুমটা ভাঙেনি—ভাঙল ফেলুদার ঠেলাতে।

'এই তোপ্‌সে ওঠ্‌ ওঠ্‌, শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কীসের জন্য।'

'ফোন করেছিলাম। কেউ ধরছে না। গন্ডগোল মনে হচ্ছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্‌সিতে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম শ্যামপুকুরের দিকে। গাড়িতে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা! আরেকটু আগে বুঝতে পারলে বোধ হয় গন্ডগোলটা হত না।'

কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে ফেলুদা বেল-টেল না টিপেই ভেতরে চলে গেল। অবিশ্যি দরজাটা যে খোলাই ছিল সেটাও আমাদের ভাগ্য। সিঁড়ি পেরিয়ে অবনীশবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছতেই চক্ষুস্থির! টেবিলের সামনে একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, আর তার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাতদুটো পিছনে জড়ো করে বাঁধা আর মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন অবনীশবাবু। ফেলুদা হুম্‌ড়ি দিয়ে পড়ে আধ মিনিটের মধ্যে দড়ি রুমাল খুলে দিতেই ভদ্রলোক বললেন, 'উঃ—থ্যাঙ্ক গড!'

ফেলুদা বলল, 'কে করেছে এই দশা আপনার?'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে বললেন, 'মামা! কৈলাসমামা! মামার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—সেদিন বলছিলাম না আপনাকে? ভোরে এসে বসেছি ঘরে—বাতি

জ্বালিয়ে কাজ করছিলাম। মামা ঘরে ঢুকেই আগে বাতি নিভিয়েছেন। তারপর মাথায় একটা বাড়ি। তারপর আর কিচ্ছু জানি না। কিছুক্ষণ হল জ্ঞান ফিরেছে—কিন্তু নড়তে পারি না, মুখে শব্দ করতে পারি না-উঃ!'

'আর কৈলাসবাবু?' ফেলুদা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'জানি না!'

ফেলুদা এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম তার পিছনে।

একবার বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে না দেখে, তিন ধাপ সিঁড়ি এক এক লাফে উঠে দোতলায় পৌঁছে ফেলুদা সটান কৈলাসবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাটের চেহারা দেখে মনে হল সেখানে লোক শুয়েছিল, কিন্তু ঘর এখন খালি। আলমারির দরজা দেখি হাঁ করে খোলা। ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে দেরাজ খুলে যে জিনিসটা বার করল সেটা মখমলের সেই নীল বাক্স। খুলে দেখা গেল ভিতরে সেই পাথর যেমন ছিল তেমনিই আছে।

এতক্ষণে দেখি অবনীশবাবু এসে হাজির হয়েছেন, তার মুখের অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেখেই ফেলুদা বলল, 'ছাতের ঘরের চাবি কার কাছে?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'সে-সে-সেতো মামার কাছে।'

'তবে চলুন ছাতে' —বলে ফেলুদা তাকে হিড়হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে ছাতে উঠে দেখি—চিলেকোঠার দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ। এইবারে দেখলাম ফেলুদার গায়ের জোর। দরজা থেকে তিন হাত পিছিয়ে কাঁধটা আগিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চার বার ধাক্কা দিতেই কড়াগুলো পেরেক সুদ্ধ উপড়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা ঝটাং করে খুলে গেল।

ভিতরে অন্ধকার। তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ক্রমে চোখটা সয়ে আসতে দেখলাম—এক কোণে অবনীশবাবুরই মত দড়িবাঁধা মুখবাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—ইনি কে? কৈলাস চৌধুরী, না কেদার চৌধুরী?

দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি...?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির। চিঠিটা বোধ হয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন—কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।....অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।'

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তাহলে কৈলাস চৌধুরী। ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরে জোর ছিল, তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে...এই চার দিনে...!'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'কিছু কথা তো বলতেই হবে—নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাত হবে কী করে—যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই তো ও আমাকে বন্দী করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে—নইলে গায়ের জোরে পারত না।''

'আর সেদিন থেকেই উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বসেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই, জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে একেবারে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে

একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে চাঁদার জঙ্গলের এক দেবমন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। বোধ হয় ভাবত—দুজনে যমজ ভাই—চোখে দেখে কোন তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য—এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া, রেক্‌লেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোন রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। এই সাতদিন আগে—গত মঙ্গলবার—বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই। তার কথা মনেই হয়নি। চাকরদের উপর চোটপাট করলুম—কোন ফল হল না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে চিঠি দিলাম। সেদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোন দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার—অন্তত বিশ হাজার! চাইল—রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দী করল। বলল যতদিন না টাকা দিই তদ্দিন ছাড়বে না—আর সে ক'দিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে—কেবল আদালতে যাবে না—অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, তাই আমাদের দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুম্‌কি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি থাকলেও বিপদ—তাই আবার টেলিফোনে হুম্‌কি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন!'

কৈলাস ভ্রূকুটি করে বললেন, 'কিন্তু, আমি ভাবছি, কেদার এ ভাবে হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে চলে গেল কেন। আমি তো কাল রাত অবধি ওকে টাকা দিতে রাজি হইনি। ও কি শুধু হাতেই চলে গেল?'

অবনীশবাবু যে কখন দুধ নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন তা লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ ভদ্রলোকের চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'খালি হাতে যাবেন কেন তিনি? আমার টিকিট—আমার মহামূল্য ভিক্টোরিয়ার টিকিট নিয়ে গেছেন তিনি।'

ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'সেকী—সেটা গেছে নাকি?'

'গেছে বই-কি! আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন কেদারমামা।'

'কত দাম যেন বলেছিলেন টিকিটটার?'

'বিশ হাজার!'

'কিন্তু—' ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নামিয়ে বলল, 'ক্যাটালগে যে বলছে ওটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।'

অবনীশবাবু মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মধ্যেও তো চৌধুরী বংশের রক্ত রয়েছে—তাই না? আপনিও বোধহয় একটু রঙ্ চড়িয়ে কথা বলতে ভালবাসেন?'

ভদ্রলোক এবার একেবারে ছেলেমানুষের মতো কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, ''কী করি বলুন! তিন বছর ধরে চার হাজার ধুলোমাখা চিঠি ঘেঁটেও যে একটা ভালো টিকিট

পেলাম না! তাও তো মিথ্যে বলে লোককে অবাক করে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়।''

ফেলুদা হো হো করে হেসে উঠে অবনীশবাবুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। আপনার কেদারমামাকে আপনি যে টাইটটি দিলেন, সেটার কথা ভাবলেই দেখবেন প্রচুর আনন্দ পাবেন।....যাক্ গে, এবার দমদম এয়ারপোর্টে একটা টেলিফোন করে দেখি। কেদারবাবু পালাবেন আন্দাজ করে আজ সকালে এয়ার ইন্ডিয়াতে ফোন করে জেনেছি আজই একটা বোম্বাই-এর প্লেনে ওঁর বুকিং আছে। পুলিশ থাকবে ওখানে, তাই পালাবার কোন রাস্তা নেই। ভাগ্যে তপেশের কনুই ছড়েছিল! ডেটলের ব্যাপারটাতেই আমার ওর উপর প্রথম সন্দেহ হয়।'

কেদারবাবুকে গ্রেপ্তার করতে কোন বেগ পেতে হয়নি, আর অবনীশবাবুও তাঁর পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা ফেরত পেয়েছিলেন। ফেলুদা যা টাকা পেল, তাই দিয়ে আমাদের তিনদিন রেস্টুর‍্যান্টে খাওয়া আর দুটো সিনেমা দেখার পরও ওর পকেটে বেশ কিছু বাকি রইল।

আজ বিকেলে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ফেলুদা, একটা জিনিস আমি ভেবে বার করেছি, সেটা ঠিক কিনা বলবে?'

'কী ভেবেছিস শুনি।'

'আমার মনে হয় কৈলাসবাবুর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেদারবাবু কৈলাসবাবু সেজে বসে আছেন, আর সেই জন্যেই সেদিন ওর দিকে কটমট করে চাইছিলেন। বাবারা নিশ্চয়ই নিজেদের যমজ ছেলেদের মধ্যে তফাত ধরতে পারে—তাই না?'

'এক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, তাহলেও, তোর ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমি তোকে সম্মানিত করছি'—এই বলে ফেলুদা আমার প্লেট থেকে একটা জিলিপি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

শার্লক হেবো ফিরে এলেন

নারায়ণ সান্যাল

শার্লক হেবোকে তোমরা চেন না। সে-দোষ তোমাদের নয়, আমার। আমি একসময় শার্লক হেবোর কীর্তিকাহিনী লিখে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখতাম—ডক্টর ওয়াটসন যেমন বিখ্যাত হয়েছিলেন আসল শার্লক হোমস্-এর গল্প লিখে। তোমাদের দাদা দিদিরা যখন তোমাদের বয়সী তখন কিশোর শার্লক হেবোর কিছু কিছু কাণ্ডকারখানার কথা শুকতারায় লিখেছিলাম। তারপর নানান ধান্দায় তার কথা ভুলে বসে আছি। হেবো তখন হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্র, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার আগে আর গোয়েন্দাগিরিতে সে হাত দেবে না। তা সে প্রতিজ্ঞা হেবো রেখেছিল; রীতিমতো স্কলারশিপ নিয়ে পাস করে এখন সে প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

হেবো আমার ভাইপো। সে জানত, তার কীর্তিকাহিনী নিয়ে আমি গল্প লিখতে চাই, কিন্তু তার মতিগতি দেখেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো? হেবোর মাথায় গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপেছিল। পড়াশুনা সে কিছুই করত না—দিবারাত্র মাপবার ফিতে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বাইনোকুলার নিয়ে সে চোর-ডাকাত ধরে বেড়াত। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হত—শেষে যাদের জন্য গোয়েন্দা-গল্প লিখব তারাও না হেবোর মতো লেখাপড়া চাঙে তুলে ওই নিয়ে মাতে! সম্প্রতি আমার সে-ভুলটা হেবো ভেঙে দিয়েছে। সে এখন আর বাচ্চা নয়, রীতিমতো কলেজে-পড়া ছেলে। আজকাল আমার সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। একদিন আমাকে এসে বললে, ছোটকাকু, তোমার ধারণাটা কিন্তু ভুল। বাজে গোয়েন্দা-গল্প পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ভালো ডিটেকটিভ-গল্পে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে, দৃষ্টি গভীরতর হয়, বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। গোয়েন্দা-গল্প মানে শুধু খুন-জখম নয়, গোয়েন্দা-গল্প মানে একটা বড় জাতের ধাঁধা। গোয়েন্দা তার সমাধান দেবার আগে পাঠককে সমাধানে পৌঁছাতে হবে। সমাধানটা থাকবে পাঠকের চোখের সামনে, অথচ তার নজর পড়বে না!

আমি বলি, কী রকম? একটা উদাহরণ দাও দেখি।

হেবো বলে, আপনি হিচ্‌ককের 'রিয়ার উইন্ডো' ফিল্মটা দেখেছেন। ধরুন, আমার অবস্থাও ওইরকম। একটা অত্যন্ত রহস্যজনক জিনিস ক'দিন ধরে লক্ষ করছি। অবস্থাটা খুলেই বলি। আগেই বলে রাখছি, এটা একটা গোয়েন্দা-গল্প। একটা রহস্যে পৌঁছে দিয়ে আমি থামব, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে সমাধানটাও জানিয়ে যাব। তুমি আমার প্রতিটি কথা মন

দিয়ে শোন, দেখ আর পাঁচটা কথার সঙ্গে আমি যে সমাধানটা জানিয়ে গেছি সেটা ধরতে পার কি না :

একটা কালো মোটা আর অত্যন্ত বেঁটে লোক সামনের ওই ফ্ল্যাট-বাড়িটায় থাকে। একমুখ চাপ দাড়ি—দিবারাত্র গগল্‌স্ পরে থাকে—দেখলেই মনে হয় লোকটা পাকা ক্রিমিনাল। ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রকাণ্ড; নয়তলা উঁচু। লোকটা থাকে আটতলায়। দু-দুটো অটোমেটিক লিফ্‌ট আছে। সন্দেহজনক লোকটাকে আমি আমার ঘর থেকে দিবারাত্র নজরে নজরে রেখেছি, বাইনোকুলারটা দিয়ে তাকে সবসময় লক্ষ করি। যতদূর শুনেছি লোকটা কোন কারখানায় কাজ করে—কখনও দিনের বেলা তার ডিউটি থাকে, আবার কখনও বা রাতের বেলায়। দিনের বেলা দেখেছি লোকটা লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। কখনও বিকালে, কখনও সন্ধ্যারাত্রে ফিরে আসে। হাতে সব সময়েই একটা ফোলিও ব্যাগ। চুপচাপ লিফ্‌টে করে উঠে আসে আটতলায়। লিফ্‌ট-এর পাশেই ওর ঘর। চাবি খুলে ঢুকে যায় ঘরে। কিন্তু যেদিন ওর নাইট ডিউটি থাকে সেদিন ফিরতে ওর রাত দুটো বেজে যায়। সেদিন কিন্তু সে সোজা আটতলায় উঠে আসে না। ওঠে ছয়তলা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে আটতলায় উঠে আসে। আমি আরও লক্ষ করেছি, ঐ ছয়তলা থেকে আটতলায় সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সে আমাকে খুঁজতে থাকে—দেখে, আমি দেখছি কি না। আমার উপস্থিতি টের পেলেই কেমন যেন ধরা পড়ে যাবার মত অবস্থা হয়। একছুটে বাকি সিঁড়ি কটা ভেঙে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

মাস-তিনেক ধরে ক্রমাগত লক্ষ করছি ব্যাপারটা। এ তিন মাসে সে একশো সতের বার নেমেছে এবং দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে সাকুল্যে পঁচাশিবার উঠেছে। প্রতিবারই লিফ্‌ট করে। নামা এবং ওঠা। আর বাকি বত্রিশ বার সে ফিরেছে গভীর রাত্রে—তার মধ্যে একত্রিশ বারই সে লিফ্‌ট বেয়ে উঠেছে ছয়তলায়, বাকি দুইতলা হেঁটে। আশ্চর্য—মাত্র একবার, সেদিন ওই রাত দুটোর সময়েও আর একজন লোক তার সঙ্গে ছিল—সেদিন সে ছয়তলায় নামেনি। নিতান্ত ভালোমানুষের মতো আটতলায় লিফট-এ করে উঠে গিয়েছিল। এর কারণটা কী হতে পারে বলুন তো?

আমি বলি, নিশ্চয় ছয় বা সাততলার কোন ঘরের দিকে ওর নজর আছে। গভীর রাত্রে সে হয়তো কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছয়তলায় লিফ্‌ট-টা ছেড়ে দেয়। তাই সে লক্ষ করে দেখে তোমাকে। বাইনোকুলার-চোখে তোমাকে এ-বাড়িতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে পালিয়ে যায়।

হেবো বললে, এই দেখ, তোমার মনের মধ্যে পাপ আছে। সমাধান তোমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি সন্দিগ্ধমনা হয়ে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ।

আমি বলি, কী রকম? আর কোন সমাধান হতে পারে? কেন লোকটা গভীর রাত্রে বত্রিশ বারই শেষ দুতলা হেঁটে উঠল?

হেবো বলল, বাত্রিশবার নয় ছোটকাকু, একত্রিশবার....

—হ্যাঁ, হ্যাঁ একত্রিশবার, কিন্তু একবার তো তার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল। সেদিন তো আর.....নাঃ! পারলাম না। বলে দাও?

আমি প্রথমেই বলেছি, দুটি লিফ্‌টই অটোমেটিক। আর বলেছি, লোকটা অত্যন্ত বেঁটে। আসলে বেচারি ছয়-নম্বর বোতাম পর্যন্ত হাত পায়। মাঝরাত্রে অটোমেটিক লিফ্‌ট-এ বেচারি একা একা ওঠে। কাকে আর বলবে বলুন—'আট নম্বরের বোতামটা যদি কাইন্ডলি—'

আমি হো হো করে হেসে উঠি।

ওর এই গল্প শোনার পরেই মনস্থির করলাম। হেবোর কীর্তিকাহিনীগুলি তোমাদের জানানো উচিত। তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।

হেবোর গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। অনেকবার অনেককে ঐ গল্প শুনিয়ে ঠকিয়েছি। লক্ষ করে দেখেছি— ওই 'অত্যন্ত বেঁটে' আর 'অটোমেটিক লিফ্‌ট' শব্দ দুটি কেউ খেয়াল করে না। লোকটার গগল্‌স্‌, ফোলিও ব্যাগ, সন্দিগ্ধ চলাফেরায় সকলেই বোকা হয়। একদিন অফিসে আমার সহকর্মীদের এই গল্পটি শোনাবার পর সুধীরবাবু বললেন, আচ্ছা! শার্লক হেবো তা হলে আপনার ভাইপো?

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, আপনি শার্লক হেবোকে চেনেন?

চাক্ষুষ চিনি না, তবে তার কিছু কীর্তিকাহিনী এক সময় শুকতারা পত্রিকায় পড়েছিলাম। একদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আসব।

আমি বলি, সে তো আমার সৌভাগ্য। শুধু হেবোর নয়, আমারও।

সুধীরচন্দ্র বলেন, না, নরেনবাবু—এ প্রস্তাবের পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে আমার জীবনে। একটা বিরাট রহস্য আছে, জানলেন—তার সমাধান হয়নি। আজ দুবছর ধরে ক্রমাগত চিন্তা করছি; কোনও কূলকিনারা করতে পারিনি। তা পারলে, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারতাম।

আমি হেসে বলি, কী ব্যাপার? কোনও গুপ্তধনের সংকেত খুঁজছেন? সেই—'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা?'

সুধীরবাবু একটুও হাসলেন না। চোখ দুটি তাঁর ধক করে জ্বলে উঠল। কাছে সরে এসে বললেন, এক্‌জ্যাক্টলি নরেনবাবু! ঠিক তাই! আমি এক গুপ্তধনের মালিক, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছি না।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। এ-যুগে আবার অমন গুপ্তধনের সন্ধান কেউ পায় নাকি? কিন্তু সুধীরবাবুর তো মাথায় ছিট নেই—দিব্যি গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ; তিনি এমন উৎকট রসিকতা করতে যাবেন?

প্রশ্ন করি, কী ব্যাপার বলুন তো?

সুধীরবাবু বলেন, এখানে নয়। শনিবার অফিস ছুটির পর একসঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আপনার ভাইপোকে বাড়িতে থাকতে বলবেন। একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলও আপনাদের দেখাব। আমার প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্রের একটি বিচিত্র দিনপঞ্জিকা।

শনিবার অফিস ছুটির পর সুধীরবাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। হেবোকে বলাই ছিল। সে কলেজ থেকে ম্যাটিনি শোতে যায়নি। সোজাই বাড়ি চলে এসেছে। হেবোর সঙ্গে পরিচিত হবার পর সুধীরবাবু বললেন, হেবো, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি আজ এসেছি। তুমি যে নরেনবাবুর ভাইপো এ-কথা জানা থাকলে আরও আগেই আসতাম। তোমার কিছু কিছু কাণ্ডকারখানা আমি অনেক অনেকদিন আগে শুকতারায় পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে পারলে তুমিই এর সমাধান করতে পারবে—

—সমস্যাটা কী জাতের? খুনের কিনারা?

—না বাবা, হেবো, খুন জখম নয়। আমি ছা-পোষা মানুষ। তবু ঘটনাচক্রে একটা গুপ্তধনের অধিকার পেয়েছি, অথচ তার চাবিকাঠিখানি পাইনি।

—গুপ্তধন! কার গুপ্তধন? —হেবো ঘনিয়ে আসে।

সুধীরচন্দ্র বলেন, আইনত তার মালিক আমি—যদি অবশ্য খুঁজে পাই।

হেবো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, সব কথা খুলে বলুন। কোনও তথ্যই অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দেবেন না।

সুধীরচন্দ্র যে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বিবৃত করলেন তা এই:

সুধীরচন্দ্র মধ্যভারতের এক বর্ধিষ্ণু জমিদারের শেষ বংশধর। তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুর্লভচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিচিত্র ঘটনাচক্রে এক গুপ্তধন আবিষ্কার করে বসেন। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ সুবেদার। মধ্যপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজসৈন্য তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করে। সে-যুদ্ধে রাজা নিহত হন। বস্তুত নির্বংশ হন। ইংরেজসৈন্য বহু আয়াসেও কিন্তু রাজার অতুল সম্পত্তির হদিস পায় না। দুর্লভচন্দ্র ছিলেন একজন দুর্লভ-প্রতিভার মানুষ। যেমন ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল কূটবুদ্ধি। তিনি ওই পরাজিত রাজার প্রাসাদে তাঁর একটি দিনপঞ্জিকা আবিষ্কার করেন, এবং সেই সূত্রেই রাজার অতুল সম্পদের সন্ধান পান। ক্রমে দুর্লভচন্দ্র নিজেই হয়ে পড়েন বিরাট জমিদার। এলাহাবাদ শহরের মাইল খানেক দূরে যমুনার ধারে প্রকাণ্ড একটি প্রাসাদ বানান। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হলেও দুর্লভচন্দ্রের পারিবারিক জীবনটা সুখের হয়নি। প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই স্ত্রী মারা যান এবং সেই প্রথম সন্তানও মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মারা যায়। দুর্লভচন্দ্র তাঁর একমাত্র পৌত্র সুবলচন্দ্রকে নাবালক বয়সেই বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সুবল বিলাতেই লেখাপড়া শেখেন। দাদুর মৃত্যুর টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি যুবা পুরুষ। শোনা যায় দুর্লভচন্দ্রও তাঁর বিষয়সম্পত্তি ব্যাঙ্কে রেখে মারা যাননি। সুবলচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখেন ব্যাঙ্কে কোনও টাকা-কড়ি নেই। তিনিও নাকি ওই দুর্লভচন্দ্রের একটি দিনপঞ্জিকা থেকে সন্ধান পান বৃদ্ধ কোথায় টাকাকড়ি পুঁতে রেখে গেছেন। কী-ভাবে তিনি ও গুপ্তধনের সন্ধান পান তা জানা যায় না। এই সুবলচন্দ্রও ছিলেন পণ্ডিতব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন আমাদের সুধীরবাবুর পিতামহ। মজা হচ্ছে এই, সুবলচন্দ্র যখন মারা যান তখন সুধীরবাবুর বাবাও ছিলেন বিদেশে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখেন এবারও ব্যাঙ্কের পাশবইতে সম্পত্তি আছে নিতান্ত সামান্য। সুবলচন্দ্র নিশ্চয় কোথাও তাঁর সোনা-দানা-হীরা-জহরত পুঁতে রেখে গেছেন—কিন্তু কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। গুপ্তধন তো দূরের কথা, এবার সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকাই উদ্ধার করা যায়নি। বাড়িটা প্রায় একশ বিঘা জমির চৌহদ্দিতে। সাবেক আমলের ফুলের বাগান, পুকুর, মন্দির নিয়ে প্রকাণ্ড এলাকা। আন্দাজে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে দু-পুরুষ ধরে। কিন্তু গুপ্তধনের কোন সন্ধান মেলেনি। সারা চৌহদ্দিটাই কোপানো হয়েছে। মোহর পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে শুধু আলু।

: আলু! মানে? —অবাক হয়ে হেবো প্রশ্ন করে।

সুধীরবাবু বলেন, মাটিটা যখন কোপানোই হল তখন আর সেটা ফেলে রেখে কী লাভ? আলু চাষ করা হত বছর বছর! এতদিনের বাড়িঘর সব ভেঙে গেছে। সবটাই জঙ্গল হয়ে গেছে। তবু জমিটা আমরা দু-পুরুষ ধরে বিক্রি করতে পারিনি। বেচলে আজও ভালো দাম পাওয়া যায়, কিন্তু তা হলে গুপ্তধনও যে বেহাত হয়ে যাবে।

হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের কোনও দিনপঞ্জিকা, বা কাগজপত্র কি পাওয়া যায়নি?

—কাগজপত্র প্রচুর আছে। দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র—কিন্তু দিনপঞ্জিকা বা ডায়েরি বলতে যা বোঝায়, তা নেই। বাবার বিশ্বাস ছিল, এবং আমারও তাই ধারণা—কোন নির্দেশ রাখলে দাদু নিশ্চয়ই তা একটি স্বহস্তে লিখিত দিনপঞ্জিকাতেই রাখতেন। সেটাই আমাদের বংশের ঐতিহ্য। রাজা সাহেবের সম্পত্তির হদিস দুর্লভচন্দ্র পেয়েছিলেন তাঁর দিনপঞ্জিকায়। ফলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, সুবলচন্দ্রের হস্তাক্ষর আপনি চিনতে পারবেন?

—নিশ্চয়।

হেবো বলে, এ রোগের চিকিৎসা দূর থেকে করা সম্ভব। সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। আপনার দাদু নিশ্চয়ই একটি ডায়েরি রেখে গেছেন, সেটা আপনারা খুঁজে পাননি।

সুধীরবাবুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন, ঘর-দোরের যা অবস্থা তাতে এতদিন পরে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

হেবো বললে, আচ্ছা রাজা-সাহেবের কিংবা দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা আপনি দেখেছেন?

—রাজা সাহেবেরটা দেখিনি, তবে দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটা আমার কাছে এখানেই আছে। তোমাকে এনে দেখাব। তার শেষ দিকে একটা ধাঁধা আছে, যেটার সমাধান করে সুবলচন্দ্র গুপ্তধনের উদ্ধার করেন। অবশ্য কেমন করে তা করেন, তা আজও আমি জানি না। আমার কাছে সেটা আজও ধাঁধার পর্যায়ে।

—বেশ, সেটাই আমাকে এনে দেখান। চোর-ডাকাত কিছু কিছু ধরেছি, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধারের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথের 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা' ছাড়া। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা এনে দিন। আগে দেখি, সে ধাঁধাটার সমাধান করতে পারি কি না।

সুধীরবাবু বললেন, বলছ, এনে দেব; কিন্তু সেটা তো পণ্ডশ্রম। আসলে তোমাকে যেতে হবে আমাদের দেশে। সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে। পুজার ছুটিতে।

হেবো বললেন, না পণ্ডশ্রম নয়। দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটার সমাধান করে একটু হাত পাকিয়ে নিই প্রথমে।

পরদিন সুধীরবাবু দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাটি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। হাতে তৈরি কাগজে, মানে হ্যান্ড-মেড-পেপারে পুঁথির আকারে বইটি লেখা। দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স শতখানেক বছর। পাতাগুলো বাঁধানো নয়। পুঁথির পৃষ্ঠার মতো সযত্নে সাজানো। পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া নেই; কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাথায় প্রথমেই দুর্লভচন্দ্র তারিখটা বসিয়েছেন। ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা সাজানোতে কোন অসুবিধা নেই। কালো কালিতে গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে খাগের কলমে লেখা।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। হেবো সকাল থেকে সেই পুঁথি নিয়ে পড়েছে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে। দিনপঞ্জিকার শুরু হয়েছে ৩।৮।১৮৫২ থেকে; আর শেষ হয়েছে ৫।৫।১৮৬২-এ। শেষ তিনখানি পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্র বর্ণনা বলেছেন, তিনি কীভাবে রাজা সাহেবের লুকানো গুপ্তধনের উদ্ধার করেন এবং কীভাবে নিজেও তা লুকিয়ে রেখে যান। তোমরা যাতে হেবোর মতো এ সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারো, তাই সেই দিনপঞ্জিকার শেষ তিনখানি পৃষ্ঠা হুবহু নকল করে দিলাম:

বৃহস্পতিবার, ৩রা জুন, ১৮৬২

অতঃপর একদা দুর্গের পতন হইল। পরিখা অতিক্রম করতঃ ইংরাজসৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীবৎ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সূর্যাস্তের পূর্বেই রাজা সবংশে নিহত হইলেন। মেজর ম্যাকফার্লং তৎপরে দুর্গাধীপের পদ গ্রহণ করতঃ আদেশ জারী করিলেন সিপাহীগণ দুর্গের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, প্রতিটি প্রত্যন্তদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুক। আদেশ পালিত হইল, পরন্তু রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যের—হীরা মুক্তা রত্নরাজির সন্ধান কেহই পাইল না। সর্ব্বশেষে দুর্গাধীপ বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপে বিরত হইলেন। পরন্তু আমার হৃদয় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অর্ণবের ন্যায় অশান্তই রহিয়া গেল। আমি সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে থাকি: ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এত অল্প সময়ে রাজা কেমন করিয়া ঐ রত্নরাজি লুক্কাইত করিলেন? ঐ সময়ে রাজা-সাহেবের

দিনপঞ্জিকাটির প্রতি নজর পড়িল। তাহা সর্ব্বচক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়াছিল। আমার সন্দেহ হইল, হয়তো রাজা-সাহেব ঐ দিনলিপিতে এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। আমি সেটি যত্ন সহকারে পাঠ করিতে থাকি। দিনপঞ্জিকার সর্ব্বত্র সহজ ও সরল ভাষা; শুধুমাত্র শেষ পৃষ্ঠাটির শেষ অনুচ্ছেদটুকু সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য।

উক্ত শেষ পৃষ্ঠার প্রথমেই রাজা-সাহেব তাঁহার ইষ্টদেবী ৺বিমলার প্রতি একটি প্রার্থনাবাণীর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তৎপরেও কিছুটা বোঝা যায়; কিন্তু শেষ অংশ সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। রাজা-সাহেবের ঐ দিনপঞ্জিকার ঐ অংশটি আমি হুবহু নকল করিয়া দিতেছি:

৺বিমলাদেব্যৈঃ নমঃ

নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা

তস্যাদর্শন মাত্রেণ বিদ্যাবান্ জায়তে নরঃ ।।

অদ্য আমার ঘোর দুর্দ্দিন। প্রাতে সভারম্ভে সর্ব্বপ্রথম সভাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব পাঠের প্রস্তাব করিলেন। প্রথম শ্লোকটি সবেমাত্র পাঠ করিয়াছেন—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' অমনি ভগ্নদূত আসিয়া সংবাদ দিল সেনাপতি বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন—ইংরাজসৈন্য পার্ব্বতীপুরের দুর্গ বিচূর্ণ করিয়া অতঃপর এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ হইল। আত্মরক্ষায় যত্নবান হইলাম। আমি মা ৺বিমলার ভক্ত। মৃত্যুকে ভয় পাই না। পরন্তু স্ত্রীপুত্র পরিজনদিগের কী ব্যবস্থা করিব? একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী 'বিভাপন' গ্রামে আমার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করিলে তাহারা রক্ষা পাইবে। পরন্তু আমার অমূল্য রত্নরাজির কী ব্যবস্থা করিব? তাহাও তৎক্ষণাৎ অপসারিত করিলাম। কোথায় তাহা রাখিলাম তাহা জানি শুধু আমি, আমার একান্ত সহচর লক্ষ্মণদেব, এবং মা ৺বিমলা। পরন্তু অদ্যকার যুদ্ধে আমি এবং লক্ষ্মণদেব দুইজনেই নিহত হইতে পারি। তাই আমার ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগের উদ্দেশে এই সাবধানবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। অবধান কর:

> ''শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলের প্রথম সারির প্রথম চারিটি সৈন্যের শিরশ্ছেদ করিবে এবং কবন্ধগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বিপথগামী করিবে। দ্বিতীয় সারির সৈন্যদলের প্রথম চারিটি সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম সৈন্যকে আক্রমণ কর। পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকদ্বয়কেও সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।''

রাজা-সাহেবের দিনপঞ্জিকার ঐ শেষ উপদেশটি লইয়া আমি নিরন্তর চিন্তামগ্ন থাকিতাম। সৈনিকদের শিরশ্ছেদ করার পর কবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাহাদের বিপথগামী করা যায়? তাহা ভিন্ন ঐ সৈন্যদের কাটাকাটি করিয়া কী প্রকারে গুপ্তধনের সন্ধান সম্ভব একথা আমার বোধগম্য হইল না:

শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৮৬২

দীর্ঘদিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে একদিবস বিদ্যুৎচমকের ন্যায় আমার নিকট ঐ গূঢ়-সঙ্কেতের অর্থ প্রতীয়মান হইল। রাজা-সাহেব আদৌ প্রলাপোক্তি করেন নাই। অতি সুকৌশলে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের হিত্যার্থে গুপ্তধনের নির্দ্দেশ ঐ সাঙ্কেতিক ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এইভাবে সমাধানে উপস্থিত হইলাম: রাজা-সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য গুপ্তধনের অবস্থান জ্ঞাপন করা। নিঃসন্দেহে তাহা ভাষার মাধ্যমে করিতে হইবে। ভাষার মৌল উপাদান বাক্য এবং বাক্য শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টির দ্বারা নির্মিত। সুতরাং রাজা-সাহেব কিছু 'অক্ষর' খুঁজিতেছেন। এদিকে দেখিতেছি নির্দেশে কোনও সৈন্যের শিরশ্ছেদ

করিয়া, কবন্ধগুলি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। শিরশ্ছেদের পর কবন্ধ ত্যাগ করিলে 'মুণ্ড' পড়িয়া থাকে। সম্ভবতঃ তিনি কোনও কোনও পদের প্রথম অক্ষরগুলি গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। এস্থলে প্রথম সারির সৈন্য বলিতে সর্বপ্রথমে লিখিত ঐ-বিমলাদেবীর প্রসঙ্গে শ্লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার প্রথম চারিটি সৈনিক—অর্থাৎ প্রথম চারিটি শব্দ হইতেছে 'নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা'। তাহাদের শিরশ্ছেদ করতঃ অর্থাৎ প্রথম চারিটি অক্ষর গ্রহণ করিয়া কবন্ধ ত্যাগ করিলে পাই 'ন-প-ভা-বি'। পরবর্তী নির্দ্দেশ এই চারিটি অক্ষরকে বিপথগামী করিতে হইবে, অর্থাৎ বিপরীত দিক হইতে পাঠ করিতে হইবে। উল্টা করিয়া সাজাইলে পাইতেছি—'বিভাপন'। সেটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম—রাজা-সাহেবের শ্বশুরালয়। বুঝিলাম, গুপ্তধন ঐ গ্রামেই সংরক্ষিত। কিন্তু গ্রামের কোথায়? কোন প্রান্তে? পুনরায় দেখিতেছি রাজা-সাহেব বলিয়াছেন দ্বিতীয় সারির সৈন্যদল, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকটির '—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ' প্রথম চারিটি শব্দকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম শব্দটিকে আক্রমণ করিলে পাই—'নগাধিরাজ'। আশ্চর্য্য! ঐ বিভাপন গ্রামে একটি শিবমন্দির বিরাজমান, যাহার বিগ্রহের নাম নগাধিরাজ! কূটচক্র ভেদ করিয়া আমার সর্ব্বাবয়বে রোমাঞ্চ হইল। অতঃপর মেজর ম্যাকফার্লন সাহেবের নিকট দিবসত্রয়ের নিমিত্ত অনুপস্থিতির অগ্রিম আর্জ্জি পেশ করিলাম। বলিলাম, পার্শ্ববর্তী গ্রামে আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। ছুটি মঞ্জুর হইল। আমি একাকী ঐ বিভাপন গ্রামে উপনীত হইলাম। নগাধিরাজ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুই দিবস বৃথা অন্বেষণ করিলাম। কোনও সংকেত দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় স্মরণ হইল—রাজা সাহেবের আরও একটি নির্দেশ ছিল, যাহা এতাবৎকাল আমি গ্রাহ্য করি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'পরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সৈন্যদ্বয়কে সম্পূর্ণ অবহেলা করিও না।' সেই দুইটি শব্দ হইতেছে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি' অর্থাৎ উত্তর দিকে আছে। 'বিভাপন' গ্রামের নির্দেশ পাইয়াছি 'নগাধিরাজ' মন্দিরের নির্দেশ পাইয়াছি, এখন নির্দেশ পাইলাম—'উত্তর দিকে আছে।' আমি নগাধিরাজ মন্দির হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে শুরু করিলাম। লক্ষ হইল, সেদিকে গ্রাম্য পথ নাই—বিজন অরণ্য! তাহা হউক। আমি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এক্ষণে দেখিলাম—ঘনপত্রগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে সম্প্রতি মনুষ্যাগমনের চিহ্ন রহিয়াছে। দুই-একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া যেন কিছুদিন পূর্বেই কেহ এ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অরণ্যের বিপরীত প্রান্তে কোনও গ্রাম নাই, যমুনার তট। যমুনাতে যাইবার অসংখ্য পায়েচলা পথ রহিয়াছে। ফলে অরণ্য-অভ্যন্তরে যে প্রবেশ করিয়াছিল সে ঐ পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার অর্থ সে গভীর অরণ্যে কোন কিছু লুক্কায়িত রাখিতে গিয়াছিল। ছিন্ন বৃক্ষশাখার সঙ্কেত-চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অতিক্রম করিলাম। তৎপরে একটি উন্মুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এই স্থান অরণ্যের বাহির হইতে কিছুতেই লক্ষ্য হইবে না। দেখিলাম, প্রায় চারিহস্ত পরিমিত বর্গক্ষেত্রে লতাগুল্মাদি পরিষ্কার করা হইয়াছে। সে-স্থলে কে বা কাহারা একটি গর্ত্ত মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়াছে। আমার রোমাঞ্চ হইল। অনুধাবন করিলাম, গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছি! দিবাভাগে খনন করিতে সাহসী হইলাম না। স্থানটি অন্তরে চিহ্নিত করিয়া অরণ্য হইতে নির্গত হইলাম। লোকালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি খনিত্র সংগ্রহ করিয়া নগাধিরাজ মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। প্রথম প্রহরে শিবাকুলের সঙ্কেত পাইয়া নগাধিরাজ মন্দিরে প্রণাম পূর্ব্বক আমি খনিত্রসহ পুনরায় অকুস্থলে পুনরাগমন করিলাম। তিন দণ্ডকাল নিরন্তর কায়িক পরিশ্রমে মনুষ্যদেহ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিতে আমার দেহে শ্রমজল নির্গত

হইল। তৎপরে কোন কঠিন ধাতব পদার্থে আমার খনিত্র প্রতিহত হইল। একটি মঞ্জুষা পাইলাম। তাহা উন্মোচন করিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে রাজা সাহেবের অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি ঝলমল করিয়া উঠিল। আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম। আমি এক্ষণে অতুল বৈভবের অধিকারিণী হইয়াছি। এক্ষণে আমার সমস্যা এই অতুল ঐশ্বর্য্য সমভি—

শনিবার, ৫ই জুন ১৯৬২

ব্যাহারে কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব? কী প্রকারে হীরামুক্তা-মাণিক্য মোহর ও তঙ্কায় রূপান্তরিত করিব? যদ্যপি তাহা সঙ্গোপনে করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে শুধু আমি নহি, অস্মদবংশীর অধস্তন সপ্তপুরুষ শতাধিক বৎসরকাল বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। রাজা-সাহেব আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। আমিও চোর-তস্কর হস্তলাঘবদিগের এবং স্বার্থলোলুপ আত্মীয় পরিজনের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আমার এ গুপ্তধন একই কৌশলে লুক্কায়িত রাখিব। ঈশ্বর আমাকে একহস্তে অপরিমেয় সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপর হস্তে আমার দুর্ভাগ্যের পশরাও পূর্ণ করিয়াছেন। অলৌকিকভাবে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারি নাই। প্রথম সন্তান প্রসব করিতেই ধর্মপত্নী লোকান্তরিত হইলেন। আমার একমাত্র স্নেহের পাত্র, একমাত্র বংশধর কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র আশৈশব বিলাতেই রহিয়াছে। তাহাকে এই বৃদ্ধের বক্ষপঞ্জরে আবদ্ধ করিবার সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত। আমার সমস্ত জীবনে একটি সত্য প্রণিধান করিয়াছি: বিত্তবানদিগের সন্তানেরা অধিকাংশই বিপথগামী হয়। যেহেতু পৈত্রিক সম্পত্তি স্বোপার্জিত নহে তাই তাহার প্রতি কোনও মমত্ব জন্মে না। এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে অধিকাংশ বিত্তবানের পরিবারেই তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য 'বাবু-কালচার' জঘন্যরূপে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। এজন্য স্থির করিয়াছি, আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমিও রাজাসাহেবের ন্যায় লুক্কায়িত রাখিয়া যাইব। এই দিনপঞ্জিকাতেই রাখিয়া যাইব বজ্রকূট সমস্যা-সমাকীর্ণ আমার নির্দেশ। আমার দেহান্তে শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র যদি এই সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই সে ঐ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। নচেৎ নহে। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের প্রতি আরও নির্দেশ দিতেছি, যদ্যপি সে এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়, সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলে সেও যেন অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহার পুত্র পৌত্রদিগের জন্য সমস্যা-সমাকীর্ণ গুপ্তধন রাখিয়া যায়। এ সব সহজলভ্য নয়। প্রতিটি পুরুষেই ইহা স্বোপার্জিত হওয়া চাই। অতঃপর শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র অবধান কর:

সপ্তকূপ গবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ

= দশ আলোকবর্ষ।

ধ্রুব-নক্ষত্র তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করিতে হইবে। ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান

'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে।

তুলাদণ্ড: এক আলোকবর্ষ = একমিমি।

ধ্রুবসত্য লাভে সপ্তঋষির দূরত্ব:

ক্রতু =	৪৯ আলোকবর্ষ	ক্রতু-অত্রি =	৪৪ আলোকবর্ষ।
পুলহ =	৭৯ আলোকবর্ষ	অঙ্গিরা-পুলস্ত্য =	৪৪ ঐ
অত্রি =	৫২ ঐ	ক্রতু-পুলস্ত্য =	৪৬ ঐ
অঙ্গিরা =	৬৭ ঐ	অঙ্গিরা-বশিষ্ঠ =	২০ ঐ
পুলস্ত্য =	৮০ ঐ	বশিষ্ঠ-মরীচি =	৩০ ঐ
বশিষ্ঠ =	৭৮ ঐ	পুলস্ত্য-মরীচি =	৮০ ঐ

তদুপরি অবধান কর :

কূটচক্র ভেদের কুঞ্চিকা :

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিয়া উঠিল।
গ্রহাচার্য আমার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিলেন।
তখন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানিলাম যে,
আমার শনির দশা। রাহু আছেন পঞ্চমস্থানে।
দেবগুরু বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত-বিষার
অবস্থানের জন্য আমার এই দুঃসময় চলিতেছে।
গ্রহাচার্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া
বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির
সংক্রমণের পরে অর্থাৎ অদূরে সৌভাগ্য-সূর্যের
উদয় সম্ভাবনা।
বুঝিলাম তখন নতুন করিয়া সব
রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার অর্থ
আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

বৎস সুবোধচন্দ্র! এ কথা ভুলিও না যে, বজ্র-শলাকাবিদ্ধ ঐ ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্ত্তন করিতেছেন। সেই চক্রাবর্তন-দৃশ্যেই সপ্তর্ষির আশীর্বাদে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে।''

দুন্দুভি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গ্রহাচার্য্য আমার জন্মপত্রিকা বিচার করিয়া দিলেন। তখন নানান প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে আমার শনির দশা চলিতেছে। রাহু আমার পঞ্চমস্থানে আছেন। বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শত বিষার অবস্থানের জন্যই আমার এখন দুঃসময় চলিতেছে। গ্রহাচার্য্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির সংক্রমণের পবে অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আবার আমার সুদিন আসিবে।

বুঝিলাম তখন নতুন করিয়া সব রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বুঝিলাম আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ আমরা খুড়ো-ভাইপো এ সমস্যাটা নিয়ে পড়ে রইলাম। হেবোর মেজদা,—সে এখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ে,—সেও এগিয়ে এল আমাদের সাহায্য করতে। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের ঐ দুর্লভ ধাঁধাটির সমাধান করা গেল না। দিন সাতেক ধস্তাধস্তি করার পরে, আবার একদিন সুধীরবাবু এসে হাজির। বললেন, কী স্থির হল? আপনারা কি এলাহাবাদ যাবেন? বন্দোবস্ত করব?

হেবো কিছু বলার আগেই মেজদা বলে ওঠে, সেটা তো করতেই হবে। এখনও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা আছে। চলুন সবাই মিলে ঘুরে আসি।

হেবো বললে, কিন্তু তার আগে দুর্লভচন্দ্রের সমস্যাটা সমাধান করতে হবে যে—

মেজদা বললেন, কেন? দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধা সল্ভ করলে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে? ও ধাঁধা তো একশ বছরের পুরানো। আর আমরা না পারলেও ওটা যে সুধীরবাবু ঠাকুর্দা সল্ভ করেছিলেন সে খবর তো জানাই গেছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওঁর ঠাকুর্দা যে সমস্যা রেখে গেছেন...কিন্তু, তাঁর কোন দিনলিপিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সুধীরবাবুর সেই এলাহাবাদের বাড়িতে গিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা। সবার আগে উদ্ধার করতে হবে ওঁর ঠাকুর্দার কোন ডায়েরি আছে কি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ঠাকুর্দা কবে মারা যান? তখন আপনারা কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, দাদু মারা যান ১৯৬৪ সালে। তখন আমি পুনা কলেজে পড়ি। বাবা তখন পুনাতে পোস্টেড। দাদুর অসুখের খবর পেয়ে বাবা আর আমি যখন সেখানে

গিয়ে পৌঁছলাম তার আগেই দাদু মারা গেছেন। তারপর বাবা এবং আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু দাদুর কোন ডায়েরি বা দিনপঞ্জিকা উদ্ধার করতে পারিনি।

হেবো বললে, আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

—না, তিনিও দেহ রেখেছেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ঐ সম্পত্তিটা এখন আমার। ভালো অফার পেয়েছি। বেচে দিলে এই দুর্দিনের বাজারে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে হেবোর মেজদা বললে, খবর্দার অমন ভুল করবেন না। আপনার ঠাকুর্দার ডায়েরি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে—

সুধীরবাবু বলেন, তা হলে সেই ব্যবস্থাই করি? আমরা চারজনই যাচ্ছি তো?

আমি হেবোর দিকে ফিরে বলি, কি রে হেবো? তাই তো ঠিক হল?

হেবো তখনও সেই পুঁথিটার মধ্যে কি যেন দেখছিল। বললে, না ছোটকাকু, এখন নয়। আগে এই দুর্লভচন্দ্রের ধাঁধাটা সল্‌ভ করি।

হেবোর মেজদা খিঁচিয়ে ওঠে—ওই তোর বড় দোষ হেবো! শুনছিস এটা দুর্লভচন্দ্রের ডায়েরি। এ ধাঁধা সল্‌ভ করে আমাদের কি পাখা গজাবে?

হেবো সে-কথার জবাব না দিয়ে সুধীরবাবুকেই প্রশ্ন করে, আপনি কোনদিন আপনার দাদুর কাছে জানতে চাননি, তিনি কীভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ ধাঁধাটার সমাধান করেছিলেন?

সুধীরবাবু মাথা নেড়ে বলেন, না। এ বিষয়ে দাদুর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি। বাবারও হয়নি। দাদু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর ছিল ভীষণ মন্ত্রগুপ্তি। বস্তুত দুর্লভচন্দ্রের এই দিনলিপিটি বাবা এবং আমি প্রথম দেখতে পাই দাদু মারা যাবার পর। তাই আমি জানি না, দাদু কী-ভাবে দুর্লভচন্দ্রের ঐ শেষ ধাঁধাটার সমাধান করে গুপ্তধনের নাগাল পেয়েছিলেন।

হেবো বললে, আপনার দাদুর মৃত্যুর পরে আপনারা সব কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। অথচ তাঁর কোনও দিনপঞ্জিকা খুঁজে পাননি। সুতরাং এতদিন পরে গিয়ে নতুন করে খুঁজে লাভ হবে না—

মেজদা বললে, অন্তত আমরা এখানে-ওখানে খুঁড়ে তো দেখতে পারি?

হেবো বললে, কী বলছ মেজদা? বাড়িটার চৌহদ্দি একশ বিঘার উপর! গুপ্তধন যদি ওখানে থাকে তবে তা আছে অন্তত দু-মিটার গভীরে। আন্দাজে কি তা খুঁড়ে বার করা সম্ভব?

—তবু চেষ্টা করে দেখলে কি কিছু পাওয়া যাবে না?

হেবো বললে, যাবে। আলু! গুপ্তধন নয়!

মেজদা চটে উঠে বলল, তা হলে তুই কি করতে চাস? এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়বি?

হেবো বললে, একজ্যাক্টলি! এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়ব আর দুর্লভচন্দ্রের সমস্যাটার সমাধান বার করবার চেষ্টা করব! এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কর্মপন্থা আমি নির্ধারণ করতে অপারগ!

অগত্যা সুধীরবাবু প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরে গেলেন।

কদিন পরে হেবো আমার কাছে এসে বলল, ছোটকাকু, আকাশে এখন সপ্তর্ষি আছে? চিনিয়ে দিতে পার?

বললাম, এখন তো সন্ধ্যাবেলাতেই উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিকে দেখতে পাওয়ার কথা। চল দেখা যাক।

আমরা দুজনে ছাদে উঠে গেলাম। হেবোকে চিনিয়ে দিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। বললাম, সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথমে দুটি নক্ষত্র হচ্ছে ক্রতু আর পুলহ—প্রায় একই সরলরেখায় আছে ধ্রুব নক্ষত্র। পুলহের নীচেই পুলস্ত্য—রাবণের বাবা!

—রাবণের বাবা! মানে?

—ঐ পুলস্ত্য ঋষির স্ত্রী হলেন রাক্ষসী নিকষা। তাঁদেরই সন্তান—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। পুলস্ত্যের পর অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ্য আর মরীচি। সবটা মিলিয়ে অনেকটা যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

হেবো অন্যমনস্কের মতো বললে, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসার চিহ্ন! অনন্ত জিজ্ঞাসা।

আমি ওকে আরও বললাম, এই গোটা সপ্তর্ষিমণ্ডল, —শুধু তাই বা কেন, সমস্ত আকাশটাই ধ্রুব-নক্ষত্রকে পরিক্রমা করছে।

—জানি। সে কথা দুর্লভচন্দ্রই বলেছেন—'এ কথা ভুলিও না যে, বজ্রশলাকা বিদ্ধ ঐ ধ্রুব-নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।' কিন্তু বজ্রশলাকা বিদ্ধ কেন?

আমি পাগলটাকে সামলাবার জন্য বলি, হেবো, তুই কেন খামোকা এ ধাঁধাটা নিয়ে সময় নষ্ট করছিস বলতো? সেদিন তোর মেজদা তো, ঠিক কথাই বলেছিল। আমাদের প্রথম কাজ সুবোধচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা উদ্ধার করা। দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকা নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

হেবো হাসল। বলল, তা হলে তোমাকে খুলেই বলি, ছোটকাকু। সুবোধচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা খুঁজবার কোনও দরকার নেই। সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

আমি চমকে উঠি। বলি, সে কী রে, সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার আজও তো দেখা হয়েছে। কই, তেমন কথা তো তিনি কিছু বললেন না।

—সুধীরবাবু জানেন না। সেটা আমার কাছেই আছে।

আমি বজ্রাহত হয়ে যাই। ধাঁধা কষতে কষতে ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

হেবো বললে, চলো নীচে যাই। তোমায় দেখাচ্ছি।

আবার নীচে নেমে এলাম আমরা। হেবো সেই দুর্লভচন্দ্রের দিনপঞ্জিকাখানা বার করে বলে, এটা তো তুমি খুঁটিয়ে দেখেছ, ছোটকাকু। বল তো, কোনও অসঙ্গতি তোমার নজরে পড়েছে?

আমি বলি, পড়েছে। একটা মারাত্মক ভুল আছে। একটা সংখ্যায়। দুর্লভচন্দ্র এক জায়গায় 'আট' লিখতে 'নয়' লিখেছেন। ফলে সালটা একশ' বছর ভুল হয়ে গেছে!

হেবো বললে, কারেক্ট! শেষ তারিখটা '৫ই জুন ১৮৬২' লিখতে গিয়ে ভুলে লেখা হয়েছে '৫ই জুন, ১৯৬২' জুন। তাই নয়?

—হ্যাঁ। ওটা প্রথম দিনই নজরে পড়েছিল আমার। 'অবভিয়াস' ভুল বলে তখন কিছু বলিনি।

হেবো বললে, ওইটাই হচ্ছে প্রধান 'ক্লু'! ওখানে ভুল লেখা হয়নি কিছু।

—মানে? '১৯৬২' সালটা ভুল নয়?

—না, নয়। ভুল লেখা হয়নি। ওটা ১৯৬২-ই হবে।

আমি ধমকে উঠি, কী পাগলের মতো বকছিস হেবো? দুর্লভচন্দ্র তো মারা গেছেন একশ বছর আগে! তিনি কেমন করে—

—না! তিনি নয়! ওই সালটা লিখেছেন সুধীরবাবুর ঠাকুর্দা। বস্তুত, শেষ পৃষ্ঠার ধাঁধাটাই হচ্ছে আমাদের গুপ্তধন লাভের চাবি! শেষ পৃষ্ঠাটা সুধীরবাবুর ঠাকুর্দার লেখা।

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করি—আমি মানতে রাজি নই হেবো। ভুলে দুর্লভচন্দ্র 'আট'-এর বদলে 'নয়' লিখেছেন বলে—

বাধা দিয়ে হেবো বললে, না ছোটকাকু! আমি আন্দাজে কিছু বলি না। আমার প্রতেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত!

আমি আবার ধমক দিয়ে উঠি, ওই এক বুলি শিখেছিস! দেখছিস না—কাগজ এক, হাতের লেখা এক, কালি এক, ভাষা এক, এমনকী পূর্বপৃষ্ঠা থেকে পারম্পর্যটুকু পর্যন্ত বজায় আছে। আগের পৃষ্ঠার শেষ লাইনটা হচ্ছে ''এই অতুল ঐশ্বর্য্য সমভি''—আর পরের পৃষ্ঠায়—''ব্যাহারে কী প্রকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব?''

হেবো বললে, ওই একটি লাইনের আর কোন অসঙ্গতি নজরে পড়ছে না তোমার?

—কী অসঙ্গতি?

আগের পৃষ্ঠায় বানান রয়েছে 'ঐশ্বর্য্য'' আর পরের পৃষ্ঠায় 'প্রত্যাবর্তন'?

—তাতে কী?

—ভেবে দেখ, ছোটকাকু! লক্ষ করে দেখ—প্রথম দুটি পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ ৩রা এবং ৪ঠা জুন বানান রয়েছে—সূর্য্যস্ত, পূর্ব্বেই সর্ব্বত্র পার্শ্ববর্ত্তী গর্ত্ত, পার্শ্বতীপুর, নির্দ্দেশ, আশ্চর্য্য, প্রত্যাবর্ত্তন ঐশ্বর্য্য' অথচ শেষ পৃষ্ঠায়—'প্রত্যাবর্তন, ঐশ্বর্য, নির্দেশ, জ্যোতির্ময়, চক্রাবর্তন, আশীর্বাদ!' দেখেছ।

দেখেছ? সোজা কথায় শেষ পৃষ্ঠায় 'রেফ'-এর পরে দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে। তুমি তো জান, ছোটকাকু, এই রেফ-এর পর দ্বিত্ব-বর্জন করার নীতিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই শতাব্দীতে চালু করেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমের কোনও পাণ্ডুলিপিতে এসব বানান পাওয়া সম্ভব? তা হলে শেষ পৃষ্ঠায় দুর্লভচন্দ্রের মতো পণ্ডিত এতবার বানান ভুল করলেন কেমন করে? অথবা তিনি কেমন করে জানলেন পরবর্তী শতাব্দীতে এ বানান চালু হবে?

আমি অবাক হয়ে যাই ওর বিশ্লেষণী শক্তিতে। সত্যিই তো। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় রেফের পর একটিমাত্র ক্ষেত্রেও দ্বিত্ব বর্জন করা হয়নি আর শেষ পৃষ্ঠায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে!

হেবো বললে, সুধীরবাবু ঠাকুর্দা বুদ্ধিটা করেছিলেন ভালোই। একই কাগজ জোগাড় করে, একই হাতের লেখা নকল করে পুঁথিতে নিজের লেখা পাতাটা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে, সহজে ধরাই যায় না এটা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু দু-দুটি স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। ১৯৬২ সালটা স্পষ্ট করে লিখেছেন,—তিনি জানতেন, সাধারণ লোক হয় এটা খেয়াল করবে না, অথবা মনে করবে সংখ্যাটি ভুলে 'আট' লিখতে 'নয়' লেখা। কিন্তু রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এটা তাঁরই লেখা।

মনে হল, হয়তো ঠিকই বলছে হেবো। ওই পুঁথির শেষ পৃষ্ঠাটা দুর্লভচন্দ্রের নয়, তাঁর নাতি সুবোধচন্দ্রের লেখা। তা যদি হয়, তা হলে ঐ শেষ পৃষ্ঠাতেই সুবোধচন্দ্র ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ১৯৬২ সালে তিনি কোথায় গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম হেবোকে—তা এই ধাঁধাটার কিছু বুঝতে পেরেছিস?

—ওই "কৃপগবাক্ষের বিপরীতমুখী বেদব্যাসের পরিমাণ—দশ আলোকবর্ষ কথাগুলোর মানে বুঝিনি। কিন্তু তার পরবর্তী নির্দেশটা বোঝা যায় "তুলাদণ্ড: এক আলোকবর্ষ—একমিমি"।

অবাক কাণ্ড! হেবো ওর মানে বুঝতে পেরেছে! জিজ্ঞাসা করি, কী ওর মানে?

—সমস্যা সমাধান করতে করতে আমরা একটা ম্যাপ পাব। সুবোধচন্দ্র এখানে বলছেন সেই ম্যাপের স্কেলটা। "তুলাদণ্ড" ইংরাজী করলে হয় 'Scale'। 'একমিমি' মানে হচ্ছে 'এক মিলিমিটার'। যে ম্যাপটা পাব তার স্কেল হচ্ছে এক আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার!

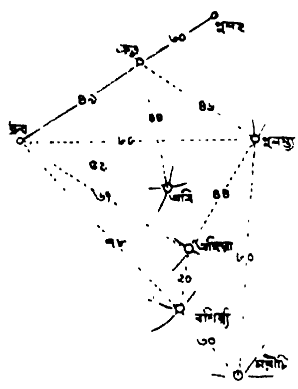
আমি বলি, আলোকবর্ষ কী জানিস তো? আলোক তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার যায়। ওই গতিতে সে এক বছরে যে দূরত্ব যেতে পারে তাকেই বলে 'আলোকবর্ষ'।

হেবো বললে, তা জানি। সেসব তথ্য এখানে কাজে লাগবে না। এখানে যে দূরত্বগুলি বলা হয়েছে সেগুলি সোজা মিলিমিটারে প্রকাশ না করে উনি প্যাঁচ কষে প্রকাশ করেছেন আলোকবর্ষ আর বলেছেন প্রতিটি আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার। অর্থাৎ যে ম্যাপটা পাব তাতে ধ্রুবনক্ষত্র থেকে ক্রতুর দূরত্ব ৪৯ মিলিমিটার। পুলহের দূরত্ব ৭৯ মিলিমিটার ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাপটা কোথায় পাই?

আবার দুজনে ভাবতে থাকি। শেষে হেবো বলে, তুমি নিজের মতো করে ভাব ছোটকাকু, আমি আমার ঘরে গিয়ে ভাবি। ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে ভাবতে হবে। মনে হচ্ছে জ্যামিতির মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানো যাবে। সুবোধচন্দ্র যেভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেখি সেভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে নিছক জ্যামিতির অঙ্ক হিসাবে আঁকা যায় কিনা।

আমি তো হেবোর মতো পাগল নই। তাই নিজের নথিপত্র নিয়ে লিখতে বসি।

একটু পরে হেবো ফিরে এসে বললে, ছোটকাকু অনেকটা হয়েছে। এই দেখ কূটচক্রের ভেদসূত্রের কুঞ্চিকা দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল আঁকা গেছে।



কৌতূহলী হয়ে বলি, কেমন করে?

—এই দেখ। তুমি বলেছ—ধ্রুব ক্রতু আর পুলহ একই সরলরেখায় অবস্থিত। আরও বলা হয়েছে ধ্রুব থেকে ক্রতু আর পুলহের দূরত্ব ৪৯ মিলি আর ৭৯ মিমি। ফলে, তিনটি নক্ষত্রকে পাওয়া গেল। এবার ধ্রুব আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৫২ মিমি আর ৪৪ মিমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে তাদের ছেদবিন্দুতে পেলাম 'অত্রি'কে। তারপর অত্রি আর ক্রতুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে ৩৪ এবং ৪৬ মিমি ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্তচাপ আঁকলে পাওয়া যাচ্ছে পুলস্ত্যকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাত ঋষি আর ধ্রুব নক্ষত্রকে স্কেলে আঁকা যায়।

স্বীকার করতেই হল—তা যায়। কিন্তু তাতে কী হল?

হেবো বললে, হল এইটুকুই যে, আমরা একটা ধাপ অতিক্রম করলাম। এবার বেদব্যাসের কূপগবাক্ষটাকে খুঁজে পেলেই—

অনমনস্কের মতো আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে হেবো নিজের ঘরে চলে গেল। আমি আবার খাতাপত্র টেনে নিয়ে লিখতে বসি। কিন্তু কিছুতেই কিছু লিখতে পারলাম না। ঘুরে ফিরে ঐ ধাঁধাটাই মাথার ভিতর পাক খেতে থাকে। হেবো কি সত্যিই এক ধাপ অতিক্রম করেছে? কেমন করে? গুপ্তধন লুকানো আছে এলাহাবাদ শহরের আট মাইল দূরে একটা ভাঙা বাড়িতে। একশ বিঘা যার চৌহদ্দি। আর সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে আকাশে। সুতরাং..

এইসব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো। ব্যাপার কী? দরজা খুলে দেখি—শ্রীমান হেবো।

—কী চাই? —আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি।

—বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী করা গেছে ছোটকাকু।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, ফের যদি মাঝরাতে এমন 'বেদব্যাস বেদব্যাস' কর, তোমার বাবাকে বলে দেব কিন্তু।

হেবো ম্লান হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, ও তুমি ঘুমাচ্ছিলে বুঝি?

—তুমি কি ভাবলে! রাত দুটোর সময় আমি দাঁত মাজছিলাম?

হেবো কেঁচো! কোন রকমে পালিয়ে বাঁচে। আমি আবার শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না কিন্তু। মহাকবি বেদব্যাসকে বিপরীতমুখী ও কেমন করে করল? আহা! বেচারাকে অমন ধমক না দিলেই ভালো হত।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই হেবোর ঘরে গেলাম। হতভাগা অঘোরে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। বিছানায় ছড়ানো রয়েছে স্কেল, কম্পাস, খাতা পেনসিল। মায়া হল, কী জানি—কত রাত পর্যন্ত জেগেছে বেচারা।

বেলা নটা নাগাদ হেবো উঠল। বললাম, কী রে? কাল রাতে বকেছি বলে রাগ করেছিস নাকি?

হেবো একগাল হেসে বলল, না ছোটকাকু। তবে সমাধান করে ফেলেছি। তোমার বন্ধুকে বলো আমাদের জন্য এলাহাবাদ যাবার টিকিট কাটতে হবে না। আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারব—ওই বাড়ির ঠিক কোথায় গুপ্তধনটা পোঁতা আছে।

বাহাদুর ছেলে বটে! বলি, কেমন করে? কালরাত্রে কী জানতে পেরেছিস তুই?

—এই দেখ! 'কূপ-গবাক্ষ' হচ্ছে কাগজে একটি ফুটো। ধ্রুব বাদে ছয়টা ফুটো করতে হবে কাগজে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ঐ জ্যামিতিক নকশায়—ছয় ছয়টা নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। আর সেই ফুটোগুলোর ব্যাস হবে দশ মিলিমিটার।

—কেমন করে বুঝলি?

—'বেদব্যাসের' শব্দটাকে বিপরীতমুখী করতে পাই 'ব্যাসের বেদ'—অর্থাৎ 'ব্যাসের মাপ'। বলা হয়েছে সেটা দশ আলোকবর্ষ। যেহেতু এক আলোকবর্ষ = এক মিলিমিটার, তাই ফুটোগুলো দশ মিলিমিটার বা এক সেন্টিমিটার ব্যাসের হবে। কেমন তো?

—বেশ, তা না হয় হল, তারপর?

—তারপর, ধ্রুব-নক্ষত্রকে তীব্র শলাকায় বিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আমার এই ফুটোওয়ালা কাগজখানা পাণ্ডুলিপির ওই গুপ্তধন সঙ্কেতের রচনার উপর এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ধ্রুব নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্রের উপর পড়ে।

আমি বলি, থাম থাম—পাণ্ডুলিপির ঐ লেখায় ধ্রুব নক্ষত্র কোথায়?

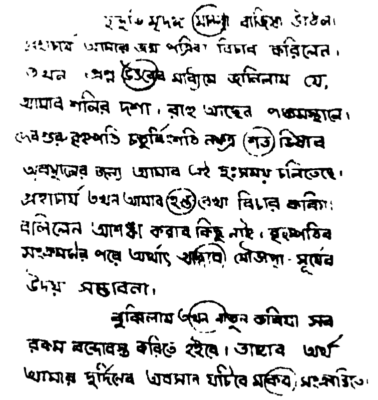
—তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ছোটকাকু। 'ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান 'অবস্থানের' জ্যোতির্ময় আদিবিন্দুতে। লক্ষ করে দেখ, 'শতাভিষার অবস্থানের জন্যই' কথাগুলি লিখে এ 'অবস্থান' শব্দটির 'অ' অক্ষরটির পুঁটুলিতে একটি জ্যোতি-চিহ্ন আছে। ওইটাই ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থান। ফুটো-ওয়ালা ওই লেখাটির উপর এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে উপরের কাগজের ধ্রুব নক্ষত্র নীচের কাগজের 'অবস্থান' শব্দটির অ-বিন্দুর পুঁটুলির উপর পড়ে। তারপর একটা আলপিন দিয়ে ধ্রুব নক্ষত্র দুটিকে বিদ্ধ করে উপরের কাগজখানা ঘোরাতে হবে—ঠিক যেভাবে আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুব নক্ষত্রকে বেষ্টন করে, কারণ নির্দেশ 'ভুলিও না যে, বজ্রশলাকাবিদ্ধ ওই ধ্রুব-নক্ষত্রের চতুষ্পার্শ্বে সপ্তর্ষিগুল ক্রমাগত চক্রাবর্তন করিতেছেন।'

আমি বলি, বুঝলাম। ধর, তাই করলাম, তাতেই বা কেমন করে বুঝব—গুপ্তধন কোথায় আছে?

—তুমি করেই দেখ না ছোটকাকু। খুব ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকো—আর লক্ষ করে দেখ—ফুটোর মধ্যে দিয়ে কী দেখা যাচ্ছে।

ওর নির্দেশমতো ধ্রুব নক্ষত্রকে বজ্রশলাকা-বিদ্ধ করে আমি উপরের কাগজখানা ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকি। আশ্চর্য! হেবো যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। কলকাতায় বসেই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া গেল—সুবোধচন্দ্রর ঐ একশ বিঘা জমির ঠিক কোথায় লুকানো আছে সেই গুপ্তধন।

বিশ্বাস না হয় তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পার। নেহাত যদি জ্যামিতি জানা না থাকে তবে দাদা-দিদি-মামা-মামি কাউকে পাকড়াও করো। তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নাও। তাঁর সাহায্য নিয়ে একটি কাগজে প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে এঁকে ফেল। তারপর কোদাল নয়, কাঁচি দিয়ে ছয়-ছয়টা কূপ খুঁড়তে হবে। অর্থাৎ ছয়টা ফুটো করতে হবে—ফুটোগুলির কেন্দ্র ধ্রুব বাদে ঐ সপ্তর্ষি অবস্থান, ব্যাস এক সেন্টিমিটার। এবার সুবোধচন্দ্রের ওই লেখার উপর তোমার ছবিটা বসাও—এমনভাবে, যাতে তোমার আঁকা ধ্রুব-নক্ষত্র ওই 'অবস্থান' শব্দের 'অ' অক্ষরের পুঁটুলির উপর পড়ে। একটা আলপিন দিয়ে দুই ধ্রুব নক্ষত্রকে বিদ্ধ করো। তারপর ধীরে ধীরে উপরের কাগজখানা ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘোরাতে থাকো। কী? গুপ্তধনের সন্ধান পেলে? নেহাত না পেলে শেষ পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখে নাও! কিন্তু না! আগেভাগেই ঐ সমাধানটা তোমরা দেখো না! গোয়েন্দা গল্প তো অনেকক্ষণ হল, এবার একটু জ্যামিতির খেলাই হোক না! তা ছাড়া নিজে নিজে সমাধান করতে পারার একটা আলাদা আনন্দ আছে। যতক্ষণ না পারছ—কিছুতেই সমাধানটা দেখবে না কিন্তু! শার্লক হেবোর দোহাই!


হঠাৎ মৃদঙ্গ মন্দ্রা বাজিয়া উঠিল।
মহাচার্য আমার জন্ম পত্রিকা বিচার করিলেন।
তখন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানিলাম যে,
আমার শনির দশা। রাহু আছেন পঞ্চমস্থানে।
দেবগুরু বৃহস্পতি চতুর্বিংশতি নক্ষত্র শতভিষার
অবস্থানের জন্য আমার এই দুঃসময় চলিতেছে।
মহাচার্য তখন আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া
বলিলেন আশঙ্কা করার কিছু নাই। বৃহস্পতির
সংক্রমণের পরে অর্থাৎ শনিবার মৌজপা-সূর্যের
উদয় সম্ভাবনা।
বুঝিলাম এখন নতুন করিয়া সব
রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার অর্থ
আমার দুর্দিনের অবসান ঘটিবে মকর সংক্রান্তিতে।

চক্ষু-কর্ণ
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"আসল কথাটা কী জানেন," স্পিড কমিয়ে, গিয়ার পালটে, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে চারু ভাদুড়ি বললেন, "চোখ-কান সারাক্ষণ খোলা রাখা চাই।"

গাড়ির স্পিড আবার বেড়েছে। সামনের রাস্তা ফাঁকা। বৃষ্টি হয়েছে। গাছপালা, ঘাস, লতা সব এখন এত সবুজ যে, চারদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বললুম, "তা তো অবশ্যই চাই।"

"কিন্তু সেইটেই সবাই রাখে না।"

ভাদুড়ির গলায় আবেগের সুর। জিজ্ঞেস করলুম, "কথাটা আপনি ঠিক কাদের সম্পর্কে বলছেন?"

"সকলের সম্পর্কেই বলছি। তবে হ্যাঁ, বিশেষভাবে বলছি আমাদের পুলিশ বিভাগের কিছু লোক সম্পর্কে। তাদের যে চোখ-কান নেই, তা নয়, ওদুটো বস্তু সকলেরই এক-এক জোড়া থাকে, তাদেরও আছে। কিন্তু তার ব্যবহার হয় কদাচিৎ। বিদ্যাসাগর মশাই পুত্তলিকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, মনে আছে?"

হেসে বললুম, "চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না..."

ভাদুড়ি বললেন, "বাঃ! মনে আছে দেখছি। তা এদেরও সেই অবস্থা। চোখ থাকতেও এরা দেখে না, কান থাকতেও শোনে না। নইলে নিশ্চয় মার্ডার-ওয়েপনটা বার করে ফেলত।"

কথা হচ্ছিল শিল্পপতি মহেশ্বর শ্রীবাস্তবের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে। দুর্গাপুর থেকে অণ্ডালের দিকে খানিকটা এগোলেই ন্যাশনাল হাইওয়ের বাঁ দিকে তাঁর কারখানাটা চোখে পড়বে। ওষুধের কারখানা। উদ্বোধনের পরদিনই সেটি বন্ধ হয়ে গেল। আসলে উদ্বোধন উপলক্ষেই কলকাতা থেকে পরশু দিন তিনি এখানে এসেছিলেন। কিন্তু এখান থেকে আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারলেন না। দিল্লি রোডের ধার দিয়ে কাল ভোরবেলায় যখন তিনি মর্নিং ওয়াক করছিলেন, সেই সময়ে একটা গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। গাড়িটা আর থামেনি। স্পিড বাড়িয়ে পালিয়ে যায়।

মহেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুরের বিখ্যাত কনট্রাক্টর গোপীচাঁদ ভার্মা। তিনিই গিয়ে থানায় খবর দেন। গাড়ির ধাক্কা খেয়ে পথের ধারের ঢালু জমি দিয়ে মহেশ্বর গড়িয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায়, ঠিকই তা-ই, একটা কাঁটাঝোপের পাশে মহেশ্বরের লাশটা পড়ে রয়েছে। মাথাটা একেবারে থ্যাঁতলানো।

পুলিশ-অফিসার রিপোর্ট লিখলেন, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। রেকলেস ড্রাইভিং দিনে-দিনে বেড়ে যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। মস্ত একজন শিল্পপতিও তাঁর কারখানা খুলতে এসে তেমনি একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। খুবই দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু কী আর করা যাবে।

কিছুই যে করা যায় না, তা নয়। যে গাড়িটা ধাক্কা মেরে পালিয়েছে, তার সন্ধান করা যায়। কিন্তু তাও এক্ষেত্রে করা গেল না। কেননা, গাড়িটা একেবারে আচমকা এসে এই কাণ্ড করায় গোপীচাঁদ এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে, গাড়িটার নম্বর তিনি দেখে রাখেননি।

মহেশ্বর শ্রীবাস্তবের স্ত্রী দুর্গাদেবী কিন্তু পুলিশের কথা মেনে নিলেন না। বললেন, "চল্লিশ বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে একদিনও আমার স্বামীকে আমি মর্নিং ওয়াক করতে দেখিনি। হঠাৎ দুর্গাপুরে একটা কারখানা খুলতে গিয়ে তাঁর মর্নিং ওয়াক করার দুর্মতি হবে কেন?"

ভদ্রমহিলা কাল রাত্তিরেই চারু ভাদুড়িকে ডেকে পাঠান। ভাদুড়ির সঙ্গে আমিও গিয়েছিলুম। মিসেস শ্রীবাস্তবের যুক্তি শুনে ভাদুড়ি বললেন, "তাই তো। তা আপনার কী মনে হয়?"

দুর্গাদেবী কথার মারপ্যাঁচ পছন্দ করেন না, সরাসরি বললেন, "আমার মনে হয়, গোপীচাঁদ ভার্মা আমার স্বামীকে খুন করেছে।"

"কেন, কেন এমন কথা আপনার মনে হয় কেন!"

"বলছি। ওষুধের ফ্যাক্টরির বিলডিং বানাবার কনট্রাক্ট ওই গোপীচাঁদ নিয়েছিল। এখন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, বিলডিংয়ের মালমশলা সে অতি রদ্দি দিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস মেটিরিয়ালের পয়সা নিয়েছে, কিন্তু দিয়েছে থার্ড ক্লাস মেটিরিয়াল। আমার স্বামী তাই মামলা করার কথা ভাবছিলেন। ওখানে যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন যে, গোপীচাঁদের গলায় গামছা দিয়ে পয়সাটা তিনি আদায় করে ছাড়বেন।"

পয়সা মানে যে নেহাত পয়সা নয়, কোটি টাকার ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারিনি। আমি চুনোপুঁটি, মেরেকেটে হাজার পর্যন্ত গুনতে পারি। এটা যে সেক্ষেত্রে লাখের অঙ্কও ছাড়িয়ে গিয়ে কোটির কারবার, আজ সকালে চারু ভাদুড়িই সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "ভদ্রমহিলা ভুল বলেননি। মর্নিং ওয়াকের ব্যাপারটা আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"কেন?"

"আরে মশাই, যারা পুণ্যলাভ করবার জন্য পয়সা দিয়ে অন্য লোককে তারকেশ্বর পর্যন্ত হাঁটায়, স্বাস্থ্যলাভ করবার জন্যই বা তারা কষ্ট করে মর্নিং ওয়াক করবে কেন? দরকার হলে বরং তাদের হয়ে মর্নিং ওয়াক করবার জন্য তারা পয়সা দিয়ে লোক রাখবে।"

কথা বলতে বলতেই আমরা দুর্গাপুর পেরিয়ে এসেছিলুম। ঘটনাস্থল যে-থানার এলাকার মধ্যে পড়ে, তার অফিসারের নাম দুর্গেশ মল্লিক। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হল। তিনি বললেন, ''মার্ডারই যদি হবে তো অস্ত্রটা কোথায় গেল? গোপীচাঁদ বন্দুক-পিস্তল চালাতে জানেন না, ছুরিছোরারও ধার ধারেন না। তা ছাড়া, জখমটা দেখলেই বোঝা যায় যে এটা বন্দুক-পিস্তল কি ছুরিছোরার ব্যাপারও নয়। মাথাটা থেঁতলে গেছে। মনে হয়, গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে মাথা ফেটেছে।''

''ইট কি পাথর দিয়ে কি ওইভাবে মাথা ফাটানো যায় না?''

''যায়, কিন্তু ঘটনাস্থলের ধারে কাছে কোনও ইট কিংবা পাথর আমরা দেখিনি।''

''ঠিক আছে, কিন্তু আমি একবার ঘটনাস্থলটা দেখতে চাই।'' চারু ভাদুড়ি বললেন, ''একজন কনস্টেবলকে যদি সঙ্গে দেন তো বড্ড ভালো হয়। জায়গাটা আমরা চিনি না তো, সেইজন্য কাউকে সঙ্গে নিতে চাইছি।''

মল্লিকমশাই কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ''চলুন, আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।''

আমাদের গাড়িটা আর নিতে হল না। সেটা থানায় পড়ে রইল, আর থানার জিপে উঠে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলাম।

জিপ থেকে নেমে, রাস্তার ধারের ঢালু জমির দিকে একটা আঙুল তুলে দুর্গেশ মল্লিক বললেন, ''দেখুন, ওই যে কাঁটাঝোপটা দেখছেন, ওরই পাশে ডেডবডিটা পড়েছিল। ওর ধারে কাছে কি কোনও ইট কিংবা পাথর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? পাচ্ছেন না তো?''

ঢালু জমিটা ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। সেই ঘাসের উপরে মিনিট খানেক চোখ বুলিয়েই ভাদুড়ি বললেন, ''না, তা পাচ্ছি না।''

''তা হলে চলুন, ফেরা যাক।''

''এক্ষুনি তো ফিরতে পারছি না, মিনিট দুই-তিন দেরি হবে।'' ভাদুড়ি বললেন, ''তার কারণ, ইটপাথর এখানে দেখছি না বটে, কিন্তু আর-একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি। সেটা কিন্তু আপনারও দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, মশাই।''

''কী দেখতে পেলেন!''

''হলদে ঘাস।''

ঢালু জমিটা ঘন-সবুজ ঘাসে ঢাকা। দেখে মনে হয় যেন ঘন-সবুজের বিশাল একটা কার্পেট। তার মধ্যে খানিকটা জায়গায় ঘাস সত্যি হলদেটে! ঢাল দিয়ে খানিকটা নেমে গিয়ে সেই হলদে ঘাসের পাশে উবু হয়ে বসলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর পকেট থেকে একটা ফিতে বার করে সেই জায়গাটুকুর মাপ নিয়ে বললেন, ''দশ ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি।''

মল্লিক বললেন, ''সেটা আবার কী?''

চারু ভাদুড়ি বললেন, ''বুঝতে পারলেন না? একখানা ইটের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। অনেক দিন ধরে ইটখানা ওইখানে ছিল বলেই তার তলাকার ঘাস হলদে হয়ে আছে।''

''ছিল তো গেল কোথায়?''

''সেইটেই আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে, মিঃ মল্লিক। কেননা লাশ পরীক্ষা করলে এই প্রমাণই মিলবে যে, একখানা ইট দিয়ে মহেশ্বরের মাথা ফাটানো হয়েছিল। এটা মোটেই অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার নয়।''

কলকাতার পথে ফিরতে-ফিরতে জিজ্ঞেস করলুম, ''কিন্তু লোকটা যদি মর্নিং ওয়াক না-ই করে তো মরতে হঠাৎ গোপীচাঁদের সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে হাঁটতে গিয়েছিল কেন?''

চারু ভাদুড়ি বললেন, ''বলা শক্ত। তবে একটা আন্দাজ নিশ্চয় করা যায়। কাছেই একটা ছোট্ট মতন মন্দির দেখলেন না? আমার ধারণা, মন্দির দেখাবার নাম করেই মহেশ্বরকে রাস্তায় বার করেছিল গোপীচাঁদ। হয় তো বলেছিল, ওখানকার ঠাকুর খুব জাগ্রত, একটা পেন্নাম যদি ঠুকে আসা যায় তো বাজারে জাল-ওষুধ ছাড়লেও ধরা পড়বার ভয় থাকবে না।''

বালি ব্রিজের উপরে উঠে পড়েছি। গঙ্গার উপরে আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। সেদিকে তাকিয়ে বললুম, ''যাবার পথে চোখ-কানের কথা বলেছিলেন। সেটার প্রমাণ যে আজ হাতে-হাতে পেয়ে যাব, তা কিন্তু তখন ভাবিনি।''

ভাদুড়িমশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ''মল্লিকমশাইয়ের কি চোখ নেই? আছে। তার উপরে আবার সোনালি ফ্রেমের চশমাও পরেছেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, দেখতে পান না।''

গোয়েন্দার নাম গোগো

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

মেজাজটা রীতিমতন খারাপ হয়ে রয়েছে গোগো-র।

তার ছোটকাকার সঙ্গে কতখানিই বা বয়সের তফাত গোগো-র? তবু যেহেতু ছোটকা কলেজে পড়ে, কলেজের দলের সঙ্গে একা দার্জিলিং বেড়াতে গেছে। আর গোগো? যেহেতু স্কুলের চৌকাঠ পেরুতে এখনও তার দু-বছর বাকি, অতএব কলকাতার ভ্যাপসা গরমে পচছে। একা হাওড়া ঘুরে আসার অধিকার পর্যন্ত তার নেই। তাহলেই হই-চই পড়ে যাবে বাড়িতে। শুধু রোদে ঘামতে ঘামতে রোজ স্কুলে যাও আর ফিরে এসো। ফিরে এসে ছোটকার চিঠিতে পড়ো, দার্জিলিং-য়ে আ-হ্ কী-রকম ঠাণ্ডা! টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের দৃশ্য কী ম্যাগনিফিসেন্ট! তেনজিং নোরকের সঙ্গে কীভাবে আলাপ করেছে ছোটকা, আর সেই আলাপে তেনজিং নোরকে এতই ইমপ্রেসড, যে নিজে পাহাড়ে-চড়া শেখাতে চেয়েছে ছোটকাকে!

শুধু ওই সবই যদি লিখত ছোটকা তবু সহ্য হত! গোগোর মনের ঘা-য়ে নুনের ছিটে দিতে সেইসঙ্গে প্রতি চিঠিতে একা-একা কোনও গোয়েন্দাগিরি না করতে যদি না উপদেশ দিত! গোগো যেহেতু স্কুলে পড়ে অতএব ছেলেমানুষ, অতএব একা কোথায় কোন্ বিপদে পড়ে যাবে বলে সাবধান না-করত!

ছোটকার এই সাবধানতা কী জন্যে সেটা অবশ্য গোগো বোঝে। না-বোঝার মতন বোকা বা খোকা সে নয়। ছোটকা ছাড়াই একটা কোন রহস্যের কিনারা যদি গোগো করে ফেলে, সেইটাই আসলে ভয় ছোটকার। তাহলে ছোটকার আর মুখ থাকবে না কারুর কাছে। আর স্কুলে পড়ে অতএব ছেলেমানুষ বলে গোগোর উপর হামবড়াইও বন্ধ হয়ে যাবে।

আর ভগবানও তেমনি। গোগোর বাড়ির লোকজনদের মতনই ইস্কুলে পড়া ছেলেদের প্রতি সমান অবুঝ আর নিষ্ঠুর। নইলে ছোটকা দার্জিলিংয়ে থাকতে থাকতে তেমন একটা গভীর রহস্যময় ঘটনা কি ঘটতে পারে না যা গোগো অক্লেশে সমাধান করে ফেলতে পারে! স্কুলে যাতায়াতের পথে কিম্বা বিকেলে যখন গোগোর খেলার ছুটি—সেই সময়ের মধ্যে! অন্য সময় তো আর বাড়ি থেকে তার বেরুনোর উপায় নেই! হে ভগবান, তুমি তো সব পারো! দাও না একটা তেমন রহস্যের ব্যবস্থা করে! তেনজিং নোরকের কাছে পাহাড়ে-চড়া শেখার মজাটা তাহলে বেরিয়ে যায় ছোটকা-র।

কী করে বুঝি কথাটা ভগবানের কানে পৌঁছেছিল। আর শুধু তেমন একটা রহস্যের ব্যবস্থা নয়, সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা ছুটির দিনের ব্যবস্থা এবং কারুকে কোনও কৈফিয়ত না দিয়ে অসময়ে বাড়ি থেকে গোগোর বুক ফুলিয়ে বেরুনোর ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ ছুটির ব্যবস্থাটা হয়ে গেল মহাবীরের আড়াই হাজারতম জন্মদিন উপলক্ষে। তা ছুটি তো কী? স্কুলেই শুধু যেতে হবে না, সকালবেলায় পড়া থেকে তো আর গোগোর ছুটি নেই। সকালের জলখাবার খেয়ে গোগো উঠে তাই চারতলায় তার পড়ার ঘরে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে মেজকা-র সঙ্গে দেখা। তাড়াহুড়ো করে মেজকা কোথায় যেন বেরুচ্ছেন, গোগোকে দেখে সিঁড়ি জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর, কী যেন ভাবতে লাগলেন গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হাইকোর্টের নামজাদা উকিল মেজকা! কী হল, কী ঘটল হঠাৎ তাঁর গোগোর মুখের দিকে, ও-ভাবে তাকিয়ে ভাববার?

ভেবে কী যেন স্থির করলেন মেজকা। জিগ্যেস করলেন—'আজ তো তোর স্কুল ছুটি?'

গোগো ঢোঁক গিলে বলল—'হ্যাঁ।'

'তবে চট করে জামা পরে আয়। আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়।'

'কোথায়?' অনেকটা ঢোক গিলে গোগো বলল, 'মানে, কী রকম জামাকাপড় পরব?'

'আমার এক মক্কেলের বাড়ি। একটা রহস্যময় চুরি হয়েছে সেখানে। ছোট্টুটা থাকলে ওকেই নিয়ে যেতাম। যা চটপট কর্।'

কী শুনছে গোগো? ঠিক শুনছে তো কানে? ছোট্টু মানে ছোটকা আর গোগো মিলে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, মেজকা সেটা জানে। আর সেই সঙ্গে যেটা মেজকা ভাবে সেটা হল সেইসব গোয়েন্দাগিরির আসল কৃতিত্ব ছোটকার। ধারণাটা যে কত ভুল, সেটা যদি আজ গোগো প্রমাণ করে দিতে পারে! হে ভগবান, আমার কথা যখন শুনেছো, ছোটকা না-থাকার সময় একটা রহস্যের ব্যবস্থা যখন করেইছো, তখন বাকিটা মানে সমাধানের ব্যবস্থাটাও কোরো!

মেজকা গাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। গোগো গিয়ে পাশে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মেজকা বললেন—'ঘটনাটা এখন পর্যন্ত আমি যেটুকু জানি, মানে মিঃ বিলমোরিয়া ফোনে যেটুকু বললেন, শুনে নে। বাকিটা ওঁর কাছে গিয়ে শুনবি।'

'মিঃ বিলমোরিয়া, মানে পার্শি?'

'হ্যাঁ। কলকাতা শহরের একজন বড় হিরের ব্যবসাদার। কাল সন্ধেবেলা ওঁর একজন পুরনো খদ্দের একটা হিরে যাচাই করার জন্যে ওঁর বাড়িতে নিয়ে আসে—'

'বাড়িতে কেন? ওঁর দোকান নেই?'

'আছে। বেশ বড় দোকান। আমি সেই দোকানে অনেকবার গিয়েছি। খদ্দেরটির বাড়িতে আসার কারণ দোকান তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আজও আবার বন্ধ। অথচ আগামী কাল সকালে খদ্দেরটি আবার বম্বে চলে যাবে বিশেষ কাজে। তাই খদ্দেবটিকে বাড়িতে আসতে বলেছিলেন মিঃ বিলমোরিয়া। তারপর যথাসময়ে খদ্দেরটি এসেছিল, হিরেটি দেখিয়েছিল। হিরেটি মাপে খুব বড় নয়, কিন্তু এত ভালো জাতের যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম হবে। তবে সে-রকম দাম কবুল করার আগে মিঃ বিলমোরিয়া হিরেটিকে আর ভালো করে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই খদ্দেরটিকে বলেছিলেন হিরেটি তাঁর কাছে রেখে যেতে আর আজ সকালে দশটায় আসতে।'

'তারপর?'

'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস বিলমোরিয়া শুয়ে পড়েন আর সেই ঘরে বসেই মিঃ বিলমোরিয়া ঘুমোবার আগে হিরেটি আবার পরীক্ষা করতে বসেন। পরীক্ষা করে বোঝেন হিরেটি এত ভালো যে সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া চলে। তারপর হিরেটি লোহার আলমারিতে তুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখেন মিসেস বিলমোরিয়া যথারীতি নীচে কিচেন-এ নেমে গেছেন। তারপর রোজকার অভ্যেসমতন মিঃ বিলমোরিয়া বাথরুমে যান এবং বাথরুম থেকে তাঁর লোহার আলমারি খোলার আওয়াজ পান। যেহেতু মিসেস বিলমোরিয়ার তখন উপরে উঠে আসার কথা নয়, তাই মিঃ বিলমোরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন আর দেখেন আলমারি খোলা, হিরের কৌটোটি উধাও। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসেন কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। ওঁর তিন ভাইপো ওঁর সঙ্গে থাকে, তাদের ঘরে গিয়ে দেখেন তারা তিনজনই ঘরে রয়েছে—'

'মিসেস বিলমোরিয়া আর ওই তিন ভাইপো ছাড়া আর কে থাকে বাড়িতে?'

'বেয়ারা, খানসামা, ড্রাইভার। পুরনো বিশ্বাসী লোক তিনজনই। তার মধ্যে ড্রাইভার সেই সময়ে বাজারে গিয়েছিল আর খানসামা আর চাকর নীচে কিচেন-এ তাঁর কাছে ছিল বলে মিসেস বিলমোরিয়া বলেছেন—।'

'ওই ক-জন ছাড়া আর বাড়িতে কেউ ছিল না?'

'না। একটি মাত্র মেয়ে রয়েছে মিঃ বিলমোরিয়ার। বিয়ে হয়ে বম্বেতে থাকে।'

'সন্দেহটা তাই তিন ভাইপোর উপর?'

'হ্যাঁ। যতদূর মিঃ বিলমোরিয়ার কাছে শুনেছি, লোক তিনজনের কেউই সুবিধের নয়। তিনজনের একজনকেও মিঃ বিলমোরিয়া দেখতে পারেন না। মিঃ বিলমোরিয়া অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ পার্শি। কিন্তু তিন ভাইপোই চেন স্মোকার। অথচ পার্শিদের দেবতা হল আগুন—তাই ধূমপান একটা মস্ত অপরাধ।'

গোগো জানত না ব্যাপারটা, অবাক হয়ে শুনল। তারপর কোন প্রশ্ন করার আগেই দেখল গাড়িটা একটা বাগানওয়ালা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি মেজকা-কে জিগ্যেস করল—'পুলিশে খবর দিয়েছেন মিঃ বিলমোরিয়া?'

'এখনও দেননি। তবে ব্যাপারটা তো এখনও ঘণ্টাখানেকের বেশি হয়নি। পুলিশে খবর দেবার সময় যায়নি। মিঃ বিলমোরিয়ার যেটা বড় চিন্তা এখন সেটা হল দশটার সময় সেই খদ্দের তাঁর হিরে ফেরত নিতে এলে তিনি কী করবেন। আর সেই পরামর্শের জন্যই আমাকে ফোন করেছেন।'

মেজকা-র আসার খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতেই বুঝি-নীচে নেমে এলেন মিঃ বিলমোরিয়া। ষাটের উপর বয়েস, শুকনো চেহারা। আরও বেশি শুকিয়ে গিয়েছেন বোধ হয় এই চুরির ঘটনায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বসার ঘরে ঢুকলেন আর তারপর চেয়ারে বসে মেজকা-কে বললেন—'যাক, আপনি এসে গিয়েছেন। এবারে বলুন মিঃ মুখার্জি, আমি কী করব।'

মেজকা বললেন—'বলছি। তার আগে আমার ভাইপো গোগো-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

মিঃ বিলমোরিয়া সখেদে বললেন—'বেচারাকে আজ কেন আনলেন? অন্য একদিন আনলে ওকে আমি অনেক হিরের গল্প শোনাতে পারতাম। তা এনেছেন যখন, ও তখন বরঞ্চ একটু গিয়ে বাগানের ফুল দেখুক।'

মেজকা বললেন—'না, এখানেই বসুক। হ্যাঁ, আপনি কী করবেন আমায় জিগ্যেস করছিলেন—'

'হ্যাঁ। বলুন, আমার সেই খদ্দেরের আসার সময় হয়ে এল। কী বলব তাকে?'

'হিরেটা যদি ফেরত দিতে পারেন তাহলে কী বলবেন সেটা নিশ্চয়ই আমাকে জিগ্যেস করছেন না—'

'না। কিন্তু হিরেটা ফেরত দিচ্ছি কোত্থেকে?'

'চুরির ঘটনার পর আপনার বাড়ি থেকে কেউ কি বাইরে গিয়েছে?'

'না। আমার মেজ ভাইপো রুসি বেরুতে যাচ্ছিল, আমি বেরুতে দিইনি।''

'তাহলে যেই চুরি করে থাকুক, হিরেটা এখনও এই বাড়িতেই আছে। আপনার আলমারি থেকে খোয়া গেলেও বাড়ি থেকে খোয়া যায়নি।'

শুনে মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—'আমি কি সেটা ভাবিনি মনে করছেন? এতক্ষণ হোমি, রুসি আর জাল—আমার তিন ভাইপোর ঘর আমি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করছিলাম—জানেন?'

মেজকা হেসে বললেন—'শুধু তাদের ঘর নয়, সেইসঙ্গে তাদের শরীরও যে তন্নতন্ন করেছেন, বুঝতে পারছি। আরও বুঝতে পারছি—ফল তাতে কিছু হয়নি। কেননা যে-ই হিরেটি চুরি করে থাকুক, ধরা পড়ার জন্যে নিজের ঘরে বা কাছে কখনই সে রাখবে না!'

মিঃ বিলমোরিয়া অধৈর্য হয়ে বললেন—'তাহলে কোথায় রাখতে পারে আমায় বলুন। আমি আবার খুঁজে দেখি—'

মেজকা বললেন—'তার আগে হিরের সাইজটা আমাকে একটা কাগজে এঁকে দেখান।'

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে কাগজ কলম নিয়ে মিঃ বিলমোরিয়া এঁকে ফেললেন। মেজকার হাতে কাগজটা দিতে গোগো ঝুঁকে দেখল—আকারে একটা মটরদানার মতন। কাগজটা দেখতে দেখতে মেজকা বললেন—'এবার বলুন, ওই হিরেটি যে কাল রাতের জন্যে আপনার কাছে থাকছে, এ-কথা আপনি ছাড়া আর কে কে জানত।'

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'রাতে খেতে বসার আগে ড্রয়িংরুমে বসে হিরেটি আমার স্ত্রীকে আমি যখন দেখাই আমার তিন ভাইপোই সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'চাকরবাকরদের কেউ তখন ঘরে এসেছিল?'

'না।'

'অর্থাৎ আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে বাদ দিলে মোট তিনজন—আপনার তিন ভাইপো শুধু জানত যে হিরেটি রাতে বাড়িতে থাকছে।'

'হ্যাঁ।'

গোগো মনে মনে মাথা নেড়ে বলল, 'তিনজন নয়, আর চারজন। যে-খদ্দের হিরেটি দিয়ে গিয়েছিল, খবরটা সে-ও জানত!'

মেজকা আবার প্রশ্ন শুরু করলেন—'আপনার ভাইপোদের তিনজনেরই নিশ্চয় হিরে-জহরত সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রয়েছে?'

মিঃ বিলমোরিয়া জবাব দিলেন—'কিছু তো থাকার কথা। একসময় তিনজনই আমার সঙ্গে দোকানে বেরুতো।'

'এখন আর বের হয় না?'

'না, এ-ব্যবসায়ে তিনজনের কারুরই কোনও উৎসাহ নেই দেখে আমি ওদের অন্য কাজকর্ম দেখতে বলে দিয়েছি। প্রত্যেককে টাকাও দিয়েছি সেই জন্যে।

'কী করে এখন তারা?'

'ভাইপো হোমি সেই টাকা নিয়ে একটা হোটেল খুলেছিল, চলেনি। আবার টাকা চাইছে আমার কাছে অন্য ব্যবসা করবে বলে।'

'মেজ ভাইপো রুসি?'

'সে-টাকা নিয়ে বম্বে গিয়েছিল সিনেমা তুলতে। সব টাকা খুইয়ে তারপর ফিরে এসে বাড়িতে বসে আছে।'

'আর টাকা চায়নি?'

'না। হোমিকে দিইনি দেখেই বোধ হয় চায়নি।'

'আর ছোটজন? যার নাম জাল?'

'সে টাকা নিয়ে সোজা ইংল্যাণ্ডে চলে গেল। কী করল সেখানে জানি না। তারপর বছরখানেক হল ফিরে এসে আবার টাকা চাইছে জাপানে গিয়ে মোটরগাড়ি তৈরি শিখবে বলে।'

'অর্থাৎ তিনজনেরই টাকার খুব প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ।'

গোগো মনে মনে বলল—টাকার প্রয়োজন সকলেরই। যার আছে, যার নেই—দু-জনেরই। তবে অসাধু যে সেই শুধু চেষ্টা করে চুরি, বাটপাড়ি করবার।

মেজকা আবার আরেক দফা প্রশ্ন শুরু করলেন—'আচ্ছা হিরেটি আলমারি থেকে উধাও দেখেই তো আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে তখনই তিন ভাইপোর ঘরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়ে কাকে কী অবস্থায় দেখলেন?'

'প্রথমে গিয়েছিলাম জাল-এর ঘরে। গিয়ে দেখলাম সে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে আর হাতে সদ্যধরানো একটা সিগারেট জ্বলছে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেটা বইয়ের আড়ালে লুকলো।'

'তারপর কার ঘরে গেলেন?'

'তারপর মেজ ভাইপো রুসির ঘরে। সে দেখলাম তার তামাক খাওয়ার পাইপটা পরিষ্কার করে তাতে তামাক ভরছে। আমাকে দেখে পাইপটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলল।'

'তারপর বড় ভাইপো-র ঘরে গিয়ে কী দেখলেন?'

'সামনে খালি চায়ের কাপ আর হাতে খবরের কাগজ, মুখে চুরুট। দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার কাছে বসেছিল সে। আমার পায়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল আর চুরুটটা ফেলে দিল তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে।'

মনের মধ্যে হিসেব টুকে নিল গোগো—তিন ভাই ধূমপান করে। বড় হোমি—চুরুট, মেজ রুসি পাইপ, ছোট জাল—সিগারেট। তারপর মেজকাকে ফিসফিস করে বলল—'কোন্ ঘরের কোন্ আলমারি থেকে চুরি গেছে সেটা একবার দেখা দরকার।'

মিঃ বিলমোরিয়া-র কান খুবই সতর্ক। সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করলেন—'কী বলছে আপনার ভাইপো?'

মেজকা হেসে বললেন—'খুব ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে তো। তাই বলছে—'কোন্ জায়গা থেকে চুরি হয়েছে সেটা দেখা দরকার। তা, কথাটা ঠিকই বলেছে। চলুন, জায়গাটা দেখি—'

মিঃ বিলমোরিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভেরি ব্রাইট বয়,' তারপর মেজকা-কে বললেন—'চলুন—'

মিঃ বিলমোরিয়ার পিছন-পিছন তাঁর বাংলো প্যাটার্নের দোতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে সিঁড়ির দু-পাশে সাজানো ফুলের টবগুলি লক্ষ করল গোগো। ওই মটরদানা মাপের একটা হিরে কত সহজেই না এই ফুলের টবগুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। কিম্বা বাইরের বাগানে অত যে ফুলের গাছ, তার যে কোনও একটার তলার মাটি খুঁড়ে। যে লুকোবে, তার নিশানা তাতে ঠিকই থাকবে, কিন্তু অন্যের পক্ষে খুঁজে পেতে হলে সবগুলি টব বা গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখতে হবে।

সিঁড়ির শেষে দোতলায় প্রথমে একটা ল্যান্ডিং বা ঢাকা জায়গা। তারপর একটা করিডোর আর সেই করিডোরের দু-পাশে পর পর ঘর। মিঃ বিলমোরিয়া হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—'বাঁ-দিকের প্রথম ঘরটা আমার বেডরুম যেখান থেকে আজ ভোরে হিরেটি খোয়া গেছে।'

মেজকা বললেন—'ডানদিকের প্রথম ঘরটায় কে থাকে?'

'কেউ না—ওটা ড্রয়িংরুম।'

'আপনার ছোট ভাইপো জাল কোনটায় থাকে?'

'ড্রয়িংরুমের পর ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরটায়। তারপর তৃতীয় বা শেষ ঘরটায় রুসি।'

'আর বড় ভাইপো হোমি?'

'বাঁ-দিকের শেষ ঘরটায় অর্থাৎ রুসির উল্টোদিকে।'

'আর বাঁ-দিকের দ্বিতীয় ঘরটায়? মানে, আপনার আর হোমির ঘরের মাঝখানের ঘরটায়?'

'জাল-এর ঘরের উল্টোদিকে ওটা ডাইনিং-রুম। ওই ঘরটা থেকেই দরজা রয়েছে ও-পাশের খোলা ছাদ বা বারান্দায় যাবার।'

অর্থাৎ, গোগো মনে মনে হিসেব করে নিল, যে-গাড়িবারান্দার তলায় এসে ওরা গাড়ি থেকে নেমেছিল, তারই উপরের বারান্দা।

'এক সেকেন্ড দাঁড়ান!' বলে মিঃ বিলমোরিয়া পর্দা সরিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এসে বললেন—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একজন প্রৌঢ়া মহিলা গুড মর্নিং বলে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ বিলমোরিয়া আলাপ করিয়ে দিলেন—'আমার স্ত্রী। আর ইনি আমাদের ল-ইয়ার মিঃ মুখার্জি। সঙ্গে ব্রাইট ছেলেটি মিঃ মুখার্জির ভাইপো।'

স্বামীর কাছাকাছি বয়েস মিসেস বিলমোরিয়ার। তবে চেহারা অত শুকনো নয়। মেজকা-কে বললেন—'যাক, আপনি এসে গেছেন। সকাল থেকে ওকে বলছি পুলিশে খবর দিতে, তা ও বলছে আপনি এলে পর পরামর্শ করে যা করার করবে।'

মেজকা বললেন—'হ্যাঁ, আগে ব্যাপারটা একবার নিজেরা আমরা বুঝে নি।'

মিসেস বিলমোরিয়া বললেন—'যাই, ততক্ষণ আমি আপনাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করিগে।'

মিসেস বিলমোরিয়া চলে গেলেন। ইতিমধ্যে গোগো ঘরটা ভালো করে দেখে নিয়েছে, এঁকে নিয়েছে মনে।

প্রথমে জানলা-দরজা। ঘরের দরজা দুটো। একটা যেটা দিয়ে তারা ঘরে ঢুকেছে এবং মিসেস বিলমোরিয়া বেরিয়ে গেলেন। অন্য দরজাটা ঘরের বাঁ-দিকে—নিশ্চয়ই বাথরুমের, সেখান থেকে তাঁর আলমারি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন মিঃ বিলমোরিয়া। জানলাও ঘরের দুটো—একদিকে। ঘরে ঢোকার দরজার উল্টোদিকে, গাড়িবারান্দার দিকে।

তারপর আসবাব। জোড়া খাট পাতা রয়েছে ঘরের মাঝখানে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে ড্রেসিং টেবিল। জানলা-দুটোর গায়ে ডিভান, ডানদিকের দেওয়ালে ওয়ার্ডরোব আর স্টিলের একটা আলমারি জানলার উল্টোদিকের দেওয়ালে, ঘরে ঢোকার দরজার ডান পাশে। আলমারিটার পাল্লা খোলা অর্থাৎ মিঃ বিলমোরিয়ার, যেটা থেকে হিরেটি খোয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কাল রাতে যখন মিঃ বিলমোরিয়া ওই আলমারিতে হিরেটি তুলে রাখছেন তখন জানলার বাইরে অন্ধকার গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে-কেউ সে-দৃশ্য দেখে থাকতে পারে। যে-কেউ বলতে তাঁর ভাইপোদের যে-কেউ।

মিঃ বিলমোরিয়া-র সঙ্গে গিয়ে মেজকা পাল্লা খোলা স্টিলের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোগো লক্ষ করল—জামাকাপড় আর জিনিস ঠাসা। মেজকা সেগুলি দেখতে দেখতে বললেন—'চুরির পর আলমারি আর বন্ধ করেননি দেখছি—'

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'আমার স্ত্রী বলেছেন পুলিশ না-আসা পর্যন্ত যা যেমন রয়েছে তেমনি রেখে দিতে।'

'ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, এই আলমারিতে দামি জিনিস মানে হিরে জহরত আর কিছু ছিল?'

'না। আমার ব্যবসা কীসের এ পাড়ার সবাই জানে। যা দিনকাল, বাড়িতে কখনও ও-সব আনি না। কালকের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল।'

'হিরেটি কোথায় রেখেছিলেন?'

'দ্বিতীয় তাকে—' মিঃ বিলমোরিয়া আঙুল দিয়ে দেখালেন—'বাঁ-দিকে ওই জামাকাপড়ের ভাঁজে।'

'ওইখানেই কি আপনি সাধারণত টাকাকড়ি বা প্রয়োজন পড়লে দামি জিনিসপত্তর রাখেন?'

'না, তার কোনও ঠিক নেই। ওই দেখুন না, আমার মানি-ব্যাগটা উপরের তাকে একেবারে চোখের সামনে রাখা রয়েছে।'

'ব্যাগটা তো নেয়নি দেখছি। কত টাকা ছিল আপনার ব্যাগে?'

'চারশো মতন—'

'আর কোনও টাকা রয়েছে কোথাও?'

'না।'

আলমারিতে গোগোর যা দেখবার, দেখা হয়ে গিয়েছিল। ফিস ফিস করে মেজকা-কে বলল—'ওই গাড়িবারান্দায় গিয়ে জানলাদুটোর বাইরেটা একবার দেখা দরকার।'

ভুরু কুঁচকে মেজকা বললেন—'কেন?'

'বেশ তো। চলুন না—'

মিঃ বিলমোরিয়ার পিছন-পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল গোগো আর মেজকা। তারপর করিডোর ধরে এগিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল। ঢোকার আগে ডানদিকের ঘরের দিকে একবার আড় চোখে দেখে নিল গোগো। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখল ইজিচেয়ারে বসে রয়েছে একজন যুবক, মানে জাল। হাতে বই কিন্তু চোখ বইতে নয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে গোগোদের দিকে।

ডাইনিং রুমের অন্য দরজা দিয়ে গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এসে গোগো লক্ষ করল গাড়িবারান্দায় যাতায়াতের দরজা শুধু ওইটাই। মিঃ বিলমোরিয়ার ঘরের মতন অন্য ঘরগুলিরও শুধু দুটো করে জানলা রয়েছে গাড়িবারান্দার দিকে।

মিঃ বিলমোরিয়ার ঘরের জানলা দুটোর কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল গোগো—একটা পোড়া দেশলাই-এর কাঠি পড়ে রয়েছে একটা জানলার কাছে। নিচু হয়ে কাঠিটা তুলে নিল গোগো। তারপর যা করল, হাঁ-করে তা দেখতে লাগলেন মেজকা আর মিঃ বিলমোরিয়া।

পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে সেই জায়গার মেঝেটা পরীক্ষা করতে লাগল গোগো। হামাগুড়ি দিয়ে ওই জানলার পাশের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল।

মেজকা জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু পেলি?'

গোগো হাসিমুখে বলল—'না। চলো আমার কাজ হয়ে গিয়েছে।'

'কিছুই তো পেলি না, বলছিস—'

'এই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটা পেয়েছি—আর কিছু নয়।'

মিসেস বিলমোরিয়া চা সাজিয়ে বসে ছিলেন ড্রয়িংরুমে। আর সকলের জন্যে চা, গোগোর জন্যে কোকো। সেই কোকোর কাপে একটা চুমুক দিয়ে গোগো মিঃ আর মিসেস বিলমোরিয়ার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল—'আজ বা কাল, আপনাদের দু-জনের মধ্যে কেউ কি ধূপ বা কোনও কিছু জ্বালিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি আপনাদের ঘরের জানলার বাইরে ফেলেছেন?'

মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'আমি ফেলিনি।'

মিসেস বললেন—'আমিও না। কেন?'

গোগো বলল—'আপনাদের ঘর যে-রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাতে ও-রকম অভ্যেস আপনাদের থাকার কথা নয়। তবু সাবধানের মার নেই। যাক, হিরেটি তাহলে কে চুরি করেছে, সেটা জানা গেল।'

মেজকা বললেন—'বলিস কী? কে?'

মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে বললেন—'কে? শিগ্গির বলো—'

মিসেস বিলমোরিয়া হাঁ-করে তাকিয়ে রইলেন গোগোর মুখের দিকে।

গোগো বলল—'হিরেটি চুরি হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি, কেননা আলমারি খোলার আওয়াজ পেয়েই মিঃ বিলমোরিয়া বেরিয়ে এসেছিলেন। অত অল্প সময়ের মধ্যে ওই আলমারি ঘেঁটে চোরের পক্ষে হিরেটি খুঁজে পাওয়া কখনই সম্ভব হত না যদি হিরেটি আলমারির কোন্ তাকে কোথায় রাখা রয়েছে সেটা চোরের আগে থেকে দেখা না-থাকত।'

মেজকা ঘাড় ঝুঁকিয়ে সায় দিলেন। মিঃ বিলমোরিয়া বললেন—'রাইট।' মিসেস বিলমোরিয়া হাঁ-করে শুনতে লাগলেন।

কোকোর কাপে আরেকটা চুমুক দিয়ে নিয়ে গোগো বলতে শুরু করল —মিঃ বিলমোরিয়া আলমারিতে হিরেটি তুলে রেখেছিলেন কাল রাতে। কোন্ তাকে, কোথায় সেটা তার

আগে কারু পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। দেখতে হলে চোরকে সেইসময়ে অর্থাৎ হিরেটি রাখার সময়ে দেখতে হয়। আর, দরজা বন্ধ ঘরে সেই দৃশ্য তাকে দেখতে হলে দেখতে হয় জানলার বাইরে ওই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে তাকে দেখতেও পাচ্ছে না কেউ।'

আবার সায় দিলেন মেজকা। মিঃ বিলমোরিয়া আবার বললেন—'রাইট।' মিসেস বিলমোরিয়া আরও হাঁ-করে শুনতে লাগলেন।

গোগো আবার বলতে শুরু করল, 'মিঃ বিলমোরিয়া হিরেটি কোথায় রাখেন সেটা দেখার জন্যে চোরকে ওইখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর সে-সময়ে সে যে ধূমপান করেছিল, এই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটাই তার প্রমাণ। এই কাঠিটা ওইখানে পড়ে থাকার অন্য কোনও কারণ নেই। অর্থাৎ, চোর ধূমপান করে এবং সে আপনার একজন ভাইপো।'

মিঃ বিলমোরিয়া একটু হতাশ হয়ে বললেন—'আমার ভাইপোদের একজন, সে তো আমি গোড়া থেকেই জানি। কিন্তু কোন্ জন ?'

গোগো হেসে বলল—'জানলার বাইরে শুধু এই পোড়াকাঠিটা পাওযা গেছে, আর কিছু নয়। তাতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না তিনজনের কোন্ জন ?'

মিঃ বিলমোরিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন—'কী করে বুঝব ?'

'আপনার ভাইপোদের মধ্যে একজন চুরুট খায় আপনি জানেন ?'

'হোমি খায়। তাতে কী ?'

'অন্য একজন পাইপ খায় ?'

'সে রুসি। তাতেই বা কী ?'

'আরেকজন সিগারেট খায় ?'

'জাল। তাতেই বা কী হচ্ছে ?'

হতাশ হয়ে মেজকা-র দিকে তাকাল গোগো। মেজকা-ও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। মিসেস বিলমোরিয়া অবাক বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন গোগোর মুখের দিকে।

গোগো হেসে বলল—'তবে শুনুন, চোর আপনার যে ভাইপো পাইপ টানেন, তিনি। অন্য দু-জনের একজন চুরুট খান, অন্যজন সিগারেট। তাঁরা হলে কিছু ছাইও পাওয়া যেত জানলার বাইরে। সে-ছাই এমনি চোখে দেখা না-গেলেও আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসে নিশ্চয় কিছুটা দেখা যেত। গুঁড়ো ছাই এমনকি ছাই রঙের কিছুটা ধুলো নিশ্চয়ই জানলার বাইরে যেখানে পোড়া কাঠিটা পড়েছিল, তার আশপাশে আমি দেখতে পেতাম। একমাত্র চোর যদি পাইপ খায় তাহলে সে-রকম কিছু না-পাওয়া সম্ভব।'

মিঃ বিলমোরিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—'রাইট। তার মানে রুসি।' আর বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ছুটে যেতে চাইলেন রুসি-র ঘরে।

গোগো বলল— 'দাঁড়ান। চোর যে আপনার পাইপটানা ভাইপো রুসি তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু তাকে গিয়ে বললেই বা ধমকালেই কি সে অপরাধ স্বীকার করবে, হিরেটি ফেরত দেবে ?'

মিঃ বিলমোরিয়া গর্জে উঠলেন—'আমি ওকে পুলিশে দেবো।'

গোগো হেসে বলল—'তা যদি পারতেন তাহলে আমার কাকাকে না-ডেকে আপনার স্ত্রীর কথা মতন প্রথমেই পুলিশ ডাকতেন।'

মিঃ বিলমোরিয়া যেন নিভে গেলেন। চুপসে বসে পড়লেন চেয়ারে।

গোগো জিগ্যেস করল—'আপনার পুলিশ না-ডাকার কারণটা কি আমি বলব?'

মিঃ বিলমোরিয়া কোনও উত্তর দিলেন না। মিসেস বিলমোরিয়া সাগ্রহে বললেন—'বলো, আমি জানতে চাই।'

'মিঃ বিলমোরিয়া যদি তাঁর খদ্দেরের ওই হিরেটা স্মাগল্ড্ বা চোরাই নয় বলে নিশ্চিত থাকতেন, তাহলে পুলিশেই খবর দিতেন প্রথম।'

শুনে চোখ বুজে ফেললেন মিঃ বিলমোরিয়া, হাঁ-হয়ে গেল আবার মিসেস বিলমোরিয়ার মুখ। সেই সঙ্গে কিছুটা বুঝি মেজকারও।

গোগো বলল—'কী হল, মিঃ বিলমোরিয়া? যান, গিয়ে হিরেটি নিয়ে আসুন রুসিসাহেবের ঘর থেকে। কোথায় লুকনো রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি—'

শোনামাত্র ফট করে চোখ খুলে গেল আবার মিঃ বিলমোরিয়ার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উত্তেজিত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন—'কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?'

'ওর তামাক খাওয়ার ওই পাইপের মধ্যে। ওই কারণেই আপনি চুরির পর তার ঘরে গিয়ে তাকে তার পাইপ পরিষ্কার করে তাতে তামাক ভরতে দেখেছিলেন। অত তাড়াতাড়ি হিরেটি লুকিয়ে রাখার মতন অত ভালো জায়গা আর কী হতে পারে, আপনিই বলুন না!'

মিঃ বিলমোরিয়া ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুরদুর করতে শুরু করল গোগোর বুক। চোখ বুজে একমনে প্রার্থনা করতে শুরু করল গোগো '—হে ভগবান, হিসেবটা যেন শেষপর্যন্ত ঠিক হয় আমার। আসলে না-হলেও তুমি ঠিক করে দিও—এতটাই যখন এ-পর্যন্ত করেছো!'

যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন মিঃ বিলমোরিয়া। তাঁর একহাতে প্যাঁচ-খোলা একটা পাইপের দুটো অংশ, অন্য হাতের দু-আঙুলে ধরা মটরদানার মতন একটা হিরে। গোগোর মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার কী-যেন বলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, শেষপর্যন্ত পারলেন না। এগিয়ে এসে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন গোগোকে।

তারপর মিঃ বিলমোরিয়া ছাড়েন তো মিসেস বিলমোরিয়া। তিনি ছাড়েন তো বাড়িতে অমন গম্ভীরমুখে ঘুরে বেড়ানো মেজকা!

আর তারপরই বেয়ারা এসে জানাল মিঃ চিমনলাল দেখা করতে এসেছেন। গোগোকে মুক্তি দিয়ে মেজকা হাতের ঘড়ি দেখলেন বললেন—'দশটা বাজে। অর্থাৎ যাঁর হিরে, সেই ভদ্রলোক! মিঃ বিলমোরিয়া, হিরেটি চোরাই বলে যদি এতটুকু সন্দেহ থাকে আপনার, তাহলে পুলিশে জানানো যে আপনার কর্তব্য সেটা আপনার উকিল হিসেবে আপনাকে আমি জানিয়ে দিলাম।'

এবারের গরমের ছুটিতে মেজকা সপরিবার কাশ্মির যাচ্ছেন। গোগোও যে তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে সেটা মেজকা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দাদা-বউদিকে। আর ছোটকা দার্জিলিং থেকে ফেরার আগেই রওনা হবেন মেজকা। ফিরে সব খবর শুনে কি আর ছোটকার মেজাজ থাকবে তেনজিং নোরকে-র গল্প করবার?

খবরের কাগজ

শ্রীধর সেনাপতি

ক্লাসে ওঠার পরে কিছু-কিছু নতুন বইও হাতে এসে গেছে। অভি বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বইয়ের পাতা খুলে মাঝেমধ্যে নাকের কাছে তুলে ধরছিল। নতুন বইয়ের গন্ধ বেশ ভালো লাগে অভির। আজ বাবার অফিস নেই। মণিকাকুর সঙ্গে ঘরের অন্যপাশে বসে গল্প করছেন। দিবাকর এসে টেবিল থেকে চায়ের খালি কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে গেল।

তাকে দেখে মণিকাকু বাবাকে বললেন, ''শিশিরদা, আপনি দেখছি বাড়ির কাজের জন্যে লোক পেয়ে গেছেন।''

বাবা খুশি-খুশি গলায় বললেন, ''হ্যাঁ। মাস দুই হয়ে গেল। বেশ চটপটে। আর অতি সরল।''

দিবাকর ফের এসে অভির কাছে দাঁড়াল। নিরীহ গলায় বলল, ''অভিদা, মা তোমারে ডাকতিছেন গো। হরলিকস খাবে এসো।''

দিবাকরের বয়স বছর বাইশ-তেইশ। গোলাকার মুখ। ওপর-পাটির সামনের একটা দাঁত আধখানা ভাঙা। দাঁতটা কালো হয়ে গেছে। কথায় এখনও গ্রামের টান। অনেক দোষ। শুনে অভি আগে খুব হাসত। দিবাকর বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। তবু সে তাকে অভিদা বলে ডাকে বাড়িতে আসার প্রথম দিন থেকে। অভিও তাকে ডাকে দিবাকরদা বলে।

দিবাকর সিঁড়ির নীচে থাকে। তার একটা টিনের স্যুটকেস আছে। তাতে বড় গোলাপফুল আঁকা। স্যুটকেসের ভেতরে দিবাকরের শুধু একখানা কাচা কাপড় আর গেঞ্জি থাকে। অভি দেখেছে।

অভির নতুন বইগুলো একটা মোটা শক্ত কাগজে প্যাক করে বাড়িতে আনা হয়েছিল। সেই কাগজখানা দেখে দিবাকর বলল, ''অভিদা, কাগজটা আমারে তুমি দিবা? আমার বাস্কোটার ভিতর পেতে জামা-কাপড় রাখব।''

অভির কাছ থেকে কাগজখানা সে পেল। স্যুটকেসের ভেতরে পাতা ছিল একখানা পুরনো খবরের কাগজ। সেটাকে টেনে বের করল। তারপর সেখানে প্যাকিং কাগজটাকে যত্নের সঙ্গে পাতল। কাপড় গেঞ্জি সাজিয়ে রাখতে রাখতে ভাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসিমুখে বলল, ''দুবছর আগে আমাদের পাশের গেরামে বুড়া শিবের মেলা থিকে বাস্কোটা কিনেছিনু। সেই বাস্কোওলাই তখন খপরের কাগজটা আমারে দেছিল।''

পাশেই দাঁড়িয়েছিল অভি। তার নজরে এল পুরনো খবরের কাগজখানায় ছোটদের ছড়া, গল্প, ছবি রয়েছে। সে আগ্রহের সঙ্গে কাগজখানা হাতে তুলে নিল। গল্প আর ছড়াগুলো একবার পড়ে নিয়ে কাগজখানা ফেলে দেওয়া যাবে।

রাত্রে বিছানায় শোবার আগে অভি পুরনো খবরের কাগজখানা নিয়ে বসল। প্রথমে দুটো ছড়া পড়ল। বাহ্, বেশ মজার ছড়া। একটা ছোট্ট গল্প রয়েছে। সেটা পড়তে গিয়ে একজনের ওপরে অভির ভীষণ রাগ হল। ইশ! ঠিক গল্পটার ওপরেই দু-তিন জায়গায় রবার স্ট্যাম্প মেরে লেখাটাকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভালো করে পড়া যায় না। অপরাধীকে হাতের কাছে পেলে অভি নিশ্চয়ই শাস্তি দিত। বিরক্ত হয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে সে টেবিলে বইখাতার ফাঁকে গুঁজে রেখে শুয়ে পড়ল। কাল দিনের আলোয় ফের পড়বার চেষ্টা করা যাবে।

দিবাকরের কাছে অভি রোজ অনেক গল্প শোনে। সেসব গল্প গ্রামের মানুষ, বনজঙ্গল, মাঠ ঘাট নদী শ্মশানকে জড়িয়ে। অভি মনে মনে দিবাকরের তারিফ করে খুব। হাবাগোবা মতন দেখতে হলে কী হবে, তার গ্রাম্য ভাষায় অদ্ভুত একটা টান দিয়ে দিয়ে সে যা গল্প বলে অভি শুনে খুবই মজা পায়। আর, সব গল্পের নায়ক দিবাকর নিজে।

একদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে ঘুরে এসে পুরনো খবরের কাগজখানা উলটে-পালটে দেখতে লাগল অভি। তারপর দিবাকরকে শুধোল, ''শহর তোমার ভালো লাগে না?''

দিবাকর একটু থেমে জবাব দিল, 'ইখানে মা, বাবু, তোমারে আমার খুবই ভালো নেগেছে গো অভিদা! তবু গাঁ-গেরামের কথা মনে পড়লি মন খারাপ হয়ে যায়। উদাস উদাস হয়ে যায়। ইখানে কাজে তখন মন বসতি চায় না।''

অভি জিজ্ঞেস করল, ''তোমার শহরে আসাটা কি এই প্রথম?''

''হ্যাঁ। এই যে চাদ্দিকে এত হই-চই, মানুষ, গাড়ি, কত বড়-বড় বাড়ি। ই বাব্বাঃ! কী সব কাণ্ড! হাবড়া ইস্টিশনে গাডি থিকে নাববার পরই সেই যে আমার বুকটো ধড়ফড় করতি নেগেছে, এখনও যেন থামতি চায না। কাল বিকালে খেয়েদেযে মা আর বাবুর সনে তুমি মামাবাড়ি যাবে শুনিছি। আমি বাড়ি থিকে বেরোবনি বাবা; মা'রে বলে দিচ্ছি। তোমরা যাও। বাড়ির দরজা-জানলা সেঁটে দে আমি বসি থাকব।''

অনেক দিন পরে এক বেলার জন্যে অভি বাবা-মা'র সঙ্গে মামাবাড়ি যাবে। তাই খুব আনন্দে ছিল। কিন্তু এখন ভীষণ মন খারাপ। বন্ধুর বাড়ি থেকে সে একটা সাঙ্ঘাতিক কথা শুনে এসেছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করবে? মাকে? সত্যি কি তেমন কিছু কখনও ঘটে বা ঘটতে পারে? অভি বিছানায শুযে অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিযে পড়ল অভি। বাঁধাঘাটে গিয়ে লঞ্চের টিকিট কাটল। গঙ্গা পেরিয়ে আহিরিটোলা ঘাটে পৌঁছে লঞ্চ থেকে নেমে একজনকে জিজ্ঞেস করল,''আহিরিটোলা স্ট্রিটটা কোথায়?'' নতুন একটা উত্তেজনায় আর অজানা ভয়ে তার বুক ঢিপ-ঢিপ করছে।

বাবাকে বা মাকে না বলে অভি কখনও কোথাও যায় না। বেলা যত বাড়ে, অভিকে বাড়ি ফিরতে না দেখে দারুণ দুর্ভাবনায় মা চোখের জল রোধ করতে পারেন না। শিশিরবাবু তাঁর চেনাজানা নানান জায়গায় অভির খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। অভির বন্ধুরাও কোন খবর দিতে পারল না। শেষে পুলিশের সাহায্য নিতে তিনি থানায় গেলেন। ব্যাপার দেখে দিবাকর যেন পাথর। তার দু চোখে রাজ্যের ভয় নেমে এসেছে। মুখ দিয়ে আর রা বেরোয়

না। মাঝেমাঝে সেও চোখ মুছতে থাকে।

তিন-চার ঘণ্টা বাদে বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনে উদ্বিগ্ন শিশিরবাবু ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন। দেখলেন, পুলিশের একখানা জিপ থেকে দু'জন অফিসার সাদা পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক আর অভিকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন।

পরে জানা গেল, সাদা-পোশাক-পরা ভদ্রলোকের নাম তিমির দে। আহিরিটোলা স্ট্রিটে একটা ওষুধের দোকানের মালিক। তাঁর বাড়িতে পাঁচ মাস আগে দিবাকর কাজে লেগেছিল। তখন তার নাম বলেছিল, দুলাল। দেখতে হাবাগোবা। বলেছিল, শহরে এই প্রথম এসেছে। মাত্র মাসখানেক পরেই একদিন বাড়ি থেকে ঘড়ি, আংটি, কলম, টেপরেকর্ডার আর নগদ হাজার-বারোশো টাকা চুরি করে নিয়ে সে গা ঢাকা দেয়। তখনই অবিশ্যি থানায় ডায়েরি করা হয়েছিল। অভির চিন্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর তৎপরতায় দুলাল ওরফে দিবাকর এতদিন বাদে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। হ্যাঁ। পুরনো খবরের কাগজখানা তারই বাড়ির।

অভি জানাল, দিবাকরকে তার সন্দেহ হত না যদি না বন্ধুর বাড়িতে অভি শুনে আসত যে, বাড়ির কাজে নতুন লোক লাগাবার সময় লোকটির পরিচয় জেনে তার এক কপি ফোটো তুলে রাখা উচিত। কেউ কেউ নাকি চুরি-ডাকাতি করে পালায়। কিন্তু দিবাকরদার মতন মানুষ চোর-ডাকাত হতেই পারে না! কথাটা মনে রেখেই অভি গতকাল দিবাকরকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। দিবাকর বলেছিল, শহরে সে আগে আর কখনও আসেনি। অভির মনে পড়ল, দিবাকরের স্যুটকেসটি দুবছর আগে গ্রামের মেলা থেকে কেনা। স্যুটকেসের ভেতর থেকে সে যে খবরের কাগজটি ফেলে দেয়, সেটা ওই মেলাতে স্যুটকেসওলাই দিয়েছিল। অথচ খবরের কাগজটির তারিখ অভি লক্ষ করেছিল, পাঁচ মাস আগেকার। কাগজের ওপরে একটা ওষুধের দোকানের রবারস্ট্যাম্পের ছাপ। তবে পুরনো কাগজ তো, হাত ঘুরে অন্য কোনও জায়গা থেকেও আসতে পারে। যাইহোক, তারিখ অনুযায়ী দিবাকরের কথামতো কাগজখানা তার স্যুটকেসে কখনও আসতে পারে না। দিবাকর তো তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে! অভির মনে তখন একটা সন্দেহ কাঁটার মতো বিঁধে গেল। পুরনো খবরের কাগজের ওই সূত্র ধরেই দিবাকর সম্পর্কে গোপনে একটা খোঁজখবর নিলে কেমন হয়?

নিজের মনের সন্দেহ আর কৌতূহল নিরসন করতে অভি সকালে পুরনো খবরের কাগজটিকে নিয়ে শালকে থেকে কলকাতা দৌড়েছিল। তিমিরবাবুর দেখা পেয়ে হুবহু বর্ণনা দিয়েছিল দিবাকরের।

অভির কাজের জন্যে সবাই বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু অভি এখন প্রায় হতভম্ব! আজ বিকেলে বাবা-মা'র সঙ্গে অভি মামাবাড়ি চলে যেত। ওই সুযোগে দিবাকর কি ওদের বাড়ি থেকেও জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে পালাত? অপরাধ একবার সে করে ফেলেছিল ঠিকই। তবে এখন তো দিবাকর ভালো হয়েও যেতে পারে!

আদি পর্ব

জয়ন্ত চৌধুরী

ভারতবিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মণীশ গুপ্তর নাম আজ কে-না জানে? স্বয়ং পুলিশ কমিশনারসাহেব কোন জটিল কেসের কূলকিনারা করতে না পারলে মণীশ গুপ্তকে ডাকেন পরামর্শের জন্যে।

কিন্তু এই বিখ্যাত লোকটির সাফল্যের আদিপর্ব অর্থাৎ একেবারে গোড়াকার ইতিহাসের সঙ্গে বোধ হয় অনেকেই পরিচিত নয়। সেই গোড়াকার কথাই আজ বলব।

সে আজ কুড়ি বছরেরও আগেকার কথা। ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কাছে একটা বেঞ্চে বসে এক আধবয়সী ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছিলেন, এমন সময় একটি কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে তাঁর পাশে এসে বসল। শ্যামবর্ণ, চোখদুটো বেশ বড় বড় এবং জ্বলজ্বলে, লম্বাটে গড়ন। পরণে আধময়লা খাটো ধুতি এবং সস্তাদরের খেলো একটা টুইল সার্ট।

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় বলে উঠল, ''একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার?''

ভদ্রলোক বলে উঠলেন—''আমাকে বলছ?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ-আপনাকেই বলছি। বলছিলুম আপনার সন্ধানে কোন চাকরি-বাকরি খালি আছে? ভদ্রলোকের ছেলে, বেকার বসে আছি; দয়া করে একটু যদি সুলুক-সন্ধান বলে দেন।''

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন—''তুমি কি কাজ করতে চাও?''

''আজ্ঞে, যে কাজ দেবেন।''

একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন—''হাইকোর্টের জজিয়তি যদি দিই,—পারবে?''

ছেলেটি একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিলে —''হাইকোর্টের জজিয়তি করবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি যদি থাকত, তাহলে আপনার কাছে বোধ হয় আসতুম না স্যার।''

ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে একবার আড়-চোখে চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললেন—''হুঁ!'' —তারপর পূর্বের মতোই সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একসময় ভদ্রলোক বলে উঠলেন—''দূরে ওই ঝোপটার কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আদ্দির পাঞ্জাবি গায়।

ও লোকটি সম্বন্ধে তোমার মনে কী ধারণা হয়?''

ছেলেটি বলে উঠল—''তা কেমন করে বলব স্যার? তবে যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি।''

''বেশ বল।''

''যেকোন কারণেই হোক, আপনি ও-লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।''

''কীসে বুঝলে?''

''এটা বোঝা আর শক্ত কি স্যার? আপনি লোকটার দিকে একবার চাইলেনও না, অথচ লোকটা যে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার গায়ে যে আদ্দির পাঞ্জাবি রয়েছে, সেটা লক্ষ করেছেন। এথেকে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছেন, অথচ লোকটি যাতে সে কথা জানতে না পারে, তার জন্যও চেষ্টার কসুর নেই। এথেকে এটা আবিষ্কার করা আদৌ শক্ত নয় যে, আপনি লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কেমন, ঠিক কিনা বলুন স্যার?''

ভদ্রলোক আবার চুপ করে গেলেন এবং পূর্বের মতোই অন্যমনস্ক-ভাবে সিগারেট টানতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন—''তুমি কাল সকাল নটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। কার্ডে ঠিকানা রইল।''

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক হাইকোর্টের দিকে হন হন করে পা চালিয়ে দিলেন। ছেলেটি কার্ডটা হাতে নিলে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তার সেই ঝোপটার দিকে। সে যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। দেখলে, আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ঝোপের ধারের সেই লোকটিও হাইকোর্টের দিকে চলতে শুরু করেছে।

ছেলেটি আপন মনেই বললে—''ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না।'' তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠল—''চুলোয় যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।''

কথাটা শেষ করেই সে কার্ডখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। পরক্ষণেই বড় বড় চোখদুটো তার আরও বড় হয়ে উঠল। কার্ডের ওপর লেখা ছিল—''প্রভাত গাঙ্গুলি, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।—নং ক্রিক রো।''

কার্ডখানা পকেটে ফেলে সে আপনমনে বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগল—''কি আশ্চর্য! বিখ্যাত ডিটেকটিভ প্রভাত গাঙ্গুলির সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করছিলুম?—অতবড় একটা লোকের সঙ্গে কথা কইছি.তা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম, তাহলে কি অমন করে যা-তা আবোল-তাবোল বকতুম? ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক কি মনে করলেন?''

কিন্তু পরক্ষণেই একটা অভূতপূর্ব আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল। এই অদ্ভুতকর্মা লোকটির সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কত কথাই না সে এতদিন শুনে এসেছে। আজ সেই লোকটি শুধু তার সঙ্গে আলাপ করেনি, তাকে বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার জন্যে কার্ড দিয়ে গেছে। এর চেয়ে সৌভাগ্য তার পক্ষে আর কী হতে পারে?

পরদিন বেলা ঠিক নটার সময় ছেলেটি প্রভাত গাঙ্গুলির ক্রিক রোর বাসায় গিয়ে হাজির। প্রভাতবাবু তাকে সুমুখের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারটার ওপর হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে বললেন—''তোমার নামটি তো এখনও পর্যন্ত শুনলুম না।''

"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীমণীশচন্দ্র গুপ্ত।"

"বেশ!—দেশ কোথায়?"

"আজ্ঞে, বারাসতের কাছে।"

"হুঁ!—কলকাতায় চাকরির সন্ধানে এসেছ বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কতদূর পর্যন্ত পড়েছ?"

"আজ্ঞে, ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ফি জোগাড় করতে পারিনি বলে পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা লেটারপ্যাড তুলে নিয়ে কি লিখতে বসলেন।

লেখা শেষ হলে কাগজটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে মণীশের হাতে দিয়ে বললেন—"খামের ওপর যে ঠিকানা দিলুম, সেই ঠিকানায় গিয়ে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমাকে কাজ দেবেন।"

খামটা হাতে নিয়ে মণীশ জিজ্ঞেস করলে—"আজ্ঞে, তাঁর ওখানে কী কাজ করতে হবে?"

"সেটা তিনিই তোমাকে বাত্‌লে দেবেন। আমি কেবল গোটা-কতক কথা তোমাকে বলতে চাই। মন দিয়ে শুনে যাও। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যাঁর কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন একজন ভারতবিখ্যাত লোক। লোকটি যেমন ধনী তেমনি পণ্ডিত। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নি। যে-বাড়িতে তোমাকে পাঠাচ্ছি সে-বাড়িতে তিনি একাই থাকেন, আর থাকে চাকর-বাকর এবং কয়েকজন কর্মচারি। বাড়িটাকে তিনি পুরোদস্তুর একটি মিউজিয়াম করে তুলেছেন। দোতলার একটা ঘরে তিনি নিজে থাকেন। পাশের ঘরে থাকে মিউজিয়ামের কয়েকজন কর্মচারি এবং তারও ওপাশের ঘরে থাকে চাকর-বাকরেরা। একতলাটা খালিই পড়ে থাকে। তেতলার ঘরগুলোতে থাকে তাঁর মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলো। কতবকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সংগ্রহ যে তাঁর আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর কোন কোন সংগ্রহ খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছরেরও আগেকার। এই সব সংগ্রহের পিছনে ভদ্রলোক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। সে যাক, এখন কাজের কথা বলি। আজ কয়েকদিন হল ভদ্রলোকের সংগ্রহাগার থেকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি গেছে। জিনিসটা হচ্ছে অশোকের সময়কার একটি অটুট বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটা একটি আস্ত নীলা থেকে কুঁদে বার করা।

এই চুরির কিনারা করবার জন্যে ভদ্রলোক সম্প্রতি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। তোমাকে ওখানে পাঠাচ্ছি চাকরি করবার জন্যে বটে, কিন্তু সেইটেই তোমার আসল কাজ নয়। ওখানে তুমি যে-কাজই করনা কেন, জানবে—সেটা আসলে হচ্ছে লোক দেখানো ব্যাপার। তোমার আসল কাজ হচ্ছে ওবাড়ির চাকর-বাকর এবং কর্মচারিদের ওপর নজর রাখা। কেমন করে নজর রাখবে বা বিশেষ করে কার কার ওপর নজর রাখবে সেটা এখান থেকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; ওখানে থাকতে থাকতে তুমি নিজেই সেটা বুঝতে পারবে। প্রতিদিন রাত নটার পর আমার সঙ্গে দেখা করে ওখানকার খবরাখবর দেবে। আমার চিঠি নিয়ে আজই বিকেলের দিকে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। বেশ করে চারিদিকে নজর রাখবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না, তা সে যেই হোক না কেন।"

বেলা পাঁচটা আন্দাজ মণীশ গিয়ে হাজির হল নবগোপালবাবুর বাড়িতে। পেল্লায় তেতলা বাড়ি; বড় বড় জানালা-দরজা, লম্বা লম্বা হল। ইয়া উঁচু উঁচু তলা। বসত-বাড়ি না বলে তাকে আফিস বাড়ি বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে গদিমোড়া একটা দামি চেয়ারে বসেছিলেন নবগোপালবাবু। রোগা জরাজীর্ণ চেহারা, বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণই চেহারায় পরিস্ফুট। গায়ে একটা গলাবন্ধ লংক্লথের কোট। পায়ে একটা সাধারণ কট্‌কি চটি।

প্রভাত গাঙ্গুলির চিঠিটা পড়া শেষ করে চশমার পুরু কাঁচদুটোর ভিতর দিয়ে মণীশের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"ওই চেয়ারটাতে বসো। তোমার নামই মণীশ গুপ্ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, তোমাকে আমি আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিতে চাই। কি কাজ তোমাকে দিই বলতো? বুঝতেই তো পারছ মিউজিয়ামের কাজটা হচ্ছে একটা অছিলা মাত্র। আসলে তোমাকে করতে হবে গোয়েন্দাগিরি। এখন আসল কথা হচ্ছে, তোমাকে কি কাজ দেওয়া যায়।"

তারপর কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন—"আচ্ছা হয়েছে; তুমি আজ থেকে হলে আমার পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। আজ থেকেই তাহলে কাজে লেগে যাও—কেমন? এখানকার অদ্ভুত চুরির সম্বন্ধে প্রভাতবাবুর কাছ থেকে সবই শুনেছ নিশ্চয়; সুতরাং সে-সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার দরকার হবে না বোধ হয়?"

মণীশ বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই শুনেছি। কেবল একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বল, কী জানতে চাও?"

"বলছিলুম, আপনি কি আপনার কর্মচারিদের কাউকে সন্দেহ করেন?"

"না না আদৌ নয়, আদৌ নয়। আমার বিশ্বাস কোন দর্শকই এই কাজ করেছে। প্রতিদিন বহু লোকই তো মিউজিয়াম দেখতে আসে। তাদেরই কেউ সম্ভবত মূর্তিটা সরিয়েছে। ছোট্ট একরত্তি জিনিস বৈ তো নয়।"

"আচ্ছা, আপনারা কখন টের পান যে মূর্তিটা চুরি গেছে?"

"চুরির বোধহয় এক মিনিট পরেই।"

"তখুনি দর্শকদের সব আটক করে তাদের জামা-কাপড় সার্চ করলেই তো পারতেন।"

"তাও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।"

"আপনার কর্মচারিদের জামা-কাপড় সার্চ করেছিলেন?"

"না, তা করা হয়নি। তার কারণ যে তিনজন কর্মচারি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং বহুকালের লোক। তাদের সন্দেহ করতে গেলে নিজেকেও সন্দেহ করতে হয়। প্রভাতবাবু অবশ্য এজন্যে আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে আমি আদৌ ভুল করিনি।"

মণীশ বললে—"আপনি এদের যত পারেন বিশ্বাস করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার আসল পরিচয়টা দয়া করে এদের দেবেন না।"

'আরে না না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব।—এঁরা কি রাত্রে এখানেই থাকেন?''

''হ্যাঁ!—ওঁদের শোবার ঘর তেতলায়। খাওয়া-দাওয়াও ওঁদের এইখানেই হয়। তোমার সম্বন্ধে অবশ্য কোন রকম বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পার; আবার না ইচ্ছে করলে অন্যরকম ব্যবস্থাও করতে পার। বিকালের চা খাওয়াটা আমরা একসঙ্গেই করে থাকি। ঠিক ছ-টার সময় আমরা চায়ের টেবিলে বসি। ওই সময় চা খেতে-খেতে আমাদের কাজের কথা হয়। তুমি ইচ্ছে করলে ওই সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো।''

একটু ভেবে মণীশ বললে—''বিকেলে আপনাদের চায়ের টেবিলে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে দরকার হবে বলে মনে করি। কেন না, ওই সময় ওঁদের তিনজনকেই একসঙ্গে পাব এবং সে সুযোগে ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টাও হয়ে যাবে।''

আজ তিনদিন হল মণীশ নবগোপালবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে বহাল হয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে ছ-টার সময় নবগোপালবাবুর চায়ের টেবিলে হাজরে দিতে সে ভোলে না। এর ফলে মিউজিয়ামের কর্মচারি তিনটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তিনজনেরই বয়স ষাটের ওপর। বহুকাল থেকে এই কাজে এঁরা লেগে রয়েছেন। মিউজিয়ামটি এঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। এর উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এঁরা চিরটাকাল প্রাণপণে খেটে এসেছেন এবং এখনও খাটছেন। সত্যিই এঁদের সন্দেহ করতে মন কিছুতেই চায় না।

নবগোপালবাবুর ওখানেই মণীশ তার শোবার ব্যবস্থা করেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল—কি করা যায় এখন? একটা কোন সূত্র ধরে তাকে এগুতে হবে তো; কিন্তু কোন সূত্রই তার হাতের কাছে নেই। বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগল কীভাবে কাজ শুরু করা যায়?

ভাবতে ভাবতে রাত একটা বাজল, দুটো বাজল, তিনটে বাজল, তবু কোন সূত্রই সে খুঁজে পেল না। এমনি করে আরও একটা ঘন্টা কেটে গেল। দূরে একটা গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বেজে গেল। হঠাৎ মণীশ লাফিয়ে উঠল—হয়েছে, হয়েছে, একটা উপায় মাথায় এসেছে। হ্যাঁ, হবার হলে ওইতেই কাজ হবে নিশ্চয়ই। উৎসাহে এবং আনন্দে তার মনটা ভিতরে ভিতরে নেচে উঠতে লাগল!

পরের দিন বিকাল ছ-টার সময় নবগোপালবাবু চায়ের টেবিলে বসেছেন। তাঁর সামনা-সামনি তিনটে চেয়ার দখল করে বসেছেন হরিহর চাটুয্যে, মন্মথ দত্ত আর প্রবোধ মিত্তির; অর্থাৎ মিউজিয়ামের তিন জন প্রধান কর্মচারি। একটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে মণীশের জন্যে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হরিহরবাবু বললেন,—''মণীশবাবুকে দেখছি না কেন?''

নবগোপালবাবু বললেন—''তাকে পাঠিয়েছি একটা কাজে; বোধ হয় আটকে পড়েছে কোথাও।''

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্তভাবে মণীশ ঘরে ঢুকল এবং নিজের চেয়ারটা দখল করে বসেই বলে উঠল—''আজ একটা ভারি ইন্টারেস্টিং খবর আছে স্যার!''

একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে নবগোপালবাবু বললেন—''তাই নাকি! কী খবর শুনি?''

মণীশ শুরু করলে—"আজ্ঞে ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটা নাগাদ ভারি খিদে আর তেষ্টা পেয়ে গেল। আমি তখন ধর্মতলার মোড়ে। সমুখেই বেশ বড় গোছের একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লুম। সবকটা টেবিলই ভর্তি, কেবল ঘরের কোণে একটা টেবিল খালি ছিল, অগত্যা সেইটেই দখল করে বসলুম।

আপন মনে চা খাচ্ছি, এমন সময় একটি লোক তাঁর নিজের সিট ছেড়ে আস্তে উঠে এসে আমার পাশের চেয়ারটাতে বসলেন। আধাবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে মটকার দামি পাঞ্জাবি, হাতে সোনার রিস্টওয়াচ; ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ শুরু করলেন, "আপনার নামটি শুনতে পাই কি?"

বললুম—"আমার নাম মণীশ গুপ্ত। কেন বলুন তো?"

ভদ্রলোক একটা চাপাহাসি ঠোঁটের ডগায় এনে খুব মোলায়েম সুরে বললেন—"তাহলে আমি বোধহয় নবগোপালবাবুর নবনিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে কথা বলছি?"

বললুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক একটা মোটা সিগার ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে গলাটাকে অত্যন্ত খাটো করে বললেন—"আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বরটা দয়া করে টুকে রাখবেন কি?"

বললুম—"কেন বলুন তো?"

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—"দরকার হতে পারে তো।"

বললুম—"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আগের মতোই খাটো এবং মিহিকণ্ঠে বললেন—"নবগোপালবাবুর মিউজিয়ামের মহামূল্য জিনিসগুলোর প্রতি যথেষ্ট লোভ আছে, এরকম লোক কলকাতার শহরে দু-চার জন থাকাটা আপনি কি অসম্ভব মনে করেন? অবশ্য তার জন্যে উপযুক্ত খরচ করতেও তারা পিছপা নন। দু-দশ হাজার টাকা তাঁদের কাছে কিছুই নয়, অথচ আপনাদের মতো ছাপোষা লোকের কাছে সেটা হয়তো অনেক কিছু, কেমন, নয় কি? যাই হোক, যদি কখনও দরকার বোঝেন,তাহলে..."

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক পকেট থেকে ফাউন্টেনপেন বের করে একটা কাগজে নাম ঠিকানা এবং ফোন-নম্বর টুকে আমার হাতে দিলেন। তারপরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি কিন্তু পরশু বম্বে রওনা হচ্ছি। যদি কোন কথা থাকে তা হলে কাল রাত ঠিক ন-টার সময় আমাকে ফোন করবেন। আচ্ছা নমস্কার!"

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে গেলেন। আমি কেমন যেন হতভম্বের মতো বসে রইলুম।

নবগোপালবাবু বললেন—"কই দেখি দেখি সেই কাগজটা।" তারপর কাগজটা চোখের সুমুখে মেলে ধরে পড়তে লাগলেন—"নির্মলচন্দ্র লাহিড়ি, —নং ফণী মিত্রের লেন, কলিকাতা। ফোন নং ৩৫....।"

কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে নবগোপালবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হরিহরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন—"কিছু মনে করবেন না স্যার, আমাকে একটু উঠতে হল। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন...। বোধ হয় ব্লাড্‌প্রেসারটা...। আপনারা বসুন, আমি একটু...।"

নবগোপালবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলেন—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কাউকে ডাকব না কি?—সঙ্গে যাবে?"

না, না, দরকার হবে না, আমি নিজেই ঠিক যেতে পারব।''—বলেই ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই দিনই রাত্রে মণীশ গিয়ে দেখা করলে প্রভাতবাবুর সঙ্গে। তাকে দেখেই প্রভাত গাঙ্গুলি বলে উঠলেন—''আজ নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে?''

''কী করে জানলেন স্যার?''

''তোমার মুখের চেহারা সেকথা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে। কোন সূত্রটুত্র পেলে নাকি হে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই চেয়ারটাতে ভালো করে বসো।''

চেয়ারে বসে মণীশ বললে—''আজ্ঞে সূত্রটুত্র কিছুই পাইনি, তবে সূত্র একটা নিজেই বানিয়ে নেব ঠিক করেছি। আপনাকে কিন্তু সেসম্বন্ধে এখন কিছুই বলবনা স্যার।''

''কিছুই বলবে না?''

''আজ্ঞে না। আমাকে দয়া করে নিজের মতো কাজ করতে দিন স্যার। কিছু মনে করবেন না তো? তাহলে অবশ্য...''

বাধা দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন—''আরে না, না, কিছুই মনে করব না। তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? নিজের ওপর বিশ্বাস থাকাই তো দরকার।''

উৎসাহ পেয়ে মণীশ বলে উঠল—''আপনাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে স্যার।''

''কী কাজ বল।''

''কাল রাত ঠিক নটার সময় এক জায়গায় আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।''

''বেশ, ভালো কথা। আর কিছু করতে হবে আমাকে? হুকুম করো।''

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মণীশ বললে—''কি যে বলেন স্যার, তার ঠিক নেই, আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন।''

একটু হেসে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন—''আরে না না, ঠাট্টা করতে যাব কেন? চিয়ার্ আপ্ ইয়ং সোলজার। এই তো চাই। নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা না থাকলে কেউ কখনও বড় হতে পারে? এখন তোমার বক্তব্য বলে দাও দেখি।''

''আজ্ঞে রাত ঠিক ন-টার সময় আমার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে একজন ফোন করবে, আপনাকে নয়, অন্য একজন লোকের নামে।''

''বেশ তারপর?''

''যে নামেই ফোন করুক, আপনি জানাবেন আপনিই সেই লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন—''আপনার নাম কি মণীশ গুপ্ত?'' উত্তর আসবে—না, আমার নাম মণীশ গুপ্ত নয়, আমার নাম অমুক। তারপর লোকটি আপনাকে জানাবে যে সে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়। আপনি খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলবেন,—বেশ, আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। আপনি হাসছেন স্যার?''

''না, না হাসতে যাব কেন। আমি তোমার হাতমুখ নাড়ার সুন্দর ভঙ্গিটি উপভোগ করছিলুম।''

''আপনি তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোনেন নি?''

প্রভাত গাঙ্গুলি মুখে বললেন বটে যে মণীশের কথা তিনি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছেন, আসলে কিন্তু তিনি এই ছেলেটির ছেলেমানুষি এবং তার চেয়ে তার সরল আত্মবিশ্বাসটুকু বেশি করে উপভোগ করছিলেন।

পরদিন রাত ন-টার কিছু আগে প্রভাতবাবুকে মণীশ তার আত্মীয়ের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক ন-টার সময় ঝন্‌ঝন্‌ করে টেলিফোন-যন্ত্রটা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি হাঁকলেন—"হ্যাল্লো—কে আপনি? —হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন কি বলবার আছে। কি বললেন? —একটা জিনিস আমাকে দেখাতে চান, —আজই, এখুনি? বেশ তো। —আপনার নাম—মণীশ গুপ্ত? —কি বললেন?—আপনি মণীশ গুপ্ত নন?—বেশ, বেশ। —নামেতে কি আসে যায়।—তাহলে আপনি আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন, —হ্যাঁ এখুনি —আচ্ছা নমস্কার।"

আধ ঘন্টাও বোধহয় কাটেনি, হঠাৎ একটা ট্যাকসি এসে দরজার সম্মুখে দাঁড়ালে। মণীশ বললে—"আমি পাশের ঘরে রইলুম স্যার। ঠিক সময় বুঝে এসে হাজির হব।"

পরক্ষণেই উড়ে বেয়ারার পেছনে পেছনে একটি বৃদ্ধ লোক ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটা টিনের কৌটো। প্রভাতবাবু তাঁকে খাতির করে বসালেন। ভদ্রলোক ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"জিনিসটা নির্ভয়ে দেখাতে পারি বোধ হয়?"

"সম্পূর্ণ নির্ভয়ে; এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। শুধু আপনার জন্যই নয়, আমার নিজের জন্যেও যথেষ্ট সাবধান হবার দরকার আছে; সে কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

এরপর টিনের কৌটোটার ভিতর থেকে যে জিনিসটি বেরুল, তার দিকে চেয়ে প্রভাতবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কী আশ্চর্য! এ যে নবগোপালবাবুর সেই নীলার বুদ্ধমূর্তি!

এই সময় সহসা পাশের ঘরের পর্দাটা হঠাৎ সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল মণীশ।

সেইদিক পানে একবার মাত্র চেয়েই বৃদ্ধলোকটি বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মৃদু হেসে মণীশ বললে—"এই যে হরিহরবাবু, তারপর, ভালো আছেন তো? হঠাৎ এখানে কি মনে করে?"

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কেবল একটিমাত্র কথা—"শয়তান!"

পরের দিন সকালে নবগোপালবাবুর অফিস-ঘরে নবগোপালবাবু এবং প্রভাত গাঙ্গুলি সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসে কথা কইছিলেন। আর একটা চেয়ারে বসেছিল মণীশ গুপ্ত।

নবগোপালবাবু মণীশের দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, তুমি কি হরিহরবাবুকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে?"

মণীশ বললে—"আজ্ঞে না, বরং ওঁর ওপর আমার গোড়ায় সন্দেহই হয়নি। ওঁর ওপর প্রথম সন্দেহ হল সেই দিন, যেদিন রেস্তোরাঁর সেই কাল্পনিক লোকটির কথা আপনাদের কাছে বানিয়ে বলি। আপনার মনে আছে বোধ হয়, যেই আপনি আমার কাছ থেকে ভদ্রলোকের ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর চেঁচিয়ে পড়লেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই হরিহরবাবু অসুস্থতার অছিলা করে ঘর

ছেড়ে উঠে গেলেন। মনে পড়ছে বোধ হয় আপনার?''

''হ্যাঁ খুব মনে পড়ছে। কিন্তু তা থেকে তাঁর ওপর সন্দেহ করবার কী আছে তা তো বুঝতে পারলুম না।''

একটু হেসে মণীশ বললে—''ঠিক ওই রকম একটা কিছুই আমি আশা করেছিলুম। আমি জানতুম চায়ের দোকানের কাল্পনিক ভদ্রলোকটির ঠিকানা এবং ফোন নম্বর শোনবামাত্রই আপনার তিনজন কর্মচারির মধ্যে একজন না একজন ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন। কারণ নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর, এতগুলো জিনিস একবার শুনে টাটকা-টাটকি মনে রাখা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অতগুলো জিনিস গোল পাকিয়ে যেতে পারে; সুতরাং যদি কেউ ওগুলোকে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে কোন কাগজে বা খাতায় টুকে ফেলা, নয় কি?''

প্রভাত গাঙ্গুলি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন, এইবার আপন মনেই বলে উঠলেন—''সাবাস ছোকরা!''

মণীশ বলে চলল—''আমি তখুনি বুঝেছিলুম, ভদ্রলোক কাল রাত্তিরেই ফোন করবেন। কেননা আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি আগেই জানিয়ে রেখেছিলুম, ভদ্রলোক কালই বম্বে চলে যাচ্ছেন।''

সব কথা শুনে নবগোপালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন—''আমি যদি মণীশকে আমার কাছে রাখি, আপনার আপত্তি আছে কি প্রভাতবাবু? মাইনেটা যাতে ওর মতন প্রতিভাবান ছেলের উপযুক্ত হয়, সেদিকে অবশ্য আমার দৃষ্টি থাকবে।''

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলি বললেন,—''আমি কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি না নবগোপালবাবু। ওর প্রতিভা আপনার মিউজিয়ামের জন্যে নয় নবগোপালবাবু, ওর প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে, নয় কি?''

কচুরিপানা রহস্য

মঞ্জিল সেন

সকালে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলস্যভরে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিলেন সদাশিব মিত্র। হঠাৎ একটা শিরোনামায় তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। তিনি পড়লেন :

''তেজারতি ব্যবসায়ীর রহস্যজনক মৃত্যু।

গতকাল সকাল এগারটায় কদমপুরের খালে কলিকাতার ধনী তেজারতি ব্যবসায়ী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সাহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। শ্রীসাহার বড়বাজারের গদিতে খোঁজ করিয়া জানা গিয়াছে গত পরশু বিকালে তিনি কদমপুরে শ্রীরামজীবন রায়ের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্বে শ্রীরায় ব্যক্তিগত কারণে বসতবাটী বন্ধক দিয়া শ্রীসাহার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন। গত পরশু ছিল ওই টাকা শোধ দিবার শেষ তারিখ। অন্যথায় চুক্তি অনুযায়ী শ্রীরায়ের বসতবাটী শ্রীসাহার নিকট হস্তান্তরিত হইবে ইহাই ছিল চুক্তি-পত্রের শর্ত।''

''পুলিশের নিকট শ্রীরায় বলিয়াছেন যে শ্রীসাহা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। টাকা ধার লইবার কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুলিশকে যাহা বিভ্রান্ত করিতেছে তাহা হইল, শ্রীরায় বলিয়াছেন তিনি সুদসমেত আসল-টাকা-পাই-পয়সা শ্রীসাহাকে মিটাইয়া দিয়াছিলেন, এবং শ্রীসাহা সেই মর্মে একটি রসিদও শ্রীরায়কে দিতে ভুলেন নাই। উক্ত রসিদ এবং চুক্তিপত্র, যাহা টাকা ফিরিয়া পাইবার পর শ্রীসাহা ফেরত দিয়াছিলেন, শ্রীরায় পুলিশকে দেখাইয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, মৃত শ্রীসাহার নিকট কোনও টাকা পাওয়া যায় নাই। তাহার মাথার পিছনে অনেকটা জায়গা ফুলিয়া ছিল। পুলিশের ধারণা, শক্ত কিছু দিয়া সাহাকে পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিয়া তাহার অচৈতন্য দেহ খালের জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় জলে ডুবিয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।''

সদাশিবের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি আবার গোড়া থেকে ঘটনাটা পড়তে শুরু করলেন।

দাশু এসে জানাল ইনসপেক্টার সাহেব এসেছেন। সদাশিবের মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে আসতে বললেন, সেই সঙ্গে আরও এক পেয়ালা কফির কথাও বলে দিলেন।

ঘরে ঢুকেই সমর গুহর চোখ চলে গেল খবর কাগজের খোলা পাতার ওপর।

''ওঃ, আপনার তবে পড়া হয়ে গেছে।'' অনেকটা যেন নিশ্চিন্ততার সুর ফুটে ওঠে গুহর গলায়।

''হ্যাঁ, এইমাত্র পড়লাম,'' সদাশিব সকৌতুকে বললেন, ''আপনার ঘাড়ে চেপেছে বুঝি কেসটা ?''

''আর বলেন কেন!'' গুহ একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল, ''কদমপুর থানা থেকে লালবাজারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আর অমনি ডি. সি. আমাকে ডেকে কেসটা গছিয়ে দিলেন—সেই যে প্রবাদ আছে না, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আমার অবস্থা হয়েছে তাই। কোথায় সেই কদমপুর, এখন যাও সেখানে!''

''কোথায় জায়গাটা ?'' সদাশিব মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

''ক্যানিং লাইনে, ট্রেনে যেতে হবে।'' একটু ইতস্তত করে গুহ বলল, ''ভাবছিলাম আপনিও যদি আমার সঙ্গে যেতেন!''

''আমি!''

''চলুন না, একটু বেড়িয়েও আসবেন আর আপনার মগজের ধূসর কোষের একটু নাড়াচাড়াও হবে।'' গুহ শেষের কথাটা একটু কৌতুক করে বলল। অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে সদাশিবের নেশা সে জানে বলেই অমন কৌতুক করল।

সদাশিবও হাসলেন, বললেন, ''কাগজের রিপোর্ট ছাড়া আর কি তথ্য জোগাড় করেছেন, বলুন শুনি।''

''রামজীবন রায় হলেন ওখানকার একজন গণ্যমান্য মানুষ। দুপুরুষ আগেও অবস্থা ছিল খুব ভালো, আসলে ওদের হল জমিদারি বংশ। গোটা কদমপুরটাই ছিল ওদের খাস দখলে। জমিদারি যাবার পর থেকেই অবস্থা পড়ে আসে। তবে বাড়িটা নাকি প্রকাণ্ড—চকমিলানো দালান, বড় বড় মহল, নাটমন্দির—কোন কিছুরই অভাব নেই।

রামজীবন রায়ের অবস্থা পড়ে এসেছে। বছর দুই আগে ফাটকাবাজিতে তিনি এমন দেনায় জড়িয়ে পড়েন যে অবিলম্বে দশ হাজার টাকা জোগাড় করতে না পারলে তার বাড়ি, জমি সব ক্রোক হয়ে যাবে এমন অবস্থা হয়। কোনও উপায় না দেখে তিনি কৃষ্ণবল্লভ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাহা লোকটি, যা খবর পেয়েছি, মহা ধড়িবাজ ছিল। এসব ব্যাপারে টাকা ধার দিতে সে যেন মুক্তহস্ত, শর্ত থাকে নির্দিষ্ট দিনে টাকা শোধ করতে না পারলে খাতকের স্থাবর সম্পত্তি তার অধিকারে বর্তাবে। এ ধরনের শতকরা প্রায় নব্বুইটি ক্ষেত্রে খাতক টাকা শোধ দিতে পারে না।

এভাবে প্রচুর সম্পত্তি সাহার দখলে এসেছিল—এ ভেরি প্রফিটেবল অ্যান্ড রোয়িং বিজনেস।

''রামজীবন রায়ের বাড়ির ওপব সাহার লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কম করেও ওটার এখনকার দাম কয়েক লাখ টাকা তো হবেই। মাত্র দশ হাজার টাকায় সম্পত্তিটা হাতে আসবে এই আশায় সে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ওর গদির ম্যানেজারের কাছে সে কথা নাকি বলেছিল। রামজীবন রায় ওকে টাকাটা শোধ করে দেবেন এটা সে কল্পনাই করতে পারেনি।''

''রামজীবন রায় টাকাটা পেলেন কোথায় ?'' সদাশিব জানতে চাইলেন।

''হ্যাঁ, সে খবরও আমরা পেয়েছি কদমপুর থানার ও-সি'র কাছ থেকে। রামজীবন রায় নাকি বলেছেন সম্প্রতি ফাটকাবাজিতে তিনি প্রায় কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন,

তা থেকেই সাহার টাকা সুদে-আসলে মিটিয়ে দিয়েছেন।''

''ভেরিফাই করেছেন খবর?''

''হ্যাঁ, রামজীবনবাবু সত্যি কথাই বলেছেন।''

''আই সি!''

দাশু এসে আর এক পেয়ালা কফি দিয়ে গেল।

''কে কে আছে রামজীবনবাবুর বাড়িতে?'' সদাশিব আবার প্রশ্ন করলেন।

''স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন। একমাত্র ছেলে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে, ওখানেই হোস্টেলে থাকে। ছুটি-ছাটায় বাপের কাছে যায়। বাড়িতে ভদ্রলোকের খাসচাকর সুদর্শন আর একজন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই।''

''অত বড় বাড়িতে মাত্র তিনটি প্রাণী।''

''হ্যাঁ। ফলে সুদর্শনের ওপর চাপ বড্ড বেশি।''

''রামজীবন রায় কী বলছেন?''

''টাকা মিটিয়ে দেবার পর তিনি ঘরের দরজা খুলে সাহাকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তাকে নাকি উনি খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে যেতে দেখেন।''

''খালপাড়?'' সদাশিব ভুরু কুঁচকোলেন।

''হ্যাঁ। স্টেশন থেকে 'রায় ভবনে' যেতে বাড়ির কাছে একটা খাল পড়ে। বেশ বড় খাল, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় মাইলখানেক চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে অনেকটা ঘুরপথ হয়, তাই বহুদিন থেকেই খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। 'রায় ভবন' ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই বসতি শুরু, তাই কিছু লোক নৌকোয় খাল পার হয়ে সময় সংক্ষেপ করে। তবে গাঁয়ের লোক ঘুরপথে হেঁটে যাওয়াটা কষ্ট মনে করে না, তাদের অভ্যেস আছে।''

''সাহা তবে খেয়া পার হয়েই গিয়েছিলেন?''

''হ্যাঁ।''

''ভালো কথা, রামজীবন রায় নিজে দরজা খুলে দিলেন কেন সাহাকে? সুদর্শন না কি বললেন চাকরের নাম, তাকে ডাকলেন না কেন?''

''ওই যে বললাম, তার কাজের খুব চাপ, অন্য কাজে সে ব্যস্ত ছিল বলে রামজীবন তাকে আর ডাকেননি!''

''হুঁ। রামজীবনবাবু সাহাকে কি নৌকোয় উঠতে দেখেছিলেন?''

''অন্ধকার হয়ে এসেছিল, তিনি শুধু তার আবছা মূর্তিটা এগিয়ে যেতে দেখেছিলেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দেন।''

''খেয়া নৌকোর মাঝিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে?''

''হ্যাঁ, সাহাকে সে ওপারে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি আর ফেরেননি।'

''স্ট্রেঞ্জ! রামজীবনবাবুর বয়স কত?''

''তা পঞ্চাশ তো হবেই, কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। কদমপুর থানার দারোগাই এসব খবর জানিয়েছে।''

''ও। রামজীবনবাবুকেই নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে?''

''হ্যাঁ, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু তিনি বলছেন, খুনের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। টাকা শোধ দিয়ে রসিদ পেয়ে গেছেন, তিনি কেন অমন মূর্খের মতো কাজ করবেন!''

‘‘তিনি যে টাকা দিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই একশ’ টাকার নোট, দশ হাজার তো কম নয়। ওগুলোর নম্বর তার কাছে টোকা আছে?’’

‘‘না। তিনি বলেছেন, নম্বর রাখা দরকার মনে করেননি! তবে একটা নোট নাকি একটু ছেঁড়া ছিল, সাহা প্রথমে ওটা নিতে চায়নি।’’

সদাশিব কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ‘‘রসিদ আর চুক্তিপত্র ফেরত নেবার পর রামজীবনবাবু সাহাকে পেছন থেকে ডান্ডা মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিলেন। তারপর টাকাটা আবার হাতিয়ে ওকে কাঁধে করে ধরে নিয়ে খালের জলে ফেলে দিয়েছিলেন। এটাই তো পুলিশের থিয়োরি?’’

‘‘হ্যাঁ। খালটা ‘রায় ভবন’ থেকে কাছেই, তা ছাড়া ভদ্রলোক জোয়ান পুরুষ, এমন কিছু একটা কঠিন কাজ নয় তার পক্ষে।’’

‘‘সুদর্শন কিছুই দেখেনি, কিম্বা ঠাকুর?’’

‘‘না। প্রকাণ্ড বাড়ি, ওরা দু’জন যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল।’’

‘‘তবে আর আপনি এত ভাবছেন কেন?’’ সদাশিব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, ‘‘আপাতদৃষ্টিতে সিম্পল মার্ডার কেস।’’

‘‘মুশকিল হচ্ছে কি জানেন,’’ কফির পেয়ালাটা শেষ করে গুহ বলল, ‘‘ডাক্তারি মতে মাথার পেছনে এত জোরে আঘাত করা হয়েছে যে সাহার জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে বাধ্য। অথচ তার হাতের মুঠিতে একটা কচুরিপানার পাতা শক্ত করে ধরা ছিল।’’

সদাশিব মুহূর্তে সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চোখদুটো শিকারী বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

‘‘বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে,’’ সদাশিবের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করে মৃদু হেসে বলল গুহ।

‘‘খালে বুঝি কচুরিপানা আছে?’’ সদাশিব প্রশ্ন করলেন।

‘‘হ্যাঁ, প্রচুর। সাহা নিশ্চয়ই তবে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়নি, তা যদি হত তবে কচুরিপানার পাতা আঁকড়ে ধরত না।’’

‘‘হয়তো ডুবে যাবার মুহূর্তে ঠান্ডা জলের প্রভাবে কিম্বা ডুবন্ত মানুষের নিজের অজ্ঞাতেই বাঁচার তাগিদে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল,’’ সদাশিব তার তুষারশুভ্র রেশমি চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন।

‘‘তবে কি আপনার যাওয়া দরকার আছে বলে আপনি মনে করেন না?’’

গুহ একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল।

‘‘চলুন, ঘুরে আসি। জায়গাটা না দেখে পাকাপাকি কোন মতামত দেওয়া উচিত হবে না বোধ হয়।’’

সেদিনই বিকেল তিনটের ট্রেনে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে তারা কদমপুর চললেন। স্টেশনে নেমে গুহ জিজ্ঞেস করল, ‘‘রিক্‌শায় যাবেন, না নৌকোয় খাল পার হয়ে যাবেন?’’

‘‘সাহা তো খেয়া পার হয়েই গিয়েছিল?’

‘‘হ্যাঁ’’, জবাব দিলেন ওখানকার থানার দারোগা। গুহর কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি স্টেশনে এসেছিলেন। সদাশিবকে দেখে তার দু’চোখে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠল—খ্যাতির মহিমা এমন, যখন ছড়ায় বাতাসের বেগে ছোটে।

‘‘তবে আমরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করব,’’ সদাশিব মৃদু হেসে বললেন। ‘‘হয় তো তার ফলে মাথায় কোনও আইডিয়া আসতে পারে।’’

খালটা স্টেশনের খুব কাছে নয়। বেশ কিছুটা হেঁটে তবে খালের ফেরিঘাটে তারা পৌঁছুলেন।

দারোগাবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে ঘাটের মাঝি নৌকাটা তাদের সামনে নিয়ে এল। বয়স হলেও জবর চেহারা লোকটির, মিশমিশে কালো, আর যেন পাথর কুঁদে কাটা শরীর। মাংসপেশি কিলবিল করছে। সদাশিব মুগ্ধবিস্ময়ে তাকালেন। হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড় পরেছে মাঝি, উর্ধাঙ্গ নগ্ন।

''জল আসবে,'' পুব আকাশে একখণ্ড কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে মাঝি বলল।

''গতকালের আগের দিন বিকেলে এক বাবুকে নৌকোয় পার করেছিলে মনে আছে?'' সদাশিব প্রশ্ন করলেন।

''কেন থাকবে না।'' বৈঠা বাইতে বাইতে জবাব দিল মাঝি! সুয্যি ডোবার মুখে বাবু এয়েছিল। ওই বাবুই সেদিন আমার নৌকোর শেষ মানুষ ছিল।''

''তাকে আর তুমি দেখনি?''

লোকটি মুহূর্তের জন্য বৈঠায় টান না দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল সদাশিবের মুখের দিকে, তারপর বলল, ''না। কাল একটু বেলায় তাকে খালের জলে ভাসতে দেখা গেছিল।''

''তোমার নৌকোয় তবে ফেরেননি তিনি?'' সদাশিব প্রশ্ন করলেন।

সদাশিবের প্রশ্নে মাঝি যেন একটু বিরক্ত হল, বলল, ''ফিরবেনই যদি তবে খালের জলে তার দেহটা ভাসবে কেন!''

''তা বটে,'' সদাশিব অন্যমনস্কভাবে জলে হাত ডোবালেন। দু'পাশে কচুরিপানা, নৌকাটা মাঝখানে পরিষ্কার জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় নৌকোটা রোজ বেশ কয়েকবার এপার-ওপার করে বলে নৌকার পথটা কচুরিপানায় ঢেকে যায়নি। সদাশিব হাতটা তুললেন, তাঁর হাতের মুঠোয় একটা কচুরিপানার পাতা।

''এখানে বডিটা ভাসছিল, দারোগাবাবু কচুরিপানার ধার ঘেঁষে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। সদাশিব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ দেখতে লাগলেন।

তারা ওপারে গিয়ে পৌঁছুলেন। খালের পারটা কিন্তু বেশ উঁচু। ওখান থেকেই 'রায় ভবন' চোখে পড়ে। সত্যিই প্রকাণ্ড দালানবাড়ি। বেশ কিছু বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। একটা পাকা রাস্তা খালপার থেকে সোজা 'রায় ভবন' পর্যন্ত চলে গেছে। নিশ্চয়ই রায় বংশের কেউ নিজেদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য পথটা বানিয়েছিলেন, সদাশিব মনে মনে ভাবলেন।

বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে একটা বড় জানালা তাঁর চোখে পড়ল।

''ওটা কোন্ ঘরের জানালা?'' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

''লাইব্রেরি-ঘরের,'' জবাব দিলেন দারোগাবাবু, আচমকা এই প্রশ্নে তিনি যেন একটু অবাকই হয়েছেন, কথা না বলে খালের জলের সমতল থেকে জানালাটা কতটা উঁচু তা মনে মনে একটা হিসেব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। জানালা থেকে যেখানে মৃতদেহটা ভাসছিল সেই নির্দিষ্ট স্থান চোখে পড়ে কিনা, তাও আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলেন তিনি।

''হ্যাঁ,'' অনেকটা আপনমনেই যেন তিনি বললেন, ''কাউকে বয়ে খাল পর্যন্ত আনা অসম্ভব কিছু নয়। চলুন, এবার 'রায় ভবন' অভিযান করা যাক।''

তার দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই , বেশ লম্বা, কালো একজন লোক দরজা খুলে তাদের সামনে দাঁড়াল। সদাশিব অনুমান করলেন, এ-ই সুদর্শন। লোকটির মাথায় কাঁচা-পাকা

চুল, মুখে একটা ভারিক্কি ভাব বনেদি বাড়ির চাকরদের মুখে যেমন ঔদ্ধত্যের ছাপ চোখে পড়ে।

"তুমি আগে থেকেই আমাদের আসতে দেখেছ?" গুহ প্রশ্ন করল। তার প্রশ্নে একটু খোঁচা ছিল, যেন লোকটি লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছিল, ধরা পড়ে গেছে। সুদর্শনের মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর ঘটল না।

"আমি ভাঁড়ার ঘরে কাজ করছিলাম। জানালা দিয়ে আপনাদের এদিক পানে আসতে দেখলাম," নির্বিকারভাবে সে জবাব দিল।

সদাশিব এগিয়ে এলেন।

"সাহাবাবু পরশু সন্ধেবেলা তোমার বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে যাবার সময় ওই ভাঁড়ার ঘরেই তুমি ছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ,"। সুদর্শন ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"তবে সাহাবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে তোমার চোখে পড়া উচিত ছিল?"

সুদর্শন দু'পাশে ঘাড় নাড়াল।

"সে কথা সত্যি—আমি যদি কোন কাজ না করে জানালা দিয়েই বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম তবে অবশ্য চোখে পড়ত," লোকটার কথায় যেন মৃদু শ্লেষ, "কিন্তু আমি সেদিন কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

"জানলা দিয়ে একবারও বাইরে তাকাওনি?" সদাশিব আবার প্রশ্ন করলেন, "কিংবা সদর দরজা খোলা কি বন্ধ হবার শব্দও কানে যায়নি তোমার?"

"না, আমি জানলা দিয়ে বাইরেও তাকাইনি, দরজা খোলা বা বন্ধ হবার শব্দও শুনিনি। যে ভদ্রলোক বাবুর কাছে এসেছিলেন তিনি কখন গিয়েছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।"

"ভাঁড়ার ঘরটা একটু দেখব," সদাশিব হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমাদের নিয়ে চলো তো।"

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল, ওরা তিনজন তার অনুসরণ করলেন। একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে সুদর্শন ছোট একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ঘরের দরজা ঠেলা মেরে খুলে ফেলল।

সদাশিব খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খালের পাড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"আপনি চট করে গিয়ে সদর দরজাটা খুলুন, আবার বন্ধ করুন," সমর গুহর কানে কানে তিনি বললেন।

সমর গুহ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সদাশিব জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিটখানেক পরেই জমিদার বাড়ির সেগুন কাঠের ভারি দরজার পাল্লা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ স্পষ্ট ভেসে এল তাঁর কানে।

সুদর্শনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এই তবে ব্যাপার, অ্যাঁ! হয় তুমি কোনও কারণে সত্যি কথা বলনি কিম্বা পরশু যে-বাবু দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি সজ্ঞানে হেঁটে এ বাড়ি থেকে বেরোননি," হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, লোকটির দিকে তাকিয়ে চোখদুটো বড় বড় করে বললেন, "তোমাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!"

সুদর্শন মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, "এদিক পানে যদি আপনি এসে থাকেন তবে হয়তো দেখেছেন। আমার এ-গাঁয়েই জন্ম, এখানেই আছি বরাবর।"

সদাশিব চিন্তিত মুখে চিবুকে হাত বুলোতে লাগলেন।

''সাক্ষী আছে কেউ, তোমার কথা সত্যি, শপথ করে বলবে?'' আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

''আমার দাদা আমার সাক্ষী,'' সুদর্শন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, ''আমার দাদা এখানকার খেয়াঘাটের অনেক দিনের মাঝি।''

''ওঃ হো, মাঝি!'' সদাশিবের মুখে এবার হাসি ফুটল, ''তোমাদের দুজনের চেহারায় খুব মিল, তাই তোমার মুখ চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। তোমার দাদা, অ্যাঁ! বেশ, বেশ, আমার বোঝা উচিত ছিল।'' তাঁর গলার স্বরে মনে হল যেন ওদের সম্পর্কটা একটা জরুরি কিছু ব্যাপার। কিন্তু তাঁর পরের প্রশ্ন ও-প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না, ''সেদিন তোমার মনিব আর সেই ভদ্রলোক কতক্ষণ এক সঙ্গে ছিলেন?''

''তা আমি ঠিক বলতে পারব না! খাবার আগে ছাড়া বাবুর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি, সে প্রায় দু'ঘন্টা বাদে।''

''হুঁ! তার মানে ভদ্রলোককে আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় খালের জলে ফেলে দেবার প্রচুর সময় ছিল।''

সদাশিব যেন আপন মনেই বললেন, ''ঠাকুর কোথায ছিল?''

''রান্নাঘরে, রান্না করছিল।''

''সে কিছু দেখেনি?''

''না''।

''ঠাকুরকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই,'' সদাশিব দরজার দিকে এগুলেন, তারপরই হঠাৎ দাঁড়িয়ে দারোগাকে লক্ষ করে বললেন, ''অ্যারেস্ট হিম, কুইক।''

দারোগাবাবু ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেলেন, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে সুদর্শনের দু-হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিলেন। সুদর্শন প্রতিবাদ কবাব জন্য হাঁ করল, কিন্তু গলা দিযে কোনও শব্দ বেরুল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুহ ফিরে এল। ব্যাপারটা দেখে সে-ও কম অবাক হযনি, তাবপরই সদাশিবকে লক্ষ করে সবিস্ময়ে বলল, ''এ লোকটাই তবে খুনি!''

সদাশিব কিন্তু দুপাশে ঘাড নাড়লেন।

''সুদর্শন খুনের ব্যাপারে সাহায্য করেছে, কিন্তু আসল খুনি ও নয়—''

''না, আমি খুন করিনি,'' সুদর্শনের গলা থেকে যেন আতঙ্ক ঝরে পড়ছে; ''সত্যি বলছি, ওই বাবু বাড়ি থেকে বেরুবার পব আব আমি তাকে দেখিনি।''

''তবে উনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, অ্যাঁ!'' সদাশিবের প্রশ্নটা যেন বুলেটের মতো ছিটকে বেরুল; ''একটু আগেই না তুমি বলেছিলে, ভদ্রলোককে বেরুতে দেখনি তুমি!''

সুদর্শনের মুখটা ঝুলে পড়ল, দুচোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

''আমি খুন করিনি'', বিড়বিড় করে ও বলল, ''আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। আমি এ ঘরেই ছিলাম, বেরোইনি।''

''জানি তুমি খুন করনি,'' সদাশিব তাকে থামিযে দিলেন, ''সেজন্য তোমার হাতে বালা পরানো হয়নি। তুমি যাতে আসল অপরাধীকে সাবধান করে না দিতে পার তাই তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।''

''কিন্তু কে সে?'' গুহ আর কৌতূহল চাপতে পারে না।

সুদর্শনকে ঘরের ভেতর রেখে বাইরে থেকে ঘরটা বন্ধ করে সদাশিব বললেন, ''খুনি হচ্ছে সুদর্শনের দাদা, খেয়ার মাঝি।''

ওরা চটপট বেরিয়ে পড়লেন। নৌকো ওপারে ছিল, তাদের দেখে মাঝি এপারে আসার জন্য নৌকো ছেড়ে দিল।

ওপারে যাবার সময় কেউ কোন কথা বলল না, মাঝি কিন্তু আড়চোখে ওদের লক্ষ করছিল, সেটা সদাশিবের দৃষ্টি এড়াল না। খালের ওপারেই একটা কুঁড়ে ঘরে মাঝি একা থাকে। নৌকো তীরে ভিড়েছে, সেই মুহূর্তে দারোগা আর গুহ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতে হাতকড়া এঁটে দিল। লোকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী, অতর্কিতে অমনভাবে আক্রান্ত না হলে তাকে কাবু করা গুহ আর দারোগার পক্ষে কঠিন কাজ হত। হাতকড়া পরা অবস্থায়ও সে বাঘের মতো লড়াই করতে লাগল। সদাশিব পকেট থেকে তাঁর রিভলবারটা বার করে লোকটার দিকে উঁচিয়ে বললেন, ''মিথ্যে পালাবার চেষ্টা করছ। পরশু সন্ধে বেলা ওই বাবুকে তুমি যে খুন করেছ তা জেনেছি আমরা।''

লোকটি যেন চুপসে গেল, তারপরই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ''কিছু জানেন না আপনারা, আমাকে হয়রানি করার মতলব আপনাদের।''

''জানি আমরা'', রিভলবারটা লোকটির দিকে তাক করে রেখে সদাশিব বললেন, ''তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, সে-ই ফাঁস করে দিয়েছে সব।''

মাঝির মুখ থেকে অশ্রাব্য একটা গালাগাল বেরিয়ে এল।

''সুদেটা এখন বুঝি সব আমার ঘাড়ে চাপাতি চায়? কুত্তার বাচ্চা!'' মাঝির প্রকাণ্ড শরীরটা দারুণ ক্রোধে কাঁপতে থাকে। ''বুদ্ধিটা যে তার মাথায় এসেছিল তা নিশ্চয়ই বলেনি আপনাদের। সাঁঝের একটু বাদে ও ছুটে এসেছিল আমার কাছে। ওর কত্তা যে অনেক ট্যাকা ওই বাবুরে দেবে তা কপাটে কান পাইতে ও শুনেছিল। ট্যাকাটা নিয়ে ওই বাবুরে লৌকো করে খাল পার হতি হবে—একা' আমি ওর কথায় প্রথমে কান দিই নাই, কিন্তু হারামজাদা এমন মতলব দিতি লাগল যে আমার কাঁধে যেন শয়তান চাপল...''

মাঝির কুঁড়ে ঘর থেকে প্রায় পুরো টাকাটাই উদ্ধার হল, একটা নোট সত্যিই ছেঁড়া ছিল।

ফেরার পথে ট্রেনে কথা হচ্ছিল। গুহ বলল, ''আপনি না এলে কিন্তু ভীষণ একটা অবিচার ঘটে যেতে পারত। সুদর্শন আর মাঝিকে সন্দেহ করার কোন কারণ আমরা আগে পাইনি।''

সদাশিব বললেন, ''ওই কচুরিপানাই কিন্তু কেসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওটা যদি সাহার মুঠিতে ধরা না থাকত তবে এ খুনের আসল রহস্য ভেদ হত কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।''

''একটু গুছিয়ে বলুন।'' গুহ অনুরোধ করল।

সদাশিব মৃদু হাসলেন, তারপর বলতে শুরু করলেন:

''আপনি বলেছিলেন, ডাক্তারি-মতে প্রচণ্ড আঘাতে সাহা জ্ঞান হারিয়েছিল, এবং সেটা আঘাত পাবার সঙ্গে সঙ্গে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার হাতের মুঠোয় কচুরিপানা এল কী করে? রামজীবনবাবু যদি তার বাড়িতেই রসিদ আর চুক্তিপত্র ফেরত পাবার পর ও-কাজটা করে থাকেন, তবে কচুরিপানার প্রশ্ন ওঠে না, ঘরের মধ্যে তো আর কচুরিপানা নেই। রামজীবনবাবু যদি সন্ধের আড়ালে সাহাকে কাঁধে করে বয়ে খালের জলে ফেলে ডুবিয়ে মারেন তবে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? দুটো প্রশ্ন জাগল আমার মনে। প্রথম, অচেতন কেউ কিছু আঁকড়ে ধরে না, আর দ্বিতীয়, ওটা হল মস্তবড় একটা ঝুঁকি। খেয়া পারাপারের

মাঝি ঘাটেই আছে, এমন অন্ধকার তখন নয় যে ব্যাপারটা তার চোখে পড়বে না। সুতরাং 'রায় ভবন'-এ সাহাকে আক্রমণ করা হয়েছে এ সম্ভাবনা বাতিল করলাম আমি।

"দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, সাহাকে হয় খালের পারে কিংবা যখন সে নৌকোয় খেয়া পার হচ্ছিল তখন আক্রমণ করা হয়েছে। অজ্ঞান হবার মুহূর্তে কিংবা ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার তাগিদে খড়-কুটো চেপে ধরে ঠিক তেমনিই সাহা হাতের কাছে কচুরিপানা পেয়ে তাই মুঠোয় ধরেছিল। আমার এখন অনুমান, মাঝি পেছন থেকে বৈঠা দিয়ে ওর মাথায় সজোরে আঘাত করে। সাহা জ্ঞান হারিয়ে জলে পড়বার মুহূর্তে একটা কিছু তাড়নায় ওই কচুরিপানাই চেপে ধরেছিল। সুতরাং তার ওপর আক্রমণ যে 'রায় ভবন'-এ হয়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হলাম।"

তখন কিন্তু মাঝিকে আমি সন্দেহ করিনি বরং সন্দেহটা রামজীবনবাবুর ওপরেই ছিল। প্রথম সূত্র পেলাম সুদর্শনের আচরণে। ও বেশ জোর দিয়েই বলেছিল সাহাকে সে যেতে দেখেনি, যদিও ভাঁড়ার ঘরের জানলা দিয়ে খাল পর্যন্ত পথটা স্পষ্ট দেখা যায। আবার সাহা বেরিয়ে যাবার সময় দরজা খোলা বা বন্ধ হবার শব্দও ওর কানে যায়নি। আগেকার আমলের বাড়ি, খুব ভারি দরজা, বেশ জোরে শব্দ হয। তাই আপনাকে দিযে এক্সপেরিমেন্ট করলাম। দরজা বন্ধ করার শব্দ স্পষ্ট আমি শুনতে পেযেছিলাম অথচ সুদর্শন বলছে ও শুনতে পায়নি। লোকটা কি তবে কিছু গোপন করছে? আমি চিন্তিত হলাম। তখুনি মনে হল ওকে যেন আগে কোথায় দেখেছি। কথায কথায জানতে পারলাম খেযার মাঝি ওর দাদা! মুহূর্তে রহস্যটা পরিষ্কার হযে গেল। মাঝির মুখের আদলের সঙ্গে ওর মুখের বেশিরকম সাদৃশ্য, তাই ওকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সুদর্শন বলছে ও সাহাকে যেতে দেখেনি কিংবা দরজা বন্ধ হবাব শব্দ শোনেনি, সেটা কি ইচ্ছে করেই ও বলছে? ওর মনিবকে পুলিশ যাতে এ-ব্যাপারে সন্দেহ করে তাই কি এই মিথ্যে ভাষণ! দবজা বন্ধ হবার শব্দ যে আমি শুনতে পেযেছি সেটা বুঝতে পেরে ও খুব ঘাবড়ে গিযেছিল। আমার আর সন্দেহ রইল না।

সাহাকে আঘাত করা হযেছে খালের পারে কিংবা যখন সে নৌকায খেয়া পাব হচ্ছিল, আর সে কাজটা করার মস্ত সুবিধে ওই মাঝির, সুদর্শনের দাদার। সাহা যে তার মনিবের কাছে টাকার জন্য এসেছে, এবং টাকাব অঙ্কটা অনেক তা যেমন করেই হোক ও জেনেছিল।

রামজীবন আর সাহা যখন কথাবার্তায ব্যস্ত ছিলেন, ও নিশ্চয়ই তখন সবার অলক্ষ্যে বেরিযে তার দাদাকে খবরটা দিযে আসে। মাঝিই খুনি আর সুদর্শন তার সহযোগী, এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুদর্শনের চালাকিটা দেখুন, রামজীবনবাবুব ঘাড়ে কেমন দোষটা চাপিযে দিযেছিল! ভদ্রলোকের স্বপক্ষে জোরালো কোনও যুক্তি ছিল না, তাই না? সাহা 'রায ভবন'-এ গেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, কিন্তু সে যে ফিরেছিল তার প্রমাণ নেই।

আমার কথামতো সুদর্শনের হাতে হাতকড়া পরাতেই কাজ হল। ভুল করে ও বলে ফেলল যে সাহা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর আর তাকে ও দেখেনি। নিজের জালেই নিজে জড়িযে পড়লো ও। সুদর্শন আর তার দাদা সাঁট করে যে সাহাকে খুন করেছে সে ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ রইল না আমার।

ওই কচুরিপানাটাই আসলে সাহার হত্যারহস্য ভেদের জন্য দাযী, সদাশিব মৃদু হেসে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

ওয়াটসনের বোকামি

হিমানীশ গোস্বামী

গোয়েন্দা দে তাঁর পড়বার ঘরের জানালার পাশে একটি রকিং চেয়ারে বসে একখানি পুরনো গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিলেন। কাহিনীটি তিনি এর আগে পড়েননি, শার্লক হোমস্-এর কিছু কিছু কাহিনী তিনি ছোটবেলায় পড়েছিলেন, কিন্তু তারপর আর ওসব গল্প-কাহিনী পড়বার সময়ও পাননি, আগ্রহও হয়নি। গল্পের গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে তাঁর প্রথম থেকেই কিছুটা বিতৃষ্ণা, তার কারণ তারা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় পরিচিত, তারা বাস্তব জগতের অধিবাসী না হয়েও যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা উপভোগ করেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন গল্পের গোয়েন্দা যে চটপট রহস্যের সমাধান করে ফেলেন তার কারণ আর কিছুই নয়, লেখক যে রহস্যগুলি সৃষ্টি করেন সেগুলি লেখকেরই সৃষ্ট নায়ক অথবা গোয়েন্দাপ্রবর বহু জল ঘোলা করবার এবং প্রচণ্ড ন্যাকামি করার পর সেটার সমাধান করেন। গোয়েন্দা দে-র কাছে তাই গোয়েন্দা-কাহিনীগুলো ছিল অতিরিক্ত রকমের আর্টিফিশিয়াল। এসব কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। আর যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই সেগুলো পড়ার অর্থ হচ্ছে সময় নষ্ট করা। কিন্তু সময়ের যেখানে অভাব নেই, আর সময় কাটানোর জন্য যখন কোন লাভজনক কর্মের হদিশ নেই তখন বই, তা সে গোয়েন্দা-কাহিনীই হোক আর যাই হোক, না পড়ার কোন অর্থ হয় না।

বইটির নাম, অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস্। বইটি তিনি পড়েছিলেন তাঁর এক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে উনিশশো চৌত্রিশ সালের ডিসেম্বর মাসে। ভোজনগরের মহারাজা রামভোজ বাহাদুরের প্রিয় কুকুর তেন্ তেন্ চুরি হয়ে যায়। সেই কুকুর উদ্ধারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয় দু-হাজার টাকা। তখনকার আমলে দু-হাজার টাকার অন্য অর্থ ছিল। যাই হোক, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তেন্ তেন্কে উদ্ধার করেন পুরীর সমুদ্রের ধার থেকে। কৃতজ্ঞ রামভোজ বাহাদুর নিজের হাতে বইটি তাঁকে দিয়েছিলেন সেই কবে। এখনও কিন্তু বইতে নতুনের গন্ধ যেন লেগে আছে। তাঁর সম্পর্কে যদি কেউ লিখত তাহলে এরকম কত কাহিনীই যে তিনি দিতে পারতেন লেখককে, কিন্তু তাঁর কাহিনী লিখবার কোন লেখক ছিল না, কোন সম্পাদক কিম্বা প্রকাশকও ছিল না। থাকলে সে-কাহিনীর গুণে তিনিও আজ পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু কী করলে কী হত সে নিয়ে আর তিনি চিন্তা না করে শার্লক হোমস্-এর একটি কাহিনী, দ্য স্পেকল্ড ব্যান্ড পড়তে শুরু করলেন। কয়েক লাইন পড়তে না পড়তেই আকাশে ঘনঘটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। কাঁচের জানালা বন্ধ করে দিলেন তিনি। ডানদিকের সাইড টেবিলে ছোট্ট

একটা ল্যাম্প ছিল, সেটাকে জ্বেলে দিলেন। তারপর আবার আগ্রহের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন গল্পটি।

গল্পটি অবশ্য বহু ইংরিজি ও বাংলা পাঠকের জানা। একটি ভয়াবহ কাহিনী। কেমন করে একজন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর আগের পক্ষের দুই যমজ মেয়ের একজনকে সাপের কামড় খাইয়ে মেরে অন্যটিকেও শেষ করতে গিয়ে অবশেষে সেই সাপের কামড়ে নিজেই মারা পড়লেন, তার কাহিনী পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ডাক্তারের নাম হচ্ছে গ্রাইমস্‌বি রয়লট। রয়লট একদা ছিলেন কলকাতায়।

এই যমজ দুই বোনের একটির নাম জুলিয়া। জুলিয়া সাপের কামড়ে মারা যায়, যদিও করোনারের তদন্তে তা ধরা পড়েনি। অন্যজনের নাম আমরা জানি হেলেন। সারের স্টোক মোরানে একটি বিশাল বাড়িতে ডক্টর রয়লট থাকতেন। তিনি খুব বড় জমিদারবংশের লোক হলেও তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না। যা টাকা তিনি ভারতবর্ষে জমিয়েছিলেন তা খরচ হয়ে গিয়েছিল মোকদ্দমায়। তিনি রাগের বশে ভারতবর্ষে তাঁর বাটলারকেই খুন করে ফেলেছিলেন। ফাঁসির হাত থেকে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

কাহিনীটি পড়ে গোয়েন্দা দে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। শার্লক হোমস্ না থাকলে হেলেন মারা পড়ত, এবং হেলেন এবং জুলিয়ার বরাদ্দ টাকা ডক্টর রয়লট ভোগ করতেন। এমনিতেও এই টাকাগুলো রয়লটই ভোগ করছিলেন, কিন্তু জুলিয়ার বিয়ের ঠিকঠাক হবার পর জুলিয়া মারা পড়ে। দু'বছর পর হেলেনের বিয়ে যখন ঠিক হয় তখন হেলেনও বুঝতে পারল তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। শার্লক হোমস্‌ই হেলেনকে বাঁচিয়ে দিল এবং তা অতি আশ্চর্যভাবে। কী আশ্চর্য কাহিনী এটি! গোয়েন্দা দে এটি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিজের মনেই বললেন: বাঃ বেশ বেশ, বেড়ে ডিটেকটিভ!

এই সময় হঠাৎ দরজায় ঝন্ ঝন্ করে ঘণ্টা নাড়ার আওয়াজ হল। তিনি নিজে গিয়েই দরজা খুলে দিলেন। এই বৃষ্টির মধ্যে যদি কোন ক্লায়েন্ট আসে মনেমনে সে দুরাশাও হয় তো ছিল। দরজা খুলতেই কিন্তু ঢুকে পড়লেন গোয়েন্দা দাঁ। বললেন বাপরে বাপ্ রাস্তায় বেরিয়েছি আর কী বৃষ্টি! রিক্‌শোয় করে আসতে হল, এইটুকু পথ, নিল পঁচাত্তর পয়সা। ডাকাতি—ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে আজকাল, উঃ।

গোয়েন্দা দে বললেন, আসুন, আসুন একা একা সময় কাটানোর জন্য গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছিলাম। খাসা কাহিনী মশাই—শার্লক হোমসের সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। পড়েছেন?

অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই করত বটে লোকটা। উঃ কী অসম্ভব বিচ্ছিরি লোকটি ওই ডক্টর রয়লট! বললেন গোয়েন্দা দে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনিও ঠকেছেন তাহলে?

গোয়েন্দা দে বললেন, তার মানে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ওয়াটসনও ঠকেছিল, আপনিও ঠকলেন।

—ওয়াটসনও ঠকেছিল? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা দে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাই তো ওয়াটসনকে ঠকানোর জন্য। ডক্টর রয়লট অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁকে খুন করা শার্লক হোমসের রীতিমত অন্যায় হয়েছে।

গোয়েন্দা দে আঁৎকে উঠে বললেন, ডক্টর রয়লটকে তো সাপে কামড়াল। ডক্টর রয়লটের নিজের সাপ—শার্লক হোমস্ কেমন করে খুন করল তাঁকে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আপনি একজন যাকে বলে গেঁয়ো, ভালো কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সরল। সাপটা ডক্টর রয়লটের এ ধারণাটা আপনার কোত্থেকে হল?

—সাপটা তাহলে কার? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা দে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সাপটা যে হোমসের পোষা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ, অবশ্য সাপের কামড়েই যে ডক্টর রয়লট মারা পড়েছেন সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। আমার ধারণা যে সাপটির কামড়ে ডক্টর রয়লট বা জুলিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য সাপ নয়। হয় সেটা একটা অতি নিরীহ সাপ, অথবা সেটি একটা রবারের সাপ। আমার দৃঢ় ধারণা সাপটি রবারের।

—তার মানে? গোয়েন্দা দে জিজ্ঞেস করলেন।

গোয়েন্দা দাঁ একটি ইজিচেয়ার টেনে নিলেন। এতক্ষণ গোয়েন্দা দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে গোয়েন্দা দাঁকে বসতে পর্যন্ত বলা হয়নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, এই দেখুন কথায় কথায় আপনাকে যে বসতে বলব তাও ভুলে গেলাম।—চা?

—চা। বললেন গোয়েন্দা দাঁ। —চা আসবার আগে আপনার আগের প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে নিই। ডক্টর রয়লটকে হোমসের বান্ধবী হেলেন সাপের বিষভর্তি সিরিঞ্জ দিয়ে কুপোকাৎ করেছিল।

—হোমসের বান্ধবী হেলেন? হোমসের বান্ধবী?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, হোমসের বান্ধবীই তো। ইন ফ্যাক্ট আমার থিয়োরি হচ্ছে এই যে বহুদিন যাবৎই হোমসের সঙ্গে হেলেনের একটা ইয়ে চলছিল। যদি জুলিয়াকে এবং সৎ-বাবা ডক্টর রয়লটকে পৃথিবী থেকে সরানো যায় তাহলে হেলেন তার মায়ের সমস্ত সম্পত্তি পেতে পারে। বছরে, বুঝে দেখ তখনকার আমলে, গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ডের অর্থ কী। ওই টাকার উপর ছিল হোমসের নিদারুণ লোভ। ফলে সে হেলেনের সঙ্গে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে সে তার যমজ বোনকে খতম করে হোমসের সাহায্যে। একটি অদ্ভুত বিষের সাহায্যে, যা কিনা সাপের বিষ কিছুতেই নয়। সাপের বিষ হলে করোনার নিশ্চয়ই ধরতে পারত। কিন্তু গল্পে দেখতে পাচ্ছি সেটা যে বিষ তা পোস্ট মর্টেমেও ধরা পড়েনি!

প্রথম খুনটিতে সাফল্য লাভ করার পর হোমস বেশ কিছুদিন চুপচাপ রইল। পরপর খুন হলে ওই অঞ্চলের নিদারুণ চাঞ্চল্য হত এবং ফলে সমস্ত দেশের দৃষ্টি সেই দিকে যেত। দু'বছর পার হল। তখন হোমস ঠিক করল এবার বুড়ো রয়লটের মরার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথম মৃত্যুটা প্রচণ্ড রহস্যময় ছিল, কিন্তু হেলেনের উপর কারও সন্দেহ হবার কথা নয়—যা সন্দেহ তা হত ওই বুড়োটির উপর। তার কারণও ছিল। বুড়ো লোকটি ছিল প্রচণ্ড একগুঁয়ে—এবং বদরাগী। সে রাগের মাথায় তার বাটলারকে প্রচণ্ড আঘাত করে, ফলে সে মারা যায়। যে লোক বদরাগী সে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ভেবেচিন্তে কাজ করে না। যাই হোক, বুড়ো একদা একটি লোককে খুন করেছিল এই ঘটনাটা জানা থাকায় যা কিছু সন্দেহ তার সমস্তটাই ওর উপরই হয়েছিল। কিন্তু বুড়ো একগুঁয়ে এবং বদরাগী ছিল, কোন লোক তাকে পছন্দ করত না, তার কারণ বুড়ো কাউকে কেয়ার করত না। এখানেই আমার প্রথম মনে হয় বুড়ো নির্দোষ, কেন না যে অপরাধী সে স্বভাবতই তার স্বভাবকে ভালোমানুষের মতো করে আনে। অর্থাৎ, যার মনে যত প্যাঁচ সে তত শান্ত। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করবার মতো চরিত্র রয়লটের নয়। তাছাড়া ডক্টর রয়লট ছিল সত্যিকারের একজন খেয়ালি লোক। সে দুনিয়ার অদ্ভুত জাত, বেদেদের নিজের জমিতে আশ্রয় দিয়েছিল। যদি সে তার মেয়েকে খুন করতেই চাইবে তাহলে বেদেদের সাহায্যে সে সহজেই সেটা করাতে পারত। অথবা কোন অসুখ হলে চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটানো তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। অসুখ না হলে অসুখ সৃষ্টি করাও তার পক্ষে

সহজ ছিল।

ডক্টর রয়লটের খেয়ালিপনার আর একটা উদাহরণ: সে একটি বেবুন এবং একটি চিতা পুষত। যদি সে খেয়ালি না হত তাহলে এরকম অদ্ভুত জানোয়ার পুষবার কথা সে ভাবতে পারত না। কেবল টাকাই যদি তার ধ্যানজ্ঞান হত তাহলে চিতা এবং বেবুনকে সে কিছুতেই পুষত না এটা ঠিক, কেন না, একটা চিতা এবং একটা বেবুন পুষতে কম খরচ হবার কথা নয়। না, দে মশাই শার্লক হোমস্ খুব সোজা লোকটি ছিল না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর রয়লট কখনই সাপ পোষেনি। সাপটি যদি সত্যি সাপই হয়—রবারের না হয় তাহলে সেটা পুষেছিল হেলেন। হেলেন কোত্থেকে সাপ সংগ্রহ করবে? সেটা অত্যন্ত সহজ—বাড়িতেই একদল বেদে থাকে, তারা তাকে সাপ বিক্রি করতে পারে। ডক্টর রয়লট বাড়ির মাঠে বেদেদের আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তার মেয়ে হেলেনের সঙ্গে বেদেদের আলাপ পরিচয় কথাবার্তা, এমনকী ষড়যন্ত্র হবে না তা সম্ভব নয়। তবে অতটা করবার তার প্রয়োজন ছিল না।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরের মধ্যে ছোট ঘুলঘুলি হেলেনই নিশ্চয় রাজমিস্ত্রিদের দিয়ে করিয়েছিল। সেটা করেছিল যাতে দোষটা শেষপর্যন্ত ডক্টর রয়লটের ঘাড়ে চাপানো যায় তাই ভেবে। ডক্টব রয়লটের পক্ষে কাউকে মেরে ফেলা অত্যন্ত সহজ ছিল। অসুখ হলে ভুল ওষুধ দেওয়া বা কোন ওষুধ ঠিক সময়ে না দেওয়াতে যে-কাজ হতে পারত তার জন্য বিরাট সব কাণ্ডকারখানা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা না করে একটি সাপকে শিখিয়ে পড়িয়ে অন্যলোককে কামড়ানোর জন্য তাকে উত্তেজিত করার হাঙ্গামা কি কম নাকি? তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়।

গোয়েন্দা দে বললেন, আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, বেজায় লক্ষণীয়। আপনি কি লক্ষ করেছেন যখন হেলেন শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এল তখন সে কাঁপছিল?

গোয়েন্দা দে বললেন, কাঁপবে না? সে কি বলছিল শুনুন—''আমি ঠান্ডায় কাঁপছি না, আমি কাঁপছি ভয়ে।'' অর্থাৎ তখন ঠান্ডা ছিল।

ইংল্যান্ডের এপ্রিল মাসে কম ঠান্ডা পড়ে না—বিশেষ করে লন্ডনের বাইরের কাউন্টি সারের অবস্থা অত্যন্তই খারাপ হয় তখন। এই ঠান্ডায় হাত-পা জমে যায়, গরম পোশাক ছাড়া চলা যায় না।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আমিও তো তাই বলতে চাই—ওই সময় হেলেন তার কথামতো, সকাল ছটার আগে উঠে, ট্রেন ধরে লন্ডনে সত্যিই এসেছিল কি? আমার বক্তব্য এই যে হেলেন প্রথম রাত্রিটা কাটিয়েছিল লন্ডনেই এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শার্লক হোমসের সঙ্গেই। তারপর রাত্রিটা সে কোন হোটেলে কাটিয়ে সকালে তার অভিনয় ক্ষমতা দেখাতে আসে বেকার স্ট্রিটে।

—অভিনয় ক্ষমতা দেখাতে আসে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সমস্তটাই তো হেলেনের অভিনয়। সমস্তই শার্লক হোমসের কাছে শেখা। সমস্তই বোকা ওয়াটসনকে বুদ্ধু বানাবার জন্য করা।

গোয়েন্দা দে হাঁ করে রইলেন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, অত হাঁ করবেন না, আসল কথাটা এখনও বলিনি। আপনি কখনও শুনেছেন কি ঠান্ডায়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের ওই ঠান্ডায় ধরা যাক হেলেন বেরুতে পারে—সে মেমসাহেব, ওই দেশের মেয়ে, তার পক্ষে সম্ভব—কিন্তু হেলে সাপের পক্ষে কি তা সম্ভব?

—হেলে সাপ?

—সাপের নামটি তো বইতে পড়লেন সোয়াম্প অ্যাডার। ওর বাংলা কি হবে তা আমি জানি না, সর্পবিদ্‌দের কাছ থেকে সেটা জেনে নিলেই হবে—আমি সুবিধের জন্য নাম দিয়েছি হেলে। এখন কোন হেলের পক্ষে কি ইংল্যান্ডের ওই দারুণ ঠান্ডায় চলে বেড়ানো সম্ভব? শীতকালে সাপেরা জানেন তো দারুণ ঘুমোয়—মাসের পর মাস ঘুমোয়। আসলে ওটা মোটেই সাপ কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। আমি আগেই বলেছি আমার ধারণা ওটা একটা রবারের নকল সাপ। গোয়েন্দা দে বললেন, তাইতো—ইংল্যান্ডের ঠান্ডায় একটা ভারতীয় সাপ, যারা শীত পড়লে আর রা—করে না, দুম দাম দড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে, কামড়াচ্ছে—সত্যিই ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলবারই মতো।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ভাবুন ভাবুন, ভাবিয়ে তুলবার জন্যই তো কথাগুলো বললাম। আরও একটা জিনিস ভাবুন, অন্ধকার ঘরে ওয়াটসন কিন্তু সাপটিকে দেখেনি, কেবল তার হিস্ হিস্ আওয়াজ শুনেছিল! কই চা কোথায়—গলা যে শুকিয়ে এদিকে কাঠ?

গোয়েন্দা দে উঠলেন। দু-এক মিনিট ঘুরে এসে বললেন, কেবল চা নয়, সঙ্গে আরও কিছু টা আসছে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ওই সকালে দেখা গেল কি, না—হেলেন এসেছে বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে হোমসের কাছে। কিন্তু হোমস্ ওয়াটসনকে অতি অভদ্রের মতো ঘুম থেকে তুলবার জন্য ব্যগ্র। ওয়াটসন ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে হোমস্ তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওয়াটসন যখন বলছে, বাড়িতে আগুন লেগেছে নাকি? তখন হোমস্ বলছে, না একজন মহিলা-মক্কেল উত্তেজিত ভাবে এসেছে। এত সকালে কোন মহিলা যখন খুব উত্তেজিতভাবে ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙায় তখন কেসটা সাধারণ কেস না হওয়ারই কথা। তা আপনি যদি ব্যাপারটা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করেন তাহলে গোড়া থেকেই দেখা উচিত আপনার। আপনাকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি।

গোয়েন্দা দে বললেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন—হোমস্ তাই বলেছিল বটে। গোয়েন্দা দাঁ বললেন, বোকা ওয়াটসন! আসলে হোমসের একজন সাক্ষী দরকার ছিল। ভদ্র সাক্ষী, যার কথা কেউ বিশেষ অবিশ্বাস করবে না এরকম একজন সাক্ষী। ওয়াটসনের অভ্যেস ছিল হোমস্ কাহিনী লিখে প্রকাশ করা, অতএব হোমসের একটা অদ্ভুত সুবিধে ছিল। ওয়াটসনের কথাই লোকে বিশ্বাস করত। এই কেসে মনে হয় শার্লক হোমস্ ধরা পড়বার ভয় করছিলেন, তাই হেলেনকে ভোরে পাঠানো নাটক সৃষ্টির জন্যই হোমস্ ওই সকালে ওয়াটসনকে ডেকে তুলেছিল।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এর পরের সমস্তটাই নাটক। ওয়াটসনকে নিয়ে হোমসের সারে-র গ্রামে যাওয়া, সেখানে একটা হোটেলে থাকা, রাত্রে হেলেনের ঘরে থাকা, এবং হেলেন যখন তার বাবাকে মারছে তখন অমানুষিক চিৎকার করানোর ব্যবস্থা করা....।

গোয়েন্দা দে বললেন, হেলেন তার বাবাকে কীভাবে মেরেছিল?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, অত্যন্ত চুপি চুপি এক সিরিঞ্জ সাপের বিষ নিয়ে ঘুমের মধ্যে ইনজেকশন করে দেয় নির্দয় হেলেন। মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ। কোনও আওয়াজ হয় না। কিন্তু তাতে নাকি জমে না। তাই চিৎকার করানোর জন্য হোমসের দ্বিতীয় সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। হোমসের কোন অভিনেতা বন্ধু—যার গায়ে বিপুল শক্তি। প্রচণ্ড লম্বা। এরই মাথায় ছিল টপ হ্যাট, ফ্রক কোট। লোকটি বেশ মোটাও বটে—বড় মুখ, হাজার হাজার রেখায় সেটা ভরা, রোদে পোড়া, আর নানা বিকৃত কামনার খনি। নাকটা বিরাট লম্বা—যেন একটা শকুন।

গোয়েন্দা দে বললেন, কিন্তু এ যে ডক্টর রয়লটের বর্ণনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ডক্টর রয়লট সেজে একজন অভিনেতা এসেছিল হোমসেরই

আদেশে। ওয়াটসন একটা বোকা—ডক্টর রয়লট যদি হেলেনকে 'ফলো'ই করবে তাহলে তাকে হেলেন একবারও দেখতে পেল না? আর যদি হেলেনকে হোমসের বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে কি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি করছিল? ওই রকম দাম্ভিক এবং খ্যাপা লোকের পক্ষে তা কি করা সম্ভব নাকি? আসল রয়লট হলে সে হেলেনকে ধরে জোর করে হোমসের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু লোকটি আসল রয়লট নয়—কারণ আসল রয়লট একটু খেয়ালি এবং আপনভোলা মানুষ। দে মশাই, যে লোকটা রয়লট সেজে এসেছিল, সে হচ্ছে হোমসের কোন অভিনেতা বন্ধু। আমরা যেমন টাকার জন্য অনেক কিছু করি—তেমনি অভিনেতাও টাকার জন্য এটুকু অভিনয় করতে পারে।

গোয়েন্দা দে বললেন, তা পারে বটে।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এই অভিনেতা স্টোক মোরানেও কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকে, যাতে ওয়াটসন তাকে দেখতে না পায়। হয়তো হেলেন যে-ঘরে ছিল সে ঘরেই ছিল, কিংবা ছিল ডক্টর রয়লটেরই ঘরে, হোমসের সঙ্কেত শুনেই সে প্রচণ্ড চ্যাঁচায়। এই চ্যাঁচানোটা দরকার ছিল। সে চেয়ারে বসে থাকে রবারের সাপ মাথায় জড়িয়ে। এমন সময় শার্লক হোমস্ এবং ওয়াটসন ঘরে ঢুকে দেখতে পায় শার্লক হোমসের অভিনেতা-বন্ধুকে। আসল রয়লট তখন বিছানায় মরে রয়েছেন। লেপঢাকা থাকায় আর দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া ওয়াটসনের সেদিকে তখন চোখ নেই। থাকবার কথাও নয়। ওয়াটসনকে যা দেখানো হল, তাই সে দেখল।

সাপটাকে তার খাঁচায় পুরে ফেলা হয়। লোহার খাঁচায়। রবারের সাপটিকে ঢোকানো মোটেই কঠিন হয়নি হোমসের পক্ষে। কিংবা হয়তো সত্যি একটা সাপ রাখা ছিল খাঁচার মধ্যে। রবারের সাপটা পকেটে পুরে নিয়ে গিয়েছিল অভিনেতাটি, আসল সাপের উপর দোষ চাপিয়ে! যাই হোক, এর পর লোকজন আসতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত ঘরটি অন্ধকার থাকে নিশ্চয়ই। সেই সময়ের মধ্যে অভিনেতাটি চটপট উঠে পোশাক পরে লোকজনের সঙ্গে মিশে যায়, এবং ফাঁকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে ওই সময়ে গ্রামে কোন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না কোথাও। হোমস্-এর সমস্ত প্যাঁচালো বুদ্ধির জয় জয়কার হয়।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, হোমস্ কতবড় শয়তান তা ওয়াটসনের মতো সরল, গেঁয়ো লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই ফাঁসির মঞ্চে না পাঠিয়ে ওয়াটসন তাঁকে মহান লোক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু দোষ ওয়াটসনের নয়—ওয়াটসন লোকটি ছিলেন অতি সরল

গোয়েন্দা দে বললেন, আপনি আমাকেও কিন্তু ওই বিশেষণে খানিক আগে ভূষিত করেছেন!

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সারল্য তো দোষ নয়, গুণ। দুঃখ এই যে দেশে সরল লোকই বেশি, বদমাইশই কম, তা নইলে এমন একটা কালো বিশ্রী বর্ষাকালে আজ পর্যন্ত একটা ভালো মতো অপরাধ হল না। আমাদের বাঁচাবার জন্য কারও কি কোন দায়িত্ব নেই!

গোয়েন্দা দে বললেন, আশা রাখুন দাদা, আশা রাখুন—ভাগ্য সকলের কি একই রকম যায়? হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন? কালই হয় তো দেখবেন সকালের কাগজে দামি কেউ নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কিংবা হয় তো খুনই হয়েছেন। আশা—আশা রাখুন, দেখবেন দুঃখের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই নিন চা-টা এসে গেল।

চা-এর কথায় গোয়েন্দা দাঁ একটু নড়ে চড়ে বসলেন, কোন কথা বললেন না। বৃষ্টি আরও জোরে এল।

পণ্ড পিকনিকের উৎসে

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে অভ্র যে হঠাৎ এই ভাবে পালাবে বা পালাতে পারে, এ আমার কল্পনারও অতীত। অথচ অধ্যবসায়, ধৈর্য আর স্থৈর্যে তার মতো ছেলে, বাপ হয়ে বলাটা হয়তো ঠিক নয়, এখনকার দিনে সত্যিই বড় দুর্লভ। আগুন, শত্রু আর ঋণ—এ তিনের শেষ যেমন রাখতে নেই, অভ্রের মতে শুরু করা কাজের বেলাতেও তেমনি। অর্থাৎ কোনওরকম ওজর দিয়ে মাঝপথে থেমে যাওয়াটাও একটা মস্তবড় অপরাধ। যাকে বলে একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ।

অথচ সেই অপরাধে অপরাধী আজ সে নিজেই!

এদিকে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার জোগাড়!

মিঃ লাহিড়ী বারবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছেন, শুকনো পাতায় মর্মর তুলে কখনও বা পায়চারি করছেন অস্থির পায়ে, কখনও বা আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভুরুজোড়া কুঁচকে প্রশ্ন করছেন, ‘‘তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো, যাবার সময় কিছু বলে যায়নি?’’

আমার গলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ফুটে উঠল কি না জানি না, তবে বললাম, ‘‘না, আমাকে কিছু বলে যায়নি। তা ছাড়া, ও তো ছিল আপনার কাছেই, কিছু বলবার হলে আপনাকেই বলে যাবার কথা।’’

মিঃ লাহিড়ী আর কোনও কথা বললেন না, শুকনো পাতায় তেমনি মর্মর তুলে পায়চারি করতে লাগলেন আপন মনে।

মাঝ থেকে আমি পড়লাম বিপাকে। ছেলে আমার, সুতরাং অভ্রর এই না-বলে যাওয়ার দোষটা যেন মনে হল আমারই।

বিশ-ত্রিশ হাত দূরে গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে সূর্যের আলো তখনও ঝিকমিকিয়ে উঠছে স্টেইনলেস স্টিলের থালা-বাটি-গেলাসগুলোর ওপর। পাতার জাফরির আলোয় জাজিমটাকে দেখাচ্ছে চিতাবাঘের ছালের মতো। তারই একধারে হাত চার-পাঁচ তফাতে একটা জ্বলন্ত উনুনের গনগনে আভা নিবে গিয়েও যেন নিবে যায়নি, ছাইয়ের একটা পাতলা আস্তর তপ্ততাকে আস্তে আস্তে শান্ত করে দিচ্ছে শুধু। চারদিক ঠান্ডা, আর কেমন নিঃশব্দ। এবং নির্জনও।

মহকুমা শহর থেকে মাইল-আষ্টেক দূরে কংসাবতীর একটা প্রশাখা-ঘেরা এই সমতলভূমিটা শুধু মনোরম বললে ভুল হবে, পিকনিকের পক্ষে এমন আদর্শ জায়গা কদাচ পাওয়া যায়। চারদিকে নিবিড় শালবন, দূরে ছোট-ছোট পাহাড় যেন শান্ত ছেলের মতো চুপ, কোলে কাকচক্ষু জল নিয়ে তিরতির করে বয়ে চলছে শীর্ণরেখা নদী একটা। লোকবসতি নেই, কিংবা কম বলে চারদিকে কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শুধু উত্তুরে হাওয়ার আনাগোনা আর শালের মর্মর। আমি সামান্য চাকুরিজীবী এবং সংসারী, নইলে শব্দময়ী শহর কলকাতার স্থায়ী বাস ছেড়ে হয় তো কবেই চলে আসতাম এই মুখর নিরালায়।

মিঃ লাহিড়ীর মতো বহু-দেখা মানুষটার মনও বুঝি নাড়া খেয়ে গেছে এই জায়গাটায় এসে। তাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে অভ্রর দিকে তাকিয়ে তিনি বারবার তারিফ করতে লাগলেন তার পছন্দের।

অভ্র কবে কোন্ ফাঁকে কার সঙ্গে এসে দেখে গেছে জায়গাটা জানি না, তবে কাল রাত্রে হঠাৎ যখন পিকনিক স্পট খোঁজার কথাটা উঠল, আগ বাড়িয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল, ''আমি একটা জায়গার সন্ধান তোমাদের দিতে পারি বাবা, যদি আমার ওপর আস্থা থাকে, তা হলে কাল সকালে দেখে আসতে পারো আমার সঙ্গে গিয়ে। সাইকেলে আধ-ঘণ্টাটাক লাগবে যেতে।''

সপরিবারে ক'দিন হল এসেছি শম্পার বিয়েয়। শম্পা অভ্রর এক মাসতুতো দিদি। সঙ্গে আমাদের মিঃ লাহিড়ীও ছিলেন। এই বিয়েতে তাঁর অবশ্য নিমন্ত্রণ হবার কথা নয়; কিন্তু কী খেয়াল হল কে জানে, নতুন মেসোমশাইকে বলে অভ্র বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়ে তবে ছাড়ল। আর মিঃ লাহিড়ীকেও বলিহারি, নির্লজ্জের মতো এককথায় তিনিও কেমন রাজি হয়ে গেলেন। সেটা অবশ্য অভ্রর প্রতি অপত্য স্নেহে, না পুকুরের টাটকা মাছের লোভে জানি না। হ্যাজাকের আলো, উলুধ্বনি আর শাঁখে বিয়ের আসর যখন সরগরম, আমরা ক'জন তখন পাশেই একটা দোতলা বাড়ির ঘরে বসে গুলতানি করছি। সেই গুলতানির আসরে জমায়েত হয়েছিল অনেকেই, কারণ মধ্যমণি ছিলেন মিঃ লাহিড়ী। নানান গল্পে আমরা যখন বেশ মশগুল, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে ছুটে এল শুভ্র। এসেই অভ্রকে বললে, ''জানিস দাদা, শম্পাদি বলেছে আমরা একটা পিকনিক করব। মেসোমশাই পুকুরের মাছ দেবেন, আর শম্পাদি দেবে টাকা। বেশ মজা হবে, না রে?''

সেই মজার জায়গা দেখতেই অভ্রর কথামতো বেরিয়ে পড়লাম সকালের জলখাবার খেয়েই। মিঃ লাহিড়ী দেখলাম বেশ উৎসাহী, আমাদের সঙ্গ নিলেন। এই বয়সেও পল্লীগ্রামের এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তায় যেভাবে অক্লেশে সাইকেল চালিয়ে চললেন তিনি, দেখে অবাক হতে হয়। তখন আটটা বেজে গেছে। আমাদের ফিরতে হবে সাড়ে-দশটা এগারোটার মধ্যেই। বর-কনে বেরিয়ে যাবার আগেই।

অভ্র বললে, ''তুমি কোনও চিন্তা কোরো না বাবা, আমাদের যেতে আসতে সময় লাগবে ঘণ্টাখানেক। আর, ওখানে খুব বেশি হলে আধঘণ্টাটাক থাকব আমরা। যাচ্ছি যখন, আশপাশটাও দেখে নেব তো!''

রাস্তা কাঁচা হলেও বেশ চওড়া। লরি না থাক, টেম্পো কিংবা ছোট্ট স্কুলবাস দিব্যি যেতে পারবে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তো তুলনাই নেই। জেলা-পরিষদ কিংবা

গ্রাম-পঞ্চায়েতকে নিজে থেকে কিছু করতে হয়নি, প্রকৃতি নিজেই যেন সাজিয়ে দিয়েছে সব কিছু। গ্রাম শেষ হতে বাঁধের রাস্তা পড়ল। বেশ উঁচু বাঁধ। দুধারে সবুজ ফসলের খেত দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে। তখন হাওয়া ছিল না, তবে ঠান্ডাটা কনকনে। সেই কনকনে ঠান্ডা আর সদ্য-দোহন-করা দুধের ফেনার মতো সকালের ঈষদুষ্ণ রোদ আমাদের তিনজন সাইকেল যাত্রীর দেহে-মনে যেন এক অব্যক্ত মায়াজাল সৃষ্টি করল। আমরা গল্প করতে-করতে এবং না করতে-করতে এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে।

বাঁধরাস্তা থেকে নেমে আমরা গিয়ে পড়লাম একখানা গ্রামে। তবে সেটা নামেই গ্রাম। দোকানপাট নেই, বিশেষ, লোকবসতিও কম। তালপাতা কিংবা খড়ের ছাউনির দু-চারখানা মেটে ঘর। শালের জঙ্গল শুরু বলতে গেলে সেখান থেকেই। প্রথমে ছড়ানো-ছিটানো দু-চারটে, তারপর যতই এগোতে লাগলাম, ঘন হতে হতে সেই জঙ্গল ঘনতর হয়ে থেমে গেছে নদীর কোলে গিয়ে। নদীর ওপারেও কিছুটা জায়গা জুড়ে সেই জঙ্গলের আভাস, তারপরই ছোট-ছোট পাহাড়ের সার আকাশে হেলান দিয়ে পরম আলস্যে দিব্যি রোদ পোহাচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কী, পিকনিকের চিন্তা তখন আমার মন থেকে একেবারেই উবে গেছে। শুধু আমার নয়, অভ্রদীপ এবং মিঃ লাহিড়ীরও সম্ভবত। কারণ অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে, চলমান অবস্থাতেই নিস্পলক চোখে আমরা শুধু তাকিয়েই থেকেছি এধার-ওধার। চক্রাকারে চারদিক ঘুরতে-ঘুরতে কতক্ষণ কেটেছে এইভাবে জানি না, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলাম মিঃ লাহিড়ীর গলায়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন, ''চলো হে চাটুজ্যে, চলো অভ্রদীপ, এবার ফেরা যাক।''

গাড়ির মুখ ঘুরিয়েই কিন্তু হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। এবং থমকে গেলেন। ভুরু দুটো স্বতই কুঁচকে উঠল তাঁর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে কিছু দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে উঠলেন, ''আরে এখানে তো পিকনিক করতে অনেকেই আসে দেখছি! কিন্তু—'' আমাদের সঙ্গে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন মিঃ লাহিড়ী, ''কিন্তু লোকজন কোথায়? সরঞ্জাম আছে, আয়োজনও তৈরি, অথচ লোকজন কেউ নেই, এ ভারি আশ্চর্য তো!''

এধার-ওধার তাকালেন মিঃ লাহিড়ী। দু-চারটে উড়ে-যাওয়া পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না কোথাও। বললেন, ''চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি কী ব্যাপার!''

পিকনিক-স্পটের একেবারে কাছে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না ব্যাপরটা কী। ঘাসের ওপর বিরাট একটা জাজিম বিছানো, আশেপাশে পিকনিকের সরঞ্জাম যেমন ছড়ানো-ছিটানো থাকে, তেমনি। বেতের বাস্কেট, কাপ-ডিশ-গেলাস-চামচে, থার্মোফ্লাস্ক। এবং আরও কত কী।

পলকের জন্যে একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, ''এ তো দেখছি পণ্ড পিকনিক!''

কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন না করে পারলাম না, ''মানে? পণ্ড পিকনিক মানে?''

মৃদু হাসলেন মিঃ লাহিড়ী। বললেন, ''পণ্ড পিকনিকের মানে বোঝো না? পিকনিক বাতিল করে ভোজনকারীরা হঠাৎ কোথায় চলে গেছেন, আর ফেরেননি!''

বিস্ময়ে আমার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল কি না জানি না, তবে মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন, ''অমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী? যা বলছি ঠিক তাই। একটা কোনও ঘটনা এমনই আকস্মিক ভাবে ঘটেছে যে, খাওয়ার প্লেট ছেড়ে সবাই দৌড়েছে একসঙ্গে—''

আমার বিস্মিত মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "ষাঁড়ে তাড়া করেনি তো?"

"কী বললে? ষাঁড়ে তাড়া করেছে?" একটু করুণ হাসি হাসলেন মিঃ লাহিড়ী, "ধরেছ ঠিকই। ষাঁড়েই তাড়া করেছে বটে। তবে ভাগ্যের ষাঁড়—'দুর্ভাগ্যের ষাঁড়ও বলতে পারো।'

আমি তখন যাকে বলে একেবারে হতভম্ব, হতবাক। অভ্রর দিকে একবার তাকালাম। দেখি, সেও নিশ্চুপ। সাইকেল থেকে নামেওনি সে তখন, বাঁ-পাটা তখনও প্যাডেল ছুঁয়ে, শুধু রিভলভিং ফ্যানের মতো মাথাটা তার একবার এদিক একবার ওদিক করছে। অর্থাৎ জাজিমের ওপর ছড়ানো সরঞ্জাম থেকে হাত-বিশেক দূরে জ্বলন্ত উনুনটা পর্যন্ত। চোখ দুটো থেকেই মনে হয়, কী যেন ভাবছে সে। কিংবা এমনও হতে পারে, কিছুই ভাবছে না—আমারই মতো অবস্থা তখন তার।

মিঃ লাহিড়ীর দৃষ্টি তখন দূরে, অনেক দূরে সমস্ত শালবনটাকে ঘিরে ঘোরাফেরা করছে। বোধ হয় কোনও মানুষজনেরই সন্ধান করছেন তিনি। কিন্তু না, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেউ কোথাও নেই। অনেকক্ষণ পর একসময় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা, বলো তো চাটুজ্যে, কিছু অনুমান করতে পারছ কি না? অর্থাৎ এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে যাতে সব ক'টা মানুষ এমন আনন্দময় পবিবেশ ছেড়ে হঠাৎ একসঙ্গে উধাও হয়ে গেল?" একটু থামলেন মিঃ লাহিড়ী, জাজিমের দিকে আঙুল দেখিযে বললেন, "এখানে দেখছ পাঁচ জাযগায় পাঁচটা প্লেট, কলা, ডিম আর সন্দেশ সাজানো। এর মধ্যে চারটে প্লেটের খাবারের পরিমাণ সামান্য কম-বেশি হলেও প্রায একইবকম। কিন্তু ওপাশেব প্লেটটার খাবার অনেক কম—অর্ধেকই বলা যেতে পারে। প্লেটটাও ছোট। চারটে প্লেটের খাবার কিছু কিছু খাওয়া হযেছে। কিন্তু ছোট প্লেটেব খাবার ছোঁওযা পর্যন্ত হযনি। চারটে প্লেটের পাশে জলের গ্লাস ছাড়া কফির বদলে এক গ্লাস দুধ। আর ওই যে দেখছ পাউরুটি—ওগুলো স্লাইস কবা হযেছে, কিন্তু মাখন লাগানো হযনি। অথচ মাখনের যে মোড়কটা পাশে রযেছে, সেটা প্রায শূন্য বললেই হয। যেটুকু আছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে রযেছে চার আঙুলেব ছাপ নয়, দাগ।"

কথাগুলো মিঃ লাহিড়ী গড়গড়িযে বলে গেলেন বটে, কিন্তু আমার কানে অর্ধেকও ঢুকছে কি না সন্দেহ। আমার মন পড়ে আছে তখন বিযেবাড়িতে। বর-কনে বেবোবাব আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে। এদিকে ঘড়িতে তখন প্রায দশটা বাজতে চলেছে। পথটা আধ ঘণ্টার ঠিকই, কিন্তু গল্প করতে করতে আসার ফলে আমাদের লেগেছে পঞ্চাশ মিনিটের ওপর। এখানে এসেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গেছি আমরা যে, নির্ধারিত সময়ের অনেক বেশিই পার হযে গেছে। এখন হাতে যা সময আছে, তীরের বেগে সাইকেল নিয়ে ছুটলে হয়তো আমরা সমযমতো বাড়িতে পৌঁছতে পারব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আবার রহস্য উদ্‌ঘাটনের দিকে মন দিই, তাহলে যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছনোর দফারফা। কী করব সেটা ভাবতেই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। অথচ মুখের ভাবখানা এমন করলাম যেন রহস্যোদ্‌ঘাটনের কথাটাই আমি চিন্তা করছি। মিঃ লাহিড়ী তখন তাঁর টোব্যাকো পাইপ ধবিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিযে একমনে কী চিন্তা করে চলেছেন।

মিনিট-কয়েক কেটেছে বোধ হয়, হঠাৎ পেছন থেকে মিঃ লাহিড়ীর গলা শুনতে পেলাম, "ওহে চাটুজ্যে, অভ্র কোথায় গেল, অভ্র?"

''কোথায় গেল মানে?'' চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে বললাম, ''এই তো এইমাত্র এখানে আমাদের সঙ্গেই ছিল!''

''ছিল তো জানি, কিন্তু এখন কোথায়?''

মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে এধার-ওধার যতদূর দৃষ্টি যায় তাকালাম। কিন্তু কোথায় অভ্র?

ঘড়ির কাঁটা তখন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর ডিঙোচ্ছে। বললাম, ''ও বাড়ি চলে যায়নি তো?''

ভুরু কুঁচকে মিঃ লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ''বলছ কী হে? বাড়ি চলে যাবে? এইভাবে না বলে? ও কি তোমার তেমন ছেলে?''

''তা অবশ্য নয়—'' মিঃ লাহিড়ীর কথার মাঝে বলে উঠেই চুপ করে গেলাম। না বলে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবার মতো চঞ্চল মস্তিষ্কের ছেলে যে অভ্র নয়, তা আমি ভালোভাবেই জানি। কিন্তু সত্যিই তো, গেল কোথায়?

হঠাৎ একটা ধারণা আমার মাথায় গজিয়ে উঠল। যদিও সেটা মিঃ লাহিড়ীর কাছে ব্যক্ত করলাম না। যে রহস্যোদ্ঘাটনের ভার মিঃ লাহিড়ী আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, আমি তো পারবই না, হয় তো সেটা অভ্রর পক্ষেও সম্ভব হবে না বুঝেই সে যঃ পলায়তে সঃ জীবতি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা, অর্থাৎ মিঃ লাহিড়ী এবং আমি তো তখন দূরে-দূরে যে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি।

আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে এগারোটা প্রায় হতে চলল, অভ্রর দেখা নেই। বারোটা বেজে গেল, তবুও।

পায়চারি থামিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, ''চলো তো বাড়ি ফিরে যাই, গিয়ে দেখি যদি...''

''তাই চলুন,'' বলে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

পৌঁছলাম যখন, একটা বেজে গেছে। বর-কনে চলে গেছে কখন। সারা বাড়িতে থমথমে একটা করুণ নীরবতা। নিজের জিনিসকে চিরজীবনের মতো পরের হাতে তুলে দেওয়ার যে দুঃখ, সেই দুঃখেই কাতর সকলে। সময়কালে আমরা যে ছিলাম না, সে-কথা খেয়ালই হয়নি কারও।

আমাকে দেখেই শ্রীমতী বীথি ফোলা-চোখে এগিয়ে এসে বলল, ''অভ্রকে দেখিনি অনেকক্ষণ, সে কোথায়?''

''জানি না তো।''

বুঝলাম, অভ্র এখানে আসেনি। তবু ভাঙলাম না কোনও কথা। সদ্য কন্যাবিদায়ের দুঃখে ভারাক্রান্ত সকলে। এইসময় নতুন কোনও খবর শোনানো মানেই বিব্রত করা সকলকে। খেয়ালি বয়স অভ্রর, নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক কোথাও ঘুরছে, ফিরে আসবে যথাসময়েই।

''সেই সাতসকালে ক'খানা বাসী লুচি আর বোঁদে খেয়ে বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই,'' কথাটা বলেই বীথি আমার মুখের দিকে তাকাল, ''তা তোমার মুখ এমন ভার কেন? কোথায় গেছলে? অনেকক্ষণ তো দেখতেও পাইনি। মিস্টার লাহিড়ী কোথায়?'' জবাবের প্রত্যাশায় না থেকে একটু থেমেই সে আবার বলল, ''নাও নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে। চানটান যদি করো তো করে নাও। মিস্টার লাহিড়ীকেও বলো করতে। অভ্র যখন আসবে, আসবে—''

''শুভ্র কোথায়?''

''ক্যারমবোর্ড নিয়ে বসেছে।''

বালতি হাতে কুয়োতলার দিকে এগোল বীথি। আমিও পায়ে পায়ে এগোলাম আমাদের ঘরের দিকে। পাশের বাড়ির সেই দোতলায়। মিঃ লাহিড়ী তখন জামা-প্যান্ট ছাড়ছেন। বললেন, ''সত্যিই কী ব্যাপার বলো তো চাটুজ্যে? গেল কোথায় ছেলেটা?''

স্নান করলাম, খাওয়াদাওয়া সারলাম, এবং হাত-পা ছড়াবার জন্যে একটা বিছানার আশ্রয়ও নিলাম, কিন্তু মনে স্বস্তি নেই এতটুকু। কেবলই মনে হচ্ছে, এই হয় তো দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল অভ্র, মুখ-চোখ রোদে কালো, চুল উশকোখুশকো, আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বলে উঠবে, 'জানো বাবা—কিংবা হয়'তো পাশের বাড়ি থেকে তার মায়ের গলা পাব, 'কোথায় গেছলি বল তো সেই সকাল থেকে? যা, আগে তোর বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। করে এসে, চানটান কিছু করতে হবে না, খেতে বসে যা!'

কিন্তু না, কোনও আওয়াজই নেই, ঘরের পুব-দেয়ালে সেকেলে জাপানি ঘড়িটা শুধু টিকটিক করে বেলা বয়ে যাওয়ার আভাস দিয়ে চলেছে। শীতের বেলা, তায় পাড়াগাঁ, কেমন যেন নিঝুম হয়ে আসছে চারদিক। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে এর মধ্যে বার-তিনেক এসে অভ্রর মা ঘুরে গেছে ঘরে। অভ্রর নতুন মাসিমা, মেসোমশাই, তাঁদের মেয়ে শিখা থেকে শুরু করে ছেলে তনু, তপন সবাই একবার করে আসছে আর যাচ্ছে। হাজারো প্রশ্ন, হাজারো 'মনে হওয়া,' হাজারো আশ্বাস। শেষে, কোথায় কোন কালীতলার মাঠে মেলা বসেছে, সেখানেও যেতে পারে আশা করে যখন মিঃ লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বেরোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় নীচের উঠোনে শোরগোল শোনা গেল।

চকিতে জানালার কাছে ছুটে এলাম। এবং গিয়ে দেখি...।

হ্যাঁ, অভ্রই বটে! সাইকেল থেকে নামছে।

মুহূর্তখানেক সময় গেল নিজেকে সামলাতে। তারপর ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ওর মাকে বললাম, ''আগে হাত-পা ধুয়ে ও চাট্টি খেয়ে নিক। তারপর শুনো'খন ও কী বলতে চায়''

মিঃ লাহিড়ী আমার পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, ''যাক, বাঁচা গেল! বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল ছেলেটা!''

সবেদা গাছের গুঁড়িতে সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে রেখে কুয়োতলায় গিয়ে হাত-পা ধুয়ে অভ্র কিন্তু খেল না। বললে, ''খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে আমার। একটু বাদে বাবা আর জেঠুকে যখন চা দেবে, রাগ কোরো না মা, আমাকেও একটু দিও। মাথাটা বড্ড ধরেছে আমার!''

অভ্র ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই মিঃ লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলেন, ''বাচ্চাটা কেমন আছে অভ্র?''

মিঃ লাহিড়ীর কথায় চমকে উঠলাম। বাচ্চা! কার বাচ্চা? কোন বাচ্চা? এ কী বলছেন মিঃ লাহিড়ী।

মুচকি হেসে অভ্র স্বাভাবিক গলাতেই জবাব দিল, ''ভালোই। এখন বাড়ি নিয়ে গেছে ওর বাবা-মা। সাতদিন বাদে একবার আউটডোরে নিয়ে আসতে বলেছেন ডাক্তাররা।''

আমার কৌতূহল তখন চরমে উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন না করে পারলাম না, ''কার কথা বলছিস রে তুই, অভ্র?''

''পিকনিক করতে গিয়ে যে-বাচ্চাটা পুড়ে গেছল।''

''মানে!'' যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

বিছানার প্রান্তে বসতে বসতে অভ্র বলল, ''বলছি, বলছি, সব বলছি। আগে একটু হাঁপ ফেলতে দাও। কত মাইল সাইক্লিং করেছি আজ জানো? অন্তত কুড়ি মাইল!''

মিনিটখানেকের জন্যে একটু থামল অভ্র। তারপর শুরু করল, ''আজ সকালে পিকনিক স্পট থেকে পাঁচজনের যে দলটাকে ষাঁড়ে তাড়া করেছিল বলে তুমি বলেছিলে, সেটা একেবারে ভুল। ষাঁড় ও অঞ্চলে নেই, অন্তত যাতায়াতের পথে একটাও চোখে পড়েনি। পিকনিকের সরঞ্জামগুলো দেখে লাহিড়ীজেঠু আসল ঘটনাটা ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই বলেছিলেন 'দুর্ভাগ্যের ষাঁড়ে তাড়া করেছে।' আমি জেঠুর শিষ্য, আমিও কতকটা সেইরকমই আন্দাজ করেছিলাম এবং সেটা মুখে প্রকাশ করার আগে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। তাই তোমাদের কাউকে কিছু না বলে তোমরা যখন যে-যার নিজেদের চিন্তাতেই বিভোর, ফাঁক বুঝে সাইকেল নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, অগ্নি দুর্ঘটনা যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হলে প্রথমেই তারা যাবে কোনও ডাক্তারের কাছে, কিংবা হাসপাতালে। গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার বড়-একটা মেলে না, মিললেও পোড়া-কেসের চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। তা হলে উপায়? উপায় একমাত্র হাসপাতাল। তা, সে তো শহর ছাড়া মিলবে না কোথাও। ছুটলাম শহরের দিকে, যেটা এখান থেকে অন্তত মাইল-আষ্টেক দূরে। গেলাম এবং এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে দেখলাম, আমার ধারণা বিন্দুমাত্র ভুল নয়। বনভোজনকারীরা বিমর্ষ হয়ে ঘোরাফেরা করছে এবং দুজন ডাক্তার একটি অর্ধ-অচেতন বছর-ছয়েকের মেয়েকে টেবিলে শুইয়ে তার পরিচর্যা করছেন। ওঁদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, ভোজনকারীরা যখন ব্রেকফাস্টের আয়োজনে এবং মনোরম পরিবেশের আনন্দে মশগুল, তখন তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ দ্যাখে, একটা ছোট্ট গাছের ডাল নিয়ে মেয়েটি আগুনের প্রায় কোলের কাছে গিয়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ও কী করছিস, ও কী করছিস?'' বলে চিৎকার করে উঠতেই মেয়েটি হকচকিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় তার ফ্রকের তলার অংশে এবং চোখের পলকেই সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার সারা শরীরে। ভোজনকারীরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে টেনে তোলে এবং সবাই মিলে হাত চাপড়ে চাপড়ে আগুনটাকে দেয় নিবিয়ে। মেয়েটি তখন আগুনের তাপেই হোক আর ভয়েই হোক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। প্রাথমিক করণীয় হিসেবে হাতের কাছে মাখনের যে মোড়ক ছিল, তা থেকে দলা দলা মাখন দিয়ে মেয়েটির শরীরের পোড়া জায়গাগুলো লাগিয়ে দিয়ে বনভোজনকারীরা জিপ নিয়ে ছোটে শহরের হাসপাতালের দিকে। তারা অবশ্য ওই শহরেরই লোক, তাই মিনিট-পনেরোর মধ্যেই তারা সোজা পৌঁছে যায় হাসপাতালে। তবে ভগবান সহায়, ডাক্তাররা যা বললেন, বাইরে থেকে আগুন দেখে যতটা আশঙ্কা করা গেছল, আসলে ততটা ক্ষতি হয়নি। পুড়েছে, জায়গায় জায়গায় ফোস্‌কাও পড়েছে, তবে কোনও ক্ষতই তত গভীর নয়। ডাক্তাররা আশা করছেন, ভালোভাবে শুশ্রূষা করলে মাসখানেকের মধ্যেই মেয়েটির পোড়া দাগগুলো পর্যন্ত মিলিয়ে যাবে।''

একটু থামল অভ্র, বোধ হয় দম নিল। তারপর বলতে লাগল, ''বনভোজনকারীদের দু-জন মেয়েটিকে নিয়ে সাইকেল-রিক্শা করে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং বাকি দুজন সাইকেল সমেত আমাকে জিপে তুলে নিয়ে আবার সেই পিকনিক-স্পটে ফিরে এলেন সরঞ্জামগুলো

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। খাবারগুলো অবশ্য তাঁরা ফেলেই দিলেন। তবে আমাকে ছাড়লেন না কিছুতেই, টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়িতে। মেয়েটির তখন জ্ঞান ফিরেছে, কথাবার্তা বলছে। আমার কোনও ওজরই শুনলেন না, জোর করে আমাকে খাইয়ে দিলেন একপেট।''

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল অভ্র। সকৌতুকে বলল, ''এখনও তোমার কৌতূহল মেটেনি তো বাবা? বলি, শোনো। পিকনিক করতে যে মোট পাঁচজন গিয়েছিল, সেটা বোঝা যায় মোট পাঁচটা খাবারের প্লেট দেখে। তাদের মধ্যে যে একজন বাচ্চা আছে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়, একটি ছোট প্লেট, কফির বদলে দুধের গ্লাস দেখে। দুর্ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছিল, সেটা জানা যায় দুটো জিনিস লক্ষ করে। এক, সাজানো খাবার ফেলে একসঙ্গে সবার উধাও হয়ে যাওয়া, আর দুই হল, মাখনের মোড়ক। স্লাইস করা রুটিতে মাখন লাগানো হয়নি, অথচ মাখনের মোড়ক খালি। যেটুকু আছে, তাতে আবার চার আঙুলের স্পষ্ট দাগ। অর্থাৎ চারটে আঙুল দিয়ে দলা দলা মাখন তুলে নিলে যা হয়। খাবারের ডিশ থেকে সামান্য-সামান্য খাবার মুখে দিতে শুরু করলেও, দলা দলা মাখন নিশ্চয়ই কেউ চাখবে না। তাই, লাহিড়ীজেঠুকে একদৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার মনে চট করে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথাটাই আসে। এবং সেটার আংশিক সত্যতা প্রমাণ করছে মাখনের মোড়কটা। পোড়া জায়গায় অনেক সময় মাখনের প্রলেপ লাগানো হয়। আমার ধারণার পুরোটা সত্যি কি না জানবার জন্যেই সাইকেল নিয়ে চট্ করে—''

মিঃ লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি বুঝলেন কী করে যে অভ্র বাচ্চাটার সন্ধানেই গেছে?''

মিঃ লাহিড়ী মৃদু হাসলেন, ''পাঁচটা ইন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে যার অপর নাম ইনট্যুইশান। সেই ইনট্যুইশানের সাহায্যেই বুঝলাম, অভ্র সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছে। এবং অল্পবয়সের চাপল্যের জন্যেই বলো, আর অনুমানটাকে প্রমাণ-নির্ভর করে নিশ্চিত হবার জন্যেই বলো, অভ্র যে হাসপাতালের দিকেই ছুটবে, এ আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে সেটা বলিনি, পাছে তুমি ছেলের ওপর রাগারাগি করো।''

দরজার আড়াল থেকে অভ্রর মা যে সমস্ত কথা এতক্ষণ শুনছিলেন, তা বোঝা গেল যখন তিনি ঘরে ঢুকেই মন্তব্য করলেন, ''তোমরা আর যেখানেই পিকনিক করো না কেন, ও জায়গায় কিন্তু কোরো না। ওটা ভীষণ অলক্ষুনে জায়গা!''

অভ্র বলে উঠল, ''কিন্তু চা—চা কোথায় মা? মাথাটা যে বড্ড ধরেছে!''

''চা নয়, কফি আনছি। তোর কি মনে নেই, মিস্টার লাহিড়ী কফিটাই পছন্দ করেন বেশি?''

প্রেত-কুকুর

নটরাজন

অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে গিয়ে পুলিশকে যতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তার মধ্যে অপরাধীকে মারধোর করাও একটি। কিন্তু এটা হচ্ছে পুরানো দিনের আসুরিক পদ্ধতি। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারটা একেবারেই অচল। কাজেই বিশ্বের প্রগতিশীল দেশে এ কাজে কৌশল অবলম্বন করতে হয় পুলিশকে। আবার আইনের চোখে পুলিশের কাছে অপরাধীর স্বীকারোক্তির মূল্যও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশে কেউ নরহত্যা করে সেকথা পুলিশের কাছে স্বীকার করলেও তার কিছু যায় আসে না, কারণ পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তির কোন মূল্যই নেই এদেশে।

পুলিশের পুঁথিপত্রে স্বীকারোক্তি আদায় করবার কতগুলো বাঁধা-ধরা পদ্ধতির কথা লেখা থাকলেও এপথে সবসময় কাজ চলে না। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে তার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো মাঝেমধ্যে এই বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরেও যেতে হয়। তেমনি এক স্বীকারোক্তি আদায়ের কাহিনীই আজ তোমাদের শোনাবো। কৌশলটি বাস্তবিকই অদ্ভুত ও অভিনব। তবে এই কৌশলের আসল ভিত্তি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই নামক দ্বীপপুঞ্জের এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যার তুলনা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

লোকটির নাম জর্জ ড্যানিয়েল। থাকে সানফ্রানসিস্‌কো শহরে। তিরিশ পঁয়ত্রিশের মতো বয়স। কাজ করে ওখানকার একটা বড় কারখানায়। বাড়িতে স্ত্রী পামেলা ছাড়া আর দু'তিনটি ছেলেমেয়ে। এ তো আর আমাদের দেশের কারখানার মজুর নয়, আমেরিকার একজন সাধারণ শ্রমিকেরও আছে নিজস্ব মোটর গাড়ি, বাড়িতে টেলিভিশন সেট্‌।

বেশ সুখেই দিন কাটছিল ড্যানিয়েলের। নিজের মোটর গাড়ি চালিয়ে ফ্যাক্টরিতে যায়। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এসে সোফায় দেহভার এলিয়ে দিয়ে বসে বসে টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখে। কিন্তু কপালে দুঃখ থাকলে তা খণ্ডাবে কে? ড্যানিয়েলেরও হল ঠিক তাই।

সানফ্রানসিস্‌কো শহর থেকে প্রায় শ'দুয়েক মাইল উত্তরে সাক্রামেন্টো নদীর একেবারে গা ঘেঁষে একটা ছোট্ট শহরে বাস করে ড্যানিয়েলের এক বৃদ্ধ পিসি। প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক ওই বৃদ্ধা কিন্তু ভয়ানক কৃপণ প্রকৃতির। একমাত্র ভাইপো ড্যানিয়েল ছাড়া বৃদ্ধার ত্রিসংসারে আর কেউ নেই। শহরের একটি নির্জন প্রান্তে একখানা ছোট বাড়িতে তিনটি বড় বাঘের মতো ব্লাড-হাউন্ড কুকুর নিয়ে বৃদ্ধা একা বাস করে। এই কুকুর তিনটিই

বৃদ্ধার রাতদিনের সঙ্গী। কেবল চেহারায় নয়, স্বভাবেও এই তিনটি প্রাণী ভয়ঙ্কর। মেটে গায়ের রঙ্, লকলকে জিভ, রক্তবর্ণ ক্ষুদে চোখে সর্বদাই যেন লেগে রয়েছে এক সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতা। চোখের ওপরে ঠিক ভুরুর কাছে একটি করে সাদা গোলাকার দাগ ওদের ওই ভয়ঙ্কর মুখগুলোকে যেন আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে।

এই কুকুর তিনটির দাপটে বৃদ্ধার বাড়িতে কাকপক্ষীটি বসবারও সাহস পায় না। প্রতিবেশীরা যমের মতো ভয় করে এই তিনটি প্রাণীকে। নেহাত দায়ে না ঠেকলে কেউ বৃদ্ধার বাড়ির ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষে না। কাজেই একা থাকলেও বৃদ্ধা একেবারেই নিরাপদ।

ছুটি-ছাটায় ড্যানিয়েল তার এই বৃদ্ধার কাছে বেড়াতে এলেও এই ভয়ঙ্কর কুকুর তিনটিকে যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না। এদের দিকে চোখ পড়লেই জোয়ান ড্যানিয়েলের বুকটা যেন ধক করে ওঠে। ওদের চোখের ওই নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ঠিক সহ্য করতে পারে না সে। ড্যানিয়েলের মনে হয়, ওরা যেন সাধারণ কুকুর নয়, ওরা যেন তিনটি সাক্ষাৎ যমদূত, সদাসর্বদা পাহারা দিয়ে চলেছে ওই বৃদ্ধাকে।

এই ব্লাড-হাউন্ড কুকুর তিনটির কথা মনে পড়লেই ড্যানিয়েলের আসতে ইচ্ছে করে না তার পিসির কাছে। কিন্তু না এসেও উপায় নেই। পিসির অবর্তমানে সে নিজেই হবে এত ধন-সম্পত্তির একমাত্র মালিক। কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও তাকে মাঝেমধ্যে পিসির কাছে এসে তার খোঁজ-খবর নিতে হয়। বলা তো যায় না, পিসি যদি তার ওপর রাগ করে সবকিছু অন্য কাউকে দিয়ে দেয়!

যমদূতের মতো দেখতে ওই তিনটি প্রাণী কিন্তু ড্যানিয়েলের ওপর তেমন বিরূপ নয়। ওরাও বোধ হয় এতদিনে বুঝে নিয়েছে যে তাদের কর্ত্রীর অবর্তমানে এই লোকটিই তাদের দেখাশোনার ভার নেবে। তখন এই লোকটিই হবে তাদের আসল মালিক। ইচ্ছে না থাকলেও ড্যানিয়েলকে ওই কুকুর তিনটির গায়ে-মাথায় মাঝেমধ্যে আলগোছে হাত বুলিয়ে পিসির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে হয়। নইলে এই নিয়েই হয়ত পিসি তার ওপর বিগড়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশের ঠাকুমা দিদিমাদের মতো ওদের দেশের বৃদ্ধারা কেবল কুটনো কুটে আর ঠাকুর দেবতার নাম করে সময় কাটায় না। বৃদ্ধ বয়সেও ওরা এমন সব কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত যা নাকি আমাদের যুবারাও অনেক সময় করতে ঠিক ভরসা পায় না। ড্যানিয়েলের বৃদ্ধা পিসির যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দেহের শক্তিও এসেছে কমে। কাজেই এখন আর তেমন দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না সে। সকাল-সন্ধ্যা ছোট নৌকায় চেপে সাক্রামেন্টো নদীতে হাওয়া খেয়ে বেড়ানোই তার একমাত্র শখ। বলাবাহুল্য নদীতে বেড়াবার সময় এই কুকুর তিনটিই তার একমাত্র সঙ্গী।

বৃদ্ধার একখানা নিজস্ব নৌকো থাকলেও তা নিজের হাতে চালানোর ক্ষমতা তার নেই। একাজে ড্যানিয়েল কিন্তু খুবই দক্ষ। কিন্তু ছুটি-ছাটা ছাড়া তাকে পাওয়া যায় না। কাজেই বৃদ্ধাকে সচরাচর ভাড়া-করা নৌকোর ওপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। ড্যানিয়েল যখন আসে তখন সে তার বৃদ্ধা পিসি আর ওই তিনটি যমদূতকে নিয়ে স্রোতস্বিনী সাক্রামেন্টোর বরফ-গলা ঠান্ডা জলে নৌকো ভাসায়।

বৃদ্ধা জানে, তার নিজের মৃত্যুর পরে তার ভাইপো ড্যানিয়েলই তার সবকিছু পাবে। পাড়া-প্রতিবেশিরাও তাই জানে। আর ড্যানিয়েল ও তার স্ত্রী পামেলা তো এই জল্পনা-কল্পনা নিয়েই রাতদিন মশগুল হয়ে থাকে। পিসির মৃত্যুর পরে তার এই বিরাট সম্পত্তি তারা কেমনভাবে ভোগ করবে তা নিয়েই তারা একটার পর একটা পরিকল্পনা রচনা করে অবসর

কাটায়।

এদিকে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। বৃদ্ধা পিসির মরার কোন লক্ষণই নেই। ইংল্যাণ্ডের সপ্তম এডওয়ার্ডের মতো আর ধৈর্য ধরতে পারে না ড্যানিয়েল। সিংহাসনে আরোহণ করার জন্যে সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁর মা রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-কামনা না করলেও ধন-সম্পত্তি পাওয়ার লোভে ড্যানিয়েল তার বৃদ্ধা পিসির মৃত্যু-কামনাই করতে থাকে মনে মনে। কিন্তু কামনা করলেই সবসময় কাম্যবস্তু পাওয়া যায় না, যেমন নাকি শকুনের শাপে গোরু মরে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সুস্থ শরীরে বেশ বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে সেই বৃদ্ধা।

অবশেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে ড্যানিয়েলের। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। আর কতকাল এমনিভাবে বসে বসে দিন গুনবে?

কিন্তু চোখের সামনে কোন উপায়ও দেখতে পায় না। যমরাজ বোধ হয় ভুলে গেছেন তার এই পিসির কথা। কিন্তু তিনি ভুললেও বৃদ্ধার এই গুণধর ভাইপো তা ভুলে থাকে কেমন করে? নিদেনপক্ষে সেই ভুলোমন যমরাজকে নিজের এই পিসির কথা মনে করিয়ে দেওয়াটাও তো তার কর্তব্য।

সেই কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই মনে মনে একটা ফন্দি আঁটে ড্যানিয়েল। এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। কেউ যাতে কোন দিন তাকে সন্দেহ করতে না পারে।

ড্যানিয়েলের একবার মনে হয় নিজের পরিকল্পনার কথা স্ত্রী পামেলাকে বলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সতর্ক হয়ে ওঠে—না, এ কথা সে পৃথিবীর কাউকে জানতে দেবে না, এমনকী নিজের স্ত্রীকেও নয়। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কাকে বলে ফেলে কী বিপদ ডেকে আনবে তার ঠিক কি? তাছাড়া, পামেলার যা স্বভাব তাতে সে তার এই পরিকল্পনায় সায় দেবে বলেও মনে হয় না। তার চাইতে তার কাছে সবকিছু চেপে যাওয়াই ভালো।

অবশেষে এক ছুটির দিনে ফন্দির বোঝা মাথায় নিয়ে ড্যানিয়েল এসে হাজির হয় তার বৃদ্ধা পিসির বাড়ি। সঙ্গে করে নিয়ে আসে কিছু ফলমূল আর বৃদ্ধার কিছু প্রিয় খাবার।

পিসি তো খুব খুশি। গাঁটের পয়সায় কেনা নিজের প্রিয় খাবারও তেতো লাগে তার মুখে। কাজেই ভাইপোর হাতে নিজের প্রিয় খাবার দেখে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে তার। মনে মনে হয় তো ভাবে, এমন ভাইপোর পিসি হওয়াও কত সুখের! কিন্তু সেই মুহূর্তে সে যদি ভাইপোটির মনের খবর পেত তাহলে হয় তো ওই খাবার তার গলায় আটকে যেত।

পরের দিন বিকেলে দলবল নিয়ে বোটিং অর্থাৎ নৌকাবিহারে বেরোয় তারা। দলবল মানে ড্যানিয়েল নিজে আর সেই বৃদ্ধা পিসি। সঙ্গে সেই যমদূত তিনটি।

বরাবরের মতো নৌকোর সামনের দিকে বসে বৃদ্ধা নদীর আবছা পাড়ের দিকে তাকিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে, আর উলটো দিকে বসে দু'হাতে দাঁড় টেনে চলে ড্যানিয়েল। ব্লাড-হাউন্ড তিনটি স্থির হয়ে বসে থাকে মাঝখানে। কিন্তু আজ ওই কুকুর তিনটির চাল-চলন যেন একটু অন্যরকম। ওরা কেন যেন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। কর্ত্রীর দৃষ্টি অনুসরণ করে নদীর পাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেও যেন তাদের মন নেই আজ। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে উঠে গরগর শব্দ করতে করতে হিংস্র দৃষ্টিতে তারা তাকায় ড্যানিয়েলের দিকে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে ওঠে ড্যানিয়েলের। ওরা আজ এমন করছে কেন? তবে কি ওরা ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তার পরিকল্পনার কথা টের পেয়েছে? তাই কি ওরা এমন খাপ্পা হয়ে উঠেছে ড্যানিয়েলের ওপর?

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে ড্যানিয়েল। ওই ভয়ঙ্কর কুকুর তিনটি যদি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ওদের এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। তার বৃদ্ধা পিসির সাধ্য হবে না ওদের সামলায়।

তবে কি নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ করবে ড্যানিয়েল? না, কক্ষনো না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করবেই, তারপর যা থাকে কপালে।

এপ্রিল মাসের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া বইছে সাক্রামেন্টো নদীর ওপর। নদীর জল ঘেঁষে উড়ে চলেছে কয়েকটা সী-হক পাখি। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। ওই যমদূত তিনটির হিংস্র দৃষ্টি উপেক্ষা করে দু'হাতে দাঁড় টানতে টানতে পা দিয়ে একটু একটু করে একখানা কাঠের তক্তা সরিয়ে ফেলে ড্যানিয়েল। নীচে একখানা গোল পাথরের চাঁই এমনভাবে রাখা হয়েছে যা নাকি পা দিয়ে একটু ঠেলা দিলেই একপাশে গড়িয়ে গিয়ে নৌকোটাকে কাত করে ফেলবে।

কুকুর তিনটি যেন আরও ক্ষেপে উঠেছে ড্যানিয়েলের ওপর, এখন আর কেবল মুখে সামান্য গরগর শব্দ নয়, প্রচণ্ড বিক্রমে তারা চিৎকার করছে তার দিকে তাকিয়ে। চোখে যেন আগুন ঝরছে ওদের।

কুকুর তিনটির ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ওঠে বৃদ্ধা। মুখের কথায় ওদের শান্ত করতে বৃথা চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে সে কুকুরগুলোর দিকে এগোতে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ড্যানিয়েলের পায়ের চাপে সেই বড় পাথরখানা গড়িয়ে পড়ে নৌকোর একপাশে।

একটিমাত্র মুহূর্ত। চোখের পলকে ছোট্ট নৌকোটা একবার টলমল করে উঠেই কাত হয়ে পড়ে একদিকে। নিজেকে সামলাতে না পেরে বৃদ্ধা জলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গেই উলটে যায় নৌকো। কুকুর তিনটি একবার ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

বৃদ্ধা সাঁতার জানে না। সাক্রামেন্টো নদীর কনকনে জলে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে ওঠে। জলে হাবুডুবু খেতে খেতে সে স্রোতের টানে ভেসে চলে। কুকুর তিনটিও ভেসে চলে বৃদ্ধার পিছু পিছু। নিজেদের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে তারা কেবল অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের কর্ত্রীর দিকে। কোন উপায় নেই। বৃদ্ধাকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই তাদের। বাঘের মুখ থেকেও যারা তাদের কর্ত্রীকে অনায়াসে ফিরিয়ে আনতে পারত, এই স্রোতস্বিনী সাক্রামেন্টোর জলে তারা একান্তই নিরুপায়। জীবিত থাকতে তারা বরাবর পাহারা দিয়ে এসেছে এই মহিলাকে, মরণের পরপারেও তারা তাকে পাহারা দিয়েই নিয়ে যাবে।

পরিকল্পনা মতো ড্যানিয়েল কিন্তু নৌকোর কাঠ ধরে ভাসতে লাগল, তা ছাড়া সে সাঁতারেও বেশ পটু। কাজেই কয়েকটি জেলে-নৌকো এসে যখন ড্যানিয়েলকে টেনে তুলল তখন ক্লান্ত হলেও সে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েনি। তার আগেই কিন্তু তার বৃদ্ধা পিসি সেই কুকুর তিনটির সঙ্গে সাক্রামেন্টোর অতল জলে তলিয়ে গেছে।

দুই

সানফ্রানসিস্কোর জর্জ ড্যানিয়েল এখন প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক, স্ত্রী পামেলা খুব খুশি। অবশ্যি পামেলা মাঝে-মাঝে দুঃখ করে বলে, শেষে কি-না পিসি এমন বেঘোরে

প্রাণটা দিলে!

স্ত্রীর এসব কথা শুনলে বিরক্ত হয় ড্যানিয়েল। তিক্ত কণ্ঠে বলে, আমি কি তাকে ইচ্ছে করে জলে ডুবিয়ে মেরেছি নাকি?

জবাব দেয় পামেলা, না—না, আমি সেকথা বলছি না-–।

—তবে আর ওসব আলোচনা করে লাভ কী?

পামেলা চুপ করে থাকে। মনে মনে ভাবে, নিজের পিসিকে রক্ষা করতে পারেনি বলে ড্যানিয়েল লজ্জিত। তাই বোধ হয় সে ওই প্রসঙ্গ এড়াতে চায়।

ওরা প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলেও স্থানীয় পুলিশের সন্দেহ কিন্তু যোচে না। এটা কি সত্যিই অ্যাকসিডেন্ট না ড্যানিয়েলের ইচ্ছাকৃত কোনও ব্যাপার? হাঁসের পেট চিরে তাড়াতাড়ি সবকটা সোনার ডিম পাওয়ার মতো ব্যাপার নয় তো? তাড়াতাড়ি ধন-সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বুড়িকে জলে ডুবিয়ে মারেনি তো ড্যানিয়েল?

পুলিশের এই সন্দেহের পেছনে আরও একটা কারণ ছিল, তাদের জেরার জবাবে ওখানকার একজন জেলে বললে যে ওই দিন সকালে সে নাকি ড্যানিয়েলকে একখানা মস্তবড় পাথর নৌকোয় তুলতে দেখেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কিন্তু ড্যানিয়েল নিজে সবকিছু অস্বীকার করলে। কাজেই প্রমাণের অভাবে পুলিশের চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় রইল না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই ড্যানিয়েলের কাঁধে এসে ভর করল এক নতুন উপসর্গ। মুখে সে যাই বলুক না কেন নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী। প্রায় প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে—তার মৃতা পিসির সেই ভয়ঙ্কর কুকুর তিনটি যেন হিংস্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তাদের সেই হিংস্র দৃষ্টির সঙ্গে যেন মিশে থাকে এক অপরিসীম ঘৃণা। ভয় পেয়ে যেন ছুটে পালাতে চেষ্টা করে ড্যানিয়েল, আর কুকুর তিনটিও যেন ঘেউ-ঘেউ করে ছুটতে থাকে তার পিছু পিছু।

ভয় পেয়ে ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে ড্যানিয়েল। ঘুম ভেঙে যায় তার, বিছানায় উঠে বসে সে হাঁপাতে থাকে।

স্ত্রী পামেলা এসে জিজ্ঞেস করে, কী হল, এমন করছ কেন?

ভয়মিশ্রিত চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ড্যানিয়েল পামেলাকে বললে, তোমার স্প্যানিয়েল কুকুরটা কোথায়?

বিস্মিত চোখে ড্যানিয়েলের দিকে তাকিয়ে পামেলা জবাব দেয়, কুকুরটা তো তার নিজের জায়গায় শুয়ে আছে। কেন, কী হয়েছে?

—না—না, তেমন কিছু হয়নি। কাল সকালে উঠেই ওটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিও।

—সেকী, ওই বেড়ালের মতো একরত্তি ছোট্ট কুকুরটাকে নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা কীসের?

—না পামেলা, দুশ্চিন্তা ঠিক ওকে নিয়ে নয়। বলেই হঠাৎ চুপ করে ড্যানিয়েল।

একদিন নয়, এমনই পর পর কয়েকদিনই ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে ড্যানিয়েল। অবশেষে স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে স্বপ্নের কথা বলতে হয় তাকে। শুনে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে পামেলা। তারপর বললে, ওসব কিছু নয়, নিজের চোখের সামনে কুকুরগুলোকে জলে ডুবে মরতে দেখেছ বলেই ওদের স্বপ্ন দেখছ। ঠিক আছে, আমি আমার কুকুরটা অন্যত্র সরিয়ে দেব। চোখের সামনে থেকে ওটা সরে গেলে হয় তো

এমন বাজে স্বপ্ন আর দেখবে না তুমি।

বাস্তবিকই পরের দিন সকালেই পামেলা তার ছোট্ট কুকুরটাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়।

দিন-কয়েক বেশ কাটে। একদিন ড্যানিয়েল পামেলাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলতে পার, মৃত্যুর পরে কুকুরের প্রেতাত্মাও কি ঘুরে বেড়ায়?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে পামেলা জিজ্ঞেসা করে, কেন, কী হয়েছে?

একটু সময় চুপ করে থেকে ড্যানিয়েল নিচু কণ্ঠে বললে, জানো পামেলা, ইদানিং আমার মনে হচ্ছে পিসির সেই ব্লাড-হাউন্ড তিনটির প্রেতাত্মা যেন সদাসর্বদা আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের অস্তিত্ব টের পাই আমি, ওদের কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পাই।

চিন্তিত মুখে পামেলা বললে, এসব তোমার মনের বিকার। একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

ডাক্তারও সব শুনে সেই একই কথা বললেন, বুঝলেন মিস্টার ড্যানিয়েল, কুকুরগুলোকে নিজের চোখে জলে ডুবে মরতে দেখে আপনার মনে যে শক্ লেগেছে তা থেকেই এসবের সৃষ্টি। কিছুদিন আমার চিকিৎসায় থাকলেই ভালো হয়ে উঠবেন।

মাস দুয়েকের চিকিৎসাতেও কিন্তু কোন ফল হল না। দেখতে দেখতে ড্যানিয়েলের এমন অবস্থা হল যে অন্ধকারে গাছের ছায়াকেও কুকুর বলে মনে করে সে চিৎকার করে ওঠে। বাইরে হাওয়ার শব্দের মধ্যেও সে শুনতে পায় কুকুরের কণ্ঠস্বর।

ড্যানিয়েলের এই অসুখের খবর আর গোপন নেই। স্থানীয় পুলিশও তা জানতে পেরেছে। তবে কি তাদের সেই অনুমানই ঠিক? কিন্তু প্রমাণ কোথায়? এখন একমাত্র ভরসা ড্যানিয়েলের নিজের স্বীকারোক্তি, কিন্তু তা আদায় করা যাবে কেমন করে?

তক্কে তক্কে থাকে পুলিশ। গোপনে ড্যানিয়েলের ওপর নজর রাখে তারা, আর সুযোগ খুঁজতে থাকে ড্যানিয়েলের কাছ থেকে সত্যি কথাটা বের করবার জন্যে।

অবশেষে একদিন জুটে গেল সেই সুযোগ। ড্যানিয়েলকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে ডাক্তার বললেন, এসব মনের রোগ ওষুধপত্রে সারবে না। আপনাকে কিছুদিন কোন সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। সমুদ্রতীরের সুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় বেড়ানো আর বিশ্রাম—এই আপনার একমাত্র ওষুধ।

কথাটা কানে আসতেই পুলিশের বড়কর্তা তদন্তকারী অফিসার সার্জেন্ট হারবার্টকে ডেকে বললেন, খবর শুনেছেন? ড্যানিয়েলকে নাকি তার ডাক্তার সমুদ্রতীরের কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম করতে উপদেশ দিয়েছে। এই সুযোগে যদি আমরা তাকে কোন রকমে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সেই বিশেষ জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারি—কথাটা শেষ না করেই তিনি সার্জেন্ট হারবার্টের দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হাসেন।

পুলিশের বড়কর্তার রহস্যময় হাসির অর্থটুকু বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না সার্জেন্ট হারবার্টের। সেও তেমনি মৃদু হেসে বললে, দেখি চেষ্টা করে।

এর পরে একদিন হারবার্টকে ড্যানিয়েলের পিছু পিছু শহরের একটা ট্যুরিস্ট অফিসে ঢুকতে দেখা গেল। হারবার্টের পরনে ছিল সাধারণ নাগরিকের পোশাক।

ড্যানিয়েল যখন ট্যুরিস্ট অফিসের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একজন কর্মচারির সঙ্গে সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলো সম্বন্ধে খোঁজখবর করছিল, ঠিক তখনই সেখানে এসে দাঁড়ায় হারবার্ট। সেও এসেছে সেই একই উদ্দেশ্যে।

হারবার্ট কর্মচারিটিকে জিজ্ঞেস করে, স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ কেমন?

—খুব চমৎকার, জবাব দেয় কর্মচারিটি, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। ঠিক যেন একখানি ছবি। যাবেন নাকি ওখানে?

কৃত্রিম দ্বিধাগ্রস্ত সুরে জবাব দেয় হারবার্ট, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ তো একেবারে কাছের জায়গা নয়। যেতে-আসতে অনেক খরচ। কিন্তু উপায় নেই। অসুখ সারাতে হলে ডাক্তারের

কথামতোই চলা উচিত, কী বলেন?

অসুখের কথায় পাশে দাঁড়ানো ড্যানিয়েলের কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। কর্মচারিটি বললে, তা তো বটেই। কোন কঠিন অসুখেই বুঝি ভুগছেন?

হারবার্ট একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, হ্যাঁ, কঠিন অসুখই বটে। তারপর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নিচু করে আবার বলতে থাকে, রাত্রে একদম ঘুমুতে পারি না। নানারকম বিশ্রী স্বপ্ন দেখি। ভয় পেয়ে জেগে উঠে সারারাত বিছানায় বসে কাটাই। ডাক্তার বলেছে, এ নাকি এক ধরনের মনের রোগ। সমুদ্রতীরের কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম করাই নাকি এর একমাত্র ওষুধ। তাই ভেবেছি ওই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেই যাব।

—বেশ তো—বেশ তো, ওখানেই যান। খুব ভালো জায়গা। বেশ আনন্দ পাবেন।

উদ্দেশ্য সফল হল হারবার্টের। ট্যুরিস্ট অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসবার মুখেই ড্যানিয়েল তাব সঙ্গে যেচে আলাপ করলে। একই রোগে ভুগছে তারা। বেড়াতে যাবার উদ্দেশ্যও তাদের এক। কাজেই পরিচয় করতে দোষ কী?

একটা পার্কে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে তারা ঠিক করলে ড্যানিয়েলও ওই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেই বেড়াতে যাবে। অপরিচিত জায়গায় একজন সঙ্গী পেয়ে খুবই খুশি হয়ে উঠল ড্যানিয়েল।

বাড়ি ফেরার পথে নানারকম চিন্তা খেলে গেল ড্যানিয়েলের মাথায়। ওই হারবার্ট লোকটি বেশ। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র। তবে সেও কি তার নিজের মতো কোন গুরুতর অপরাধ করে এখন এমনি রোগে ভুগছে? হবেও-বা। মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে? সে নিজেও কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল ওদের সে হত্যা করবে, আর ওই ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোর প্রেতাত্মা তার পেছনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াবে? উঃ, কুকুরগুলোর কথা মনে পড়লেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে ওঠে। দীর্ঘ তিনটি মাস ধরে সে ওই প্রেত-কুকুরের দাপট সহ্য করছে। ওদের হাত থেকে নিস্তার পেতে সে দিনের পর দিন বাইবেলের মধ্যে ডুবে থেকেছে, কখন-সখন ভেবেছে নিজের মুখে নিজের পাপের কথা স্বীকার করলে হয় তো ওই ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মারা তাকে রেহাই দেবে। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। পাপের স্বীকারোক্তি করে পুলিশের হাতে পড়তে ইচ্ছে হয়নি তার। এতদিনে বোধ হয় তার আরোগ্য লাভের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সে নিজে ও হারবার্ট একই পথের পথিক। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সেই মনোরম আবহাওয়ায় তারা গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকবে। তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে। স্ত্রী পামেলা যেতে পারবে না তার সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে বাড়িতেই থাকবে।

তিন

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কর্মচারিটি একটুও বাড়িয়ে বলেনি। বাস্তবিকই চমৎকার এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন শান্ত নীল জলরাশি ঘিরে রয়েছে দ্বীপগুলোকে—সত্যিই যেন একখানি ছবি।

হোটেলের পাশাপাশি দু'খানা ঘরে থাকে ড্যানিয়েল ও হারবার্ট। বেশ আরামেই দিন কাটছিল তাদের। ইতিমধ্যে ওদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে। সকাল-বিকেল সমুদ্রতীরে বেড়ানো, আর হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের। এখানে এই ক'দিনের মধ্যে ড্যানিয়েলের বেশ একটু উপকারও হয়েছে। এখন আর সে যখন-তখন কুকুরের প্রেতাত্মার কথা বলে না। সমুদ্রের গর্জনে কিংবা হাওয়ার শব্দের

মধ্যেও সে শুনতে পায় না প্রেত-কুকুরের সেই রক্তজলকরা ভীতিপ্রদ কণ্ঠস্বর। ড্যানিয়েলের প্রশ্নের জবাবে হারবার্ট বলে যে এখানে আসার পর থেকে সেও নাকি আর সেই বিশ্রী বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখে না। রাতে ভালো ঘুম হয় তার।

প্রতিদিন বেড়াতে যাবার সময় হারবার্টের সঙ্গে থাকে একটি সুদৃশ্য ছাতা। ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, এখানে যখন-তখন বৃষ্টি নামতে পারে। আমার আবার সর্দির ধাত। তাই সর্বদা এটা সঙ্গে রাখি।

দিন পনেরো কেটে যায়। হারবার্ট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে সুযোগের আশায়। অবশেষে একদিন বিকেলে একটা ট্যাকসি করে তারা চলে যায় শহর থেকে অনেক দূরে একটি জায়গায় যেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি আরও চমৎকার।

ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে হেঁটে চলেছে ড্যানিয়েল ও হারবার্ট। গল্প করতে করতে চলেছে তারা। পশ্চিম আকাশে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলে সূর্য ডুব দিচ্ছে। জলে, আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে তার লাল আভা।

হঠাৎ হারবার্ট বলে ওঠে, আমার পার্স? পার্সটা গেল কোথায়?

——ড্যানিয়েল মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে, ভুল করে পার্স হোটেলে ফেলে আসোনি তো?

——না না, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় হারবার্ট, সঙ্গেই এনেছিলাম। বোধ হয় ট্যাকসিতে পড়ে গেছে।

——অনেক টাকা ছিল নাকি ওতে?

——না, তেমন কিছু ছিল না। তবে কয়েকটা দরকারি কাগজ ছিল। বলতে বলতে পাকা অভিনেতার মতো একটু সময় সে চুপ করে থাকে। তারপর হাতের ছাতাটা ড্যানিয়েলের হাতে গুঁজে দিয়ে আবার বলে ওঠে, আমি একবার ট্যাকসি-স্ট্যান্ড থেকে ঘুরে আসছি। এই যাব আর আসব। বরাতগুণে পেয়েও যেতে পারি ওটা। তুমি ততক্ষণে এখানেই একটু ঘোরাফেরা করো বন্ধু। বলতে বলতে হারবার্ট ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে উলটো দিকে হাঁটতে থাকে।

একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন জলরাশি, অন্যদিকে ধু ধু বেলাভূমির বালুকারাশি। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ড্যানিয়েল একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অস্তগামী সূর্যের দিকে। তারপর ছাতা হাতে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে সমুদ্রের পাড়ে। বেড়াতে এসে এক জায়গায় কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চলে?

প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল তবুও হারবার্টের দেখা নেই। শুকনো বালির মধ্যে পা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে ড্যানিয়েল। হারবার্ট বোধ হয় এখনও ট্যাকসি-স্ট্যান্ডে তার পার্স খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাক্ গে, আজ একা একাই বেড়াতে হবে তাকে। ছাতায় ভর দিয়ে ড্যানিয়েল একবার মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। সন্ধে হতে এখনও কিছু বাকি। এর মধ্যে হারবার্ট ফিরে না এলে তাকে একাই ফিরতে হবে হোটেলে।

সহসা একটা দমকা হাওয়া ভেসে আসে সমুদ্রের ওপর থেকে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একখানা কালো মেঘ গোটা আকাশটাকে ঢেকে ফেলে।

চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে ড্যানিয়েলের কপালে। ঝড়জল আসতে পারে। এর মধ্যে এগোনো ঠিক হবে কিনা চিন্তা করতে করতে আরও দু'চার পা এগিয়ে যায় ড্যানিয়েল। আর সেই মুহূর্তে তার ঠিক পেছনেই জেগে ওঠে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ঘেউ-ঘেউ ঘেউ!

চমকে ওঠে ড্যানিয়েল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে পেছনে কোথাও কুকুরের চিহ্নমাত্র নেই। তবে ওই কণ্ঠস্বর ভেসে এল কোত্থেকে? না—না, বোধ হয় সে শুনতে ভুল

করেছে। কিন্তু তাই বলে ফিরে যেতেও সাহস হয় না তার। ওদিক থেকেই তো ভেসে এসেছে ওই কণ্ঠস্বর। তাই অনন্যোপায় ড্যানিয়েল সামনের দিকেই এগিয়ে চলে।

আবার—আবার সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর—ঘেউ-ঘেউ! ড্যানিয়েলের ঠিক পেছনেই যেন অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে তেড়ে আসছে। না, এবার আর ভুল নয়। আর ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই ড্যানিয়েলের। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে ওরা কারা। এতদিনে তাকে একা পেয়ে সেই প্রেত-কুকুরেরা প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে তার দিকে। আজ আর নিস্তার নেই। একটা প্রচণ্ড ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে আসে ড্যানিয়েলের। খাড়া হয়ে ওঠে গায়ের লোম। বুকের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দ্রুততালে চলতে থাকে।

হাতের মুঠোয় ছাতাটাকে চেপে ধরে এবার সামনের দিকে দৌড়োয় ড্যানিয়েল। কিন্তু পালাবে কোথায়? হিংস্র ক্ষিপ্ত প্রেতাত্মারা পাল্লা দিয়ে ছুটছে তার সঙ্গে। কণ্ঠে তাদের সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার—ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ!

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ড্যানিয়েল। না, ভীরুর মতো আর সে ছুটে পালাবে না। রুখে দাঁড়াতে হবে। মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে প্রেতাত্মাদের।

ছাতাটাকে বাগিয়ে ধরে ড্যানিয়েল ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ছুটে যায় সেই অদৃশ্য প্রেত কুকুরগুলোকে মারবে বলে।

কিন্তু একী? এবার যে তার পেছন দিকে কুকুরের চিৎকার! আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছুটে আসে, আবার পেছনে সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সমুদ্রের দমকা হাওয়ায় চারি দিকে বালি উড়ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত ঢেউ এতক্ষণে অশান্ত হয়ে উঠে ক্রুদ্ধ-গর্জনে পাড়ের ওপর ভেঙে পড়ছে। আর বেলাভূমির ওপর ছাতা হাতে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ড্যানিয়েল। না—না, আর পালাবার পথ নেই। প্রেত কুকুরগুলো বিকট চিৎকারে তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এবার তারা সেদিনকার সেই অন্যায়ের চরম প্রতিশোধ নেবে। জীবন দিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে।

না, এখনও আশা আছে। এখনও হয়তো সে বাঁচতে পারে। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে স্বীকার করলে ওই প্রেতাত্মারা হয়তো তাকে ক্ষমা করতে পারে। হ্যাঁ, তাই সে করবে। সে নিজে ছাড়া এই মুহূর্তে এখানে আর অন্য কোন জীবিত প্রাণী নেই। এই প্রশান্ত মহাসাগরকে সাক্ষী রেখেই সে নিজের পাপের কথা স্বীকার করবে।

ক্লান্ত শ্রান্ত ড্যানিয়েলের দেহে আর এক ফোঁটা শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বইছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। তবুও জ্ঞান হারিয়ে বালির মধ্যে লুটিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে সে চিৎকার করে ওঠে—হ্যাঁ, আমি—আমি জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছি আমার পিসিমাকে। হত্যা করেছি তার কুকুর তিনটিকে। আমি অপরাধী। ঘোরতর অপরাধী। আমাকে—আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।

বৃষ্টির জলে জ্ঞান ফিরে আসে ড্যানিয়েলের। তাকিয়ে দেখে, ঝড় থেমেছে। প্রশান্ত মহাসাগরও শান্ত হয়ে উঠেছে। একটু দূরে ছিটকে পড়া ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ড্যানিয়েল। তারপর ভিজে বালির ওপর জুতোর দাগ ফেলে চলতে থাকে শহরের দিকে। না—না, প্রেত-কুকুরগুলো আর নেই। তাদের কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছে না সে। তারা হয় তো তাকে ক্ষমা করেছে।

পরের দিন সকালে হারবার্ট তার ঘরে এসে ক্ষমা চেয়ে বলে যে ঝড়বৃষ্টির জন্যে আটকে পড়েছিল বলেই সে সময়মতো সমুদ্রের পাড়ে যেতে পারেনি। ড্যানিয়েলও কোন অনুযোগ না করে ছাতাটা ফিরিয়ে দেয় হারবার্টকে।

বিকেলের দিকে হারবার্ট আবার এসে ড্যানিয়েলকে বললে, চলো বন্ধু।

—কোথায়? বেড়াতে? জিজ্ঞেস করে ড্যানিয়েল।

একটু রহস্যময় হাসি হেসে হারবার্ট বললে, না, দেশে ফিরতে হবে। দু'খানা প্লেনের টিকিট আমি বুক করে রেখেছি।

—সেকী? এর মধ্যেই ফিরে যাব কেন? বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ড্যানিয়েল।

তেমনি মৃদু হেসে হারবার্ট আবার বললে, নরহত্যার অপরাধে সেখানে তোমার বিচার হবে বন্ধু।

—তার মানে? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে ড্যানিয়েল।

—মানে অতি সহজ। তোমার বৃদ্ধা পিসি ও তার তিনটি কুকুরকে তুমি জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছ।

—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা! চিৎকার করে ওঠে ড্যানিয়েল। তারপর আবার বলতে থাকে, তুমি এ-কথা জানলে কেমন করে?

—আমি? একটু সময় চুপ করে থাকে হারবার্ট। তারপর বললে, আমি হচ্ছি সানফ্রানসিস্কোর পুলিশ অফিসার সার্জেন্ট হারবার্ট। এই মামলার তদন্তভার আমার ওপর।

—আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে?

—হ্যাঁ আছে। তুমি কাল সন্ধ্যায় নিজের মুখে স্বীকারোক্তি করেছ, বন্ধু।

—মিথ্যে কথা।

—বেশ তো, হাতের কাছেই প্রমাণ রয়েছে। বলতে বলতে হারবার্ট তার শৌখিন ছাতাটার হাতলের ফোঁকড় থেকে টেনে তোলে একটা অতি ক্ষুদ্র টেপ্-রেকর্ডার। তারপর সেটা বাজাতে থাকে।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ে ড্যানিয়েল। বুঝতে পারে, এতদিনে সে ধরা পড়েছে। অবশেষে সে শান্ত কণ্ঠে বললে, তাহলে কি ওই কুকুরের চিৎকারও মিথ্যে? কোনরকম কারসাজি?

মৃদু হেসে জবাব দেয় সার্জেন্ট হারবার্ট, না, ওটা মিথ্যে নয় বন্ধু। বিচিত্র এই পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওই অঞ্চলের বালুকণায় এমন এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যার তুলনা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ওই অঞ্চলের সমুদ্রতীর ঘেঁষে প্রায় এক মাইল মতো জায়গায় যে বালুকণা আছে তার সঙ্গে মিশে আছে প্রচুর পরিমাণ প্রবাল ও লাভাচূর্ণ। তাই ওই বালুকণা একটু ফাঁপা। ওর মধ্যে ঢুকে থাকে গরম হাওয়া। কোন বস্তুর সঙ্গে ঘষা লাগলে ওই বালুকণা থেকে যে শব্দ বেরোয় তা হচ্ছে অবিকল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের মতো। তোমার জুতোর ঘষায়ও ঠিক ওই শব্দ হচ্ছিল। যত জোরে দৌড়াচ্ছিলে শব্দও ততই জোরে হচ্ছিল। আর তুমিও ওই শব্দকে কুকুরের চিৎকার বলে ভুল করেছিলে। অবশেষে বৃষ্টির জলে বালি ভিজে যেতেই আর শব্দ রইল না। তাই শহরে ফেরার সময় আর ওই শব্দ শুনতে পাওনি তুমি।

সার্জেন্ট হারবার্টের কথা শুনতে শুনতে তার মুখের পানে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে হত্যাকারী জর্জ ড্যানিয়েল।

করমণ্ডলে হীরা

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

হঠাৎ খবর এল যে, মেজকা ও পুল্লা রেড্ডিকে ওঁদের অফিসের কাজে মাদ্রাজে যেতে হবে। মেজকা বললেন, ''রেড্ডি, ওই সঙ্গে দু'চারদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নিইনা কেন? কাজ সেরে একটু ঘোরা যাবে। মাদ্রাজের আশপাশটা মোটে দেখাই হয়নি আমার।''

রেড্ডি বললেন, ''উত্তম প্রস্তাব। রন্টুও চলুক আমাদের সঙ্গে।''

''রন্টু!'' মেজকা বললেন, ''রন্টু কী করে যাবে, ওর কলেজ আছে না? আর আমরা যখন মাদ্রাজে ব্যস্ত থাকব, তখন ও কী করবে?''

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, ''কেন, মাদ্রাজ শহরে কি দেখার কিছু নেই নাকি? আর দু'চারদিন কলেজ কামাই হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।''

তিনজনের মধ্যে আমি আর পুল্লা রেড্ডি একদিকে। অর্থাৎ মেজরিটি। অতএব মেজরিটির ভোটে ঠিক হল, মেজকাদের সঙ্গে আমিও যাব। মেজকা করমণ্ডল একস্প্রেসের টিকিট কিনে নিয়ে এলেন। এ.সি. স্লিপারের।

যাবার দিনে স্টেশনে এসে রিজার্ভেশান চার্টখানা পড়ে আবিষ্কার করা গেল যে, আমাদের খোপটার চতুর্থ যাত্রী হচ্ছেন জনৈক এ. চৌধুরী। ''ইনি আবার কোন্ মূর্তিমান হবেন কে জানে,'' বললেন মেজকা, ''লম্বা জার্নিতে নাক-উঁচু সহযাত্রী হলেই চিত্তির।''

''ভাবছ কেন?'' আমি বললাম, ''আমরাই তো রয়েছি গল্প করার জন্য।''

গাড়ি ছাড়ার তিন-চার মিনিট আগে ছুটতে ছুটতে উঠে এলেন মিঃ চৌধুরী। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা। সঙ্গে একজন কনেস্টবল ওঁর অ্যাটাচি আর ব্রিফকেস নিয়ে এল।

পুল্লা রেড্ডি এতক্ষণ কাগজ পড়ছিলেন। এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আরে, মিঃ চৌধুরী, আপনি?''

মিঃ চৌধুরী ওঁর বার্থে অ্যাটাচি, ব্রিফকেস এসব গুছিয়ে রাখছিলেন। রেড্ডির কথা শুনে ওঁর দিকে ঘুরে বললেন, ''মিঃ রেড্ডি! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! মাদ্রাজ যাচ্ছেন তো?''

''হ্যাঁ, আপনি?''

''আমিও তাই। অন্তত আশা করছি।''

রেড্ডি মেজকাকে বললেন, ''বোস, তোমার প্রবলেম সল্‌ভ্‌ড্। ইনি আর্য চৌধুরী, পুলিশ অফিসার, আবার ফাইন জেন্ট্‌ল্‌ম্যান। আমার সঙ্গে আলাপ বেশ কিছুদিনের।

ভালোভাবেই আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যাবে। মিঃ চৌধুরী, বোস আমার কলিগ। আর এ হচ্ছে রণ্টু, বোসের ভাইপো।''

চৌধুরী বললেন, ''অর্থাৎ আপনাদের ট্রিনিটি, তাই না?''

মেজকা বললেন, ''আমাদের কথা পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও ছড়িয়েছে তাহলে! মিঃ চৌধুরী, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি...''

''বেশ তো।''

''একটু আগে রেড্ডির প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, আপনিও মাদ্রাজ যাবেন, অন্তত আশা করছেন। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদি মাদ্রাজ যাবেন বলে টিকিট, কেটে থাকেন, এবং মাদ্রাজ যায় এমন ট্রেনে চড়েন, তবে নেহাত অ্যাক্সিডেন্ট না হলে মাদ্রাজ পৌঁছবেন, সে-রকমই তো কথা। এর মধ্যে আশা করার কথা আসে কেন?''

রেড্ডি চমৎকৃত হয়ে বললেন, ''বাঃ বোস, তুমি তো জেরার কায়দাকানুন বেশ রপ্ত করে ফেলেছ!''

মিঃ চৌধুরী বললেন, ''তবে পয়েন্টটা উনি ভালোই তুলেছেন। আসলে আই অ্যাম অন ডিউটি। যদি দরকার হয়, মাঝপথেও নেমে যেতে হতে পারে।''

''আমিও সে-রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম,'' বললেন রেড্ডি, ''আপনার অ্যাসাইনমেন্ট কি একান্তই গোপনীয়?''

''আপনাদের বলতে অসুবিধে নেই,'' বলে গলাটা নামিয়ে আনলেন আর্য চৌধুরী, ''আমাদের পাশের খোপটা দেখেছেন তো? ওটাতে চারটে বার্থেই লেডিজ। ওঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিসেস ললিতা লাখোটিয়া। নামকরা শিল্পপতি ধনীরাম লাখোটিয়ার স্ত্রী। উনি মাদ্রাজে যাচ্ছেন কোনও এক নিকট-আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে। সঙ্গে অন্যান্য গয়নাগাঁটি ছাড়াও রয়েছে একখানা বহুমূল্য হিরের নেকলেস। আজ সকালে মিঃ লাখোটিয়া ফোন করে জানালেন যে, এই নেকলেসখানা নাকি এর আগেও কয়েকবার চুরির চেষ্টা হয়েছে। ওঁর সন্দেহ, একটা কুখ্যাত গ্যাং এই চুরির চেষ্টার পেছনে আছে। মিঃ লাখোটিয়ার ধারণা, ট্রেন জার্নিতেও ওটা চুরির চেষ্টা হতে পারে। ওটা পাহারা দেবার জন্যই আমার আসা।''

''মিসেস লাখোটিয়া প্লেনে গেলেন না কেন? তাহলে তো এসব ঝামেলা হত না?'' প্রশ্ন করলেন রেড্ডি।

''গত বছর দিল্লি থেকে যে প্লেনখানাকে লাহোরে হাইজ্যাক করেছিল টেররিস্টরা, উনি সেই প্লেনে ছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর ঠিক করেছেন, জীবনে আর প্লেনে চড়বেন না।''

''কিছু মনে করবেন না।'' মেজকা প্রশ্ন করলেন, ''আপনি যে ইউনিফর্ম পরে যাচ্ছেন, তাতে তো সবাই জেনে যাবে যে, আপনি পুলিশ অফিসার।''

''যাক না। বরঞ্চ জেনে গিয়ে যদি চোরেরা নেকলেসের দিকে হাত না বাড়ায়, তা হলেই তো আমার কাজ হাসিল। এই উদ্দেশ্যেই তো ওঁদের পাশের খোপে সিট নিয়েছি। এছাড়াও বলে রেখেছি মিসেস লাখোটিয়াকে কিছুক্ষণ পরপর আমায় এসে জানিয়ে যেতে যে, নেকলেস যথাস্থানে আছে।''

এর পর হিরের নেকলেসের প্রসঙ্গ বন্ধ করে আমরা অন্য গল্পগুজব শুরু করলাম। আর্য চৌধুরী কিছুদিন সি.আই.ডি.-তে ছিলেন, কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কেসের বিবরণ শোনালেন

উনি। এরই মধ্যে একবার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন গোলগাল চেহারার মিসেস লাখোটিয়া। জানিয়ে গেলেন, সব ঠিক আছে। অর্থাৎ নেকলেস যথাস্থানে। বলার সময় নিজের হ্যান্ডব্যাগ যে-ভাবে তুলে ধরলেন উনি, তাতে আমার মনে হল নেকলেসখানা ওটাতেই আছে।

সন্ধেটা ভালোভাবেই কাটল। রাত্তিরের খাওয়া একটু তাড়াতাড়িই সেরে নিলাম আমরা। শুয়ে পড়লাম তারপর।

মিঃ চৌধুরী নিজের বার্থে উঠে বললেন, ''শুলাম বটে, কিন্তু ঘুমোনো চলবে না।''

মেজকা বললেন, ''ট্রেনের দুলুনিতে আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।''

রেড্ডি বললেন, ''একটা কথা খেয়াল হল মিঃ চৌধুরী। এই ট্রেনগুলোতে তো করিডর দিয়ে অনায়াসে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় চলে যাওয়া যায়। ভগবান না করুন, কোনও চুরি ছিনতাই হলে চোর ধরা মুশকিল হবে আপনার।''

''কথাটা আমিও ভেবেছি। তাই কণ্ডাক্টার গার্ডকে বলে ব্যবস্থা করেছি, রাত সাড়ে দশটার পর এই কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার দরজাগুলো বন্ধ থাকবে।''

''ভালোই করেছেন।''

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতিও বেড়ে চলেছে। তবে গাড়ির দুলুনিটা বেশ আরামপ্রদ। তারপর গা-জুড়োনো ঠাণ্ডা। আরামে চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে মনে হল, মিঃ আর্য চৌধুরী যাই বলুন, জেগে থাকা ওঁর পক্ষে সহজ হবে না।

মিঃ চৌধুরী ঘুমিয়েছিলেন কি না জানি না, তবে আমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা ঠিক। ঘুম ভাঙল হঠাৎ বিরাট একটা চেঁচামেচিতে। চোখ কচলে চেয়ে দেখি, চারদিকে আলো জ্বলছে। পুল্লা রেড্ডি ও মেজকা দাঁড়িয়ে। পাশের খোপে আর্য চৌধুরীর গলা শোনা যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠের উত্তেজিত কথাবার্তা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে।

মেজকাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''মেজকা, অত চেঁচামেচি কিসের?''

''মিসেস লাখোটিয়ার হিরের নেকলেস চুরি গেছে।''

''চুরি গেছে? কখন?''

রেড্ডি বললেন, ''পাশের খোপ থেকে চৌধুরী না ফেরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।''

মেজকা বললেন, ''চলো না রেড্ডি, গিয়ে দেখি, ব্যাপারখানা কী।''

''মন্দ বলোনি কথাটা। চৌধুরী বন্ধুস্থানীয়, ওঁকে মদত দেওয়া দরকার।''

মিসেস লাখোটিয়ার খোপের সামনে বেশ বড় জটলা। ভিড় সরিয়ে আমরা ঢুকলাম। পর্দা সরাতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। রেড্ডির দিকে চেয়ে দেখি, উনিও নাকটা কুঁচকে রেখেছেন। আমি ওঁর কানে ফিসফিস করে বললাম, ''রেড্ডিকাকু, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?''

''হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ ছড়িয়েছে কেউ। তবে অল্প। দেখি মিঃ চৌধুরী কী বলেন।''

মিঃ চৌধুরীর অবস্থা দেখলাম কাহিল। মিসেস লাখোটিয়া ও তাঁর তিন সহযাত্রিণী চেপে ধরেছেন ওঁকে। চারজনেই একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। মিঃ চৌধুরীর গলা সেই গোলমালে শোনাই যাচ্ছে না। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আসা কনেস্টবলটি একেবারে বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

মিঃ রেড্ডি এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, চুরিটা কিভাবে, কখন হল?"

জবাবে চার ভদ্রমহিলা একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠলেন। কিন্তু তা মিনিট খানেকের জন্য। রেড্ডি হাতজোড় করে ওঁদের বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু থামবেন কি? প্রশ্নটা আমি মিঃ চৌধুরীকে করেছি।"

হাতজোড় করলেও রেড্ডির হাবভাবে একটা নো-ননসেন্স ভাব ছিল নিশ্চয়ই, যাতে চার ভদ্রমহিলাই একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। ফাঁক পেয়ে চৌধুরী বলে উঠলেন, "থ্যাংকস্ মিঃ রেড্ডি। এসে অবধি এঁদের চেঁচামেচিতে ব্যাপারখানা বুঝতেই পারছি না।"

"মিসেস লাখোটিয়াকে বলতে দিন না। নেকলেসখানা তো ওঁরই।"

"গুড আইডিয়া। তবে এঁদের জেরা করার কাজটা আপনিই করুন না কেন?"

রেড্ডি কিছু বলার আগেই মিসেস লাখোটিয়া উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি আপনার ডিউটি করছেন না। নেকলেসটাকে তো বাঁচাতে পারলেনই না, এখন তদন্ত করার ব্যাপারেও গড়িমসি করছেন।"

মিঃ চৌধুরী কটমট করে মিসেস লাখোটিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা চারজনে যদি তখন থেকে কোরাস গাইতে শুরু না করতেন, তা হলে এতক্ষণে তদন্ত অনেকদূর এগিয়ে যেত। আর মিঃ রেড্ডির রেপুটেশন আপনি জানেন না, তা না হলে বুঝতেন যে, তিনি এবং ওঁর বন্ধুরা যে এখানে উপস্থিত আছেন সেটা আপনার সৌভাগ্য।"

মিসেস লাখোটিয়া মিইয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "উঁ...উনি কি ডিটেকটিভ?"

রেড্ডি বলে উঠলেন, "না, না, সেসব কিছু নয়। এই দু'চারটে প্রশ্ন করব আর কি। তদন্তটা আসলে মিঃ চৌধুরীই করবেন। কিন্তু প্রশ্ন করার আগে আপনার সহযাত্রিণীদের পরিচয়টা জানতে পারলে ভালো হত।"

জানা গেল, দুজন হচ্ছেন মিসেস পারুল চক্রবর্তী ও তাঁর মেয়ে পলি। পারুল চক্রবর্তী কলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রোফেসরের স্ত্রী। পলিকে ভরতনাট্যম শেখাবার জন্য কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাতে মাদ্রাজ নিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্থ জন হলেন মিস লীনা লাকড়াওলা। উনি একটা বড় মার্কেন্টাইল ফার্মের পাবলিক রিলেশন্‌স্ অফিসার, ছুটিতে মাদ্রাজ যাচ্ছেন।

রেড্ডির প্রশ্নে জানা গেল যে, অন্যান্য গয়না একটা অ্যাটাচিতে থাকলেও হিরের হারখানা নিজের হ্যান্ডব্যাগেই রেখেছিলেন মিসেস লাখোটিয়া। ভুবনেশ্বরে যখন গাড়ি থেমেছিল, তখনও উঠে হ্যান্ডব্যাগ দেখেছেন, নেকলেস যথাস্থানেই ছিল। ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যথারীতি হ্যান্ডব্যাগ খুলে দেখেন, নেকলেস উধাও।

রেড্ডি বললেন, "ভুবনেশ্বরের পর এখনও পর্যন্ত যখন গাড়ি থামেনি এবং এই বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার রাস্তা যখন বন্ধ, তখন নেকলেসখানা এখানেই আছে।"

"কিন্তু কোথায়?"

"সেটা বার করতে হবে। এই বগির সবাইকে সার্চ করতে হবে। মালপত্রও। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় দেখছি না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী, মেয়েদের সার্চ করার ব্যাপারটা—"

দেখা গেল, এ-ব্যাপারটা আগেই ভেবে রেখেছেন মিঃ চৌধুরী। বললেন, "একজন মেয়ে-পুলিশ সাদা পোশাকে থ্রি-টিয়ার কামরায় আছে। আর পুরুষদের জন্য আমার এই কনেস্টবলই যথেষ্ট।"

রেড্ডি খোপ থেকে বার হয়ে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, ''আশা করি সার্চের ব্যাপারে আপনারা কোনও আপত্তি করবেন না।''

সবাই তখন নেকলেস-চুরির মতো রোমাঞ্চকর ঘটনার পরিণতি দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। আপত্তি-টাপত্তি কেউ করলেন না।

চৌধুরী গিয়ে সেই মেয়ে পুলিশটিকে ডেকে নিয়ে এলেন। অবশ্য যাবার আগে সবাইকে বলে গেলেন, যার যার জায়গায় বসে থাকতে।

সার্চ শুরু হল। প্রত্যেকের মালপত্র গা সব আঁতি-পাঁতি করে খোঁজা হল। কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

চৌধুরী এসে চিন্তিত মুখে বললেন, ''কী করি বলুন তো। কোথায় যে উবে গেল নেকলেসটা?''

''এই বগি ছেড়ে চোর পালিয়ে যায়নি তো?

''ইমপসিব্‌ল্‌। রাত সাড়ে দশটার পর দু'দিকের দরজা লক্‌ করিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখেছি। এই যে....''

''তাহলে তো নেকলেসখানা এই বগিতেই থাকার কথা। আচ্ছা, মিসেস লাখোটিয়ার সহযাত্রিণীদের আপনার কেমন মনে হয়?''

''মিসেস ও মিস চক্রবর্তীর মালপত্র ঘেঁটে দেখেছি, কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটির চিঠিও ওঁদের সঙ্গে আছে। ওঁরা জেনুইন। তাছাড়া শিক্ষা-জগতে প্রোফেসর চক্রবর্তীর যথেষ্ট সুনাম আছে। ওরকম একটা ফ্যামিলির কেউ নেকলেস চুরি করবে এটা বিশ্বাস হয় না।''

''আর মিস লাকড়াওলা?''

''উনি অবশ্য একটা বড় ফার্মের নাম করেছেন, কিন্তু উনি যে ওখানকার অফিসার তার কোনও প্রমাণ বা কাগজপত্র ওঁর সঙ্গে নেই।''

মেজকা বলে উঠলেন, ''ছুটিতে গেলে কেউ কি অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বেরোয়?''

''তা অবশ্য ঠিক। তার ওপর ওঁর মালপত্রেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।''

রেড্ডি বললেন, ''মিঃ চৌধুরী, আমায় একটু ভাবতে দিন।''

চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলেন রেড্ডি। কয়েক মিনিট পর বললেন, ''চলুন, মিসেস লাখোটিয়ার সঙ্গে আর-একটু কথা বলে নিই।''

ওঁদের খোপে গিয়ে দেখি মিসেস লাখোটিয়া ওঁর বার্থের একধারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। সেই বার্থের অন্য ধারে বসে মিসেস ও মিস্‌ চক্রবর্তী নিচু গলায় কী সব আলোচনা করছিলেন।

মিস লাকড়াওলা নিজের স্যুটকেস গোছাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, ''দেখুন, আপনাদের সার্চ-পার্টি জামাকাপড়ের কী হাল করেছে। মাদ্রাজে পৌঁছেই ইস্ত্রি করাতে হবে সব কিছু।''

চৌধুরী বললেন, ''সরি।''

মিস লাকড়াওলা স্যুটকেস বন্ধ করে নীচে নামিয়ে রাখলেন।

দেখলাম রেড্ডি একদৃষ্টে মিস লীনা লাকড়াওলার স্যুটকেসের দিকে চেয়ে আছেন। ব্যাপার কী রে বাবা, উনি কি সন্দেহ করছেন যে, মিস লীনার স্যুটকেস ভালো করে খোঁজা হয়নি?

না, দেখলাম যে, একটু পরেই রেড্ডি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। লক্ষ করলাম এবার উনি চেয়ে আছেন মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেসের দিকে। রেড্ডির সঙ্গে-সঙ্গে আমিও মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেসের দিকে ভালো করে তাকালাম। আর তখনই ব্যাপারটা নজরে এল।

মিসেস লাখোটিয়া ও মিস লাকড়াওলার স্যুটকেস দুটো দেখতে হুবহু এক। একই কোম্পানির তৈরি, একই রঙ, এমনকি স্যুটকেসে নিজের নিজের নামের আদ্যক্ষর (এল.এল.) দুটিও এক।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রেড্ডি বললেন, ''মিঃ চৌধুরী, এই স্যুটকেস সার্চ করা হয়েছে?''

''ওটা কেন সার্চ করতে যাব? ওটা তো মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেস।''

''তা হোক, ওটাও সার্চ করাতে হবে। খোলান ওটা।''

মেজকা বলে উঠলেন, ''রেড্ডি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাঁর গয়না চুরি গেল, তাঁর স্যুটকেসই সার্চ করতে বলছ?''

মিঃ চৌধুরী কিন্তু রেড্ডির কথামতো খুলে ফেললেন স্যুটকেসটা।

স্যুটকেস খোলা হতেই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রেড্ডি। দু'চার খানা শাড়ি সরাতেই ঝলমলিয়ে উঠল হিরের নেকলেসটা।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, ''আরে, নেকলেস তা হলে চুরি যায়নি।''

মিসেস লাখোটিয়া দেখলাম বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন নেকলেসটার দিকে।

চৌধুরী রাগে প্রায় ফেটে পড়েন আর কি। মিসেস লাখোটিয়াকে বললেন, ''নেকলেস নিজের স্যুটকেসে রেখে সবাইকে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছেন? ভেবেছেন কী? পয়সা আছে বলে যা খুশি তাই করবেন?''

মিসের লাখোটিয়া কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, ''কিন্তু আমি তো নেকলেস স্যুটকেসে রাখিনি!''

''তবে কি ওটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে উড়ে এসে স্যুটকেসে ঢুকে গেছে?''

''উত্তেজিত হবেন না মিঃ চৌধুরী। ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই,'' বললেন রেড্ডি। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, ''আপনি কোথায় যাচ্ছেন মিস লাকড়াওলা?''

দেখলাম মিস লাকড়াওলার মুখের রঙ ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বললেন, ''এই একটু বাথরুমে যাচ্ছিলাম আর কি।''

''বেশ তো, যান, মেয়ে-কনেস্টবলটি সঙ্গে যাবে'খন। কিন্তু হাতের ব্যাগখানা দিয়ে যান।'' বলে ছোঁ মেরে মিস লাকড়াওলার হাত থেকে কেড়ে নিলেন ব্যগটা।

''ও কী করছেন আপনি?'' জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস লাকড়াওলা। কিন্তু ততক্ষণে রেড্ডি সিটের ওপর ব্যাগটা উপুড় করে ফেলেছেন।

ব্যাগ থেকে বার হল একগোছা দশ টাকার ও খানকয়েক পাঁচ টাকার নোট। এ-ছাড়া ট্রেনের টিকিট, পাউডার-কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, ছোট চিরুনি। এ-সবের সঙ্গে বার হল দুটো চাবির রিং। তার মধ্যে একটাতে শুধু দুটো চাবি। দেখেই বোঝা যায় ওগুলো চাবিওলা দিয়ে তৈরি করা চাবি। রেড্ডি সেই চাবি দুটো চৌধুরীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ''দেখুন তো, এই চাবি দিয়ে মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেস খোলে কি না।''

ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে, আমরা কেউই ‘কী, কেন’ এসব প্রশ্ন তুলছিলাম না। মিঃ চৌধুরীও তাই বিনা বাক্যব্যয়ে মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেস লক্ করলেন ও তারপর রেড্ডির দেওয়া চাবি দিয়ে চট করে খুলে ফেললেন স্যুটকেসটা।

তা দেখে রেড্ডি হেসে বললেন, ‘‘মিঃ চৌধুরী, আপনি যে গ্যাং-এর কথা বলেছিলেন, তাদের একজন প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন। মিস্ লীনা লাকড়াওলা। যদিও মনে হচ্ছে ওটা ওঁর আসল নাম নয়।’’

মিস লাকড়াওলা এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘‘কী যা তা বলছেন আপনি। আপনার নামে মানহানির কেস আনব।’’

‘‘স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোর্টে বলবেন নিশ্চয়ই যে, মিসেস লাখোটিয়ার স্যুটকেস খোলে এমন চাবি আপনার হ্যান্ডব্যাগে কী করে এল? আর ওই রিংটার অন্য চাবিটায় যে মিসেস লাখোটিয়ার গয়নার অ্যাটাচিটা খুলবে না, এটাও কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?’’

মিস লাকড়াওলা দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

চৌধুরী এবার এগিয়ে এসে বললেন, ‘‘ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!’’

মিসেস ও মিস চক্রবর্তী এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মতো সব কিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, ‘‘মিঃ রেড্ডি, ব্যাপারটা কী হল বুঝতেই পারলাম না।’’

‘‘বলছি। মিঃ চৌধুরীর কথাই ঠিক। একটা গ্যাং এর পেছনে আছে। ওরাই হয়তো মিসেস লাখোটিয়ার কাজের লোকদের কাউকে টাকা দিয়ে বশ করে ফেলেছিল, এবং ওঁর স্যুটকেসের চাবির ডুপ্লিকেট তৈরি করিয়েছিল। তারপর ওঁর র মতো হুবহু আরেকটা সুটকেস জোগাড় করেছিল।’’

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, ‘‘বুঝেছি। আমার নতুন আয়া। মাত্র তিন মাস হল রেখেছি।’’

‘‘ওদের প্ল্যানটি ছিল চমৎকার। নেকলেসটা কোনওক্রমে সরিয়ে মিসেস লাখোটিয়ারই স্যুটকেসে রেখে দেওয়া, যা সার্চ করার কথা কেউই ভাববে না। পরে মাদ্রাজে নামার সময় কোনওভাবে স্যুটকেস পালটে নেওয়া।’’

চৌধুরী বললেন, ‘‘প্ল্যানটা চমৎকার ছিল ঠিকই, কিন্তু ভেস্তে গেল। ওরা তো জানত না যে, এই ট্রেনেই মিঃ পুল্লা রেড্ডি অ্যান্ড কোং যাচ্ছেন।’’

মিসেস লাখোটিয়া এগিয়ে এসে বললেন, ‘‘সত্যি মিঃ রেড্ডি, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব...’’

মেজকা বললেন, ‘‘ধন্যবাদের বদলে, আমি বলি কি ম্যাডাম এই বগির সবার জন্য চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করুন। এত বেলা হল, সবার গলাই শুকিয়ে কাঠ।’’

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, ‘‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ডাকুন না, ডাইনিং কারের বেয়ারাকে।’’

রাত তিনটে দশ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

দিন কয়েক আগে পাহাড়পুরের সেই রহস্যজনক মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। কাগজে ওরকম অনেক ঘটনাই ছাপা হয়, তা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু সংবাদটা পড়ার পরই ডিটেকটিভ ব্রতীশ পালিতের মাথায় কেমন একটা সন্দেহ চাড়া দিয়ে উঠল। ওটা মৃত্যু তো বটেই, তবে হত্যা না আত্মহত্যা! আসলে পাহাড়পুরের যে-বাড়িটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বাড়ির সঙ্গে সামান্য একটু স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর। আর তাইতেই এরকম সন্দেহ!

মনে পড়ল, আজ থেকে প্রায় বছর পাঁচেক আগে ও ওর এক বন্ধু অরুণ নির্জন ওই টিলার চুড়োর বাড়িটায় দিন সাতেকের জন্য বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল। বাড়িটা প্রায় সারা বছরই ফাঁকা থাকে। কখনও হয় তো বাড়িটার যাঁরা মালিক, সেই এ বি লাল এস্টেট থেকে লাল ভ্রাতৃদ্বয় এখানে অবসর কাটাতে আসেন। ওরা সঙ্গীত-প্রিয় মানুষ। গানের আসর-টাসর বসিয়ে কয়েকটা দিন খুব হই চই করে আবার এস্টেটে ফিরে যান। পরে আবার যেই-কে-সেই অবস্থা হয়ে থাকে বাড়িটার।

যাই হোক, সেবার ওরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে এস্টেট ম্যানেজার চন্দ্রিকাপ্রসাদকে চিঠি লিখতেই অনুমতি পেয়ে গিয়েছিল। তারপর, দিন সাতেক ওখানে গা এলিয়ে কাটিয়েও গিয়েছিল।

বাড়ির কেয়ার-টেকার রামপেয়ারির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সে বাড়িটাকে আগলে রেখেছে। খুব বিশ্বস্ত আর কর্মঠ লোক! কিন্তু হালে বয়স হওয়ায় চোখে ভালো দেখতে পায় না। তেমন গা গতর খাটিয়ে যে কাজ করবে তাও আর পারে না।

ব্রতীশরা ওখানে গিয়ে হাজির হলে রামপেয়ারি জিজ্ঞেস করেছিল, সাব, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আপনাদের জন্য কি অন্য কাউকে ঠিক করে দেব?

—আরে না না, পেয়ারিভাই। ও তুমি নিজে যা পার, তাতেই আমাদের হয়ে যাবে। আমাদের জন্য কিছু ভেব না তুমি।

ওই বৃদ্ধ রামপেয়ারির ওপরই ওরা ভরসা করেছিল। এবং তাতে কিছুমাত্র ওরা অসুবিধা বোধ করেনি।

মনে পড়ছে, কাঠের বাড়িটা একেবারে টিলার মাথায়। চারপাশে সুন্দর যত্ন-করা লন আর ফুলের বাগান। বাড়িটার সামনের দিকে আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। এখান থেকে দেখলে মনে হয় রাস্তাটা যেন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেছে। আর বাড়ির পেছনের দিকের চৌহদ্দি ছাড়ালে অদ্ভুত রকমের একটা খাদ। খাড়াই পাঁচ-সাত শো হাত নীচের দিকে নেমে গেছে। ওই খাদে একবার গড়িয়ে পড়লে তার আর চিহ্নই পাওয়া যাবে না। তবে রক্ষে, চট করে কেউ ওই খাদের মুখে গিয়ে পড়তেও পারে না। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে হাত দশেক তফাতে বিরাট একটা পাথরের চাঁই। হঠাৎ পাথরটার দিকে চোখ পড়লে মনে হবে যেন বিশাল আকারের একটা সিংহ বাড়িটার দিকে ওৎ পেতে বসে আছে।

পাথরটা যেন কোন শিল্পী কুরে কুরে ওরকম আকৃতি দিয়েছেন। অবিকল সেই কেশর, সেই চোখ, সেই মুখ।

পাথরটা সম্পর্কে রামপেয়ারিকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা, আচ্ছা পেয়ারি, এই যে সিংহের মুখের মতো দেখা যাচ্ছে, এটা কি কোন শিল্পী বানিয়েছেন?

—নেহি বাবুজি। আধা বাংলা আধা হিন্দি মিশিয়ে পেয়ারি বলেছিল, অতবড় পাথরকে কেটে কেটে ওরকম একটা মুখ বানিয়ে তোলা কোন মানুষের কাজ নয়। ভগবানই ওটা বানিয়েছেন।

পেয়ারির মুখ থেকেই ওরা জানতে পারে, প্রায় একশ বছর আগে একবার একটা মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পে পাহাড়পুরের এই টিলাটা দুভাগ হয়ে যায়। একভাগ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপরই এই বাংলো, আর একভাগ ধসে গিয়ে তৈরি হয়েছে ওই খাদ। সেই সময়েই নাকি এই কালো পাথরটা এখানে বসে যায়। ওটার এই সিংহের মতো আকৃতি সে-সময়ই তৈরি হয়ে যায়।

ব্রতীশ হাঁ করে শুনল। ওরা এই ডিটেকটিভ লাইনের লোকেরা ডাইনি-কাহিনীতে বিশ্বাস করে না। হাসল।

—আচ্ছা অরুণবাবু কী রকম লোক ছিলেন গাড়োয়ান ভাই?

—বহুত বড়িয়া আদমি থা। খুব ভালো লোক।

—আর ওর ভাই বরুণলাল?

—ও ভি খুব ভালো লোক।

—ওদের কোন শত্রু আছে কিনা জানো?

গাড়োয়ান তাকিয়ে রইল। কী করে জানবে ও। তবে লোক দেখে তো বোঝা যায়, শত্রু থাকলে মানুষ অত দিলদরিয়া হয় না।

—ভাইয়ে ভাইয়ে কীরকম সম্পর্ক?

গাড়োয়ান বলল, অত মিলমিশ খুব কম দেখা যায় বাবুজি। এই দেখুন না, অরুণলাল মারা গেলেন, আর বরুণলাল পাগলের মতো হয়ে গেছেন।

—তাই বুঝি? আচ্ছা ও-বাড়ির কেয়ারটেকার রামপেয়ারিকে চেন?

—জি বাবুজি। ওতো বুঢ্‌ডা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হাঁপানিতে কষ্ট পায়। ও ভি ভালো লোক।

—ও-বাড়িতে এর মধ্যে আর কোন লোক আসেনি?

—নেহি বাবুজি। প্রত্যেকবার বাবুদের সঙ্গে অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে আসে, এবার কেবল ওঁরা দুজনেই, আর কাউকে আমরা দেখিনি।

ততক্ষণ টাঙ্গাটা চড়াই ভাঙতে ভাঙতে একেবারে সেই বাংলোর কাছাকাছি চলে এসেছিল। বারান্দায় একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে। গাড়োয়ান বলল, ওটা রোজই জ্বলে। সাহেবরা এ-বাড়িতে এলেই ওটা জ্বালিয়ে রাখে রামপেয়ারি। ওটাই চিহ্ন যে এ-বাড়িতে এখন সাহেবরা রয়েছেন।

গাড়িটা বাংলোর সদর অবধি চলে এল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ব্রতীশ। প্রথমে রামপেয়ারিরই খোঁজ করতে হবে। গাড়োয়ানকে বলল, একটু দাঁড়াও ভাই, দেখে নিই।

ধীরে বাংলোর বারান্দায় উঠে এল ব্রতীশ। বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধ, এখানে রামপেয়ারি যে এখন কোথায় কে জানে? একবার এপাশ ওপাশ করল ও। আর ঠিক এই সময় হঠাৎ চমকে উঠল, কে? কে ওখানে?

ভারি গলা। ব্রতীশ স্থির হয়ে, দাঁড়িয়ে উত্তর করল, আজ্ঞে, আমি।

লোকটার পরনে আলখাল্লার মতো ঢিলেঢালা একটা পোশাক। এগিয়ে এল, আমি কে?

—আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। নিজের পরিচয় দিল ব্রতীশ। তারপব শুধাল, আপনিই কি বরুণলাল!

লোকটা হাত দুটো জড়িয়ে ধরল ব্রতীশের, হ্যাঁ এখন আমি বরুণলাল, কিন্তু কিছুদিন আগেও আমার কোন আলাদা পরিচয় ছিল না। আমি আর আমার দাদা একসঙ্গে মিলে একটাই নাম ছিলাম অরুণ বরুণলাল। তাই থেকে আমাদের জমিদারির নামকরণও হয়ে গিয়েছিল এ বি লাল এস্টেট। লোকে ওই নামেই চিনত আমাদের।

—আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

বরুণলাল আবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন ব্রতীশের। আমি আপনার মতোই কারও একজনের কথা ভাবছিলাম। জানেন, দাদার মৃত্যুর পর একটি দিনের জন্যও আমি ঘুমোতে পারিনি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, দাদা নেই। এই দেখুন না, এই রাতেও আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে না পেরে বাইরে এসে ঘুরে মরছি। ব্রতীশ টাঙ্গাআলাকে পয়সা মিটিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল।

এমন সময় রামপেয়ারিকে দেখা গেল। সারা গায়ে কম্বল জড়ানো, শরীরটা যেন আরও গেছে।

রামপেয়ারি ওকে চিনতে পেরে সেলাম করল।

—ভালো আছো? তোমাদের দুর্দিনের খবর পেয়ে চলে এলাম।

রামপেয়ারি কিছু বলার আগেই আবার বরুণলাল এগিয়ে এলেন, পেয়ারি বাবুকে গেস্ট হাউসের দরজা খুলে সবকিছু বুঝিয়ে দাও। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন ব্রতীশবাবু, কাল ভোরে উঠে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

ব্রতীশ এমনিতেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আপত্তি করল না।

রামপেয়ারি ব্রতীশকে সেই আগেকার ঘরটাতেই এনে বসাল। বিছানার চাদর-টাদর বিছিয়ে আবার সেলাম ঠুকল, আমি যাই বাবুজি?

ব্রতীশ বাধা দিল না, যাও। পরে রামপেয়ারি বেরিয়ে গেলে ও দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আহ্ সত্যি সত্যি এখন একটু ঘুম দরকার।

বোধ হয় একটু চোখ জুড়ে এসেছিল ওর। হঠাৎ দরজায় ঠুকঠুক করে শব্দ। টর্চটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ব্রতীশ উঠে দাঁড়াল, কে?

—দরজা খুলুন কথা আছে?

ব্রতীশ বুঝল বরুণলালেরই গলা। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল ব্রতীশ

—আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে বলবেন?

—আজ্ঞে, ঘড়ি দেখল ব্রতীশ, রাত তিনটে!

—তার মানে আরও দশ মিনিট সময় আছে।

—মানে। ব্রতীশ কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল, আর দশ মিনিট পরে কী?

—তিনটে বেজে দশ মিনিটের সময় দাদার মৃত্যু হয়েছিল। আর সেই জন্যই এই সময়টা আমার কাছে বড় মর্মান্তিক।

ব্রতীশ কথা খুঁজে পেল না।

—আসুন না, ঘটনাটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি।

ব্রতীশ গায়ে জামা পরে বেরিয়ে এল। আসুন দাদার ঘরটা দেখে যান।

বরুণলালের পিছন পিছন এগিয়ে এল ব্রতীশ। ঠিক বিপরীত দিকে সেই মিউজিয়মের পাশেই একটা ঘর। ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। ওপরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে, কেমন একটা স্বপ্নময় পরিবেশ। ঘরে দুটো খাট। একটাতে বিছানার ওপর একটা বাঁধানো ছবি, তার ওপর কিছু ফুল ছিটিয়ে রাখা।

ব্রতীশ শুধাল, এই কি আপনার দাদার ছবি?

—হ্যাঁ! এই খাটেই দাদা থাকত, আর আমি এই খাটে।

ব্রতীশ ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধাল; তা কী হয়েছিল বলবেন?

—হ্যাঁ বলব, সব বলব। জানেন নিশ্চয়ই, আমরা দুজনেই কিছু গানের চর্চা করতাম। গাইয়ে কাউকে দেখলে পাগল হয়ে উঠতাম। তাছাড়া গানের সমঝদার পেলেও আর কথা নেই। আমরা তার জন্য সবকিছু করতে পারতাম। তা এখানে সেই গানের লোভেই আমরা দু'জন ছুটে এসেছিলাম।

—গানের লোভে এখানে কেন?

—খবর পেয়েছিলাম সূর্যশংকর এখানে বিশ্রাম করার জন্য দু'দিন থাকতে চেয়ে আমাদের এস্টেটের ম্যানেজার চন্দ্রিকাপ্রসাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। সূর্যশংকর এখন গানের জগতে সূর্য। তার সঙ্গ পাওয়া কি সোজা কথা।

আমরা দুজনেই এখানে চলে এলাম। যথাসময়ে সূর্যশংকরও এলেন। কিন্তু এলেন একা। এসে আমাদের দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যেন একটু বিরক্তও হয়েছিলেন। আসলে একা থাকতে চেয়েছিলেন উনি।

—আমরা তাঁকে ধরে বসলাম, গান শোনাতে হবে।

—সে কী, আমি গলাকে বিশ্রাম দেবার জন্যই তো এখানে এসেছি।

আমরা নাছোড়বান্দা। শেষটায় সূর্যশংকর গাইলেন। দাদা অরুণলালও গাইলেন। দুজনের গানের লড়াই হল অনেকক্ষণ। শেষটায়, মনে হল ওস্তাদ সূর্যশংকরও দাদার কাছে হেরে গেলেন। সে কী উত্তেজনা আমাদের!

একটু চুপ করে রইলেন বরুণলাল। পরে আবার বলতে শুরু করলেন, তা বুঝলেন ব্রতীশবাবু, সেইদিনও গান গাইতে গাইতে এমনি রাত তিনটে বেজে গিয়েছিল। দাদা বললেন, আসুন ওস্তাদ, আমরা পেছনে সেই সিংহমূর্তির কাছে যাই। ওখানে ওই সিংহের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আসুন একটা প্রভাতী রাগ ধরি।

—পেছনের সেই খাদের দিকে? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

—হ্যাঁ সেই খাদের মুখে যে সিংহমূর্তিটা আছে পাথরের, চলুন না আপনাকে দেখাই।

আবার ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—আসুন, আসুন।

বরুণলাল ব্রতীশকে টেনে নিয়ে এলেন সেই খাদের দিকে। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। ব্রতীশ দেখল চাঁদের আলো পড়ে সিংহমূর্তিটা যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বরুণলাল বললেন, দেখুন তো এখন কটা।

ব্রতীশ আবার ঘড়ি দেখল, তিনটে দশ।

—হ্যাঁ এই সেই সময়। দাদা সিংহমূর্তির ওই মাথায় ঠিক এই ভাবে উঠে পড়লেন।

বরুণলাল তরতর করে পাথরের গা বেয়ে ওপরে একেবারে সিংহটার মাথায় গিয়ে বসে পড়লেন। ঠিক এই জায়গায়। দাদা ডাকলেন, আসুন সূর্যশংকর ওস্তাদ। আসুন উঠে আসুন।

সূর্যশংকর উঠলেন খুব ধীরে ধীরে। তারপর দাদার একেবারে নাগালের মধ্যে এসে বললেন, আপনি আজ গান গেয়ে আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন, অরুণলাল। কীভাবে যে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাব বুঝতে পারছি না।

ব্রতীশের ঠোঁট দিয়ে মৃদু একটা শব্দ বেরুল—আর পেছবেন না বরুণবাবু।

হেসে উঠলেন বরুণলাল, তারপরের ঘটনা শুনবেন না?

বলুন। ওখানে বসেই বলুন, আর পেছবেন না।

বরুণ হাসলেন, কিন্তু দাদাও এখানে বসেই প্রভাতী রাগ ধরেছিলেন। আর ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে দশ। সূর্যশংকর আলতো করে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে চিরকালের মতো থামিয়ে দিলেন। পাঁচ-সাতশো ফুট খাদের নীচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন দাদা।

—কিন্তু আপনি আরও পেছচ্ছেন কেন বরুণবাবু? পড়ে যাবেন যে।

—আসুন না সূর্যশংকর যে ভাবে দাদাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন সেভাবে একটা ধাক্কা দিননা আমাকে। কীভাবে দাদা পড়েছিলেন দেখাই।

—কী পাগলামি করছেন বরুণবাবু! বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল ব্রতীশের।

কিন্তু ততক্ষণে নাটকীয়, সেই ঘটনাটি ঘটে গেল। ব্রতীশ চিৎকার করে উঠল, বরুণবাবু—

পাঁচ সাতশো ফিট খাদের নীচে বরুণবাবুর দেহটা ততক্ষণে ছিটকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

পরের ঘটনা খুবই সামান্য। চিৎকার চেঁচামেচিতে উঠে এসেছিল রামপেয়ারি।

—বাবুজি, সাহেব একটা খত রেখে গেছেন আমার কাছে। সকালে আপনাকে দিতে বলেছিলেন।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে ব্রতীশ।

ব্রতীশবাবু,

'আমাকে ক্ষমা করবেন। এ রাস্তা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। সূর্যশংকর আর বরুণলাল যে একই ব্যক্তি এতক্ষণে নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছেন।

ঘড়ি-রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, ''আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি?''

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, ''প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।''

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, ''কেন? কেন?''

''ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?''

''ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ''কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।''

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, ''আমার ক্ষেত্রেও তা-ই । কিছু-কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।''

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, ''অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।''

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওঁর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, ''আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।''

''জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।''

মনে পড়ে গেল। বললাম, ''কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।''

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, ''একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব! রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন, তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?''

কর্নেল বললেন, ''সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মীপ্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।''

ডাক্তারবাবু বললেন, ''জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস-চোরকে চিনতে পেরেছিলেন!''

''হ্যাঁ। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারি যেভাবেই হোক, নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।''

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। ''উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডুপাত করছে।''

তারকডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, ''তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বসো জয়ন্ত! দেখি, কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।''

বললাম, ''আমি এনে দিচ্ছি।''

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পরদার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাচুমাচু মুখে তিনি বললেন, ''কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—''

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, ''আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।''

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, ''সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।''

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, ''বার বার টাইম ইজ মানি বলছেন। অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।''

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, ''আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।''

কর্নেল হেসে ফেললেন। ''ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর

খোঁজেন?''

ভদ্রলোক ঝটপট আমাকে নমস্কার করে বললেন, ''আপনিই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কী সৌভাগ্য। আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ টাইম ইজ মানি।'' বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। ''আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভুতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙ্গারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।''

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, ''আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?''

''নাহ্। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতেই বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।''

''আপনার দাদার নাম কী?''

''আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।''

''তিনি বেঁচে নেই?''

''আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।''

''আপনি কোথায় ছিলেন তখন?''

''সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।''

''তারপর কী হল বলুন।''

''হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!' ব্যস! ওই শেষ কথা।''

''কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?''

''দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে, বুঝলেন তো?''

''বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল?''

''আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।''

''ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?''

''ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ারটেবিল, একটা স্যুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।''

''আর কিছু?

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''আর তেমন কিছু—ও হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।''

কর্নেল হাসলেন। ''হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।''

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ''কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।''

''আমাকেও।'' বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, ''আপনার ঘরের ভুতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?''

''প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।''

''উনি কী বলেছিলেন?''

''উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।'''

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, ''ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পরদিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।''

''ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।''

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, ''কী বুঝলে জয়ন্ত?''

''ম্যানেজার ওকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।''

''তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?''

''তা হলে কোনও বোর্ডার—ধরুন, সেই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।''

কর্নেল হাসলেন। ''টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং!''

বিরক্ত হয়ে বললাম, ''কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।''

''হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।'' বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। ''নীচের ফ্ল্যাটের লিন্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো

আনিয়ে নিই। তুমি বসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।''

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষ প্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, ''আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।''

''টাইম ইজ মানি!'' বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, ''একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া!''

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতশ কাঁচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, ''ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পুর্বপুরুষকে কেউ হয় তো উপহার দিয়েছিল।''

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, ''সত্যিই এটা নড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।''

''কীভাবে বুঝলেন?''

''কোনও আসবাব অনেককাল এক জায়গায় রাখলে মেঝেয় তার ছাপ পড়ে। পায়া দুটো সেই ছাপ থেকে সরে এসেছে।''

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, ''আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।''

কর্নেল বললেন, ''আপনি এই আলমারিটা খুলুন।''

''খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।''

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন। তল্লাশ শেষ হলে উনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ''আপনার দাদার সেই স্যুটকেসটা দেখতে চাই।''

চামড়ার স্যুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, ''আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেটে ব্রোকার ছিলেন!''

''তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি!''

''আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।''

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, ''ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?''

''আপনি ওঁকে ডাকুন।''

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার

সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল বললেন, ‘‘আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।’’

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, ‘‘আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে স্যার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।’’

কর্নেল বললেন, ‘‘চোরাই জিনিস! তার মানে?’’

‘‘মানে আপনারা ভালোই জানেন! তবে আমি স্যার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, ‘খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।’ আমি ওকে পাত্তা দিইনি।’’

‘‘কিন্তু জিনিসটা কী?’’

‘‘খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, ‘ওই লোকটাকে তাড়াও।’ কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুন্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।’’

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ‘‘এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—’’

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।’’

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বললেন, ‘‘আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?’’

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, ‘‘এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।’’

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, ‘‘তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।’’

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, ‘‘আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?’’

‘‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’’

‘‘টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?’’

‘‘সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?’’

‘‘আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।’’

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, ‘‘দিন সাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।’’

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, ''সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন ?''

কর্নেল হাসলেন, ''কারণ টাইম ইজ মানি।''

''কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।''

ডায়ালের কাঁচ খুলে আতশ কাঁচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, ''এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যান্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরী'স সেভেনটি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি...''

চমকে উঠলাম। ''কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার! এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?''

''ডার্লিং! হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের স্যুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।''

''বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?''

''ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।' পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পাবেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—'' বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেটে মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে মুক্তো-বসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, ''টাইম ইজ মানি! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?''

সায় দিয়ে বললাম, ''অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।''

থ্রি চিয়ার্স ফর জাম্বো

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমার মুখে দিনরাত জাম্বোর গুণগানের ঢাক-ঢোল শুনে মা একদিন বললেন, ওকে একদিন বাড়িতে ডেকে আন না, দেখি। শুনে তো মনের ভিতরে তুড়িলাফ।

—কবে ডাকবো মা?

—সে তোর যেদিন ইচ্ছে বা তার যেদিন সুবিধে হবে।

—কাল?

রান্নাঘরের সামনেই ডাল বাছছিলেন ঠাকুমা। শুনতে পেয়ে বললেন,

—অ বৌমা, রথের আগের দিন রুনুর জন্মদিন। ওইদিন তো বাড়িতে ভালো-মন্দ রান্না-বান্না হবে, ওইদিনই আসতে বল না বরং।

মা বললেন,

—সেই ভালো, ওইদিনই এখানে খাবার নেমন্তন্ন কর।

—রথের আগের দিন কী বার? কোন্ তারিখ? ঠাকুরমার উত্তর,

—তারিখ কি আমার মনে আছে। পাঁজি দেখে নে না, তোর বাবাকে কতবার করে বলি অরে ও বঙ্কিম বাড়িতে একটা পাঁজি এনে রাখ, পাঁজি রাখা ভালো, অনেক দায়-দরকারে লাগে, সে বাবুর কানে ঢুকলনি কোনদিন। তা পাঁজি রাখলিনা রাখলিনা, একটা বাংলা ক্যালেন্ডারই রাখ না হয়, সেও এ বাড়িতে ঢুকলনি কোনদিন। কবে অম্বুবাচি, কবে অমাবস্যে জানতে হলে ছোটো ঘুন্‌টিদের বাড়ি।

ঠিকই বলেছেন ঠাকুমা। তবে অসুবিধেটা হল তাঁরই। আমরা ইংরেজি ক্যালেন্ডারেই অভ্যস্ত! বাংলা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকানোর দরকার হয় না। সেদিন তাই ঠাকুমার মতো আমাকেও ছুটতে হল ঘুন্‌টিদের বাড়ি।

—ও মা, মাংকু যে! কোন্ দিকে সুয্য উঠেছে আজ? আমাকে দেখেই মাসিমা অর্থাৎ ঘুন্‌টির মায়ের অভ্যর্থনা।

—একটু পাঁজিটা দেখতে এলাম।

—তোরা সব একালের ছেলে, তোদের আবার পাঁজিতে কী দেখার আছে?

—রুনুর জন্মদিনটা কবে দেখতে বললেন মা।

—রুনুর জন্মদিন? আরে সে তো জন্মেছিল রথের আগের দিন। আমার বেশ মনে আছে। তা রথ হল গিয়ে এবারে পনেরোই আষাঢ়। আরে ঘুন্‌টি দেখতো পনেরোই আষাঢ়

ইংরেজির কত তারিখ আর কী বার।

একতলার বারান্দা থেকে দোতলার দিকে চিৎকারটা ছুঁড়ে দিয়ে মাসিমা আবার আমার দিকে ঘুরলেন, মুখভর্তি হাসি।

—হ্যারে, তা তোর মা এবারে রুনুর জন্মদিন খুব ধুমধাম করে করছে বুঝি? খাওয়ান্-দাওয়ান্ হচ্ছে নাকি রে খুব? আমাকে বাদ দিসনি যেন।

—না, না। ধুমধাম টুমধাম কিছুই হচ্ছে না। শুধু জাম্বোকে খেতে বলা হবে।

—জাম্বো? জাম্বো আবার কে?

—তুমি জাম্বোর নাম শোননি মাসিমা? সে কী গো! পৃথিবীসুদ্ধ লোক এখন একডাকে চেনে তাকে। আমার বন্ধু।

—কী করে যে পৃথিবীর লোক চেনে?

—ডিটেকটিভ। ডাকসাইটে, দুনিয়া-কাঁপানো ডিটেকটিভ ব্যোমকেশের নাম তো শুনেছ, নাকি তাও শোননি।

—ব্যোমকেশ? না বাবু, ব্যোমকেশ-টোমকেশ নাম জীবনে শুনিনি আমি। সেই ছেলেবেলায় খানদুয়েক ডিটেকটিভ-গল্প পড়েছিলুম, দস্যু মোহন সিরিজের। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। কে ব্যোমকেশ, কে জাম্বো আমি ওসব কী করে জানব বল।

রাগে রি রি করে উঠেছিল আমার শরীর। যে মাসিমাকে এত ভালোবাসি আমি, যে মাসিমা এত ভালোবাসেন আমাকে, আমি যখন জন্মাই তখন ঘুন্‌টি জন্মায়নি বলে যে মাসিমা আমাকে নিজের ছেলের মতো আদর করতেন সেই মাসিমা পৃথিবী সম্বন্ধে এত অজ্ঞ! যতটা সম্ভব সংক্ষেপে জাম্বোর কীর্তি-কাহিনী বলার পর মাসিমার মুখটা হয়ে উঠল যেন লোডশেডিং-এর পরে হঠাৎ জ্বলেওঠা টিউবলাইট।

—ওমা, বলিস কী? তোর অমন একটা গুণের বন্ধু আছে আগে বলবি তো! আমাদের বাড়িতে নিত্যি চুরি লেগে আছে। চোর-ছিঁচকে চোর তো জানালা খোলা পেলে এটা-ওটা সরাচ্ছেই। ঝি-চাকরদেরও কি বিশ্বাস করার উপায় আছে? কখন হাত সাফাই করছে, কী করে সরাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে কারও বাবার সাধ্যি আছে ধরার? রুমাল, চামচে, প্লাস্টিকের গেলাস, বালতি এসবের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই দেখ না, দু'দিন আগে শ্রীগুরু ভাণ্ডার থেকে কিনে আনা হল সাবান, আজ খুঁজতে গিয়ে সারা বাড়ি তোলপাড়। কোথাও নেই। যাকে জিজ্ঞেস করি এমন মুখ করে উত্তর দেয় যে চুরি করা বলে যে মহাবিদ্যা আছে পৃথিবীতে, আজন্মে তা শোনেনি কেউ। মিট্‌মিটে শয়তানদের নিয়ে ঘর-সংসার। আবার বেশি বলার যো নেই। তখন বলবে, আপনার যদি আমাকে এত সন্দেহ হয়, আমি তবে কাজ ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি অন্য ঠিকে-ঝি দেখুন। এই রকম উৎপাত। ঘুন্‌টির একটা ফ্রক, এই দেখনা কাল বিকেল থেকে উধাও। গত মাসে ঘুন্‌টির বাবার ছাতাটা। তার আগের মাসে আমার গামছাটা। তা তোর বন্ধু যেদিন আসবে একবার আনিস তো, দেখব। বিপদে-আপদে খবর পাঠাবো, যাতে চোর-বাটপারগুলোকে ধরতে পারি হাতে নাতে। আনবি কেমন?

আবার বিরক্ত হয়ে উঠলাম মাসিমার উপর।

—আপনি ভুল করছেন মাসিমা, জাম্বো হল ডিটেকটিভ। এইসব ছিঁচকে চুরির ব্যাপারে ও মাথা ঘামায় না। বড় রকমের খুন-খারাপি-টারাপি বা সাংঘাতিক ধরনের কোনও চুরি-ডাকাতি হলে তবেই সেটা টেক-আপ করে।

—সে কী রে? তুই তো বলছিস তোর বন্ধু! তাহলে তো তোরই বয়সী। তোর বয়সী ছেলে খুন-জখম নিয়ে মাথা ঘামাবে কী করে?

—সে তুমি বুঝবে না মাসিমা, তার কী বুদ্ধি। তার বুদ্ধির কাছে আমরা ছারপোকা। কী রকম বাবার ছেলে দেখতে হবে তো।

মাসিমা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিশ্বাস না করারই কথা। আমরা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে আমরাই কি ছাই বিশ্বাস করতুম নাকি। গাঁজা বলে উড়িয়ে দিতাম এক ফুঁকে।

॥ ২ ॥

জাম্বো রাজি হয়নি গোড়ায়।

—দেখ মাংকু, আমি সত্যি নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন খেতে ভালোবাসিনা। বিলিভ মি!

আমিও নাছোড়বান্দা।

—মা যে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, সেটা কি শুধু খাবার জন্যে? তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে, গিয়েই হাপুস হাপুস করে খেতে বসে যাবে, খেয়েই আবার বাড়িতে ফিরে আসবে, এইটেই কি নেমন্তন্নের বড় কথা? খাওয়া বা নেমন্তন্ন বা রুনুর জন্মদিন এগুলোতো উপলক্ষ মাত্র। আসলে মা তোমাকে দেখতে চান। আমার মুখে শুনে শুনে মা তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির অনেক দিন থেকেই। মা তো যে কোনও দিনই নিয়ে যেতে বলেছিলেন। ঠাক্‌মা বললেন, শুভদিনে ডাকতে। তাই ঠিক হল রুনুর জন্মদিনটা। সুতরাং খাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয়।

—খাওযাটা যখন কোনও ব্যাপারই নয়, তাহলে জন্মদিনটা বাছার কী দরকার ছিল। খাওয়া-দাওয়ার কথা থাক। ওটা ছাড়াও আমার আপত্তি আছে অন্য কারণে।

—আবার কিসের আপত্তি?

—নেমন্তন্ন বাড়িতে নানান রকম লোকজনের ভিড় হয়। আমি ভিড় বা অনেক মানুষের সামনে কমপ্লিটলি আন্‌নার্ভড। সো; য়ু মাস্ট একস্‌কিউজ মি। এই ভাবে তর্কাতর্কি, কথার লড়াই চলেছিল বহুক্ষণ। ওর মতো একবগ্গা ছেলের সঙ্গে আমি কখনও জিততে পারি? তবু জিতলাম। আর তার জন্যে শর্ত পালন করতে হবে একাধিক। যেমন

১। ওকে খাওয়ার জন্যে পেড়াপিড়ি করা চলবে না।

২। ওকে বেশি লোকজনের মধ্যে রাখা চলবে না।

৩। ওর সম্পর্কে কারও কাছে প্রশংসাসূচক কথাবার্তা বলা চলবে না।

আমি সবটাতেই রাজি হয়েছিলাম। যখন রাজি হই তখন কি আর জানতাম যে জাম্বোকে নিয়ে ঘটবে অমন কাণ্ডকারখানা। নাকি জাম্বোই জানতো যে নিজের নিয়ম নিজে ভেঙে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে তাকে। কথায় বলে, মানে প্রবাদে আছে, মারে হরি রাখে কে। জাম্বো চেয়েছিল নিজেকে লুকিয়ে রাখবে আড়ালে! যেন সে দশজনের একজন নয়, দশজনের মতোই একজন। আর সত্যি সত্যি ও বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছিল আমার পড়ার ঘরে। যেহেতু বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত অনেক, নানান ফাই-ফরমাশে ছুটতে হচ্ছিল আমাকে। রুনুকে বলেছিলুম ওকে সঙ্গ দিতে। কিন্তু রুনুরও ডাক-হাঁক চারদিকে। তবে কোনও নতুন জায়গায় এলে তার চারপাশটা দেখে নেওয়া ওর অভ্যেস। তাই বেশ খানিকক্ষণ একাই ঘুরে বেড়িয়েছিল ছাদে পড়ার ঘরে এসে আত্মগোপনের আগে। পড়ার

ঘরেও বেশির ভাগ সময় ওকে থাকতে হয়েছে একা, যেহেতু ওর জন্মদিনকে উপলক্ষ করেই উৎসব, তাই যে যখন আসে, ওকে দেখতে চায়। অবশ্য রুনু কাজের কাজ করেছে একটা। জাম্বোকে দিয়ে ওর অটোগ্রাফের খাতায় আঁকিয়ে নিয়েছে একটা ছবি, মানে স্কেচ।

আমার মেজকাকা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। মারা গেছেন। তাঁর কিছু বই মিশে ছিল আমার পড়ার বইয়ের শেল্‌ফে। জাম্বো সেখান থেকে একটা কেস্ হিসট্রির বই নিযে পাতা উলটাচ্ছিল। আমি একবার ঢুকতে ও বলেছিল,

—এটা একটা ফ্যাসিনেটিং বই।

—কোন্‌টা?

—মহেন্দ্রলাল সরকারের এই কেস হিসট্রির বইটা।

—সে কী? ও তো ডাক্তারি বই। ওর মধ্যে পড়বার মতো আছে নাকি কিছু?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আমি। আমার প্রশ্নে জাম্বোকে বিরক্ত, না কি বিরক্ত নয়, কিরকম যেন একটা মনে হয়। সরাসরি আমার চোখে তাকিয়ে ওর প্রশ্ন,

—তুমি এটা পড়নি?

—না। পড়ব কেন? আমি কি ডাক্তার হব?

—না-ই বা হলে ডাক্তার। ডাক্তার না হলে ডাক্তারি বই পড়তে নেই? ডাক্তারির কথা বাদ দাও, এই যে ডিটেকটিভ হবার শখ তোমার, এর জন্যেও তো পড়া দরকার। উঁচু দরের ডিটেকটিভ হতে গেলে সব কিছুই পড়া দরকার। যা পড়বে, দেখবে সেটাই কাজে লেগে গেছে কোনও একদিন। আমার বাবার নিজস্ব লাইব্রেরিতে কত ডাক্তারি বই আছে জানো? পাতায় পাতায় লাল পেনসিলের আন্ডারলাইন করা। আমি যে বইটা পড়ছি, ডাক্তারি পড়া না-পড়া বাদ দিয়েও এটা পড়া যা; একটা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো রোগ ডিটেকশনও এক ধরনের গোয়েন্দাগিরি। কি মজা যে লাগছে বইটা পড়তে। একটা ছোট্ট এপিসোড শোনো, একজন রোগীকে ঠিক যেমন দবকার সেই রকমই ওযুধ দিযে চলেছেন, অথচ রোগীর রোগ সারছে না কিছুতেই। মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো ধন্বন্তরিরও কপালে ভাঁজ, গালে হাত। এই রকম অবস্থায় বিষণ্ণ মনে রোগীর বাড়িতে গেছেন একদিন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ে একটা অদ্ভুত রকমের দাগ। দাগটা দেখা মাত্রই ঝানু গোয়েন্দার মতো ভাবনার বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর চিন্তায়। রোগীর আত্মীয়দের দেখে প্রশ্ন করলেন, দেয়ালের গায়ে ওই দাগটা কিসের? আজ্ঞে, ওটা হুঁকো ঠেস দিয়ে রাখার দাগ। হুঁকো? তামাক খেত বুঝি কেউ? আজ্ঞে হ্যাঁ। কে? আজ্ঞে, আপনি যার চিকিৎসা করছেন। মহেন্দ্রলালের চোখে-মুখে দপ্‌দপিয়ে উঠল রাগের আগুন। সে কী? আমার রোগী তামাক খেত, অথচ এই কথাটা আমাকে জানানো হয়নি এতদিন, এত জিজ্ঞাসাবাদ সত্ত্বেও? খুব অন্যায় করেছ। এখন বুঝতে পারছি আমার অব্যর্থ ওষুধেও কাজ হয়নি কেন? এরপর তিনি যে ওষুধ দিলেন তার এক পুরিয়াতেই সেরে উঠল রোগী। থ্রিলিং স্টোরি নয়? আমি তো রিয়েলি চার্মড। তা ছাড়া তুমি ডাক্তারি বইয়ের বিরুদ্ধে কথাটা বললে কি করে? তোমার মনে পড়ছে না কোনান ডয়েলের কথা। আসলে তো ডাক্তারই ছিলেন তিনি। শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র কেন, একজন জাত গোয়েন্দার আরও বহু বিষয়েই...

জাম্বোর কথার মাঝখানেই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল আমার মাসতুতো দিদি, ময়না। ও মাংকু তোর ডিটেকটিভ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। কই? ও মা, এত কম

বয়েস? আমি ভাবলুম, ডিটেকটিভ যখন, বয়সে বড় হবে তোর চেয়ে। এ তো ছেলে-মানুষ! ময়নাদির কথার ধরনে লজ্জা পাচ্ছিলুম আমি। ময়নাদি কথা বলতে পারে অমায়িক। আর কথা বলে সারা শরীর নাচিয়ে। জাম্বো নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু জাম্বোর দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে আর ঠোঁটে মুচকি হাসি। ময়নাদিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়েছিল জাম্বো।

—আপনি জুতোটা বদলে আসুন।

ময়নাদি চমকে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল। দুটো আলাদা আলাদা জুতোর পাটি।

—ওমা! তাইতো! এতক্ষণ ধরে ঘুরছি বেড়াচ্ছি নিজেরও চোখে পড়েনি, আর কারুরও চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল ঠিক তোমার? তোমার তো আচ্ছা চোখ ভাই, ডিটেকটিভের মতো চোখই সত্যি। কিন্তু তুমি তো একবারও তাকাওনি আমার দিকে। তোমার চোখে পড়ল কি করে?

—আপনার দিকে তাকাইনি বলেই চোখে পড়ল। মুখের দিকে তাকালে পায়ের দিকে চোখ পড়ত না। আপনি বড় ছটফটে।

—কি করে বুঝলে?

—তাড়াতাড়িতে শুধু অন্যের জুতোয় পা দেননি, নিজের রিস্টওয়াচটাও পরে আসতে ভুলে গেছেন।

—অ্যাঁ! তাই নাকি?

ময়নাদি নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে যেন আঁতকে উঠল।

—ওমা, তাইতো! ঠিক ধরেছ তুমি। কিন্তু আমি যে রিস্টওয়াচ পরিনি, বুঝলে কী করে?

—নিয়মিত রিস্টওয়াচ পরার অভ্যেস থাকলে হাতের ওই জায়গাটায় একটা সাদা দাগ বসে যায়। আপনার হাতে সেই দাগটা দেখতে পেয়েই মাথায় এল ভাবনাটা। তার সঙ্গে আপনার ছটফটে স্বভাবটা মিলিয়ে বুঝে গেলুম ব্যাপারটা।

—তোমাকে ভাই সত্যি সত্যি কনগ্রাটস্! রিয়েলি, য়ু আর অ্যা জিনিয়াস।

ময়নাদি এরপর সারা বাড়ি মাত করে দিলে জাম্বোর প্রশংসায়।

কিন্তু সে হল নাটকের প্রথম দৃশ্য, আসল দৃশ্য যাকে বলে ক্লাইমাক্স, তখনও ঘটেনি। রুনুর জন্মদিনের নাটকে জাম্বোই যে হয়ে উঠবে নায়ক, এতটা কল্পনা করিনি আমিও। তবে এমন কিছু অসম্ভবও ছিলনা সেটা। কারণ ও তো হিরো হওয়ার জন্যেই জন্মেছে। ওঃ, সেদিন লুডো ব্যাটাচ্ছেলেকে নেমন্তন্ন করলে যা জমতো। অবশ্য পরে সবই সে শুনেছিল আমার মুখ থেকে। আর শুনে তার কি উল্লাস!

॥ ৩ ॥

তখন সবে আমরা খেতে বসেছি। আমরা মানে আমি আর আমার মাসতুতো খুড়তুতো ভাই বোনেরা। মাসি পিসি কাকিমারা খাবেন আমাদের পরে। বাইরের নিমন্ত্রিত বলতে একজনই। জাম্বো। জাম্বো আর আমি বসেছি পাশাপাশি। ময়নাদির এত ভালো লেগেছে জাম্বোকে যে, পরিবেশন করতে লেগে গিয়েছিল নিজেই। ভাল হয়েছিল মাছের মাথা দিয়ে। ময়নাদি ডালের ডেকচিটা ওর পাতের সামনে রেখে হাতা দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে মাথার

বেশ বড় একটা অংশ জাম্বোর পাতে তুলে দিয়ে বলেছিল হাসতে হাসতে,

—তোমার ভাই যা মাথা, তোমার এই মাথাই খাওয়া উচিত।

আমাদের চেয়ে যারা ছোট, কচি-কাঁচা তাদের খাওয়া হয়ে গেছে একটু আগেই। তারা সব দফায় দফায়, দূরে দাঁড়িয়ে জাম্বোকে দেখছিল। খাওয়ার মাঝখানে মা নিজে এসে বসলেন একবার জাম্বোর সামনে।

—লজ্জা করে খাচ্ছ না তো? ও ময়না, এখানে মাছ দিয়েছিলি?

জাম্বোর সলজ্জ উত্তর,

—আমি মোটেই লজ্জা করে খাচ্ছি না। বরং ময়নাদিকে একটু বারণ করে দিন আমাকে বেশি খাতির না করতে।

মা হাসতে হাসতে উঠে যান। ময়নাদি একটু পরে এসেছে পায়েসের ডেক্‌চি নিয়ে। ঠিক সেই সময়ে ঘুন্‌টিদের বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি। মাসিমার অর্থাৎ ঘুন্‌টির মায়ের গলার আওয়াজটাই সবচেয়ে জোরালো। তার সঙ্গে ঘুন্‌টির দাদাদের হাঁক-ডাক থেকে থেকে। সব মিলিয়ে বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো হই চই। আমি জাম্বোর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই জাম্বো আমার দিকে তাকাল চোখভর্তি প্রশ্ন নিয়ে। আমি বললাম,

—কি হয়েছে বুঝতে পারছি না।

আমি জাম্বো একটু তাড়াতাড়িই খেতে লাগলাম। জাম্বো দই মিষ্টি একেবারেই খেল না বললে চলে। খেয়ে হাত ধুয়েছি সবে, মাসিমা ঝড়ের বেগে আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমাকে ডাকলেন,

—বাবা মাংকু, তোর সেই ডিটেকটিভ বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে যাবি একবার?

—কি হয়েছে বলুন তো?

—আর বলিস না। ঘুন্‌টির বাবা অপিসে গিয়েই ফোন করলেন, ভুলে গেছেন ঘড়ি পরে যেতে। ঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে থাকে। বললেন, আছে কিনা দেখতে। আমরা খুঁজতে গিয়ে দেখি, নেই। একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মধ্যে জলজ্যান্ত ঘড়িটা ড্রয়ার থেকে উধাও।

মাসিমাকে ঘিরে জমে উঠল একটা ভিড়। নানা মুখে নানা প্রশ্ন। মাসিমা উত্তর দিয়ে চলেছেন হাত-পা নেড়ে। মোটামুটি ঘটনাটা সকলের জানা হয়ে যাওয়ার পর ভিড়টা একটু পাতলা হতেই আবার ডাক পড়ল আমার।

—বাবা, মাংকু, তোর বন্ধুটিকে নিয়ে আসবি একবার আমাদের বাড়িতে?

এখুনি যাচ্ছি বলে আমার পড়ার ঘরে জাম্বোকে ডাকতে গিয়ে দেখি, জাম্বো নেই। যাকে জিজ্ঞেস করি কেউই উত্তর দিতে পারে না। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও পাওয়া গেল না জাম্বোকে।

বুকের মধ্যে ভয়ে টিপ টিপ শুরু হয়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। জাম্বো কি জড়িয়ে পড়ল কোনও বড় রকমের চক্রান্তের মধ্যে? তাকে কি কিডন্যাপ করল কেউ? যদি সত্যিই তেমন কিছু ঘটে, আমি কী করে মুখ দেখাব ওর মায়ের কাছে? এই সব ভাবতে ভাবতেই একতলা দোতলার ঘর-বারান্দায় উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে এক দৌড়ে উঠে গেলাম ছাদে। না, ছাদেও নেই জাম্বো। ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে যতদূর চোখ যায় দেখছি! ময়নাদি কখন উঠে এসেছিলেন আমার পিছু পিছু। তার চোখে-মুখেও উদ্বেগ আশঙ্কা গেঁথে বসেছে অবিকল আমার মতো। ময়নাদি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছেন জাম্বোকে। এর জন্য আমার যতখানি গর্বিত হওয়ার কথা, হতে পারছি না। জাম্বোকে ফিরে না পেলে আমাকে হয় তো আত্মহত্যা

করতেই হবে শেষপর্যন্ত। হঠাৎ ময়নাদির তীব্র কণ্ঠের আওয়াজ,

—ওই তো জাম্বো, ও মাংকু।

দৌড়ে ছুটে গেলাম ময়নাদির কাছে। কার্নিশে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখি দূরের লম্বা গলি দিয়ে হেঁটে আসছে জাম্বো।

আমি আর ময়নাদি দৌড়ে নেমে এলাম নীচে।

জাম্বোর কাছে পৌঁছেই জড়িয়ে ধরলাম ওর হাত।

—না বলে কোথায় চলে গেছলি, বাড়িসুদ্ধ লোক দেখতে না পেয়ে ভয়ে অস্থির। বাড়িতে ঢুকতেই মা এলেন ছুটে। মায়ের গলায় যতটা স্নেহ, ততটাই রাগ আর অভিমান।

—কাউকে না বলে তোমার চলে যাওয়াটা উচিত হয়নি বাবা। কিছু একটা ঘটে গেলে কী হত বলতো।

ঠাকুমা কাঁপতে কাঁপতে এসে আর এক দাগ বকুনি,

—এদিককার রাস্তাঘাট চেনো না। হট্ করে তোমায় চলে যাবারই বা কী দরকার পড়ল বাবু। আর যাবেই যদি তো মাংকুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

জাম্বো কাউকেই উত্তর দিল না। শুধু মৃদু হাসল একটু সলজ্জ ভঙ্গিতে। তারপর মাকে বলল,

—আপনারা সবাই খেয়ে নিন মাসিমা। খাওয়ার পর পাশের বাড়ি মাসিমার চোর ধরা হবে।

চোর ধরাটা যেন তাসের ম্যাজিক দেখানোর মতো একটা মজার ব্যাপার, এই রকম হালকা ভঙ্গিতেই কথাটা বলেছিল জাম্বো। আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। কোনও সমস্যায় পড়লে ওর মুখের চেহারা কী রকম বদলে যায় সেটা জানা ছিল আমার। মুখের মধ্যে টেনশনের ছাপ নেই এতটুকুও। শুধু চোখের মধ্যে ঈষৎ অস্থিরতা। কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য চোখের মণি দুটো অস্থির।

॥ ৪ ॥

সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা জাম্বোর নির্দেশমতো, জমায়েত হয়েছিলাম আমাদের সেকেলে বৈঠকখানায়। অতবড় ঘর প্রায় ভর্তি। আমাদের বাড়ির সব লোক ছাড়াও পাশের বাড়ির মাসিমাদের বাড়ির ছ'সাত জন। সকলের মুখে উৎকণ্ঠা জিজ্ঞাসা, ঘরে বসে জাম্বো চোর ধরবে কি করে? এমনকী আমি, যে কি-না জাম্বোর অন্তরঙ্গ বন্ধু, পর্যন্ত অবাক হয়ে আছি জাম্বোর ব্যবহারে। কোনও সমস্যার মধ্যে জড়িয়েও ওর অমন নিরুত্তাপ ভঙ্গি আগে দেখিনি কখনও। ঘরভর্তি নিস্তব্ধতা জাম্বোই ভাঙল প্রথম। ওর প্রশ্ন শুরু হল পাশের বাড়ির মাসিমার দিকে তাকিয়ে।

—মাসিমা, যে ঘড়িটা চুরি গেছে সেটা কি এইচ. এম. টি-র সোনা?

—হ্যাঁ, বাবা। তোমার মেসোমশাই কিনেছিলেন গতবছর।

—চামড়ার ব্যান্ড?

—ঠিক বলেছ।

—ঘড়িটার নাম্বার কি সিকস্ জিরো ফোর নাইন ওয়ান এইট?

—তা তো জানিনা বাবা! সে তোমার মেসোমশাই থাকলে বলতে পারতেন।

—মেসোমশাই আপিসে বেরিয়েছিলেন কখন?

—উনি তো বেরোন ওই ধরো দশটা নাগাদ। দু-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হয় কখনও কখনও।

—তার মানে ঘড়িটা চুরি গেছে দশটার পর। মাংকু, আমি তোমাদের বাড়িতে এসে পৌঁচেছি কটার সময় মনে আছে?

আমি একটু ভেবে বললাম,

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঘড়ি দেখিনি বটে, কিন্তু তুই পৌঁছবার মিনিট দুয়েক পরেই সাড়ে দশটার আওয়াজ পেয়েছি ঘড়িতে।

জাম্বো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে যোগ-বিয়োগ করে নিল হয় তো কিছু।

—তার মানে ঘড়িটা চুরি হয়েছে দশটা আটচল্লিশ মিনিটের মতো সময়ে।

আমরা তো অবাক! যেন সিনেমা দেখছেন এইভাবে মাসিমা তাকিয়েছিলেন জাম্বোর দিকে। তিনি আর নিজের ধৈর্য রাখতে পারলেন না,

—হ্যাঁ, বাবা জাম্বো, ঘড়িটাকে পাওয়া যাবে?

জাম্বোর গলায় পরিপূর্ণ আশ্বাসের সুর,

—রিস্টওয়াচটা পাওয়া যাবে বলেই তো মনে হচ্ছে মাসিমা।

এইটুকু শোনামাত্র সারা ঘরে স্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্। প্রথম ভাঙল ময়নাদি। জাম্বোর মুখের কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই ময়নাদি-র উল্লসিত চিৎকার,

—সাবাস জাম্বো!

আমার মেজ মেসো অর্থাৎ ময়নার বাবা খুব সাবধানী মানুষ। তিনি ধমকালেন ময়নাদিকে

—এখুনি লাফাচ্ছিস কেন? জিনিসটা আগে হাতে আসুক।

একটু পরে মাসিমার মুখেও সেই প্রশ্ন,

—তাহলে পাব কি করে?

—এখুনি পেতে চান?

—এখুনি? এখুনি এনে দিতে পারবে? বল কি বাবা? তুমি তো ম্যাজিক দেখাচ্ছ মনে হচ্ছে।

জাম্বো আমাকে আর ময়নাদিকে ডেকে বললে, সামনের গলির শেষে দেয়ালে টাঙানো লেটার বক্সটা আছে, সেটা খুলে এখানে নিয়ে আসতে। লেটার বক্স শুনে আমি বলে ফেলেছিলাম,

—লেটার বক্স? ওটা তো ব্যবহার হয়না। ডেড্।

—ডেড বলেই তো আনতে বলছি। জ্যান্ত হলে কি আনতে পারতে? ওটা গভর্নমেন্টের প্রপার্টি।

আমরা দুজনে লেটার বক্সটা তুলে নিয়ে এলাম আমাদের সদরের ঘরে। জাম্বোর হুকুম,

—ওলটাও।

আমরা ওলটালাম।

—এবার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করো।

হাত ঢুকিয়ে যেটা বের করলাম, সেটা সত্যিই একটা রিস্টওয়াচ। এবং ব্র্যান্ডটা 'সোনা'-ই! অতি আনন্দেও পাথর হয়ে যায় মানুষ। অতি আনন্দে সমস্ত ঘরটার সেই রকম অবস্থা।

যেন মরা মানুষের দেহে প্রাণ আসছে এই ভাবে আবার যখন ধীরে ধীরে বিস্ময়কর স্তব্ধতার ভাবটা কেটে গিয়ে শোনা যেতে লাগল কথাবার্তার সাড়া, ময়নাদি অনুরোধ জানালে কাতর কণ্ঠে—কী করে ডিটেকশন করলে, সেটা কিন্তু বলতেই হবে ভাই। না শুনে আমরা কেউ এখান থেকে উঠব না।

জাম্বো গোড়ায় খানিকটা আপত্তি করলেও রাজি হল শেষপর্যন্ত। —আমি এ বাড়িতে এসে পৌঁছোই দশটা ছাব্বিশ—সাতাশ মিনিটের সময়। মাসিমা আসামাত্রই খেতে দিয়েছিলেন প্রচুর খাবার-দাবার। আমি বেশি কিছু না খেলেও খেতে খেতে সময় চলে যায় কুড়ি মিনিটের মতো। তারপর আমি ছাদে উঠি। ছাদে ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ আমার চোখে পড়ে খাকি প্যান্ট আর আধময়লা গেঞ্জি পরা সাতাশ আঠাশ বছর বয়সের একটি ছেলে পকেট থেকে বেব করে কী একটা জিনিস এই লেটার বক্সটায় ফেলল। সেই মুহূর্তে আমার মনে তেমন কোনও সন্দেহ জাগেনি। শুধু খটকা লেগেছিল যে যা ফেলল সেটা কোনওভাবেই চিঠির মতো কিছু নয়। এরপর ঘড়ি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা শোনামাত্রই, ভিড়ের ভিতর বেরিয়ে আসি সকলের চোখ এড়িয়ে। মাংকুর পড়ার ঘরে পুরনো একটা পোস্টকার্ড দেখতে পেয়েছিলাম! সেটা হাতে নিয়েই দ্রুত চলে গেলাম লেটার বক্সটার সামনে। চিঠিটা দেখিয়ে একজন রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করলুম ডাক নিতে পিয়ন আসে কখন? শুনে ভদ্রলোক বললেন, পিয়ন কোনওদিনই আসে না। আসবেও না। ওই বাক্স বাতিল হয়ে গেছে। চিঠি ফেলতে হলে তোমাকে যেতে হবে ওই দিক দিয়ে ট্রামলাইনের কাছে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে আমি লেটার বক্সের তলায় মারলুম একটা থাপ্পড়। তখন ভেতরে যে আওয়াজ হল, তাতে আমার অনুমানটার উপর আস্থা বাড়ল। চাপড় মারার সঙ্গে সঙ্গে লেটার বক্সটা এমন কাত হয়ে গেল, তখন বুঝলুম এটা তো দেয়ালে শক্ত করে গাঁথা নয়। যে কেউ খুলতে এবং লাগাতে পারে। এরপর হিসেবটা মিলে যেতেই আর কোনও সন্দেহ রইল না আমার।

জাম্বো থামতেই ময়নাদির জয়োল্লাস,

—থ্রি চিয়ার্স ফর জাম্বো। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

বিকেলের দিকে আমাদের বাড়িটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল যেন, জাম্বো যার দেবতা। লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে ওর অকল্পনীয় ক্ষমতার খবর। আর ওদিকে, মাসিমার বাড়ির সেই চাকরটা ধরা পড়ার ভয়ে সেই যে পালিয়েছিল, আজও ফেরেনি।

অলৌকিক আখড়া রহস্য

অদ্রীশ বর্ধন

ইন্দ্রনাথকে ফোন করেছিলাম। উদ্দেশ্য—জমিয়ে আড্ডা মারা। ও বড্ড একলা থাকে। সঙ্গ দেওয়া দরকার। আমারও দরকার সুভাষ সরোবরের টাটকা হাওয়া।

টেলিফোনের ঘন্টা বাজল। তারপরেই শুনলাম ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর:

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব....নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব.....

খুট করে কেটে গেল লাইন। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রনাথের গলা চিনতে ভুল হয়নি। কিন্তু এরকম বিদ্‌ঘুটে রসিকতাও আশা করিনি।

আবার ডায়াল করলাম। আবার সেই একঘেয়ে বয়ানের গা-জ্বালানো পুনরাবৃত্তি:

নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...

এবারও লাইন কেটে যেতে রিসিভার রেখে দিয়ে বললাম, ''শুনছ?''

কবিতা বললে, ''কী?''

''ইন্দ্রনাথের এই নতুন মজাটা একদম ভালো লাগছে না।''

''কী মজা?'' ঝুঁকে বসল কবিতা। গোয়েন্দা ইন্দ্র ঠাকুরপোর নাম শুনলেই রাজ্যের কৌতূহল জড়ো হয় কবিতার চোখেমুখে। গোয়েন্দা-গল্পের নম্বর ওয়ান পোকা যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে এই কবিতা, আমার বউ।

''যতবার ফোন করছি, ততবার 'নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব...নস্যি নিয়ে রাতে ফিরব' বলে লাইন কেটে দিচ্ছে।''

হেসে ফেলল কবিতা। ওর সেই মার্কামারা হাসি। যে-হাসি রাজরানিরা হাসে। হেসে কুটিপাটি হয়ে বললে, ''তোমার মাথায় গোবর আছে। বাস করছ ইলেকট্রনিক যুগে। ইলেকট্রনিক ঠাট্টা-মজার খবর রাখ না?''

''ইলেকট্রনিক মজা!''

''ইন্দ্র ঠাকুরপো একলা থাকে তো। যখন থাকে না, তখন টেলিফোন ধরবে কে? তাই ইলেকট্রনিক যন্তর বসিয়েছে। সেই যন্তরেই নিজের গলা রেকর্ড করে গেছে। জানে তো আজ শনিবার, তুমি ফোন করবে, তাই মজা করছে।''

রেগেমেগে বললাম, ''কলেজ লাইফ থেকে ওর এই সৃষ্টিছাড়া মজার ঠেলায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। এই জন্যই ওর কিচ্ছু হল না।''

''সত্যিই কী হয়নি?'' বলে আর-একদফা হাসি হাসল কবিতা। এ-হাসিটা বিদ্রূপের হাসি কি না ঠিক ধরতে পারলাম না।

ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক

আমরা এখন বেলেঘাটায়। গাড়ি থেকে নামবার আগেই দেখে নিয়েছি ইন্দ্রনাথের একতলার ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে বন্ধুবর নস্যি নিয়ে ফিরেছে।

গেট খুলতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি, "এসেছে, এসেছে, ডিটেকটিভ-গল্পের খদ্দেররা এসে গেছে।"

এবার কিন্তু রেগে গেল কবিতা নিজেই। তেড়েমেড়ে দাওয়ায় উঠে দরজায় ঠেলা দিয়েই অবশ্য থমকে গেল চক্ষের নিমেষে।

ঘরের সোফায় বসে পাশাপাশি দুটি মূর্তি। একটা মূর্তিকে আমরা হাড়ে-হাড়ে চিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এখন তার গায়ে রক্ত রঙের চাদর, পরনে লাল টকটকে ধুতি, কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ। কাপালিক-কাপালিক চেহারা। মৌজ করে নস্যি নিচ্ছে, আর সকৌতুকে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু তার পাশের মূর্তিটা যে সত্যি-সত্যি কাপালিক! গালে কালো কুচকুচে দাড়িগোঁফের আফ্রিকান জঙ্গল, লম্বা বাবরি চুলে চিরুনির পাট নেই, গলায় রক্তজবা আর রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে-বুকে-কণ্ঠায় রক্তচন্দনের মাখামাখি, চোখ দুটো আগুনের গুলির মতো ধকধকে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল কবিতা। ভড়কে গেছিলাম আমিও। তাই দেখে অট্টহেসে ইন্দ্রনাথ বললে, "বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক। এঁকে দেখে ভিরমি খাওয়ার দরকার নেই। এঁর চেহারাটা বিকট হতে পারে, মানুষটা অপরূপ, বিশেষ করে এঁর সাধনা।" এই পর্যন্ত বলেই বিকট কাপালিকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "বলুন না মশাই, আপনার নামটা বলুন।"

কাপালিক ভদ্রলোকের হাইট ইন্দ্রনাথের চেয়ে ইঞ্চিকয়েক বেশি। মানুষ-দৈত্য বললেই চলে। ইন্দ্রনাথের গুঁতো খেয়ে তিনি কিন্তু একটু হেলে পড়লেন। বন্ধুবরের নস্যির ডিবেটা দেখলাম তাঁর বাঁ হাতে। ডান হাতের দু' আঙুলে করে বেশ খানিকটা তামাকু-চূর্ণ নাসিকা-গহ্বরে ঠেসে দিয়ে নাকের ডগা মুছতে-মুছতে বললেন, "আমার নাম নাদাচার্য।"

চমকে উঠলাম গলার আওয়াজ শুনে। দৈত্য-বপুর গলা থেকে স্টিরিও-আওয়াজ বেরোবে ভেবেছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে উল্টো।

বাচ্চা ছেলের মতো কচি গলায় কথা বলছেন নাদাচার্য। এবং বিলক্ষণ আধো-আধো গলায়।

আমার আর কবিতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি দেখে নিশ্চয় করুণা হল নাদাচার্য কাপালিকের। তিনি বললেন ইন্দ্রনাথকে, "দেখলেন তো, আমার গলা শুনেই কীরকম হয়ে গেলেন। স্রেফ এই জন্যই আমি কথা বলতে চাই না। কেন যে মা-তারা আমার গলাটাকে পাকিয়ে তুললেন না।"

কবিতা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পাশাপাশি বসলাম আর-একটা সোফায়। বললে কাষ্ঠহেসে, "সবার গলা কি মোটা হয়?"

আগুনচোখ মেলে নাদাচার্য আধো-আধো সরু গলায় বললেন, "না হোক, পুরুষালি গলা হতে ক্ষতি কী ছিল? তারা, তারা ব্রহ্মময়ী! হাজার হলেও আমি তো তান্ত্রিক।"

"বস্তাপচা সস্তা তান্ত্রিক অবশ্য নন"—পাশ থেকে বলে উঠল ইন্দ্রনাথ, "রীতিমত ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক।"

সব গোলমাল হয়ে গেল আমার। বিশেষ করে নাদাচার্য মশাইয়ের হাসিটা শুনে। এত মিষ্টি, এত সুরেলা হাসি কচিকাঁচারাই শুধু হাসতে পারে।

কিন্তু ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক! সেটা কী বস্তু?

আমাদের মানে আমার আর কবিতার মনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মনের একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। মুখ খোলার আগেই ও বুঝে নেয়। এখনও বুঝল, বেজায় ধোঁকায়

পড়েছি কর্তা-গিন্নি দু'জনেই!

ইন্দ্র তাই বললে, ''হে বউদি, হে মৃগাঙ্ক, ডিটেকটিভ-গল্পের অনেক ছাইভস্ম তোমরা পড়ছ আর লিখছ। কখনও কি শুনেছ তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্সকে প্রয়োগ করা হচ্ছে?''

''তন্ত্রসাধনায় নিউ-ফিজিক্স!'' আমার কণ্ঠস্বর অনেকটা খাবি খেতে-খেতে কথা বলার-মতো শোনাল।

''মডার্ন ফিজিক্স যে-অন্ধকারে হাতড়ে মরছে, নতুন-ফিজিক্স সেখানে আলোকপাত করতে চলেছে। এজন্য দরকার মাইক্রোচিপ।''

''মা, মা।''

''মাইক্রোচিপ। ইলেকট্রন যার প্রাণ। যে ইলেকট্রনকে কেউ কোনওদিন দেখতে পাবে না, সেই ইলেকট্রনের খেলবার জায়গা মাইক্রোচিপ। যে জিনিস কম্পিউটারে লাগে, মাইক্রোপ্রসেসরে লাগে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?''

''না, না তো!''

''নাদাচার্যমশাই নিজেই ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক। পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ আনিয়েছিলেন এই কারণেই।''

''পাঁচ লক্ষ সিলিকন চিপ!''

''হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ। তার এখনকার বাজার দাম পাঁচ কোটি টাকা। সব চুরি হয়ে গেছে।''

ফস করে বললে কবিতা, ''এইজন্যই বুঝি কাপালিক সেজেছ?''

''নইলে চোর ধরব কী করে?'' বলে নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াল ইন্দ্রনাথ।

টরে-টক্কা পোস্টকার্ড

ইন্দ্রনাথ নস্যির ডিবের দিকে হাত বাড়াতেই নাক সিঁটিয়ে কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ল কবিতা। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে, ''খবরদার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ মুখ খুলবে না।''

অমনই তারস্বরে বললে ইন্দ্রনাথ, ''বউদি, ফ্রিজে এক কিলো ভেড়ার মাংস আছে।''

''ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, নুন, পাতিলেবু, মাখন?'' ভুরু কুঁচকে বললে কবিতা।

''স-ব আছে। বানাবে কী?''

''মাটন মোরব্বা।''

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক, ''তোফা! তোফা! তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী।''

মাটন মোরব্বা উদরে প্রস্থান করেছে। চোখ পাকিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রয়েছে কবিতা।

ইন্দ্রনাথ একটা ঢেকুর তুলে বললে, ''ব্যাপারটার শুরু একটা টরে-টক্কা পোস্টকার্ড থেকে।''

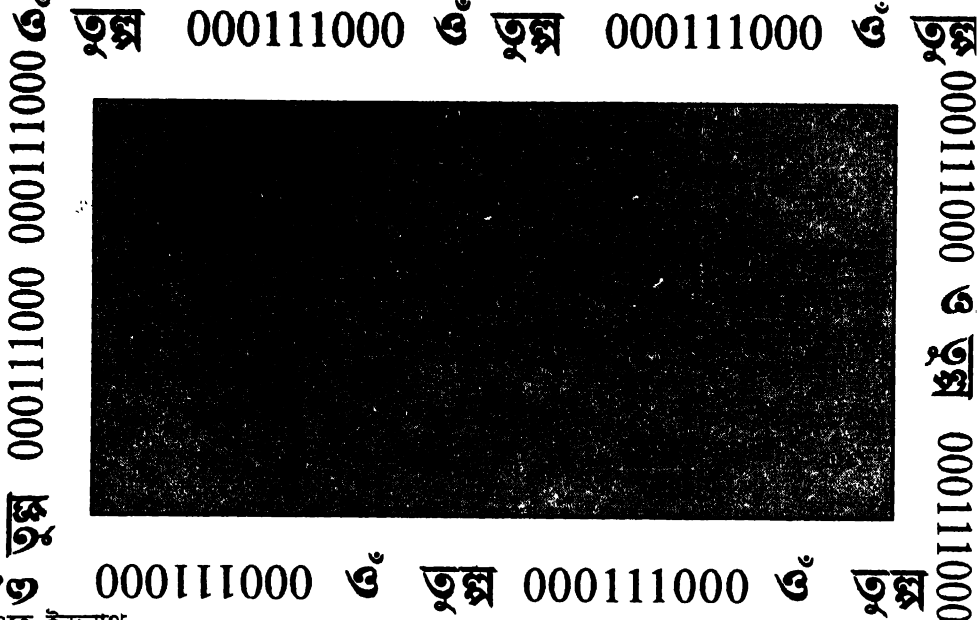
''টরে-টক্কা পোস্টকার্ড!'' কবিতার চোখ একটু ছোট হল।

''কাল রাতে বাড়ি ফিরে লেটার-বক্স খুলে পেলাম একটা পোস্টকার্ড। এই সেই পোস্টকার্ড।''

বলে, টেবিলের রাশি-রাশি কাগজ, পত্রিকা আর চিঠির মধ্যে থেকে একটা পোস্টকার্ড তুলে এগিয়ে ধরল ইন্দ্রনাথ। হাত বাড়িয়ে নিল কবিতা। নিমেষে চোখ বোলানো হয়ে গেল। ভুরু দুটোয় একটু ঢেউ খেলিয়ে বললে, ''কচি-খোকার লেখা মনে হচ্ছে।''

"হেঁ, হেঁ, ওটা আমার লেখা", যেন মরমে মরে গেলেন তান্ত্রিকমশাই।

কার্ডটা এবার হাতে নিলাম আমি। চিঠিটা লেখা হয়েছে এইভাবে:



ওহে ইন্দ্রনাথ,

তোমার মতো অপদার্থ গোয়েন্দাদের গোল্লায় যাওয়া উচিত। তোমার কবচ হয়ে গেছে। হাতে পরলেই গুলিগোলা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলেও তোমার মরণ হবে না (যদিও হলে বাঁচতাম)। আসবে কবে বাছাধন? ডেরায় গিয়ে নিয়ে নিও। দশ হাজারের বান্ডিল ছেড়ে যেও। ইতি—

তোমার যম

নাদাচার্য

চিঠি পড়ে বললাম কবিতাকে, "হাতের লেখা তো পাকা। কচি-খোকার লেখা বললে কেন?"

"এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দা-গল্প লেখো কেন? পোস্টকার্ডের বর্ডারগুলো চোখ এড়িয়ে গেল?"

"বর্ডার? ও হ্যাঁ, চারদিক ঘিরে শুধু লেখা রয়েছে ইংরেজি জিরো আর ওয়ান। এক-একজনের ওরকম খেয়াল থাকে। নাদাচার্যমশাই দেখছি জিরো আর ওয়ানের খুব ভক্ত।"

"হেঁ হেঁ হেঁ!" কাষ্ঠহাসি হাসলেন নাদাচার্য, "এখনও ধরতে পারলেন না।"

তাকালাম জুলজুল করে, "কী ধরতে পারলাম না?"

"মেসেজটা।"

অসহায় চোখে তাকালাম ইন্দ্রনাথের দিকে, "কীসের মেসেজ রে?"

ইন্দ্রনাথের তখন সবে এক টিপ নস্যি নেওয়া হয়েছে। নাকের ডগা মুছছে। চোখে একটু জলও এসে গেছে। সেই অবস্থাতেই বললে, "জিরো আর ওয়ান ঠিক একটা ফরমুলার মতো সাজানো রয়েছে না?"

"কীরকম ভাবে?"

আবার তাকালাম পোস্টকার্ডের দিকে। যা দেখলাম, তা ওপরে এঁকে দেখাচ্ছি।

ইন্দ্রনাথ মুখের অবস্থা দেখেই বুঝেছিল হালে পানি পাচ্ছি না। তাই বললে, ''মূর্খ মৃগাঙ্ক, ইংরেজিতে টরে-টক্কা মেসেজ যখন লেখা হয় 'ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট'—তখন কী বোঝায়? বুঝলে না? মর্স কোড-টা এই'', বলতে বলতে পোস্টকার্ডের উলটো দিকে লিখল ইন্দ্রনাথ:

ফস করে বলে উঠল কবিতা, ''পতাকা সঙ্কেত অথবা আলোর সঙ্কেত তো এই একই মেথডে পাঠানো হয়। কলেজ লাইফে শিখেছিলাম। বলব আমি?''

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, ''জানতাম তুমিই বলবে। ডট ডট ডট ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ ডট ডট ডট—কী মানে, বউদি?''

''সেভ আওয়ার সোলস; সংক্ষেপে এস. ও. এস; বাংলায় বাঁচাও, বাঁচাও। জাহাজডুবির সময়ে অথবা সেইরকম বিপদে পড়লে এই সঙ্কেত পাঠানো হয়। কিন্তু ঠাকুরপো, জিরো আর ওয়ানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?''

''বউদি, এটা ইলেকট্রনিক সিগন্যাল।''

''খুলে বলো। 000 111 000 সঙ্কেতে এস. ও. এস. মেসেজ পাঠানো হয়েছে। প্রতিবার এস. ও. এস. লিখে মাঝে 'ওঁ তুল্ল' লেখা হয়েছে নিছক ভড়কি দেওয়ার জন্য অবশ্য নয়।'' এবার বড়-বড় চোখ মেলে নাদাচার্যর দিকে তাকাল কবিতা, ''পোস্টকার্ডে অত গোপনে 'বাঁচাও বাঁচাও' করলেন কেন?''

কবিতার ধমক তো! বেলুনের মতো চুপসে গেলেন নাদাচার্য। রক্তচক্ষু ছোট্ট করে ফেলে তাকালেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, ''নাদাচার্য তান্ত্রিককে আমি চিনি না। কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন। ইলেকট্রনিক মেসেজ পাঠিয়ে আমার সাহায্য চেয়েছেন। যাদের ভয়ে গোপন সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন, তারা নিশ্চয় তাঁর ডেরা-র সন্ধানও জানে। সুতরাং গবেষণা করতে লাগলাম, কোন্ চুলো থেকে এসেছে পোস্টকার্ডটা। পেয়েও গেলাম।''

''কোত্থেকে?''

ঝুঁকে বসল ইন্দ্রনাথ, ''অলৌকিক আখড়া যে অঞ্চলে—সেখান থেকে।''

অলৌকিক আখড়া

একটা ছোট এলাচ তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কবিতা বললে, ''আখড়া কখনও আলৌকিক হয়?''

''কেরলে আছে এন্তার, কলকাতায় হয়েছে একটা।''

''অলৌকিক আখড়া?''

''হ্যাঁ বউদি, হ্যাঁ। কেরলের থ্রিসুর জেলায় থুকথুক করছে প্রেতলোকের এজেন্টরা—তিন হাজার বছর ধরে। তারা অশরীরীদের ধরে এনে মানুষের উপকার করায়—অপকারও করায়।''

''বলছ কী ঠাকুরপো!''

''হুঁ হুঁ, বউদি, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সব খবরই রাখতে হয় আমাকে।''

''তোমার এই অহঙ্কারেই একদিন পতন ঘটবে।''

''আমার তো? তাতে মৃগাঙ্করই ক্ষতি, গল্পের মসলা পাবে কোথায়? হ্যাঁ, কী বলছিলাম? অলৌকিক আখড়া, ভূতপ্রেতের মঠ, কেরলের এই জেলাটা তাদের বড় আড্ডা। সবচেয়ে

বড় ঘাঁটি কেরালার সাংস্কৃতিক শহর থ্রিসুরে—ভূত-গুরুদের শহরও বলতে পারো—এরকম ভূতপুজো তুমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবে না।''

''ভূতপুজো! ভূত-গুরু! তোমার মাথা ঠিক আছে তো ঠাকুরপো?''

''বিলক্ষণ ঠিক আছে। আর-একটু নস্যি নিলে আরও ঠিক হবে। নেব? আচ্ছা, আচ্ছা, নেব না। কুট্টি চাথান-দের নাম শোনোনি নিশ্চয়। কেরলে ভূত-গুরুদের বলা হয় কুট্টি চাথান। প্রায় কুড়িটা মঠ আছে শুধু এই একটা জেলাতেই, 'চাথান সেবা মঠ' নামেই এরা বিখ্যাত। রোজ এক হাজার মানুষ যায় এইসব মঠে ভূতেদের দয়া ভিক্ষা করতে।''

''ভূতেদের মঠ বলে কিছু কি থাকতে পারে?''

''আছে বউদি, আছে। তিন হাজার বছর ধরে ভূত-গুরুরা দাপিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে যে মঠটায়, তার নামটা শুধু শুনে রাখো....আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া।''

''আভানগাট্টু বিষ্ণুমায়া!''

''বাঃ, বাঃ, বেশ তো উচ্চারণ করে গেলে। 'কানাড়ি মঠ'টা তা হলে সহজেই মনে থাকবে—এর বয়স দেড় হাজার বছর। তিন নম্বর বিখ্যাত মঠটার নাম এক্কেবারে মনে গেঁথে যাবে, শ্রীকালী চাথান সেবা মঠ।''

''মা-কালীকে নিয়ে কারবার!''

''কে না করছে? যাক সে-কথা। সমাজমনোবিজ্ঞানী আর যুক্তিবাদীরা যতই চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাক না কেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রোফেসর, অ্যাডভোকেট, জার্নালিস্ট, পলিটিশিয়ানরাও দলে-দলে এই সব মঠে ভিড় করছে। কেউ- কেউ আসছে সুদূর রাজস্থান থেকেও। দক্ষিণা দিচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সাড়ে চারশো...''

''টাকা?''

''তবে কি পয়সা? করকরে খরচ গুনে দিতে হয় পুজো অর্চনার জন্য। মঠের বেদির সামনে একজন মিডিয়ামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে বলতে হবে, কী তোমার যাচ্ঞা। নিজের মঙ্গল চাও, না অন্যের ক্ষতি করতে চাও।''

''অন্যের ক্ষতির জন্য ভূতপুজো?''

''কথা না বলে শুনে যাও বউদি। ভূত-গুরু যে শক্তির আরাধনা করে, সে শক্তি যে পয়লা নম্বর কুচুটে আর করাল, তা কে না জানে? সুতরাং তুমি যদি চাও অমুক লোকের পেটের নাড়িভুঁড়িগুলোকে পেটের ভেতরেই ক্যাঁচ করে কেটে দেবে, তা হলে ভূত-গুরু সেই ব্যবস্থাই করবে। কীভাবে জানো? মিডিয়াম তোমার আরজি শুনবে। তারপর অপদেবতা তার ওপর ভর করবে। সে বোঁ-বোঁ করে পাক খাবে, চোখ ঘুরিয়ে হাঁই-হাঁই করে অনেক কথা বলে যাবে, ভূতের ভাষা বলে একবর্ণও বুঝবে না তুমি। তারপর ভূত-গুরু সহসা কারও কাছ থেকে একগোছা পান নেবে। বেদির সামনে পুজোটুজো করে কচ করে বোঁটাগুলো কেটে দেবে, যার ক্ষতি করতে চাও, তার নাড়িভুঁড়িগুলোও সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক যেন খুর দিয়ে কাটা হয়ে যাবে।''

''ইশ্! সত্যি কি তাই হয়?''

''শোনা কথা। মা-কালী জ্বলন্ত সরা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্যও নাকি অনেকে দেখেছে। সেই সরার মধ্যে দেখা গেছে গনগনে কাঠকয়লা, মেটে সিঁদুর, জবাফুল, গলাকাটা একটা পায়রা....''

''ও মাগো!''

''তা হলে আর বলব না। যদি কারও যেতে ইচ্ছে হয়, বলবে মঙ্গল আর শুক্রবারে যেতে।''

''শনি-মঙ্গলে নয়?''

''না। এখানে যত রহস্য ওই মঙ্গল-শুক্কুরে। যেমন ঘটছে কলকাতার কুশগ ওয়ানচেং মঠে।''

''এটা তো কেরল-নাম বলে মনে হচ্ছে না, ঠাকুরপো!''

''ধরেছ ঠিক। তিব্বতে একজন বিখ্যাত লামার নাম কুশ ওয়ানচেং। তাঁর নামেই মঠ। এখানেও হচ্ছে ভূতপুজো। বাঞ্ছাপূরণ। লোকের অমঙ্গল। অনাচার অবিচার আর প্রতারণা।''

''প্রতারণা! তোমার টনক নড়েছে এই কারণেই?'' আর-একটা ছোট এলাচ তুলে নিল কবিতা।

''তক্কে-তক্কে ছিলাম অনেকদিন ধরেই। ঠিকানাটাও খুঁজে বের করেছিলাম, কিন্তু চান্স পাচ্ছিলাম না ঢুঁ মারার। এখন সুযোগ এসে গেল।''

''এল এই টরে-টক্কা পোস্টকার্ডে?''

''জি হ্যাঁ, বউদি। পোস্টকার্ড পড়েই বুঝলাম, নাদাচার্য নামে এক তান্ত্রিক বড় বিপদে পড়েছেন। তাঁর নাম আমি কস্মিনকালেও শুনিনি, কিন্তু তিনি আমার নাড়িনক্ষত্র জেনে বসে আছেন। ভদ্রলোক ইলেকট্রনিক টেকনোলজিতে এক্সপার্ট, অথচ তিব্বতি মিস্টিসিজম বিলক্ষণ জানেন। মোদ্দা কথা, তিনি একজন অত্যাধুনিক তন্ত্রসাধক। লুকিয়ে চুরিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। তাঁকে আমি কবচ বানানোর কথা মোটেই বলিনি। কিন্তু তিনি সেই ভড়ং মেরেছেন চিঠির লাইনে-লাইনে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মর্স কোড লিখলেন কেন? নিশ্চয় যাদের হাত দিয়ে পোস্টকার্ড ফেলতে দিয়েছেন—তারা যেন বুঝতে না পারে এস. ও. এস. মেসেজ—শুধু বুঝবে যে, ইন্দ্রনাথ রুদ্র নামে একটা অখদ্যে গোয়েন্দা হাজার দশেক টাকার তাড়া নিয়ে হাজির হবে নাদাচার্যর ডেরায়। এবং এই টাকাটাই তাদের দরকার—নিশ্চয় মুক্তিপণ হিসেবে। পরিষ্কার?''

কবিতা বললে, ''এক্কেবারে। কিন্তু তুমি বুঝলে কীভাবে ব্যাপারটা কুশগ ওয়ানচেং মঠেই ঘটছে?''

চোখ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, ''ওই একটা রহস্যই শুধু তোমাকে ফাঁস করতে হবে। তবেই বুঝব তুমি গোয়েন্দা-লেখকের উপযুক্ত বউ।''

রেগে গিয়ে কবিতা বললে, ''আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন বলো, গিয়ে কী দেখলে কুশগ ওয়ানচেং মঠে?''

''দেখলাম শরীরী প্রেত,'' বলে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, বেশ আওয়াজ করে।

শরীরী প্রেতের নাচ

ইন্দ্রনাথ ছবির মতো বলে ঘটনাটা:

''জায়গাটা বড় রাস্তার ধারে হলেও নির্জন। ট্রাম লাইন নেই। সরকারি বাস রুট আছে একটাই। বিবিডি বাগের বাস। সন্ধের পর তাই বাস চলে না। ঝিমিয়ে পড়ে গোটা অঞ্চলটা।

রাস্তার দু'পাশে কারখানার টিনের শেড। গুদাম আর খাটাল। গাছগাছালি এন্তার। মাঝে-মাঝে পুরনো বাগানবাড়ি, ফটক আর থাম এখন শ্রীহীন। দূরের বারান্দা আর তার পেছনকার একতলা বাড়ি আরও শ্রীহীন। এখন সেসব জায়গায় নানা কারবার।

একসময়ে কলকাতা এই পর্যন্ত ছিল না, এখন ছাড়িয়ে চলে গেছে সল্টলেকে। এখানে, এই বড় রাস্তার ধারে, একটা বটগাছের ঝুপসিতে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ।

ওই যে একতলা বাড়িটা, ওই বাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনেক দুর্নীতির বাসা। কিন্তু সেই কুকর্ম যে কী, তা সঠিক জানা যায়নি। তবে কালীপুজো হয় এখানে ধুমধাম করে। ভোরবেলা থেকে ভক্তরা আসে। ইচ্ছাপূরণ হয়। চলে যায় টাকার থলি রেখে দিয়ে।

এই সেই কুশগ ওয়ানচেং মঠ। যদিও মঠ বলে মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি বললেই চলে। সর্বাঙ্গে ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ সুস্পষ্ট। নিশ্চয় এককালে কোনও সাহেব থাকতেন। বড়-বড় থাম, উঁচু-উঁচু জানলা, পেল্লায়-পেল্লায় দরজা আর ফুটবল খেলার মতো বিশাল ছাদটা সেইসব স্মৃতি বহন করছে। আধো অন্ধকারে ছাদের ওপর পায়রা ওড়ানোর কেরামতিও চোখে পড়ছে। লম্বা একটা লগা, তার মাথায় চৌকোনো জাল পাতা।

ইন্দ্রনাথ তান্ত্রিক বেশে এসেছে। বগলের ফাঁকে অবশ্য ওর প্রিয় সঙ্গী রিভলভারটা আছে। বলা তো যায় না, অলৌকিকের আখড়াগুলোতেই লৌকিক কদর্যতা প্রকাশ পায় সবচাইতে বেশি।

জায়গাটা এখন একটু ফাঁকা। সন্ধের পর ঝট করে এদিকে কেউ আসতে চায় না। দুটো কারণে—এক, ওই বাড়ির পেছনেই আছে একটা গোরস্থান। দুই, জায়গাটায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা একটু বেশি।

ইন্দ্রনাথ তবুও এসেছে। নাদাচার্য লোকটার পোস্টকার্ড পেয়েই ও বুঝেছে, তান্ত্রিক ভদ্রলোক তাকে ঠিক এইখানেই আসতে বলেছে। কেন আসতে বলেছে—সেটা একটু অ্যাডভেঞ্চার না করলে জানা যাবে না।

জোনাকির আলো জ্বলছে গাছপাতার অন্ধকারে। ঝিঁ ঝিঁ ডাক শুরু হয়েছে। এমন সময়ে একটা খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল।

আওয়াজটা এল ইয়া মোটা বটের গুঁড়ির দিক থেকে।

মাথা না ঘুরিয়ে আড়চোখে সেদিকে তাকাল ইন্দ্রনাথ।

একটা ভাঙা গাড়ি পড়ে আছে গুঁড়ি ঘেঁষে, যে গাড়ির চাকা লুঠ হয়ে গেছে। মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে চেহারাটাও পালটে গেছে। জানলা-দরজার বালাই নেই।

আওয়াজটা আবার শোনা গেল তার মধ্যে।

আর ঠিক তার পরেই একটা পেনসিল টর্চের মতো সরু আলো ফ্ল্যাশ দিয়ে উঠল মর্স কোডের সঙ্কেতে।

নাদাচার্য নাকি?

পায়ে-পায়ে সেদিকেই একটু সরে গেল ইন্দ্রনাথ। কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেল কচি মিহি গলায় উদার আহ্বান, "আসা হোক! আসা হোক! আসা হোক! ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশ্চয়?"

আর-একটু এগিয়ে গিয়ে ততোধিক মিহি গলায় বললে ইন্দ্রনাথ, "মহাশয় কি নাদাচার্য?"

"ধরেছেন ঠিক। এই না হলে গোয়েন্দা! আমার সঙ্কেতের মানে আপনি অন্তত বুঝবেন, এটা জানতাম।"

"পোস্টকার্ডের সঙ্কেত?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ....ঢুকে আসুন....ভয় নেই...ভয় নেই....আমি যখন আছি। আপনিও থাকবেন।"

বগলের রিভলভারে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ধূলিধূসরিত ভাঙা গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

অমনই ফুস করে পেনসিল টর্চ জ্বলল ওর মুখের ওপর। সেই আলোয় নাদাচার্যর মুখাবয়বও অবলোকন করে নিল ইন্দ্রনাথ।

বললে, ‘‘এই বিরাট চেহারা নিয়ে এরকম কচি গলায় কথা বলেন কেন?’’

‘‘তারা! তারা! ব্রহ্মময়ী!’’ বললে কচি গলা, ‘‘আপনাকে ডেকেছিলাম উদ্ধার পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার আর দরকার হল না। আমিই পালিয়ে এসেছি চান্স পেতেই। একেবারে চম্পট দিইনি শুধু আপনার জন্য। আপনাকে না আবার ফাঁদে ফেলে।’’

‘‘খুলে বলুন মশাই।’’

‘‘যা ধুলো, ঘাড় গুঁজে কথা বলা যায়? আপনার বাড়ি গিয়ে বলব। তার আগে ভূত দেখে যান।’’

‘‘ভূত!’’

‘‘গোরস্থান থেকে তো ভূত ধরে আনে এরা। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিকদের আড্ডা মশাই। আমাকে ধরে এনেছিল আমার ঘিলুর বড়া খাবে বলে, তাতে নাকি ওদের শক্তি আরও বাড়বে।’’

‘‘ঘিলুর বড়া!’’

‘‘পরে শুনবেন। দেরি করলে আপনার ঘিলুর বড়াও বানাতে পারে।’’

‘‘ভূত আসে গোরস্থান থেকে? আপনি দেখেছেন?’’

‘‘না দেখলে পেত্যয় হল কী করে? আসেন, আসেন, আপনাকেও দেখাচ্ছি।’’

এই ‘আসেন, আসেন’ শুনেই ইন্দ্রনাথ বুঝেছিল, নাদাচার্যমশাই বাঙাল। কিন্তু আর কথা বাড়ায়নি। নিঝুম রাতে গাছপালার অন্ধকার ঠেলে ওকে নিয়ে নাদাচার্য পৌঁছেছিল গোরস্থানের ভেতরে। একতলা বাড়িটার একটা জানলার কাচ ভাঙা। পা টিপে-টিপে তার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন ভেতর দিকে।

টানা লম্বা ঘরটায় নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। নীল ধোঁয়া পাকসাট খাচ্ছে। মেঝেতে বসে দশ-বারোজন নারী এবং পুরুষ। বিভিন্ন বয়সের। বিভিন্ন জাতের। প্রায়-অন্ধকার নীলচে আভায় এর বেশি দেখা যায়নি।

দেখা যা গেছিল, তা অতি ভয়ঙ্কর।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় শূন্যে ভাসছে একটা নর-করোটি।

শুধু একটা কঙ্কালের মুন্ডু। সাদা সাদা হাড় ঘিরে ঘুরে-ঘুরে উড়ে যাচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। মুন্ডুটা একদৃষ্টে কোটর-চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে মেঝেতে আসীন মানুষ ক'জনের দিকে।

ভাসমান মুন্ডুর সামনে একটি মেয়ে তাথৈ-তাথৈ নেচে চলেছে। তার সারা গায়ে রক্ত রঙের শাড়ি জড়ানো। তার কপাল জুড়ে লাল সিঁদুর লেপা। তার চোখ আধ-বোজা। কালো চুলের রাশি ঝোড়ো মেঘের মতো পুঞ্জে-পুঞ্জে আছড়ে পড়ে সাপটে ধরছে তাকে দমকে দমকে।

অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে কী-যেন মেয়েটা বলে যাচ্ছে উদ্দাম নৃত্যের তালে-তালে। সারা ঘর থমথম করছে দুর্বোধ্য সেই গুঞ্জনধ্বনি, নর-করোটির নিষ্পলক চাহনি আর নীলাভ ধোঁয়ার আবর্তে।

এই পর্যন্ত দেখিয়েই ইন্দ্রনাথকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন নাদাচার্য।

কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম

কবিতা গালে হাত দিয়ে সব শুনল। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল পয়েন্টগুলো টুকে ফেলার জন্য। কিন্তু সে সময় আর পেলাম না।

নাদাচার্যমশাই ফোঁত-ফোঁত করে দু'বার নস্যি নিয়ে বললেন, ''ব্যাপারটা ইন্দ্রনাথমশাইকে খুলে বলেছি। আপনারাও শুনুন। ওই গোরস্থানের বাড়িতে কঙ্কালী গুরু যে ভূত নামানোর খেলা দেখিয়ে চলেছে, তার আসল উদ্দেশ্য পয়সা কামানো।''

''সে তো বটেই,'' বললে কবিতা, ''কিন্তু কীভাবে?''

''মা-জননী ভারি বুদ্ধিমতী,'' কচি গলায় স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন নাদাচার্য, ''কিন্তু আসল ব্যাপারটা পুলিশও এখনও আঁচ করতে পারেনি। খবরও পায়নি। তাই ডেকেছিলাম রুদ্র সাহেবকে।''

''আসল ব্যাপারটা কী?'' অসহিষ্ণু গলা কবিতার।

''মা-জননীর কি জানা আছে, হায়দরাবাদ কিডনি পালটানোর চমৎকার জায়গা?''

''কিডনি পালটানোর জন্য হায়দরাবাদ!'' থতমত খেয়ে গেল কবিতা।

''ভারতের নানা জায়গা থেকে বড়লোকরা যায় হায়দরাবাদে কিডনি পালটাতে—কাকপক্ষীও অবশ্য জানে না। সেসব কিডনি আসে কোত্থেকে? স্কুলের ছেলেদের শরীর থেকে।''

''অ্যাঁ!'' মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কবিতার।

''এই তো সেদিন পঁচিশজন স্কুলের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ভ্যানে চাপিয়ে। জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে ঘুমিয়েছিল পিশাচগুলো। দুটি ছেলে সকালে উঠেই কোনও একটা অছিলা দেখিয়ে ভোঁ দৌড় দেয় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তাদের মুখেই সবাই এখন জেনেছে সমস্ত ব্যাপারটা। যাক সে-কথা, কলকাতাতেও এখন শুরু হয়েছে এই ব্যবসা—চালাচ্ছে কঙ্কালী গুরু। কী ভাবে? আরে মা-জননী, কুশগ ওয়ানচেং মঠটার প্ল্যান এসেছে কেরলের মঠগুলোর থেকে। ওই যে মেয়েটা ধেই-ধেই করে নাচছে, ও খুব ভালো মিডিয়াম—ভূতপেত্নিরা চট করে ওর শরীরটাকে আশ্রয় করে নিজেদের কথা বলে যায়। যারা বসে আছে মেঝেতে, তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ—সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেমন থাকে কেরলের মঠগুলোয়। এরা প্রত্যেকে হাজার টাকা ফি দেয় কঙ্কালী গুরুকে, আর বলে, গুরু, অমুক লোকটা আমায় বড় কাঠি দিচ্ছে—ওকে সরিয়ে দাও। কী বুঝলে?''

কবিতা শুধু ঢোক গিলল। ওর ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

নাদাচার্য বললেন, ''মিডিয়াম তাই শুনে করোটির সঙ্গে কথা বলে নেয়। করোটি ভৌতিক ভাষায় মিডিয়ামকে বলে কী করতে হবে। সে ভাষা শুনতে পায় কেবল কঙ্কালী গুরু। তারপর যে লোকটাকে সরাতে হবে সে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। মা-জননী দেখছি খুব ঘাবড়ে গেছ? অদৃশ্য হয়ে যায় মানে বুঝলে না? তাকে খতম করে দেয় কঙ্কালী গুরুর চ্যালাচামুণ্ডারা। মারার আগে নিয়ে নেয় কিডনি দুটো। সেই কিডনি বসে যায় কোনও এক বড়লোকের পচা কিডনির জায়গায়। দু'দিকে লাভ কঙ্কালী গুরুর।''

এইবার আমি কথা বললাম।

''ইন্দ্রনাথ, তুই কি শুধু রঙ্গ দেখবার জন্য অভিযানে বেরিয়েছিলি?''

দুই চোখের মণি নাচিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, ''তাই কি হয়! জয়ন্ত এতক্ষণে মঠ তোলপাড় করে ফেলেছে।''

জয়ন্ত আমাদের পুলিশবন্ধু।

পায়রাগুলো উড়ে গেছে

ইন্দ্রনাথ নাটক জানে বটে। ঠিক সময় বুঝে জয়ন্তর নামটা বলেছিল। মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতে বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ করে একটা জিপ-গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

তার পরেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল জয়ন্তর আখাম্বা মূর্তি, অতিশয় কর্কশ গলায় বললে ইন্দ্রনাথকে, ''মজার জায়গা পাসনি? কোথায় তোর কঙ্কালী গুরু? সব ভোঁ-ভোঁ। ছাদের পায়রাগুলো সুদ্ধু উধাও।''

ইন্দ্রনাথ বসে রইল সোফায়। কিন্তু সটান উঠে দাঁড়ালেন নাদাচার্য, ''সে কী!''

''তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!'' কটমট করে তাকিয়ে বলল জয়ন্ত, ''খবরের গন্ধ অনেক দিন ধরেই নাকে আসছিল। ইন্দ্রনাথ ঠিক জায়গায় হানা দিল বটে, কিন্তু পাখি গেল উড়ে।''

ইন্দ্রনাথ বললে, ''পায়রা গেল উড়ে!''

''হ্যাঁ, পায়রা গেল উড়ে।'' বলেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন নাদাচার্য, ''পুলিশমশাই, আপনার তিষ্ঠ-তিষ্ঠ রব শুনেও তিষ্ঠোতে পারছি না। আমার আশ্রমে এক্ষুনি আমাকে যেতেই হবে!''

আস্তে-আস্তে ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বগলের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে বের করে তুলে ধরল নাদাচার্যর দিকে।

বললে ভারি মিষ্টি গলায়, ''লাভ নেই। গোয়েন্দার দল সেখানেও হাজির। পায়রাগুলোর ঠ্যাং নিয়ে তারা এখন বড় ব্যস্ত।''

পায়রার ঠ্যাং

নাদাচার্যকে নিয়ে প্রস্থান করেছে জয়ন্ত।

ভীষণ রেগে মুখ লাল করে কবিতা বলছে, ''এটা কী ধরনের মজা হল?''

ইন্দ্রনাথ নিরীহ গলায় বললে, ''প্যাঁচের মধ্যে প্যাঁচ—এর নাম আড়াই প্যাঁচের বাবা।''

কবিতা আরও রেগে গেল।

ইন্দ্রনাথ তখন বললে, ''এক ঢিলে দুটো পাখি মার নাম বউদি। নাদাচার্য পাঁচ লাখ টাকার মাইক্রোচিপ স্মাগল করে এনেছিল জুনপুটের এক্টা দ্বীপ থেকে। মাছ ধরার নাম করে ট্রলার যায় সেখানে। স্মাগলারদের বোট সেখানে নামিয়ে দিয়ে যায় ব্রিফকেস ভর্তি মাইক্রোচিপ। শঙ্করপুরের বন্দর ওদের বড় আড্ডা। নাদাচার্য ইলেকট্রনিক তান্ত্রিক না কচু তান্ত্রিক। সে তার আশ্রমের ছাদে পায়রা পোষে। পায়রাদের ঠ্যাঙে মাইক্রোচিপ সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়। দরদাম ঠিক হয়ে গেলে একটা কি খানকয়েক পায়রা উড়িয়ে দেয়। সেই পায়রা এসে বসে কুশগ ওয়ানচেং মঠের ছাদে। কঙ্কালী গুরু ঠ্যাং থেকে মাইক্রোচিপ খুলে ফের উড়িয়ে দেয় পায়রাটাকে, সেটা ফিরে যায় নাদাচার্যর মঠে। এইভাবেই চলছিল কারবার চমৎকার। কঙ্কালী গুরু কোথায় যে পালাল ভগবান জানেন, পাঁচ লাখ টাকার লোভে সবক'টা পায়রাকে লুঠ করে এনে রাখল নিজের মঠের ছাদে। তার দল ভারী। তাই নাদাচার্য কায়দা করে ইলেকট্রনিক মর্স কোডের পোস্টকার্ড নিজেই ডাকবাক্সে ফেলে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল কঙ্কালী গুরুর কুকর্ম। আমাকে দিয়েই পুলিশে খবর পাঠিয়ে হানা দেওয়ালো মঠে। মতলবটা ছিল পরিষ্কার—পায়রাদের খুপরিতে পুলিশ কখনও হাত দেবে না। কঙ্কালী গুরু ধরা পড়লেই আমাকে নিয়ে মঠে যাবেন তিনি সকালের দিকে। কোনও এক ফাঁকে ছাদে উঠে উড়িয়ে দেবেন পায়রার দল। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে আকাশপথে পাঁচ লাখ টাকার মাইক্রোচিপ ফিরে যাবে তাঁর আশ্রমে। তিনি তাদের সদ্ব্যবহার করবেন।''

কবিতা ফিক করে হাসল, ''কী কুচুটে বুদ্ধি তোমার! তার আগেই ওঁর আশ্রমে পুলিশ পাঠিয়েছিলে? ঠিকানা জানলে কী করে?''

''কলকাতার পুলিশ জানে না এমন কিছু নেই,'' নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ, ''তবে হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারে পায়রাগুলোকে নিশ্চয় ছেড়ে দিয়ে যায়নি কঙ্কালী গুরু—সঙ্গেই নিয়ে গেছে।''

আমি বললাম, ''তুই কি সত্যি ভূত দেখেছিস?''

''করোটির ভাসমান মাথাটা তো? সত্যিই দেখেছি—তুই যা ভাবছিস তা নয়—স্লাইড প্রোজেকশন নয়। তা হলে তার দুটো ডাইমেনশন দেখা যেত—থার্ড ডাইমেনশন দেখা যেত না।''

থার্ড ডাইমেনশন!'' বিমূঢ় স্বর কবিতার।

''হ্যাঁ বইকী! কোনও জিনিসের গভীরতা অর্থাৎ পেছন দিকে কতটা রয়েছে, এটা তো ফোটোগ্রাফিতে বোঝা যায় না। সেখানে শুধু দুটো মাত্রা দেখা যায়, কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। কিন্তু তোমার এই মাথাটা যে খোঁপা-টোপা নিয়ে পেছন দিকে তিন ফুট ঠেলে রয়েছে...''

''তিন ফুট!''

''ওই হল গিয়ে, ধরো এক ফুট। সেটাকে তো ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যায় না। দরকার আধুনিকতম একটা আবিষ্কারের। তার নাম হলোগ্রাফি।''

''হলোগ্রাফ।''

''হলোগ্রাফ নয়, হলোগ্রাফি। হলোগ্রাফ মানে একজনের হাতে সমস্ত লেখা একখানা দলিল। হলোগ্রাফি মানে ত্রি-মাত্রিক ছবি। লেজার রশ্মি আবিষ্কারের পর ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মতো হলোগ্রাম প্লেট তৈরি হচ্ছে। তাতে ছবি থাকে না, থাকে শুধু সাদা-কালো লাইন আর একই কেন্দ্র ঘিরে অনেক বৃত্ত। এই হলোগ্রাম থেকে কাচের মতো স্ক্রিনে যে ছবি ভাসবে তাকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হবে। ঘরে কম আলো আর ধোঁয়া থাকলে স্ক্রিন প্রায়-অদৃশ্য থাকবে—যেমন দেখা যায়নি কুশগ ওয়ানচেং মঠে। শুধু একটা কঙ্কালের মুন্ডু, জানলার ফুটো দিয়ে দেখতে-দেখতে আমি ডাইনে-বাঁয়ে চোখ সরিয়ে দেখেছি, নর-করোটির এপাশ-ওপাশ আবছামতো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দ্যাট ইজ হলোগ্রাফি। জয়ন্তর কাছে রিপোর্ট পরে পাবে। সবই বুজরুকি।''

আমি কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললাম, ''বুঝলাম, বুঝলাম, বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না, পোস্টকার্ড হাতে পেয়েই তুই বুঝলি কী করে যে, তোকে যেতে হবে কুশগ ওয়ানচেং মঠে?''

''বউদি, তুমি বুঝেছ?'' ইন্দ্রনাথের সাফ প্রশ্ন।

কাষ্ঠহেসে কবিতা বললে, ''একদম না।''

''এই তো সেই পোস্টকার্ড,'' বললে ইন্দ্রনাথ, ''জিরো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো জিরোর পরেই প্রতিবার লেখা হয়েছে, 'ওঁ তুল্প'। দেখতে পাচ্ছ? শুধু মানেটা জানালেই, এই তো?''

''বলছি তো জানি না।'' রেগে যায় কবিতা।

''আমার ওই বইয়ের তাক থেকে 'ম্যাজিক অ্যান্ড মিস্ট্রি ইন টিবেট' বইটা নিয়ে গিয়ে পড়বে। আলেকজান্ড্রা ডেভিড নীল লোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন তুল্প-র। তুল্প মানে চিন্তার চেহারা। তিব্বতি যোগীরা বিশ্বাস করেন, মন থেকে জগৎসৃষ্টি সম্ভব। মনের শক্তি দিয়ে যে-কোনও বস্তু গড়ে তোলা সম্ভব। ভয়ানক দানব সৃষ্টিও সম্ভব। তিব্বতি ভাষায় একে বলে তুল্প। আর কিছু বলার দরকার আছে?''

''তিব্বতি তুল্পর আরাধনা চলতে পারে শুধু তিব্বতি মঠ কুশগ ওয়ানচেং-এ? তাই তো?'' বললাম আমি।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে কবিতা বললে, ''ইশ্, মাটন মোরব্বা বেশ খানিকটা রেখে দিয়েছি—ভুলেই গেছিলাম।''

''যাও, যাও, গরম করে আনো,'' বলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

লাহিড়িমশাই

সুকুমার ভট্টাচার্য

গাড়িটাকে গলির মুখে পার্ক করে ভদ্রলোক হাঁটা দিলেন ভেতরে।

ভর দুপুর বেলা, রোদ ঝলমল চারদিক। দুপাশের বাড়িগুলোর নম্বর দেখতে দেখতে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হাতের চিরকুটের সঙ্গে বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে রোয়াকের ওপর উঠে চাপ দিলেন কলিং বেলে।

কিছু পরেই চাকর গোছের একটা ছেলে দরজা খুলে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন,—লাহিড়িমশাই আছেন?

সমীহ দেখা দিল ছেলেটির মুখে। সংক্ষেপে বলল, —আছেন। বসুন ডেকে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ঘরের ভেতর পা রাখলেন। কিন্তু বসলেন না। ঘরভর্তি সার সার আলমারিতে নানান বিষয়ের বই। সেগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এক সময় তাঁর কানে এল, —কাকে চাই? আমিই লাহিড়ি।

পিছু ফিরলেন ভদ্রলোক। সামনেই এক লম্বা দোহারা চেহারার মানুষ: মাথাভর্তি একরাশ কাঁচা-পাকা চুল। দুদিকের চোয়াল বেয়ে নেমে আসা সুন্দর একমুখ দাড়ি। টিকলো নাকের ওপর মোটা ফ্রেমের চশমা। সব খুঁটিয়ে দেখার পর ভদ্রলোক বললেন, —আমায় চিনতে পারছেন? আমি বিজয়, বিজয় বোস। বোস অ্যান্ড সন্‌সের—

—আর বলতে হবে না। বসুন। অনেকদিনকার ছাড়াছাড়ি হলেও স্মরণশক্তি আমার খারাপ নয়। তা কী ব্যাপার বলুন?

একটা সেন্টার টেবিলকে মাঝে রেখে দুজনে এবার মুখোমুখি। বিজয়বাবু বললেন, —বাবার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার দুর্ভাগ্য, আমার আমলে আপনাকে কাছে পেলাম না।

চুপ করে রইলেন লাহিড়িমশাই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। এ অনুযোগ বিজয়বাবু করতে পারেন। একটানা বার-তের বছর বোস অ্যান্ড সন্‌সের অ্যাকাউন্টস সামলেছেন। সেটা ওনার বাবার আমল। তারপর চাকরি আর ভালো না লাগায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে এসে বসেছেন। পড়াশোনা নিয়েই থাকেন। বিশেষ আকর্ষণ অপরাধ-তত্ত্বের ওপর।

—বলুন, হঠাৎ আমার কাছে কেন?

—বলছি। তবে তার আগে বলি, দয়া করে আমাকে আর আপনি বলে বলবেন না। ওতে আমার কুণ্ঠা বাড়ে।

স্মিত হাসি দেখা দিল লাহিড়িমশাইয়ের মুখে। বললেন, —তা না হয় হল, কিন্তু ব্যাপারটা কী? মুখ দেখে মনে হয়, খুব একটা দুশ্চিন্তায় আছ।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বিজয় বোস। ভূমিকার প্রয়োজন হল না। বললেন, —ঠিকই ধরেছেন। সত্যিই খুব বিপদে পড়েছি।

—কী রকম?

—যতখানি জানি, আমাদের ফ্যাক্ট্রিতে যখন হাইটেনশন লাইন নেয়া হয় এবং পাওয়ার ট্রান্স্ফরমার রুম তৈরি হয়, সে সময় বাবার পাশে পাশে আপনি ছিলেন।

ঘাড় নাড়লেন লাহিড়িমশাই।

—সেই লাইন আর ট্রান্স্ফরমার রুম এতকাল সেইভাবেই ছিল। এখন ফ্যাক্ট্রি আরও বড় হয়েছে। ফলে নতুন পাওয়ার হাউস তৈরি করা এবং ট্রান্স্ফরমারটাকে সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। কাজ শুরুও করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম যে সব কাজ বন্ধ রেখে ছুটে আসতে হল আপনার কাছে।

—ঝামেলা! কী রকম?

—পুরনো পাওয়ার হাউসের মেঝে খুঁড়ে ট্রান্স্ফরমার ওঠাতে গিয়ে, আজ কুলিরা কাজ বন্ধ করে দেয়। আমি সেই সবে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরেছি। একটা বাজে খবর আমার কানে এল। ছুটে গেলাম, দেখলাম সত্যিই তাই। মাটির তলায় একটা মানুষের কঙ্কাল।

কী বললে?—চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল লাহিড়িমশায়ের। তারপর?

—বাধ্য হয়ে সব কাজ বন্ধ রাখতে হল। এমন ব্যাপার আমরা আশা করিনি। কোন রকম পুলিশি ঝামেলা হওয়ার আগে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। সে সময় আপনি তো ছিলেন, কী এমন ঘটেছিল যার ফলে ও জিনিস বেরিয়ে পড়ল ওখানে? আজ বাবা থাকলে, এ প্রশ্ন আমি তাঁকেই করতাম।

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল লাহিড়িমশাইয়ের কপালে। স্মৃতির ঘরে কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে বললেন,—উঁহু! তেমন কিছু ঘটেছিল বলে তো মনে পড়ে না। একটা কথা বলব?

মুখ তুললেন বিজয়বাবু। লাহিড়িমশাই বললেন,—তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি কি একবার দেখে আসতে পারি জায়গাটা?

—কী যে বলেন। এটা কি একটা কথা হল?

উঠে পড়লেন লাহিড়িমশাই, —তুমি বোসো। আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

কিছু পরেই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গলিটুকু হেঁটে গিয়ে চড়ে বসলেন গাড়িতে। ঝড়ের বেগে গাড়ি ড্রাইভ করে বিজয়বাবু এসে দাঁড়ালেন ফ্যাক্ট্রির গেটে। অনেক কিছুর অদলবদল চোখে পড়লেও পুরনো পাওয়ার হাউসটা সেই রকমই আছে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলেন দুজনে। পুরনো আমলের একজন সুপারভাইজার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সসম্ভ্রমে লাহিড়িমশাইকে নমস্কার করে বললেন, —ভালো আছেন?

হেসে মাথা নাড়লেন লাহিড়িমশাই। সুপারভাইজারের দিকে তাকিয়ে বিজয়বাবু বললেন,—এদের একটু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। বুঝতেই পারছেন, আমরা একটা ডিসিশনে আসতে চাইছি।

সে ভদ্রলোক কুলিদের নিয়ে সরে যেতেই, লাহিড়িমশাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সামনে একটা বিরাট গর্ত খোঁড়া রয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সেটার চার পাশ। তারপর গর্তের ধারে জড়োকরা মাটির ওপর বসে তাকালেন নীচের দিকে।

দীর্ঘকাল মাটির নীচে চাপা থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা কাঠের বাক্স। তার ভেতর একটা কঙ্কাল হাঁটু মোড়া অবস্থায় আড়াআড়ি পড়ে আছে। লাহিড়িমশাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে।

অনেক পরে বিজয় বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমার অফিসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা ওই জাতীয় কিছু আছে?

একটু ভেবে বিজয়বাবু বললেন—আছে। এনে দেব?

—দাও।

বিজয়বাবু চলে যেতে গর্তের ভেতর নেমে পড়লেন লাহিড়িমশাই। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কয়েকটা বোতাম তাঁর চোখে পড়ল। বুঝলেন, পরনের জামা প্যান্ট থেকেই এগুলো খসে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে কয়েকটা কুড়িয়ে নেবেন, এমন সময় একটা রঙ্-চটা পোকা খাওয়া মানিব্যাগ চোখে পড়ল। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে উলটে পালটে দেখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর কঙ্কালটার হাত আর পা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে চোখে পড়ল বাঁ হাতের আঙুলগুলোর ওপর। মধ্যমায় ঝুল ঝুল করে লেগে আছে একটা সোনার আংটি। দিনের আলোয় সেটার মিনে করা 'জে' অক্ষরটা তখনও জ্বল জ্বল করছে। আরও কী, ঠিক তার পাশের তর্জনীটি নেই। একেবারে গোড়া থেকে কাটা। আংটিটা খুলে নিয়ে পকেটে পুরে নিলেন লাহিড়িমশাই।

বিজয় বোস ফিরে এসে দেখলেন, লাহিড়িমশাই নেমে দাঁড়িয়েছেন গর্তের ভেতর। রিডিং গ্লাসটা তাঁর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, —এটায় হবে?

—খুব খুব।

বলতে কি, তখন আর লাহিড়িমশাইয়ের কিছুই করার ছিল না। যা দেখবার তা আগেই দেখা হয়ে গেছিল। তবু বিজয়বাবুর সামনে কিছু দেখার ভান করে পরে এক সময় উঠে এলেন ওপরে। বললেন, —চলো, এবার অফিসে গিয়ে বসা যাক।

নিজের চেম্বারে ফিরে বিজয়বাবু বললেন,—বলুন এখন আমার কী করণীয়?

—কিছু নয়। কাজ বন্ধ রেখে কাল বিকেল পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ বসে থাকো। পাঁচ কান না হওয়ার জন্যে যে ব্যবস্থা নিয়েছ, সেটা ভালোই। তবে ও-বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। কাল বিকেলে আমি আবার আসছি। আশা করি, তখন তোমায় কিছু একটা বলতে পারব।

বিজয়বাবুর গাড়ি লাহিড়িমশাইকে গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে সেই যে তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন, সেখান থেকে আর নড়েনই না। সামনের টেবিলের ওপর রাখা আছে সেই মানিব্যাগ আর তার ভেতর থেকে পাওয়া পনেরো বছর আগেকার একটা জরাজীর্ণ টেলিগ্রাম। আর তার পাশে পড়ে আছে কঙ্কালের আঙুল থেকে খুলে নেয়া আংটিটা। পনেরো বছর আগেকার কিছু কিছু মুখ আর ঘটনাকে মনে করার চেষ্টা করছেন তিনি। সব কিছুকে চলমান ছবি করে তুলতে চাইছেন মনের পর্দায়। সন্ধে পেরিয়ে রাত বাড়ল। মেয়ে এসে খাবার ঢাকা দিয়ে গেল পাশের টেবিলে।

দেয়াল ঘড়িতে এক সময় রাত বারোটার ঘন্টা বাজল। তখনও নির্বাক ছবির মিছিল চলেছে লাহিড়িমশাইয়ের মনে। পনেরো বছর আগে বোস অ্যান্ড সন্‌স-এ যে মানুষগুলি ঘুরে বেড়াত তাঁর চারপাশে, সকলে একে একে দেখা দিয়ে গেল।

অনেক পরে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাহিড়িমশাই উঠে দাঁড়ালেন। রাতের খাবার সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বিছানা নিলেন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলি কীভাবে শেষ করবেন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ যে মানুষ আবার বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে তিনি আগের দিনের লাহিড়িমশাই আর নন। চেহারার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পরনে শরীরের থেকেও ঢিলেঢালা পোশাক। মাথার সাদাকালো চুলগুলো একেবারে অবিন্যস্ত। দেহটাও গতকালের মতো সোজা নয়। একটা ছড়ির ওপর ভর করে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে। পাগুলো পড়ছে যথেষ্ট এলোমেলোভাবে। কেননা, এমনি কাশির ধমক যে, ভালোভাবে পা ফেলেন তার ক্ষমতা কোথায়?

কোনরকমে গলির মুখ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্‌সি ধরলেন। নামলেন গিয়ে কদমতলা বাজারের কাছে। বাস স্ট্যান্ডটা বাঁয়ে রেখে ডান হাতে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লেন। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা গ্রিল দেয়া দোতলা বাড়ির সামনে। ভেতরে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালেন তিনি। পাশেই ছিল একটা মুদিখানা দোকান। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, —আচ্ছা এটাই তো প্রতাপ মিত্তিরের বাড়ি?

দোকানদার কী-একটা ওজন করছিল। মুখ না তুলে জবাব দিল, —হ্যাঁ।

—দু-তিন বছর আগে বম্বে থেকে ফিরে ইনিই কি দাশনগরে ইলেকট্রনিকস-এর কারখানা করেছেন?

—অত খবর কারও রাখি না মশাই। তবে লোকে ওইরকমই বলে।

ওটুকু খবরই যথেষ্ট। সরে এলেন লাহিড়িমশাই। গ্রিলের গেট ঠেলে রোয়াক, তারপর একটু এগিয়ে দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি মানুষের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। মস্ত এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে কী-একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। ছায়া পড়তেই মুখ তুললেন,—কে?

উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে মুখে জোগাল না লাহিড়িমশাইয়ের। কাশির ধমক তখন এমনি প্রবল যে দম বন্ধ হয়ে আসার দাখিল। তবে পা দুটো তাঁর থেমে রইল না। একেবারে গিয়ে দাঁড়ালেন টেবিলের সামনে। কোন রকমে টেবিলের ওপর দুহাতের ভর দিয়ে নিজেকে সামলে বললেন, —আমাকে দেখে নিশ্চয়ই আর চিনতে পারছেন না? শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। আমি দীননাথ গোস্বামী। সাঁত্রাগাছির বোস অ্যান্ড সন্‌স-এ একসময় কাজ করতাম।

বোস অ্যান্ড সন্‌স-এ! —ভাবনা দেখা দিল প্রতাপ মিত্তিরের মুখে। চিনে ওঠার চেষ্টায় ছোট হল চোখদুটি। তারপর হঠাৎ হাতের ফাইলটা পাশে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, —হ্যাঁ, হ্যাঁ, দীননাথ গোস্বামী। এবার মনে পড়েছে বটে। বসো বসো। তা একী চেহারা হয়েছে তোমার?

উত্তর দেবেন কি, কাশির ধমকে চেয়ারে বসাও বুঝি সম্ভব নয় লাহিড়িমশাইয়ের পক্ষে। প্রতাপবাবু বলে চললেন, —তারপর কী খবর বলো? ওঃ ক-ত্তো দিন পরে দেখা। শুনতে পাচ্ছি সেদিনকার বোস অ্যান্ড সন্‌স আজ অনেক বড় হয়েছে।

ততক্ষণে চেয়ার নিয়েছেন লাহিড়িমশাই। কাশির বেগ সামলাতে সামলাতে কোনরকমে বললেন, —তা ঠিক।

—সকলে কে কেমন আছেন?

—আপনি যাঁদের চিনতেন তাঁরা আজ আর নেই। লাহিড়িমশাই ছেড়ে গেছেন। সিনিয়র বোসও বলতে গেলে অকালে দেহ্ রাখলেন। এখন তাঁর ছেলে বিজয়বাবুর রাজত্ব চলছে। সে দিন-কাল আর নেই।

—এমনিই হয়। রাজার বদল হলে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। কী খাবে, চা না কফি?

—তা যা বলেছেন।—অন্যমনস্ক স্বগতোক্তি লাহিড়িমশাইয়ের। তার পরেই যেন হুঁশ হল, হ্যাঁ কী যেন বললেন? চা না কফি? আমার দুটোই চলে, এখন আপনি যেটা পছন্দ করেন।

প্রতাপ মিত্তির উঠে গেলেন ভেতর ঘরে। কিছু পরে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,—পুরনো কথা, সময় অসময়ে প্রায়ই মনে পড়ে। আমি তোমাদের ভুলিনি।

—ভোলা কি এত সহজ নাকি?—এবার নিজেই পুরনো কথায় চলে গেলেন লাহিড়ি মশাই। একসময় আপনি তো ওখানকার সিনিয়র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আর আপনার জুনিয়র ছিল সেই আঙুলকাটা জগন্নাথবাবু। পেছনে লোকে যাকে বলতো ঠুঁটো জগন্নাথ।

—ঠিক বলেছ। তোমার মনে আছে দেখছি।

—থাকবে না? মানুষটা কি কম জ্বালাতন করত সকলকে? যেমন বদমেজাজ, তেমনি দুর্মুখ। একবার তো দেখেছি, লাহিড়িমশাইয়ের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করার উপক্রম।

চুপ প্রতাপ মিত্তির। লাহিড়িমশাইয়ের মুখে তখন কথার ফোয়ারা,—শুনেছিলাম, দেশ থেকে ওনার মায়ের নাকি একটি টেলিগ্রাম এসেছিল। সেই দিনই ছুটি নিয়ে দেশে যেতে চান। সিনিয়র বোস ছুটি স্যাংশন করেননি; অথচ লাহিড়িমশাইয়ের ওপর কী হম্বিতম্বি! সে মাসের মাইনে আর কিছু অ্যাডভান্স তাঁর সেদিনই চাই।

—হ্যাঁ, উনিশশো সত্তর সালে। বললেন প্রতাপ মিত্তির; বাংলাদেশে তখন মুজিবর রহমান আন্দোলন করছেন।

—সেই জন্যেই বোধহয় মা-বাবার চিন্তায় মাথাটা খারাপ ছিল। যাই হোক, আপনার সঙ্গে নিশ্চয় কখনও কোন খিটিমিটি বাধেনি?

চশমার আড়ালে এবার অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল লাহিড়িমশাইয়ের দৃষ্টি। প্রথমটায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও নিজেকে সামলে নিলেন প্রতাপ মিত্তির। বললেন,—বাধেনি আবার! মানুষটার স্বভাবটাই ছিল ওই রকম। কারোর সঙ্গে বনিবনা হত না। ওই যে তখন বললেন, দুর্মুখ। বাক্যি শুনলে মেজাজ সামলে রাখা ভার।

—ইশ্! তাহলে তো সিনিয়র হয়েও আপনাকে তার বচন শুনতে হয়েছে?

—সে কথা বলতে? বিনা ছুটিতেই সে চলে গেল বাংলাদেশে। যেদিন ভোরে গেল, তার আগের দিন সমস্ত রাত কী ঝগড়াটাই না করল আমার সঙ্গে। মনে পড়লে খুব দুঃখ হয়।

—সেদিন রাত্রে দুজনে একসঙ্গে নাইট শিফটে ছিলেন?

—হ্যাঁ। তখন ফ্যাক্‌ট্রিতে হাইটেনশন লাইন বসছে। ট্রান্স্‌ফরমার রুম ইমিডিয়েটলি শেষ করার দরকার। কাজের তখন দারুণ চাপ।

—আপনার সঙ্গে বেধেছিল কী নিয়ে?

—ওই দেশে যাওয়ার ব্যাপার নিয়েই। ছুটি পায়নি, লাহিড়িমশাই টাকা দেননি, অথচ দেশে সে যাবেই। আমার কাছে কিছু টাকা তার গচ্ছিত ছিল। আমার ওপর চাপ, সে রাত্রেই তাকে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে।

—অন্যায়, খুবই অন্যায়। অল্প না হলেও না হয় কথা ছিল।—গড়ানো জলে আরও জল ঢেলে দিলেন লাহিড়িমশাই, টাকার অঙ্কটা নিশ্চয়ই কিছু কম ছিল না।

—কম কী? ধরুন হাজার বারো টাকা।

—বলতে গেলে, তখনকার দিনে অনেক টাকা। গচ্ছিত রাখলেও মাঝ রাত্তিরে অত টাকা জোগাড় করে দেয়া সহজ নাকি? আসলে মাথা গরম লোকের অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানগম্যি বড্ড কম। তা এখন সে কোথায় আছে কিছু জানেন?

—না। সেই যে গেছে, তারপর আর বোধ হয় ফেরেনি।

—বোধ হয় বলছেন কেন?

—এই জন্যে যে, তারপর আমি আর জগন্নাথের কোন খবর পাইনি। তা ছাড়া, আমিও এখানে বহুকাল ছিলাম না। বারো বছরের ওপর বম্বেতে কাটিয়ে এসেছি।

একটা সরব আক্ষেপ বেরিয়ে এল লাহিড়িমশাইয়ের মুখ দিয়ে। অনেক পরে বললেন,—সেই ডামাডোলের সময় চলে গেল মানুষটা। কে জানে কেমন আছে?

—থাকবে কী? আমার মনে হয় সে আর বেঁচে নেই। বাংলাদেশের তখন যা অবস্থা। টিক্কা খাঁয়ের গুলিতে না শেষ হয়ে গিয়ে থাকে।

—বি-বি-বিচিত্র নয়। —প্রচণ্ড কাশির ধমকে চোখদুটো বেরিয়ে আসার দাখিল হল লাহিড়িমশাইয়ের।

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রতাপ মিত্তির,—একটু জল আনতে বলব নাকি?

কথা বলার ক্ষমতা নেই। মাথা নাড়লেন লাহিড়িমশাই। পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতে উঠে এল একটা মানিব্যাগ, টেলিগ্রামের বিবর্ণ কাগজটা আর একটা আংটি। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে রুমালটা নিয়ে চেপে ধরলেন নিজের মুখে।

সহজভাবেই প্রতাপ মিত্তিরের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলোর ওপর। এবং তারপরেই হঠাৎ বিরাট পরিবর্তন এল তাঁর চোখেমুখে। তাঁর দৃষ্টি তখন আটকে গেছে আংটির মীনে করা 'জে' অক্ষরের ওপর। মুখের প্রতিটি রেখা কুঁচকে যাচ্ছে। পরিষ্কার আতঙ্কের ছাপ।

বড় বড় চোখ, কুঁচকানো ভ্রূ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—প্রতাপ মিত্তিরের গলা চিরে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, —এ—ক্-কী!

ঠিক সেই সময়ই ভেতর থেকে চা বা কফি নিয়ে কাজের লোকটি এসে হাজির হল। লাহিড়িমশাই জিনিসগুলি পকেটে রাখতে রাখতে চটপট উঠে দাঁড়ালেন।

—ওনাকে দেখো। উনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।—লোকটিকে মালিকের দিকে নজর দিতে বলেই রোয়াক পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন লাহিড়িমশাই।

এখন আর লাঠির ওপর ঝুঁকে নেই শরীরটা। সেটাকে ছড়ির মতো নাচাতে নাচাতে দ্রুত পথ হাঁটছেন তিনি। এরই ফাঁকে জামার পকেটে লুকনো ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারটা একবার স্পর্শ করে বন্ধ করে দিলেন। ওটাই স্ট্রং এভিডেন্স। এখুনি একবার থানায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় অভিযান

প্রফুল্ল রায়

আজ রবিবার। আটটা বাজতে না বাজতেই সকালের খাবার খেয়ে তার নতুন স্কুটারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাজা। তার একটা জমকালো ভালো নামও আছে—রাজর্ষি দত্তচৌধুরী, তবে ওটা শুধু স্কুল আর বাইরের লোকেদের জন্য।

রাজা একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। এ বছর সেভন থেকে এইটে ফার্স্ট হয়ে ওঠার পর বাবা তাকে দারুণ একটা স্কুটার কিনে দিয়েছেন।

ওরা থাকে গলফ গ্রিনে। বাবার একটাই শর্ত, গলফ গ্রিনের ভেতর যত পারে স্কুটার চালাক রাজা, কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। অন্য দিন বড় রাস্তায় প্রচুর গাড়ি-টাড়ি থাকে, যে কোনওসময় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। বাবা সাবধান করে দিয়েছেন, তাঁর কথা না শুনলে স্কুটারে চড়া বন্ধ করে দেবেন।

রাজা কখনও মা-বাবার অবাধ্য হয় না, তাঁরা যা বলেন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

রাজা সম্পর্কে আরও দু-একটি কথা জানানো দরকার। তার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় অফিসার, মা একটা কলেজে পড়ান। তারা এক ভাই, এক বোন। সে ছোট, দিদি এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে ইংলিশ অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে।

রাজা গোয়েন্দা-গল্পের পোকা। বিশেষ করে শার্লক হোমসের কীর্তিকাহিনী পড়ার পর থেকে সে ঠিকই করে ফেলেছে, তাকে ডিটেকটিভ হতেই হবে। এ ব্যাপারে তাকে সবসময় উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন বাবার এক বন্ধু—প্রবীর সেন। প্রবীরকাকু লালবাজারের একজন ঝানু অফিসার।

গলফ গ্রিন থেকে বেরিয়ে টিভি সেন্টারের পাশ দিয়ে আনোয়ার শা রোডে এসে পড়ে রাজা। রবিবারের প্রায়-ফাঁকা রাস্তায় জোরে স্কুটার চালাতে দারুণ লাগছে। সে যাবে মতিলাল নেহরু রোডে তার বন্ধু সৌরভের বাড়ি। প্রত্যেক ছুটির দিনে ওখানে যাওয়া চাই তার।

লেক গার্ডেনস-এর ভেতর দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে ল্যান্সডাউন রোড ধরলে মতিলাল নেহরু রোডে কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু ছুটির দিনে প্রচুর মালগাড়ি যাতায়াত করে বলে লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকে, ফলে রেল লাইন পেরুতে অনেক সময় লেগে যায়। তাই আনোয়ার শা রোড দিয়ে ঘুরে, ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে, বাঁয়ে লেকের পাড় ধরে খানিক এগিয়ে, বিড়লা অ্যাকাডেমির পাশ দিয়ে সোজা মতিলাল নেহরু রোডের

দিকে চলে যায় রাজা। আজও সেই রুটটাই ধরেছে সে।

কিন্তু লেকের ধারে সাদার্ন অ্যাভেনিউর ওপর দিয়ে সবে বিবেকানন্দ পার্কের কাছাকাছি রাজা এসেছে, হঠাৎ স্কুটারটা থেমে গেল। তেল নেই। মনে পড়ে ক'দিন আগে তিন লিটার পেট্রোল ভরে নিয়েছিল, কিন্তু সেটা যে ফুরিয়ে এসেছে, আজ বেরুবার আগে খেয়াল করেনি।

আশেপাশে কোনও পেট্রোল পাম্প নেই। স্কুটার ঠেলে ঠেলে হয় রাজাকে যেতে হবে গোল পার্কের কাছে, নইলে ল্যান্সডাউনের মোড়ে। দু'জায়গাতেই তেল পাওয়া যাবে। কিন্তু এতটা রাস্তা স্কুটার ঠেলা বেশ কষ্টকর। তা ছাড়া সময়ও নষ্ট হবে অনেকটা। ওদিকে সৌরভদের বাড়িতে বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

কী করবে রাজা যখন ভাবছে, হঠাৎ চোখে পড়ে একটা ঝকঝকে নীল অ্যামব্যাসাডর খানিকদূরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে লোক গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে।

একটা লোকের মুখভর্তি দাড়ি, একজনের পাকানো গোঁফ, আরেকজনের মুখ পরিষ্কার কামানো। তাদের চেহারা এবং পোশাক বেশ ভদ্রলোকের মতো।

রাজা জানে, অনেক গাড়িতে প্ল্যাস্টিক কি টিনের ক্যান-এ এক্সট্রা কিছু পেট্রোল রাখা হয়। হয় তো এমন জায়গায় তেল ফুরিয়ে গেল যেখানে কাছাকাছি রিফিলিং স্টেশন নেই—তখন পেট্রোলটা কাজে লেগে যায়। সে ভাবল যদি ওই লোকগুলোর কাছে বাড়তি তেল থাকে, তা হলে লিটার খানেক চেয়ে নেবে। তার জন্য দাম অবশ্য দিয়ে দেবে। তেল না পাওয়া গেলে স্কুটার ঠেলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে পায়ে লোক তিনটের কাছে চলে আসে রাজা। তাকে দেখে ওরা চুপ করে যায়। ভুরু সামান্য কুঁচকে দাড়িওলা লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে ভাই?'

রাজা তার সমস্যার কথা জানিয়ে বলে, 'যদি কাইণ্ডলি আমাকে একটু সাহায্য করেন—'

লোকটা অমায়িক গলায় বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের গাড়িতে একটা এক্সট্রা তেল আছে, এক্ষুনি দিচ্ছি—' বলে গাড়ির দরজা খুলে একটা বড় ক্যান বার করে আনে।

লোকটাকে বেশ ভালো লেগে যায় রাজার। আজকাল কেউ কাউকে সাহায্য করতে চায় না। সেদিক থেকে এই লোকটি চমৎকার।

আজ সকাল থেকে উলটো-পালটা হাওয়া দিচ্ছে। এখন সেটা আরও জোরাল হয়ে ওঠে।

লোকটা নিজে রাজার সঙ্গে এসে তার স্কুটারের তেলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে পেট্রোল ঢালতে থাকে। তেজী হাওয়ায় তার চুল-দাড়ি উড়ছে।

কৃতজ্ঞ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়েছিল রাজা। আচমকা তার কানে ঠিন ঠিন করে একটা ধাতব আওয়াজ ভেসে আসে। মুখ ফেরাতেই চমকে ওঠে সে। নীল অ্যামব্যাসাডরটার পেছন দিকে পাতলা টিনের নাম্বার প্লেটটা প্রবল বাতাসে বার বার লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ছে। টিনের নাম্বার প্লেটটার নীচে আরেকটা নাম্বার প্লেট রয়েছে। টিনের প্লেটটার নম্বর হল ডব্লু বি এম ১০৪৮০, নীচের প্লেটটা যেটা গাড়ির সঙ্গে সাঁটা তার ওপর লেখা ডব্লু বি কে ১১২০৯।

রাজার মস্তিষ্কের ভেতর শার্লক হোমস কাজ শুরু করে। একটু আগের ধারণাটা নাকচ করে দেয় সে—নাঃ, লোকগুলো ভালো নয়। নীচের নাম্বার প্লেটটা যে আসল এবং

টিনের পাতের নাম্বার প্লেটটা যে অন্যের চোখে ধুলো দেবার জন্য, এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে রাজা। নিশ্চয়ই এই লোকগুলো মারাত্মক কিছু ঘটাবার মতলব করেছে বা করছে।

চট করে আসল নকল দুটো নম্বরই মনে মনে টুকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় রাজা। সে যে লোকগুলোকে সন্দেহ করেছে সেটা কোনভাবেই জানতে দেওয়া ঠিক নয়। ওরা তিনজন, আর সে একা। কাছাকাছি লোকজনও বিশেষ নেই। তার মনের কথাটা টের পেলে ওরা নির্ঘাত বিপদে ফেলে দেবে। রাজা ভালোমানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদিকে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়ে দাড়িওলা লোকটা বলে, 'এক লিটার চেয়েছিলে দু-লিটারের মতো দিলাম। একটু বেশি থাকা ভালো।'

রাজার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। পকেট থেকে বার করে সে বলে, 'খুব উপকার হল। দয়া করে দামটা নিন।'

লোকটা একেবারে ভদ্রতার অবতার। বলে, 'সামান্য একটু পেট্রোল দিয়েছি, তার জন্য দাম নেবো! লোকে বিপদে পড়লে তার পাশে গিয়ে যদি না দাঁড়াই, তা হলে কি চলে ভাই। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও—'

রাজা বলে, 'তা হয় না। দামটা না নিলে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।' কথা সে বলছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধু দাড়িওলাকেই নয়, বাকি দু'জনকেও লক্ষ করছিল এবং তাদের চেহারার ফোটো অদৃশ্য ক্যামেরায় মাথার ভেতর তুলে রাখছিল।

বাবার বন্ধু প্রবীরকাকু বলেন, 'ভালো গোয়েন্দা হতে হলে সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, আর কাজে লাগাতে হয় মগজটাকে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে তার ফোটো তুলে রাখা বা তেমন কিছু শুনলে টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখাটাও ভীষণ জরুরি। খুনি ডাকাতদের ধরার জন্য কখন কোন্‌টা কাজে লাগবে, তার তো কিছু ঠিক নেই।

অন্য সময় হয় ক্যামেরা নইলে টেপ রেকর্ডার তার সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আজ কোনটাই নেই। যে কোনও একটা থাকলে দূর থেকে ওদের বুঝতে না দিয়ে কাজে লাগানো যেত। কেন যে ও দুটো আনেনি, ভাবতেই তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

লোকটা হেসে হেসে বলে, 'ঠিক আছে দাও।' পেট্রোলের দাম নিয়ে সে পকেটে পুরে ফেলে।

রাজা আর দাঁড়ায় না। মাথার ভেতর শার্লক হোমস তাকে অস্থির করে তুলছিল। কিছু একটা করতেই হবে। স্কুটারে উঠে স্টার্ট দিয়ে বিবেকানন্দ পার্কের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার সে ভাবে সৌরভদের বাড়িতেই যায়। খেলে টেলে গলফ গ্রিনে ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কিছু করা যাবে। তক্ষুনি প্রবীরকাকুর কথা মনে পড়ে যায়। কোনও ব্যাপারে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে ইনভেস্টিগেশন বা তদন্ত শুরু করা ভীষণ জরুরি। দেরি করলে অনেক ক্লু নষ্ট হয়ে যায়। তখন অপরাধীদের ধরতে অসুবিধা হয়, অনেকসময় তাদের ধরাও যায় না।

সৌরভদের বাড়ি গেলে না খেলে পারা যাবে না। ওরা জোর করে ব্যাডমিন্টনের কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে, কি চেসবোর্ডের সামনে বসিয়ে দেবে। তাহলে ভালো করে নীল অ্যামব্যাসাডরের কেসটা ভাবার সময় পাওয়া যাবে না। রাজা গাড়িটা ঘুরিয়ে ফের গলফ গ্রিনে ফিরে আসে।

তার মতোই ছুটির দিনে বাবা বাড়ি থাকেন না। গলফ গ্রিনে আসার আগে রাজারা অনেক বছর ভবানীপুরে ছিল। সেখানে বাবা আর তাঁর বন্ধুরা মিলে তাস খেলার ক্লাব

করেছেন। রবিবার সকাল হলেই বাবা তাস খেলতে পুরনো পাড়ায় চলে যান।

মা একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কি রে, আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?'

ঘরশত্রু দিদিটা সবসময় তার পেছনে লেগেই আছে। সে বলে, 'নিশ্চয়ই ঝগড়া-টগড়া করেছিল, তাই বন্ধুরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

রাজা এমনিতে খুব শান্ত, কিন্তু দিদির ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। তার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই যুদ্ধ বেধে যায়। অন্য সময় হলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত, কিন্তু নীল অ্যামব্যাসাডর এখন তার মাথার ভেতর চেপে বসে আছে। সে শুধু বলে, 'খেলতে ইচ্ছে করল না, তাই চলে এলাম।'

মা কতটা বিশ্বাস করলেন তিনিই জানেন, তবে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

দিদিটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ডাহা মিথ্যে। নিশ্চয়ই ওকে খেলায় নেয়নি।'

এবারও ততটা ক্ষেপে ওঠে না রাজা। ভেংচি কেটে বলে, 'চুপ কর মুটকি।'

দিদিটা সত্যিসত্যিই বেশ মোটা। সে হাত-পা ছুঁড়ে নাকি সুরে ঘ্যানঘ্যানানি জুড়ে দেয়, 'মা দেখ দেখ, বাঁদরটা আমাকে মুটকি বলল! ওর চোখ আমি গেলে দেবো।'

মা বললেন, 'যা ইচ্ছে কর্। আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই। এতটা বেলা হল, এখনও রান্না চড়ানো হয়নি।' বলতে বলতে তিনি কিঁচেনের দিকে চলে যান।

রাজাও আর দাঁড়ায় না, আরেকবার লম্বা ভেংচি কেটে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

দিদির ঘ্যানঘ্যানানিটা আরেকটু বেড়ে যায়। অন্য সময় হলে রাজার পেছন পেছন এসে তাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ত। আজ কিন্তু এল না। এটুকুই বাঁচোয়া।

রাজার ঘরের ডান পাশে ড্রইংরুম। সেখানে টেলিফোনটা আছে।

কিছুক্ষণ নিজের ঘরে খাটের ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকে রাজা। এখন কী করা উচিত? ভাবতে ভাবতে সে ঠিক করে ফেলে, প্রবীরকাকুকে আগে ব্যাপারটা জানানো দরকার। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরের স্টেপ ঠিক করাতে হবে।

আশেপাশে কেউ নেই, বিশেষ করে দিদিটা। সে থাকলে ফোনে প্রবীরকাকুর সঙ্গে তার সব কথাবার্তা কান খাড়া করে শুনত, তারপর টুক করে মায়ের কানে লাগিয়ে আসত। রাজা শার্লক হোমস হোক, খুনে ডাকাতদের নিয়ে মাতামাতি করুক, মা তো একেবারেই চান না। প্রবীরকাকুকেও এ ব্যাপারে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়। প্রবীরকাকু কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে ড্রইংরুমে চলে যায় রাজা, এধারের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকে। এখন আর ওপাশ থেকে কেউ তাকে দেখতে পারে না।

রবিবারেও প্রবীরকাকুর লালবাজারে ডিউটি থাকে। একবারেই তাঁকে পাওয়া গেল।

প্রবীরকাকু মজার গলায় বলেন, 'হ্যালো মাস্টার শার্লক হোমস, কী ব্যাপার? হঠাৎ ছুটির দিনে ফোন? বন্ধুর বাড়ি যাওনি?' রাজার সব নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন তিনি।

রাজা বলে, 'ভেরি সিরিয়াস কেস কাকু।' তার গলায় চাপা উত্তেজনা।

'কী হয়েছে?'

নীল অ্যামব্যাসাডরের ঘটনাটা জানিয়ে দেয় রাজা।

প্রবীরকাকু একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'হুঁ, ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।'

রাজা বলে, 'একটা কিছু করা দরকার।'

'হ্যাঁ।'

'আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'ওরা গাড়িটা চুরি করে ফলস্ নাম্বার প্লেট লাগিয়ে খুন, ডাকাতি—এরকম কিছু একটা করার মতলব এঁটেছে।'

চিন্তিতভাবে প্রবীরকাকু বলেন, 'ঠিক বলেছ।' একটু থেমে বলেন, 'ঘণ্টাখানেক পরে তোমাকে ফোন করব। এর ভেতর খবর নিচ্ছি ডব্লু বি কে ১১২০৯ নম্বরের গাড়িটা সত্যিই চুরি গেছে কিনা।'

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে খোঁজ করবেন?'

আসলে গোয়েন্দা হবার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও ইনভেস্টিগেশনের অনেক কিছুই তার জানা নেই। গাড়ি চুরি হলে কেমন করে খবর পাওয়া যাবে, সেটাই সে জেনে নিতে চায়। ভবিষ্যতে অন্য কোনও কেসে তা কাজে লাগাতে পারে।

প্রবীরকাকু বলেন, 'এখনই থানায় থানায় মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতার গাড়ি হলে এক ঘণ্টার ভেতর খবর পেয়ে যাব। বাইরের গাড়ি হলে দেরি হবে। তুমি বাড়িতে থাকছ তো?'

'হ্যাঁ। গাড়ির খবর পান বা না পান, ফোন করবেন কিন্তু। আমি খুব টেনশানে থাকব।'

'নিশ্চয়ই করব।'

ফোন নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করে রাজা, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা সায়েন্স ফিকশান পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু একটা সেন্‌টেন্সও তার মাথায় ঢোকে না। বইটা রেখে মাইকেল জ্যাকসনের গানের টেপ চালিয়ে দেয়। কিন্তু প্রিয় গায়কের পপ সংও ভালো লাগে না। টেপটা বন্ধ করে আবার পায়চারি শুরু করে। এইভাবে একটা ঘণ্টা কেটে যায়।

তারপরই প্রবীরকাকুর ফোন আসে, 'তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে, ওই নীল অ্যামব্যাসাডরটা চুরি হয়েছে। গাড়ির মালিক থাকেন নর্থ ক্যালকাটায়, তিনি কাল রাত্তিরে জোড়াসাঁকো থানায় ডায়েরি করেছেন।'

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে এখন কী করতে হবে?'

প্রবীরকাকু নিশ্চয়ই জানেন কী করা দরকার। তবু বলেন, 'তুমিই বল না—'

অর্থাৎ কিনা প্রবীরকাকু রাজাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলে, 'আপনাদের কাছে গাড়ি-চোরদের লিস্ট আর ছবি থাকে না?'

'থাকে। পুরনোদের নাম, ফোটো-টোটো পাওয়া যাবে। কিন্তু নতুন গাড়িচোর হলে তাকে ধরা মুশকিল।'

'পুরনোদেরগুলোই আগে দেখা যেতে পারে।'

'অবশ্যই পারে। তুমি যে তিনটে লোককে গাড়িচোর বলে মনে করছ তাদের নাম জানো?'

'না।'

'ওদের চেহারার ডেসক্রিপশন দিতে পার?'

'পারি।'

প্রবীরকাকু বলেন, 'এক এক করে বলে যাও। আমি টুকে নিচ্ছি। ভেবেচিন্তে বলবে—চুলের ছাঁট, মুখচোখের স্পেশালিটি, হাতে পায়ে মুখে বা কপালে বিশেষ কোন দাগ বা চিহ্ন আছে কিনা, দাঁত কেমন—কিচ্ছু বাদ দেবে না।

রাজা ভেবে ভেবে বলতে লাগল, 'ধরুন তিনটে লোকের নাম এ, বি, সি। এ-র চেহারা মাঝারি, কালো, হাইট পাঁচ ফিট ছয় কি সাত ইঞ্চি হবে, মুখ চৌকো, গালভর্তি চাপ দাড়ি, জোড়া ভুরু, গলায়—হ্যাঁ গলার ডানপাশে একটা কালচে জড়ুল আছে। কপালে একটা কাটা দাগ। দাঁতটা ঠিক লক্ষ করিনি। এবার বি আর সি-র কথা বলছি। বি-র মুখটা লম্বা, রঙ ফর্সা, নাকের নীচে সরু গোঁফ আছে, চোখের মণি কটা। সি-র মুখটা গোল। মুখে গলায় হাতে বা কপালে বিশেষ দাগ আছে কিনা মনে পড়ছে না। তার গায়ের রঙ্ বাদামি, দাঁতগুলো ট্যারাবাঁকা আর কালো—মনে হয় খুব পান খায়। ও হ্যাঁ, লোকটার চুল কালো নয়, বাদামি।'

প্রবীরকাকু বলেন, 'টুকে নিলাম। তবে তুমি যা ডেসক্রিপশন দিলে তেমন সব চেহারা কলকাতায় হাজার হাজার রয়েছে। অবশ্য ওই দাড়িওলা কালো লোকটার গলার লালচে জড়ুল আর কপালের কাটা দাগটা খুব ইমপর্টান্ট।' একটু থেমে ফের বলেন, 'ঠিক আছে, তোমার ডেসক্রিপশনগুলোর সঙ্গে গাড়িচোরদের ফোটো মিলিয়ে দেখছি। ঘণ্টা দুই বাদে আবার ফোন করব।'

এখন দশটা বাজতে বারো মিনিট। বারোটা পাঁচে প্রবীরকাকু ফের ফোন করলেন, 'তুমি যা ডেসক্রিপশন দিয়েছ তার সঙ্গে একটা ফোটোও ঠিক মিলছে না। মনে হচ্ছে এরা সব নতুন গাড়িচোর।' একটু থেমে বলেন, 'অবশ্য তোমার মুখে শুনে আমি ফোটোগুলো মেলাতে চেষ্টা করেছি, তাতে ভুলও হতে পারে। ওই লোক তিনটেকে কিছুক্ষণ আগে তুমি দেখেছ, গাড়িচোরদের ফোটোর যে অ্যালবাম আমাদের কাছে আছে সেটা দেখলে হয় তো বুঝতে পারবে তার ভেতরে ওরা আছে কিনা। অ্যালবামটা দেখবে?'

এই ব্যাপারটা অনেক আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল। রাজা একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই। কখন দেখাবেন?'

'ধরো বিকেলে। তুমি আবার খেলতে বেরুবে না তো?'

'আমি পাঁচটায় আসছি।'

ছুটির দিনে দুপুরবেলায় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেয় রাজা। আজ আর ঘুমটুম এল না, অন্যমনস্কর মতো একটা বইয়ের পাতা উলটে কাটিয়ে দিল সে, যদিও তার একটি বর্ণও তার মাথায় ঢুকল না।

এর ভেতর বাবা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, দুপুরে ফিরবেন না।

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় প্রবীরকাকু এসে হাজির। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড একটা ছবির অ্যালবাম।

প্রবীরকাকুকে দেখে মা হেসে হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ রাস্তা ভুল করে নাকি?'

প্রবীরকাকু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলেন, 'নানা কাজে এত ব্যস্ত আছি যে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'কাজ মানে তো দিনরাত খুনে ডাকাতদের পেছনে ছুটে বেড়ানো।'

'কী আর করি! পুলিশে যখন ঢুকেছি, ওটা করতেই হবে। তা ক'দিন ধরে ভাবছিলাম, আপনাদের এখানে আসব। একটা না একটা ঝঞ্ঝাটে আটকে যাচ্ছিলাম। আজ জোর করেই চলে এলাম।'

'বেশ করেছেন। আসুন—' প্রবীরকাকুকে ড্রইংরুমে বসিয়ে মা বলেন, 'এমন দিনে এলেন যে আপনার বন্ধুও নেই, বনিও নেই। একজন ভবানীপুরে তাসের আড্ডায়, আরেকজন সিনেমায়।'

'তাতে কী, রাজা আর আপনি তো আছেন'—কোল থেকে অ্যালবামটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রাখতে রাখতে প্রবীরকাকু বলেন, 'আপনাদের সঙ্গেই গল্প করা যাক। ওদের জন্যে আরেকদিন আসা যাবে।'

মা অ্যালবামটা আগেই লক্ষ করেছিলেন। এবার জিজ্ঞেস করেন, 'ওটার ভেতরে ফোটো আছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। মহাপুরুষদের ফোটো।' বলে হাসতে থাকেন প্রবীরকাকু।

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'মানে?'

'আমাদের কাছে চোর ডাকাত খুনিরাই মহাপুরুষ।'

রাজা বলে, 'অ্যালবামটা একবার দেখব কাকু?'

প্রবীরকাকু বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ না।'

মা চোখ কুঁচকে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, 'না না, ওসব দেখতে হবে না।'

'দেখলে আর দোষ কী।' প্রবীরকাকু বলেন, 'কী ধরনের লোক আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের চিনে রাখা ভালো।'

'আপনারা গল্প করুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

প্রবীরকাকু যে খেতে ভালোবাসেন, এ বাড়ির সবাই তা জানে। শুধু চা নয়, মা সেই সঙ্গে কিছু খাবারও তৈরি করে আনবেন। সেজন্য বেশ খানিকটা সময় লাগবে। ততক্ষণে অ্যালবামটা দেখা এবং প্রবীরকাকুর সঙ্গে পরামর্শও সেরে নেওয়া যাবে।

মা চলে গেলেন।

রাজা চট করে সেন্টার টেবল থেকে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পাতা ওলটাতে থাকে। প্রত্যেক পাতায় চারটে করে পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। প্রতিটি ছবিতে একজনেরই মুখ। দারুণ ভালো ক্যামেরায় তোলা হয়েছে এগুলো। প্রতিটি মুখের গালের খাঁজ, কপালের ভাঁজ, এমনকি ঘামের ছোট ছোট দানা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রবীরকাকু বলেন, 'খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ।'

চোদ্দ পনেরটা পাতা উলটে যাবার পর একটা ছবির ওপর রাজার চোখ আটকে যায়। মুখটা সেই দাড়িওয়ালার মতো, কপালের কাটা দাগ এবং জোড়া ভুরু প্রায় মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ফোটোর লোকটার দাড়ি নেই, গলায় লালচে জড়ুলও না।

বার বার ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে নানাদিক থেকে দেখতে থাকে রাজা।

পাশ থেকে প্রবীরকাকু বলেন, 'তুমি যা ডেসক্রিপশন দিয়েছ তার একটার সঙ্গেও কিন্তু এ ছবি মেলে না।'

রাজা উত্তর দেয় না। সে যে ছবিটা দেখছিল সেই পাতার ফাঁকে আঙুল রেখে বাকি পাতার ছবিগুলো একে একে দেখে যায়। কিন্তু সকালে দাড়িওলা ছাড়া নীল অ্যামব্যাসাডরটার গা ঘেঁষে আর যে দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে তাদের কারোও মুখের মিল অন্য

ছবিগুলোতে নেই। রাজা ফের পাতা উলটে সেই ছবিটা একদৃষ্টে দেখতে থাকে। নীচে লেখা আছে নিতাই হালদার। বাইশ বার গাড়ি চুরির কেস হয়েছে তার বিরুদ্ধে। দু'বার মাস তিনেকের বেশি তাকে জেল খাটানো যায়নি, বাকি কুড়িবার সে বেকসুর খালাস পেয়েছে।

হঠাৎ রাজার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা আইডিয়া খেলে যায়। সে বলে, 'এই ছবিটার আর কোনও কপি কি আপনাদের আছে?'

'আছে। শুধু নিতাইয়ের না; ক্রিমিনালদের সবারই আটটা দশটা করে ফোটোর কপি করানো হয়। তা ছাড়া নেগেটিভও থাকে। কেন, ছবিটা দিয়ে কী করবে?'

উত্তর না দিয়ে রাজা বলে, 'এটা নষ্ট হয়ে গেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না তো?'

'না।'

'তা হলে বার করে নিচ্ছি।' ছবিটা খুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে রাজা বলে, 'পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন প্রবীরকাকু। তারপর উত্তেজিতভাবে বলেন, 'ছবিটা দিয়ে কী করবে, বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।'

একটু হেসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পড়ার টেবলে গিয়ে বসে রাজা। শুধু পড়াশোনা বা খেলাধুলোতেই না, ছবি আঁকার হাতও তার চমৎকার।

টেবলে রঙ তুলি টুলি সবই রয়েছে। সরু ব্রাশ টেনে নিতাই হালদারের ছবির মুখে আস্তে আস্তে দাড়ি এঁকে ফেলে রাজা। তারপর ব্রাশটা ধুয়ে হালকা লাল রঙ দিয়ে জড়ুল বসিয়ে দেয়। এবার সকালবেলার দেখা সেই দাড়িওলার মুখটা হুবহু দেখা যাচ্ছে। তবু কোথাও এতটুকু খুঁত থেকে গেল কিনা, খুব ভালো করে দেখে নেয় রাজা। নাঃ, সব ঠিক আছে। এই দাড়িওলাই নিতাই হালদার।

ছবিটা নিয়ে প্রবীরকাকুর কাছে এসে বলে, 'এবার দেখুন—'

প্রবীরকাকু ছবিটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলেন, 'একেই তুমি আজ তা হলে লেকের ধারে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'দাড়ি গজিয়ে আর ফলস জড়ুল লাগিয়ে মুখের চেহারা পালটে দিয়েছিল নিতাই। কিন্তু তোমার অবজারভেশন সুপার্ব। জোড়া ভুরু আর কপালে কাটা দাগ লোকটাকে ঠিক ধরে ফেলেছ। আসল কাজটা তুমি করে দিয়েছ, বাকিটা এবার আমাদের করতে হবে।'

'বাকি কাজটা কী?'

'অ্যারেস্ট করা।'

'নিতাই হালদার গাড়ি চুরি করে কেন?'

'রঙ টঙ পালটে, গাড়ির কিছু অদলবদল করে অন্য রাজ্যে বিক্রি করে দেয়। নইলে মোটা টাকা নিয়ে মার্ডারার বা ব্যাঙ্ক রবারদের হাতে তুলে দেয়।'

এইসময় ওধারের প্যাসেজ দিয়ে মা আর ওদের কাজের মেয়ে সীতাকে আসতে দেখা যায়। সীতার হাতে একটা বিরাট ট্রে-তে প্রচুর লুচি, মিষ্টি, তরকারি ছাড়া রয়েছে চায়ের সরঞ্জাম।

লুচি তরকারি মিষ্টি আর পর পর তিন কাপ চা খেয়ে এবং ফাঁকে ফাঁকে গল্প করে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে একসময় উঠে পড়লেন প্রবীরকাকু। বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি ফর একসেলেন্ট লুচি, তরকারি অ্যাণ্ড সন্দেশ। আপনার কর্তাকে বলে দেবেন খুব তাড়াতাড়িই

আবার হানা দিচ্ছি।'

রাজা প্রবীরকাকুকে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে নীচে নামে। মা দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজার নীচে নামার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তখন মা এসে পড়ায় নিতাই হালদার সম্বন্ধে আলোচনাটা শেষ করা হয়নি। তার আরও কিছু বলার আছে।

রাজাদের ব্লকের সামনে অনেকটা ঘাসের জমি। সেখানে প্রবীরকাকুর জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির দিকে যেতে যেতে রাজা বলে, 'নিতাই হালদার অ্যারেস্ট হলে আমাকে খবর দেবেন তো?'

প্রবীরকাকু বলেন, 'কী আশ্চর্য, তোমার জন্যে এত বড় একটা ক্রিমিনাল ধরা পড়তে যাচ্ছে, আর তুমি খবর পাবে না? ফার্স্ট তোমাকে ফোন করব।'

'অ্যারেস্ট করার সময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না?'

'না। এখন তুমি আড়ালে থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে ক্রিমিনালদের ধরতে চেষ্টা কর। ওদের সামনে যাবার দরকার নেই। আরও বড় হলে তখন দেখা যাবে।'

প্রবীরকাকু জিপে উঠে চলে গেলেন।

ছ'দিন পর লালবাজার থেকে প্রবীরকাকুর ফোন এল। তিনি বললেন, 'নিতাই হালদার আজ সকালে ধরা পড়েছে।'

উত্তেজিতভাবে রাজা জিজ্ঞেস করে, 'কী করে ধরলেন?'

'আমাদের হাতে অনেক ধরনের দাগী আসামি থাকে, তাদের বলা হয় ইনফর্মার। একটা লোক একসময় নিতাই-এর দলে ছিল, গাড়ি চুরি করত। তাকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সে গোপনে খবর নিয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।'

'গাড়িটার কী হল?'

'সেটাও উদ্ধার করেছি।'

'নিতাইরা ওটা চুরি করেছিল কেন?'

প্রবীরকাকু জানালেন, 'ওদের উদ্দেশ্য ছিল মারাত্মক। মোটা টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের একটা দলকে গাড়িটা দেবার ব্যবস্থা করেছিল নিতাইরা। ডাকাতরা ওটায় চড়ে আসছে সপ্তাহে আসানসোলে একটা ব্যাঙ্কে হানা দিত। নিতাই ধরা পড়ায় ব্যাঙ্কটা বেঁচে যায়। নিতাই-এর কাছ থেকে খবর নিয়ে ডাকাতের দলটাকে পাকড়াও করা গেছে।'

প্রবীরকাকু বলেন, 'এর জন্যে তোমাকে ডাবল কনগ্রাচুলেশনস।'

রাজা অবাক হয়ে বলে, 'ডাবল কেন?'

'একটা নিতাইকে চিনিয়ে দেবার জন্যে। দু নম্বরটা হল ব্যাঙ্ক ডাকাতরা ধরা পড়ার জন্যে।'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে আমি তো কোন সাহায্য করিনি।'

'ইনডাইরেক্টলি করেছ। নিতাইকে চিনিয়ে না দিলে ওরা কি ধরা পড়ত?'

পরদিন প্রবীরকাকু লোক দিয়ে এক সেট ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়া আর জলভরা সন্দেশের মস্ত একটা বাক্স পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠি। 'নিতাই এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে তোমার সাহায্যের জন্য পুলিশ এবং ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সামান্য উপহার পাঠালাম। চিঠিটা যেন তোমার মা দেখতে না পান, পড়েই ছিঁড়ে ফেলবে। ওঁর চোখে পড়লে আমাকে খুন করে ফেলবেন। গোয়েন্দাগিরিতে তোমার প্রতিভা ষোলকলায় বেড়ে উঠুক। আমার আশীর্বাদ নিও। প্রবীরকাকু।'

আয়না

আনন্দ বাগচী

কিন্নরদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছনোর আগেই সুনন্দর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। খুনটুন নয় তো? ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা পুলিশের জিপ, ভ্যানগাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। সেই খালি গাড়িগুলোর পাশে খাকি পোশাকে কয়েকজন লোক খৈনি ডলতে-ডলতে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছিল। তবে কি কিন্নরদের বাড়িতেই কিছু হয়েছে? আজকাল ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা তো আকছার ঘটছে। বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় কেমন দিশেহারা হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

একতলার অ্যাপার্টমেন্টের জানলা দিয়ে কিন্নর ওকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ''এই সুনন্দ, শুনেছিস, সাঁঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে দোতলায়। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, কিরণকাকু নেই!''

''নেই! নেই মানে?'' সুনন্দ হাঁ হয়ে যায়।

''নেই মানে ইয়ে, মারা গেছেন! হার্ট ফেলিওর।''

''সে কী! আমি যে ওঁর জন্যেই,'' পেছনে বিচিত্র রবের হর্ন শুনে রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়েই সুনন্দ চমকাল। দেখল কমলেশকাকা তাঁর মিউজিয়াম মাস্টারপিস থেকে নামছেন। এ যুগে এই কিম্ভূত মডেলের গাড়ি ভাবাই যায় না।

''কী রে! তুই এখানে?''

অতশত জবাব দেওয়ার সময় ছিল না। শুধু বলল, ''এ আমার বন্ধু কিন্নর সেন। একতলায় থাকে।''

''কিন্নর! বাঃ চমৎকার নাম! তোমার সঙ্গে একটু পরে এসে আলাপ করব, কেমন? এই, তুই আয় তো আমার সঙ্গে। কুইক!'' হাত ধরে ছোট্ট করে একটা টান দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কমলেশকাকা বললেন, ''অন ডিউটি না, বুঝতেই পারছিস। আমার বুজুম ফ্রেন্ড কুশলকিরণ ঘোষ চলে গেল রে! খুবই রহস্যময়ভাবে। ফোন পেয়েই যেমন ছিলাম ছুটে আসছি।''

সুনন্দ দেখল ওঁর পরনে ঘরে পরার ধ্যাস্তানো পাজামা আর হাফ পাঞ্জাবি। অবাক হয়ে বলল, ''ওঁকে তুমিও চিনতে?''

"চিনতাম মানে?" ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, "বললাম না, ছেলেবেলার বন্ধু? কত বড় লেখক!" বলেই হঠাৎ কিছু একটা খটকা লেগেছিল বোধ হয়, তাই 'হুঁ' বলে ওর মুখের দিকে আর এক-ঝলক তাকালেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ফ্ল্যাটের দরজায় মোতায়েন কনস্টেবল হাঁ-হাঁ করে পথ আগলে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক দাবড়ানি। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে দু'জন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছিল। একজন থানার ও.সি.। অন্যজন লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর। দু'জনেই ছুটে এসে স্যালুট করলেন, "আসুন সার! কাজ প্রায় শেষ, শুধু আপনার জন্যেই..."

ভেতরের ঘরে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একগাদা লোক সেখানে সন্তর্পণে চলাফেরা করছিল। কেউ দেওয়ালের গায়ে মাছির মতো সেঁটে রয়েছে, কেউ টেবিলে হুমড়ি খেয়ে যেন গন্ধ শুঁকছে।

এটাই ছিল ওঁর লেখার ঘর। দিনসাতেক আগে কিন্নর ওকে নিয়ে এসেছিল সকালের দিকে। ব্যাপার এই, ছোটদের একটা পত্রিকা বের করবে বলে সুনন্দ খুব তোড়জোড় করে লেগেছে। এত বড় একজন লেখকের যে-কোনও একটা লেখা পেলেই ওরা বর্তে যাবে, তাই কিন্নরকে ধরেছিল। কিন্নর ওঁর নাড়িনক্ষত্র জানে, তাই বলে দিয়েছিল একবার লেখায় বসে গেলে কেউ মাথা খুঁড়লেও উনি দেখা করেন না। ঠিক সকাল সাতটায় উনি দাড়ি কামাতে বসেন। সব কিছুই ওঁর ঘড়ি ধরে, একচুল নড়চড় হওয়ার জো নেই। আসলে স্বাধীন মানুষ, লেখাই ওঁর জীবিকা, লেখাই ওঁর চাকরি। দিনে দশ ঘণ্টা করে লেখেন। প্রথম খেপ ভোর সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার পর চা দিয়ে গেলে চা খান। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে আটটায় ব্রেকফাস্ট। খবরের কাগজে চোখ বুলনো। সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা লিখে উঠে পড়েন। আহারান্তে একটু গড়িয়ে নিয়ে ফের তিনটে থেকে ছ'টা। চা খেয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসেন। সন্ধেয় বন্ধু-বান্ধব, সম্পাদক, প্রকাশক কি প্রতিবেশীরা কেউ এলে দেখা করেন। গল্পগুজবও হয়। রাতে আর কলম ধরেন না, পড়াশোনা করেন। এই রুটিন অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেন সপ্তাহে সাতদিনই। এত পুরস্কার, এত সংবর্ধনা আর প্রশস্তি তো আর অকারণে পাননি। এখন বাংলায় জীবিতদের মধ্যে, তিনিই বলতে গেলে এক নম্বর লোক। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরের দরজা উনি সকাল থেকে বন্ধ করেই রাখেন। এটাই নিয়ম। বাড়ির লোকজন সবাই জানে। দাড়ি কামাতে বসেছিলেন। ঠিক সাতটায় ওরা নক করতে দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন, কথা দিতে পারছেন না। সাতদিন পরে ঠিক এই সময়ে সুনন্দ যেন তাঁকে একটা ফোন করে। তখন তিনি বলবেন আদৌ লিখতে পারবেন কি না।

আজ ঠিক সাতটাতেই সুনন্দ ফোন করেছিল কিন্তু পর-পর দু'বার রঙ নাম্বার হয়ে যাওয়ায় মিনিট সাতেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ফোন বেজেই গেল উনি ধরলেন না। একটু সময় দিয়ে-দিয়ে বারতিনেক চেষ্টা করল কিন্তু একই ফল হল। ফোন উনি তুললেনই না। বোঝাই গেল উনি রেগে গিয়েছেন। তাই খুব মনমরা হয়েই কিন্নরের কাছে ছুটে এসেছিল সুনন্দ। এসে শুনল এই কাণ্ড!

লেখার ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। পুব দিকে বিশাল জানলার একপাশে ছোট্ট একটা টেবিলে চা-ব্রেকফাস্ট হয়। তলায় দু'থাক দেরাজে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, মসলা-মুখশুদ্ধি আর

হঠাৎ দরকারের ওষুধপত্র থাকে। প্রায় তার গায়ে-গায়েই বেশ বড়সড় লেখার টেবিলে টেলিফোন, কারুকাজ করা কলমদানি, স্বামী বিবেকানন্দের ফ্রেমে দাঁড় করানো রঙিন ছবি, ধূপদান আর সুদৃশ্য শেড দেওয়া, যে-কোনও দিকে ঘোরানো-ফেরানো যায় এরকম টেবিল ল্যাম্প। পাশেই ঘূর্ণি বুকশেল্ফে ঠাসা রেফারেন্স বই। র‍্যাক পেরোলে ব্যালকনির দরজা আর অ্যাটাচ্ড বাথ।

চায়ের টেবিলের ঠিক উলটো দিকে পশ্চিমের জানলার তলায় মেঝের ওপরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে ছিলেন কুশলকিরণ। কীরকম বেকায়দা ভঙ্গিতে। একটু তফাতে রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে। এক গাল কামানো। অন্য গালে সাবানের ফেনা পুরু হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। চোখ আধখোলা, মৃত্যুযন্ত্রণায় কোঁচকানো। ওদিকে টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে সাবান মাখানো ব্রাশ, জলের বাটি আর শেভিং ক্রিমের টিউব, আফটার শেভ লোশনের শিশি রয়েছে দেখতে পেল। গালে রেজারের মাত্রই একটা কি দুটো টান দিয়ে হঠাৎ পশ্চিমের জানলার কাছে কেন যে তিনি উঠে এসেছিলেন, বোঝা গেল না। তাঁকে কি কেউ ডেকেছিল? তাঁকে এভাবে এখানে কি কেউ ডাকতে পারে?

সুনন্দ পায়ে-পায়ে পশ্চিমের জানলায় গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বডি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বছর পঞ্চাশ বয়সের কিরণবাবুকে দেখতেই শক্তপোক্ত ছিল। কিন্তু মানুষটার নাকি হার্টের ব্যামো ছিল। নীচে এই হাউসের পেছন দিকের ফালি জমিতে কিচেন গার্ডেন টানা চলে গেছে। লতানে শশা, ভুঁইকুমড়ো, টম্যাটো আর লালশাক, ফুলকপির চাষ। চলাফেরা করার পথ নেই। তারপর মাথায় কাঁটাতার জড়ানো এক মানুষ সমান পাঁচিল। পাঁচিলের ও-পিঠেই বোধ হয় লম্বা ডোবার সাইজের পুকুর ছিল একটা। ঘেঁষ ফেলে বোজানো হয়েছে। তার ওপাশে চোরকাঁটায় ছাওয়া ঘেসো জমি সাফ করে হাউসিং-এর গোটাতিনেক বাড়ি উঠেছে। শুধু পিলার, মেঝে আর সিঁড়ি হওয়ার পর কোনও কারণে কাজ বন্ধ আছে। কমলেশকাকা পাশে এসে বললেন, ''যা ভাবছিস, অসম্ভব।'' সুনন্দ সত্যিই চমকাল। সে সত্যিই ভাবছিল। অসম্ভব। শুধু অসম্ভবই নয়, অর্থহীন, হাস্যকর। এদিক থেকে ভদ্রলোককে ডাকা দূরে থাক, এমন কোনও শব্দ-টব্দ করার লোকও নেই যা শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবেন।

সুনন্দর কথা সব শুনে কমলেশকাকা বললেন, ''তার মানে তুই যখন প্রথম রিং হতে শুনেছিলি তখন কুশল ওয়াজ অলরেডি ডেড। সদর বন্ধ ছিল। ওঁর স্ত্রী নবনীতা কিচেনে, গ্যাসে চাপানো প্রেশার কুকার সিটি দিচ্ছিল। অন্যদিকের একটা বেডরুমে বাইশ-তেইশ বছরের ভাগ্নে রূপেন দরজা বন্ধ করে শীর্ষাসন করছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, অনেকক্ষণই কারও কানেই যায়নি। পরে শুনতে পেয়ে ওঁর স্ত্রী গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে লেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোন শেষবার বাজতে-বাজতে থেমে গেল। মেঝের ওপর কুশল পড়ে আছে। রূপেন ব্যায়ামের পোশাকেই ছুটে গিয়ে তেতলা থেকে ওঁর বন্ধু ভবনাথবাবুকে ডেকে আনে। তিনি তখন মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে সবে লুঙ্গি আর ফতুয়া চাপিয়েছেন, সেইসঙ্গে চায়ের জল। কারণ স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা এখানে নেই, বাইরে কোথায় বিয়েবাড়িতে গেছে। লোক জড়ো করে দরোয়ানকে ডেকে ঘরের কপাট ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়। ভবনাথই থানায়, লালবাজারে ফোন করেন। লালবাজার আমাকে।''

''কাকু, ডাক্তার কী বললেন?'' সুনন্দ জানতে চায়।

কমলেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, ''হার্ট ফেল। কিন্তু বাঁ হাতের তালুতে একটা পোড়া সাদা দাগ দেখতে পেয়েছেন। টাটকা। সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ

কর, তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এ-ঘরের যা কিছু দেখার ইচ্ছে খুঁটিয়ে দেখে নে। আমরা তারপর ওপাশের ঘর থেকে ভরনাথবাবুকে ডেকে নিয়ে ওপরে ওঁর ঘরে যাব। ওঁর মুখ থেকে আলাদা করে কিছু শুনব।''

গ্রিলে পিঠ ঠেকিয়ে পেছনে হাত রেখে সুনন্দ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ হুল ফোটার মতো খচ্‌ করে আঙুলে কিছু বিঁধতেই সুনন্দ ভয়ে চমকে উঠেছিল। রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘরে স্নায়ু এমনিতেই এমন টানটান হতে থাকে, ভিতু-সাহসীর কোনও ব্যাপার নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, কিছুই না, একগুছি তামার তার গ্রিলের নীচের দিকের একটা পাতে কেউ বেঁধে যেন আংটি বানিয়েছে। ছেলেবেলায় সুনন্দও করেছে, তবে আঙুলে। হাইট দেখেই বোঝা যায় কোনও বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ের কাজ। ভাগ্যিস, কমলেশকাকা তার চমকে ওঠা দেখতে পাননি, সেই সময় সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, নইলে ভিতু বলে ঠাট্টা করতেন। তারের গুছিটার প্যাঁচ খুলে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কমলেশ বললেন, ''কী করিস!''

''ও কিছু না।'' সুনন্দ মুচকি হেসে বলল, ''চলো, যাবে না?''

ভবনাথ সদর বন্ধ করে যেতেও ভুলে গিয়েছিলেন, সময় পাননি। ওদের নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে বললেন, ''আসুন, আসুন।''

সোফার ওপর দলা পাকিয়ে ফেলে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুকিটাকি তুলে নিয়ে বললেন, ''আপনারা বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন? ইশ, আমাব চায়ের জল বোধ হয় ফুটে ফুটে শুকিয়ে গেল।''

কমলেশ মাথা নেড়ে জানালেন, না। ভবনাথবাবু ফিরে আসতেই কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি বোধ হয় কোনও শব্দটব্দ শোনেননি?''

''কিসের শব্দ? না। তবে নীচের তলার ভদ্রলোক নাকি ধুপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলেন। কুশলের লেখার ঘরের ঠিক নীচেই ওঁর ঘর কিনা। তবে গুরুত্ব দেননি।''

''আচ্ছা, রূপেন সম্পর্কে আপনার....''

''না, না, ও খুব ভালো ছেলে। একটু ডাল হেড, শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকে। মামা-মামির অবর্তমানে ওই অবশ্য সব কিছু পাবে। তবে ছেলেটার টাকা-পয়সার লোভ নেই। কুশলরা নিঃসন্তান, রূপেনকেই ওরা ছেলের মতো দেখত। আচ্ছা, জানেন, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, কুশলের নাম এবার নোবেল পুরস্কারের জন্যে উঠেছে। এবার যদি নাও হয়, সামনের বছরে পেয়ে যেতেও পারত!''

কমলেশ ঠাট্টা করে বললেন, ''আপনার হিংসে হয়নি? আপনিও তো লেখক মশাই।''

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবনাথ বললেন, ''কী যে বলেন ভাই! কিসে আর কিসে। আমি ওর পায়ের নখের যুগ্যিও না।''

আরও দু-একটা কথার পর সুনন্দ মাঝে পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা ভবকাকা, ওঁর ঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কখনও ঢুকত?''

''না, কেন ঢুকবে না!'' ভবনাথ হাত নেড়ে বললেন, ''কুশল বাচ্চাদের ভীষণ ভীষণ ভালোবাসত! ওই তো একতলার ভদ্রলোকের ভাইয়ের দুটি যমজ মেয়ে প্রায় ওর ঘরে ঘুরঘুর করত। কেন বল তো?''

সুনন্দ হেসে বলল, ''এমনিই।''

ক'দিন পরে কমলেশকাকা সুনন্দদের বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, ''জানিস, বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে ইলেকট্রিক শক দিয়ে কুশলের হার্টফেল করানো হয়েছে। কিন্তু

কী করে, সেটাই ধরতে পারা যাচ্ছে না।''

সুনন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, ''তাই বলো! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইস কাকু, এই সোজা ব্যাপারটা আমি ধরতেই পারিনি। আমি কী মুখ্যু!''

কমলেশ সোজা হয়ে তাকোলেন, ''কী বকছিস পাগলের মতো?'

''হয় তো পাগলামিই করছি। আমার মনে হয় পশ্চিমের জানলার গ্রিলটা ইলেকট্রিফায়েড করে রাখা হয়েছিল। এই দ্যাখো,''—বলেই সুনন্দ ছুটে গিয়ে ওর টেবিল থেকে ইঞ্চি দুই-আড়াই লম্বা একগুছি তামার তার এনে দেখাল, ''এ কোনও বাচ্চা মেয়ের কম্মো না।''

''এইটুকু তার দিয়ে? কোথায় পেলি?''

''গ্রিলে জড়ানো ছিল। পরে টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার সময় এটুকু থেকে গিয়েছিল।''

''অ্যাঁ! তোর কথা ঠিক হলে বলতে হয় বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরার ফলেই কুশল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়? কিন্তু যে করেছে তার মোটিভ কী? আর কী করেই বা সে কুশলকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল, গ্রিল ধরতে বাধ্য করল? ঘর তো ভেতর থেকে বন্ধই ছিল?''

''মোটিভ-টোটিভ আমি জানি না। তবে কী করে নিয়ে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। হত্যাকারীরা পেছনের দিকের হাউসিংয়ের বাড়িটার তিনতলায় উঠে একটা ছোট হাত আয়না দিয়ে কুশলবাবুর সামনের আয়নায় রোদ্দুরের ঝলক ফেলতে থাকে। অবাক আর বিরক্ত হয়ে তিনি ব্যাপারটা দেখার জন্যে পেছনের জানলার দিকে আসেন। কোত্থেকে আলোটা আসছে বুঝতে পেরে ওপরের দিকে তাকান। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। মুখের ওপর আলো এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্যাপারটা সামলাতে বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরেন। ফলে শক্‌ লাগায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছিটকে পড়ে যান মাটিতে চিত হয়ে। হার্টের কাজ বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুও হয় সঙ্গে সঙ্গে। এরই ফাঁকে খুনি লোকটা ছুটতে-ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে আসে আর তারটা টেনে ছিঁড়ে নেয়। আংটাটুকু কিন্তু গ্রিলের সঙ্গে লেগে থাকে। আগের রাতেই সেসব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু কানেকশন দিয়েছিল ভোরবেলা। তারপর ওবাড়িতে উঠে রোদ ওঠার অপেক্ষায় বসেছিল।''

''ওয়ান্ডারফুল গপ্পো!'' কমলেশ হাসলেন, ''কিন্তু লোকটা কে? রূপেন, না নীচের তলার কেউ?''

''ভবনাথবাবু!'' সুনন্দ মাথা চুলকে বলে, ''তুমি খেয়াল করোনি, আমি দেখেছি। সোফার ওপর ছাড়া জামা-পাজামার সঙ্গে একটা গোলমতো আয়না আর তারের বাণ্ডিল (প্লাগ-পিন সুদ্ধ) তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। চায়ের জলের ব্যাপারটা নিশ্চয় বানানো।''

কঠিন শাস্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুই বন্ধুই ক্লাস নাইনে পড়ে, কিন্তু আলাদা ইস্কুলে। ওদের মধ্যে টিটো খুব খেলাধুলো ভালোবাসে, পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই বিশেষ পড়ে না; বড়জোর দু-একটা ইংরেজি কমিকস্ ছাড়া। আর পাপান খেলার মাঠে বিশেষ যায় না, যখনই একটু সময় পায় অমনই একটা গল্পের বই নিয়ে বসে। এমনকি একবার টিটোর সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়েও পাপান একটা ডিটেকটিভ-বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিল। পাপান ইংরেজি বইও পড়ে। বাংলা বইও পড়ে।

এখন একটানা দশদিন স্কুলের ছুটি। সকালবেলা পড়াশোনা শেষ করে টিটো যায় ব্যাডমিন্টন খেলতে, আর পাপান বড় রাস্তার মোড়ে একটা বইয়ের দোকানে এসে নতুন নতুন বই দেখে, একটা-দুটো কেনে। যাওয়া-আসার পথে রোজই প্রায় এক জায়গায় ওদের দু'জনের দেখা হয়ে যায়। গল্প হয় খানিকক্ষণ। টিটো বলে আগের দিনের ব্যাডমিন্টন ম্যাচে একজনকে হারিয়ে দেওয়ার কথা, আর পাপান বলে, ''কাল রাত্তিরে একটা দারুণ বই পড়লুম, জানিস!'

সেদিন সকাল সাড়ে দশটায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গল্প করছে টিটো আর পাপান। টিটোর হাতে দু'খানা বই। পাশেই একটা ব্যাঙ্ক, সামনের রাস্তায় তিন-চারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পে-গল্পে ওরা যখন মশগুল তখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সুট-টাই পরা, মাথার আধখানায় টাক। মুখে একটা কেউকেটা ভাব। লোকটির হাতে একটা চাবি, সেই চাবি দিয়ে একটা গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে সে টিটো আর পাপানের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলল, ''অ্যাই, আমার গাড়িতে ঠেসান দিয়েছিস কেন রে? সরে যা! সরে যা!''

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে পাপান একটা নীল রঙের গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিকই। তাতে কী হয়েছে, গাড়িটা ক্ষয়ে গেছে নাকি? তাছাড়া একজন অচেনা লোক তাদের তুই বলবে কেন?

পাপান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা থেকে সরে গেল খানিকটা। ''আপনার গাড়িটা ছুঁয়ে ফেলেছি, এজন্য দুঃখিত!''

লোকটি গাড়িতে ঢুকতে গিয়েও এদিকে চলে এল। গাড়িটা যেন একটা পোষা জন্তু এইভাবে এক জায়গায় হাত বুলোতে গিয়ে চমকে উঠল। গর্জন করে বলল, ‘‘আমার গাড়িতে আঁচড় কেটেছিস? গাড়িটা নষ্ট করে দিয়েছিস!’’

পাপান সেদিকে তাকাল, গাড়িটার গায়ে সে কোনও দাগ দেখতে পেল না। তা ছাড়া গাড়ির গায়ে সে আঁচড় কাটতে যাবে কেন? তাও অন্যের গাড়িতে? একটুখানি পিঠটা ঠেকিয়েছিল শুধু।

লোকটি রেগে গরগর করতে করতে বলল, ‘‘যত সব বিচ্ছু ছেলে! বদমাশ!’’

এবার টিটো বলল, ‘‘আপনি গালাগাল দিচ্ছেন কেন? আপনার গাড়ির কোনও ক্ষতি করা হয়নি!’’

লোকটা প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, ‘চোপ!’

তারপর দুটো হাতের পাঞ্জা ঠিক থাবার মতন ওদের দু’জনের মুখের ওপরে রাখল। এক ধাক্কায় ওদের দু’জনকেই ফেলে দিল মাটিতে। কঠিন ফুটপাথে মাথা ঠুকে গেল টিটো আর পাপানের।

ওরা আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটি গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টিটো আর পাপানের যত না ব্যথা লেগেছে তার চেয়েও ওরা মানসিক ভাবে আহত হয়েছে বেশি। বিনা দোষে একজন লোক ওদের গায়ে হাত দিল! এর আগে কেউ কোনওদিন ওদের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করেনি, ওরা কোনওদিন মারই খায়নি।

কলকাতার রাস্তায় এরকম কত কী ঘটে, অন্য কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। কত লোক হেঁটে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে। একদম কাছাকাছি দু-চারজন লোক ওদের ওরকমভাবে পড়ে যেতে দেখে একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর চলে গেল যে-যার নিজের কাজে। কেউ সেই লোকটিকে একটু বাধাও দিল না, কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

টিটো আর পাপান গায়ের ধুলো ঝেড়ে হতবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। এটা কি হল? কেন লোকটা এরকম অসভ্যের মতন ব্যবহার করে চলে গেল? লোকটা কে?

ব্যাঙ্কের গেটে একজন বন্দুকধারী দারোয়ান থাকে। সে বন্দুকটা পাশে শুইয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খৈনি খাচ্ছে। টিটো তার কাছে গিয়ে বলল, ‘‘এইমাত্র যে-লোকটি বেরোল ব্যাঙ্ক থেকে, তাকে আপনি চেনেন? এখানে ও কি প্রায়ই আসে?’’

দারোয়ান ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কোন্ লোক? কত লোকই তো যাচ্ছে আর আসছে।’’

টিটো বলল, ‘‘বেশ লম্বা, খয়েরি সুট পরা।’’

দরোয়ান বলল, ‘‘সুট এখন সবাই পরে। শীত পড়েছে, সুট পরবে না?’’

বোঝা গেল, এর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

পাপান বলল, ‘‘আমি গাড়ির নম্বরটা দেখেছি। 9837’’ তবে আগে কি ছিল? WMF না WMB?’’

টিটো বলল, ‘‘আমি দেখিনি। আর ওকে ধরা যাবে না।’’

পাপান চোয়াল শক্ত করে বলল, ‘‘ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। অকারণে একটা লোক অন্যায় করে যাবে?’’ ওকে শাস্তি পেতেই হবে! ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে..’ তুই এই কবিতাটা পড়িসনি, টিটো?’’

টিটো বলল, "কিন্তু ওকে খুঁজে পাব কি করে?"

পাপান বলল, "পৃথিবীর যেখানেই থাকুক ওকে আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। ওর মুখটা যেন ভুলে যাস না। দাঁড়া, একটু চোখ বুজে ওর মুখের ছবিখানা মনে গেঁথে রাখি।"

টিটো বলল, "ওর মুখটা আমার মনে না থাকলেও, দেখলেই চিনতে পারব।"

তারপর থেকে ওই ব্যাঙ্কের সামনেটায় নজর রাখে দু'বন্ধুই। যদি সেই লোকটাকে বা গাড়িটাকে দেখা যায়। ব্যাঙ্কটার সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে দু'জনেই হাঁটে। অন্য সময়েও রাস্তার যে-কোনও গাড়ির নম্বরটা ওরা একবার দেখে নেয়। লম্বা-চওড়া খয়েরি কোটপরা একজন লোককে পেছন থেকে দেখে পাপান অনেকখানি ছুটে গেল তার মুখটা দেখার জন্য। কিন্তু, না, সে অন্য লোক।

লোকটা আর ব্যাঙ্কে আসে না। রোজ রোজ কে-ই বা ব্যাঙ্কে যায়? তবে পাঁচ দিন পর অন্য একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

পাপান টিকিট কাটতে গিয়েছিল গ্লোব সিনেমায়। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা গাড়ির নম্বরের দিকে। ৭৪৩৭। তবে আগের অক্ষরগুলো মেলাটাই বেশি দরকার, একই নম্বরের অনেক গাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু এ-গাড়ির রঙটাও নীল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নিউ মার্কেটের সামনে।

যদি এই গাড়িটাই সেই লোকটার হয়? কিন্তু পাপান একা-একা সেই লোকটাকে দেখতে পেলেই বা কি করবে? কি করে শাস্তি দেবে? টিটোকে একটা খবর দেওয়া দরকার। টিটোদের বাড়িতে টেলিফোন আছে।

একটা দোকান থেকে ফোন করল পাপান। টিটো জিজ্ঞেস করল, "তুই ঠিক জানিস ওটা সেই গাড়ি? নীল রঙের অ্যামব্যাসাডর গাড়ি তো কতই আছে।"

পাপান একটু দুর্বলভাবে বলল, "না, একেবারে ঠিক ত পারছি না। অন্য গাড়িও হতে পারে। কিন্তু যদি সেই গাড়িটাই হয়? গাড়িটাকে ফলো করলে সেই লোকটার বাড়িটা চিনে আসা যাবে।"

টিটো বলল, "ঠিক আছে, তুই নজর রাখ। আমি আসছি!"

একটু দূরে, অন্য একটা গাড়িব আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল পাপান। টিটোর আসতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবেই। তার আগেই যদি লোকটা বেরিয়ে আসে নিউ মার্কেট থেকে? অতবড় লোকটাব সঙ্গে পাপান গায়ের জোবে পারবে না। তবে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে একটা ল্যাং মেরে আছাড় খাওযাতে পারে। তাতেই অনেকটা প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু ওর সঙ্গে যদি অন্য লোক থাকে?

ঠিক তাই। টিটো এসে পৌঁছবার আগেই নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটা। হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। সেই লোকটা বটে। তার সঙ্গে রয়েছে আবও দু'জন লোক। তারা নীল গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে হাসতে হাসতে। হাতে কয়েকটা প্যাকেট। পাপানের মনটা দমে গেল। এখনই তো ওরা গাড়িতে উঠে চলে যাবে, সে কি করবে?

লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্য পাপান অনেকটা কাছে এগিয়ে এল।

সেই আসল লোকটাই গাড়ি চালাবে। একটা ভিখিরি বুড়ি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল তার কাছে। লোকটা ধমকে উঠল, "এই যা! সরে যা!"

বুড়ি তবু সরে না। ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

তারপরের ব্যাপারটা দেখে আঁতকে উঠল পাপান। লোকটা সাঁ করে কাচ তুলে দিল গাড়ির জানালার। তাতে আটকে গেল ভিখিরি বুড়িটার হাত। বুড়িটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে 'ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে' বলতে লাগল, আর ভেতরে সেই লোকগুলো খলখল করে হাসছে।

ঠিক এই সময় টিটো এসে ডাকল, ''পাপান!''

কাছেই একটা ট্যাক্সি থেমেছে, তার মধ্যে বসে আছে টিটো। পাপান দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলল, ''সেই গাড়ি, সেই লোক। ওকে ফলো করে বাড়িটা দেখে আসতে হবে।''

জানলার কাচ আবার নামিয়ে নীল গাড়িটা এবার স্টার্ট দিয়েছে।

পাপান উত্তেজিতভাবে বলল, ''ওই লোকটা, ওই লোকটা, ওর মতন খারাপ লোক আমি পৃথিবীতে আর দেখিনি। একটা ভিখিরিকে শুধু-শুধু কী কষ্টটাই না দিল! ওকে ছাড়া হবে না, ওকে শাস্তি দিতেই হবে!''

টিটো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, ''আপনি আবার চলুন শিগগির!''

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, ''কোন্ দিকে যাব?''

টিটো কিছু বলবার আগেই পাপান বলল, ''ডান দিকে ঘুরিয়ে নিন।''

সে একটা গল্পের বইয়ে পড়েছে যে, অল্পবয়সী ছেলেরা কোনও ট্যাক্সিতে চেপে অন্য কোনও গাড়িকে ফলো করতে বললে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সন্দেহ করে। যেতে চায় না। সেইজন্য পাপান শুধু আগের গাড়িটা দেখে-দেখে বলতে লাগল, ''ডান দিকে, এবার বাঁ দিকে।''

বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর টিটো ফিসফিস করে বলল, ''গাড়িটা কত দূর যাবে রে? ট্যাক্সিভাড়া অনেক হয়ে গেল, কি করে দেব? আমার কাছে বেশি পয়সা নেই। তোর কাছে আছে?''

পাপান বলল, ''আমার কাছে তো পাঁচ টাকার বেশি নেই!''

টিটো বলল, ''এর মধ্যেই পনেরো টাকা উঠে গেল, আমার কাছে আছে মাত্র দশ টাকা।''

পাপান বলল, ''একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। এখন আর ওকে ছাড়লে চলবে না।''

নীল গাড়িটা এসে থামল টালিগঞ্জে, বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ির সামনে। পাপান আর টিটো নেমে পড়ল একটু দূরে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ঠিকানা খোঁজার ভান করে একটু-একটু করে এগোতে লাগল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। এ-রাস্তাটা অন্ধকার অন্ধকার মতন। সেই বাড়িটার সামনে একটা লোহার গেট, ভেতরে একজন দারোয়ান বসে আছে। লোক তিনটে ভেতরে ঢুকে গেছে, ভেতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এ তো বেশ বড়লোকের বাড়ি। এখন কী করা যায়?

পাপান ভাবল, লোকটা এমন বড়লোক হয়েও একটা বুড়ি ভিখিরিকে অমন কষ্ট দিল! পাষণ্ড! ওকে শাস্তি দিতেই হবে!

বাড়িটার সামনে এমনই ঘোরাঘুরি করা যায় না! ট্যাক্সি ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। পাপান ঠিক করে ফেলেছে যে, ওই ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরতে হবে, না হলে ভাড়া দেবে কী

করে? বাড়িতে গিয়ে দাদার কাছে টাকা চাইতে হবে। দাদা যদি এখন বাড়িতে না থাকে, তা হলে মায়ের কাছে!

টিটো বলল, ‘‘এখন আর তো কিছু করার নেই। বাড়িটা তবু চেনা হল।’’

পাশ থেকে গায়ে চাদর জড়ানো একটি লম্বা মতন ছেলে জিজ্ঞেস করল, ‘‘তোমাদের কী চাই ভাই? কাকে খুঁজছ?’’

টিটো বলল, ‘‘কিছু চাই না। একটা ঠিকানা খুঁজছি। আমার এক বন্ধু থাকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়িতে, কিন্তু সে তো ওরকম লোহার গেটওয়ালা বাড়ি বলেনি, এমনই সাধারণ দোতলা বাড়ি। ওই বাড়িটা কার বলতে পারেন?’’

লম্বা ছেলেটি বিরক্ত ভাব করে বলল, ‘‘ওটা তো রঘু চৌধুরীর বাড়ি। কেন, ওর সঙ্গে তোমাদের কী দরকার?’’

পাপান বলল, ‘‘না, না, কোনও দরকার নেই। এমনই জিজ্ঞেস করছিলাম।’’

ছেলেটি বলল, ‘‘মহা-পাজি লোক! লোককে ঠকিয়ে-ঠকিয়ে অত বড় বাড়ি করেছে। এটা আগে ছিল একজন বিধবা ভদ্রমহিলার, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর বাড়িটা রঘু চৌধুরীর হয়ে গেল। লোকে বলে, ওই রঘু চৌধুরীই বিধবা মহিলাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে!’’

টিটো চোখ বড় বড় করে বলল, ‘‘খুন? ওকে পুলিশে ধরেনি?’’

ছেলেটি বলল, ‘‘ওর সব বড়-বড় লোকের সঙ্গে চেনা আছে। কী সব কলকাঠি নেড়েছে, কেউ ওকে ছুঁতেও পারেনি।’’

টিটো আবার জিজ্ঞেস করল, ‘‘আপনারা পাড়ার লোক কিছু করতে পারেননি? ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল না?’’

ছেলেটি বলল, ‘‘ওকে ধরা-ছোঁওয়া অত সহজ নয়। আমরা কিছু করতে গেলে আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে। জান, আমি ওর কাছে একবার চাকরি চাইতে গিয়েছিলাম। আমার কথা ভাল করে শুনলই না, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল, কুকুর লেলিয়ে দিল!’’

ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্য হয়ে পড়েছে, ওদের উঠে পড়তে হল। ফেরার পথে আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইল পাপান।

এর পর দু-তিনদিন দুই বন্ধু দেখা হলেই ওই রঘু চৌধুরীকে নিয়ে আলোচনা করে। লোকটা অসভ্য, নিষ্ঠুর খুনি অথচ তাকে কেউ শাস্তি দিতে পারে না! একটা খারাপ লোক মানুষের ক্ষতি করে ঘুরে বেড়াবে, এত বড় বাড়িতে থাকবে, অথচ কেউ জানতে পারবে না তার আসল রূপটা? একটা কিছু করতেই হবে, কিন্তু কী করা যায়?

ওরা দু’জন মাঝে-মাঝে চলে আসে টালিগঞ্জে। সেই বাড়িটার সামনে ঘোরাঘুরি করে। দু-একবার রঘু চৌধুরীকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে। একবার রঘু চৌধুরীর সঙ্গে পাপানের চোখোচোখিও হয়ে গেল। কিন্তু রঘু চৌধুরী তাকে চিনতেও পারল না। ও নিশ্চয়ই অনেক অনেক লোকের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করেছে, তাই তাদের মুখ মনে রাখতে পারে না।

ওরা খবর জোগাড় করল যে, রঘু চৌধুরী এ-পাড়ার দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় অনেক টাকা চাঁদা দেয়। তাই কেউ তাকে ঘাঁটায় না। তবে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে বলছিল, রঘু চৌধুরী আসলে স্মাগলার, তাই ওর এত টাকা।

একদিন সকালবেলা ওই বাড়ির লোহার গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল, ভেতরে একটা সুন্দর সবুজ লন। সেখানে দুটি ফুটফুটে ছেলে, পাপানদের চেয়ে অনেক ছোট। মনে হয় ক্লাস ফোর আর ফাইভে পড়ে, একটা বল নিয়ে খেলছে, আর তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছে রঘু চৌধুরী আর একটা কুকুর। বাবা ছেলেদের সঙ্গে খেলছে আর সবাই মজা করে হাসছে। এক একবার ছোট ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছে রঘু চৌধুরী। কুকুরটা লাফাচ্ছে পাশে।

কী সুন্দর দৃশ্য! মনে হয় কী আনন্দময় এই বাড়ি। রঘু চৌধুরী তার ছেলেদের সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে, আর খুব খারাপ ব্যবহার করে বাইরের লোকদের সঙ্গে!

সেদিন ফেরার পথে টিটো বলল, "আর টালিগঞ্জে এসে কী হবে রে পাপান? কিছুই তো করা যাবে না!"

পাপান বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

টিটো সঙ্গে সঙ্গে উৎসুকভাবে বলল, "কি?"

পাপান বলল, "ওকে বেনামী চিঠি লিখব! ওপরে একটা মানুষের মাথার খুলি এঁকে লিখব, 'সাবধান রঘু চৌধুরী! তুমি যদি পাপ কাজ বন্ধ না করো, তা হলে তোমার মুন্ডু উড়ে যাবে! ইতি মেঘনাদ!' মেঘনাদের তলায় একটা জ্বলন্ত তীর আঁকা থাকবে!"

টিটো বলল, "এই চিঠি পেলে ও হাসতে হাসতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে! মোটেই ভয় পাবে না।"

পাপান বলল, "কেন ভয় পাবে না? তুই কী করে জানলি ওদের বাড়িতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট আছে?"

টিটো বলল, "সব বাড়িতেই থাকে। শুধু শুধু একটা চিঠি পড়ে ভয় পাবে কেন? মুন্ডু ওড়াবার ক্ষমতা যে তোর আছে, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবি?"

পাপান বলল, "আরও বেশি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখব।"

টিটো বলল, "ধুত! ওতে কিস্সু হবে না। অন্য রাস্তা ভাব।"

পরদিন বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে না গিয়ে টিটো দৌড়ে দৌড়ে চলে এল পাপানের বাড়িতে। ছাদে টেনে নিয়ে গেল। তারপর দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, "আজ ইস্কুলে কী দেখলাম জানিস। ওই ছেলে দুটো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে!"

"ওই ছেলে দুটো মানে?"

"রঘু চৌধুরীর দুই ছেলে। ওদের নাম অজয় আর সুজয়। আমাদের জয়দেবের ভাই গোগো ওই সুজয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। গোগো বলল, ওরা দুই ভাই-ই খুব ভদ্র! ওই নীল গাড়িটা ছুটির পর ওদের নিতে আসে।"

"তা হলে তো খুব কাছাকাছি এসে গেল রে!"

"রঘু চৌধুরীও হয়তো কোনওদিন স্কুলে আসবে। তারপর ওকে পেছন থেকে ল্যাং মারব?"

"তার চেয়ে অনেক কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথা আমার মাথায় এসে গেছে। শোন্ টিটো, মনে কর্, তুই একদিন জানতে পারলি যে, তোর বাবা একজন চোর কিংবা খুনি—"

"অ্যাই, কী হচ্ছে কি? আমার বাবা কিরকম লোক, সবাই জানে।"

''আহা, সত্যি সত্যি বলছি না! ধর্, যদি এমন হত। তোর কিংবা আমার বাবাকে সবাই খুব ভাল লোক বলেই জানে, হঠাৎ একদিন প্রমাণ বেরিয়ে গেল বাবা একজন খুনি, তা হলে তোর মনের অবস্থা কি হত?''

''বাবাকে আমি ঘেন্না করতাম।''

''ঠিক তাই। রঘু চৌধুরী লোকটা তো সত্যিই খারাপ! ছেলে দুটো কিন্তু বাবাকে ভালোবাসে। ওদের আমরা সব কথা জানিয়ে দেব। প্রমাণ দেব। তখন ওরা বাবাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে। সেটাই হবে রঘু চৌধুরীর উপযুক্ত শাস্তি।''

''গুড আইডিয়া, কিন্তু—''

''এর মধ্যে আবার কিন্তু কী?''

''অজয় আব সুজয় অত ছোট...বাবা সম্পর্কে হঠাৎ ওই সব জানতে পারলে ওদের মনে খুব আঘাত লাগবে না? ওদের তো কোনও দোষ নেই! অন্য কিছু করা যায় না, পাপান?''

''অন্য আর কি?''

টিটো পাপানের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে বলল, ''তুই যে সেই চিঠির কথাটা বলেছিলি?''

দু'জনে বুদ্ধি আঁটল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিনই রঘু চৌধুরী তার বাড়ির লেটাব বাক্সে একটা চিঠি পেল। সাদা খাম। ভেতরে একটা সাদা পাতায় গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা:

''রঘু চৌধুরী, সাবধান! তোমার পাপের কথা, কু-কীর্তির কথা সব বলে দেব তোমাব দুই ছেলেকে! ইতি মেঘনাদ''

চিঠিটা পড়ে রঘু চৌধুরীর ভুরু-কুঁচকে গেল। কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল বটে, কিন্তু সারাদিন তার মনটা খচ খচ করতে লাগল।

পরদিন আর-একটা চিঠি:

''রঘু চৌধুবী, সাবধান। তোমার ছেলে অজয় সুজয় কোন্ ইস্কুলে যায়, আমরা জানি। তোমার বহু পাপের প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। অজয় আর সুজয়কে জানিয়ে দেব সব কথা, সব কথা জানলে লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ইতি মেঘনাদ''

এবারে চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না রঘু চৌধুরী। ভাঁজ করে করে পকেটে রেখে দিল। সারাদিন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে চিঠিটা পড়তে লাগল বারবার। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। জীবনে সে কখনও এত ভয় পায়নি। নিজের ছেলে দুটিকে সে সত্যিই খুব ভালোবাসে।

এবার এল তিন নম্বর চিঠি:

''রঘু চৌধুরী, সাবধান! আর সময় নেই। তুমি কি চাও তোমার ছেলেরা তোমাকে ঘেন্না করুক? সব বলে দেব, সব! এখনও যদি বাঁচতে চাও কাল সকাল সাতটায় দেখা করো বিবেকানন্দ পার্কে বড় ছাতিম গাছের তলায়। ইতি মেঘনাদ

''পুঃ—একা আসবে।''

এবার রঘু চৌধুরী ধরে নিল, যে তাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে টাকা চায়। ব্ল্যাকমেইল! তার মুখখানা হিংস্র হয়ে উঠল, চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে পা দিয়ে মাড়িয়ে সে ড্রয়ার খুলে বার করল একটা রিভলবার!

পরদিন ঠিক সকাল সাতটায় রঘু চৌধুরী বিবেকানন্দ পার্কে এসে হাজির। বড় ছাতিম গাছটার কাছে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সেখানে বসে আছে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের হাফপ্যান্ট পরা রোগা ছেলে। তাকে সে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ধারণা, কোনও বিকট চেহারার গুণ্ডা লুকিয়ে আছে কাছেই। পকেটে হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আছে রিভলভারটা।

পাপান হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, ''এই যে চৌধুরীমশাই, এদিকে আসুন। আমিই মেঘনাদ!''

রঘু চৌধুরীর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ''হতভাগা ছেলে! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? মেরে তোর মুখের সব কটা দাঁত ফেলে দেব!''

একটুও ভয় না পেয়ে পাপান বলল, ''আমাকে ওরকম শাসাবে না, কোনও লাভ নেই। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে আমার বন্ধুরা। আপনি আমার ওপর আক্রমণ করতে এলেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একজন পুলিশে খবর দেবে। তাতেই তোমার দুই ছেলে সব জেনে যাবে!''

থমকে গিয়ে রঘু চৌধুরী বলল, ''তুই কী চাস? কত টাকা?

পাপান হা-হা করে হেসে উঠল।

রঘু চৌধুরী বলল, ''শোন্, আমি তোকে এক হাজার টাকা দেব। তারপর খবরদার আমার ছেলেদের কাছে ঘেঁষবি না। যদি ওদের কিছু বলতে যাস তোকে খুন করে ফেলব। নির্ঘাত খুন করে ফেলব!''

পাপান বলল, ''আমাকে খুন করলেও আমার অন্য বন্ধুরা থাকবে। তারা তোমার ছেলেদের বলে দেবে, তুমি খুনি, তুমি স্মাগলার, তুমি বিনা কারণে অন্য ছেলেদের ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দাও! এইসব শুনে তোমার ছেলেরা তোমাকে ঘেন্না করবে। তোমাকে বাবা বলে মানতে চাইবে না।''

রঘু চৌধুরী এক পা এগিয়ে এসে বলল, ''তুই কত টাকা চাস?''

পাপান বলল, ''এক পয়সাও চাই না। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে! যদি ক্ষমা না চাও...''

রঘু চৌধুরীর শরীরটা কেঁপে উঠল। সমস্ত মুখটা কুঁচকে গেল। হঠাৎ সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, ''ক্ষমা চাইছি। আর কক্ষনো এসব করব না! কাউকে ঠকাব না, কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। তুমি আমার ছেলেদের কিছু বোলো না। ওরা আমাকে এত ভালোবাসে, বলো না, প্লিজ, কিছু জানিয়ে দিয়ো না ওদের, আমি এখন থেকে আর কোনও অন্যায় করব না।''

বলতে-বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রঘু চৌধুরী।

বাঘা গোয়েন্দা সত্যজিৎ

পরিচয় গুপ্ত

নিয়ারিং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ফল বেরিয়েছে।

এবারেও সত্যজিতের রেজাল্টের কোনওরকম হেরফের হয়নি। যথারীতি সে সর্ববিষয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে।

জ্বর-জ্বর ভাব থাকার জন্য সত্যজিৎ সেদিন কলেজে যেতে পারেনি। স্বভাবতই খবরটা নিয়ে এল তার দুই সতীর্থ তথা সহকারী শুভজিৎ এবং সমরজিৎ।

সত্যজিৎ তখন বিছানায় শুয়ে শার্লক হোমস্ পড়ছিল। ওরা দুজনে দুপাশ থেকে এসে তার কানে ফিস্ ফিস্ করে খবরটা দিয়ে বললে, ভালো খবর এনেছি। নিদেনপক্ষে একখানা করে হারুদার গরম কাটলেট হোক্ এখনি।

সত্যজিৎ বই থেকে মুখ তুলে আড়চোখে তাকাল তাদের মুখের দিকে। বললে, কে বলেছিল তোদের গায়ে পড়ে এত উপকার করতে?

ওরা বুঝল সত্যজিৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শুভ গা টিপল সমরজিতের। সমরজিৎ গম্ভীর হয়ে বললে, তুই বললি কি বললি না সেটাতো কথা নয়। তুই আমাদের গুরু! এটা আমাদের কর্তব্য তোর কৃতিত্বে গর্বিত হওয়া।

---তাই নাকি? সত্যজিৎ হা-হা-হা করে হেসে উঠল। এমন প্রাণখোলা হাসি সে কদাচিৎ হাসে। কলেজ থেকে ফিরে সুমন, স্বপন, অনুপ, কুনাল আর সন্দীপ ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সত্যজিৎকে হঠাৎ এমন করে হাসতে দেখে তারাও ঢুকে পড়ল হাসির প্রকৃত কারণটা জানতে।

সত্যজিৎ সর্ববিষয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে শুনে তারাও গলা মেলালো শুভ আর সমরজিতের সঙ্গে। শূন্যে মুষ্টি আস্ফালন করে বললে:

দারুণ খুশি আমরা ভাই
ব্রেস্ট কাটলেট খেতে চাই।

সত্যজিৎ দেখল বিপদ। এখন ওদের দাবি মেনে নিলে ওই আটখানাতেই ঝামেলা মিটে যায়। বেশি হইচই হয়ে গেলে তখন ডজন গুনে আনতে হবে। কাউকেই বাদ দেওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বার করে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিল শুভর হাতে। বললে, এই শেষ খাওয়ানো, পাশ করি আর ফেল করি।

'দেখা যাবে'—শুভ সমরকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ল হারুদার ফ্রেন্ডস্ গ্রিলে।

হারুদা ওরফে হারাধন ঘোষ এখানে সর্বজনপরিচিত। কলকাতা থেকে কারিগর আনিয়ে তিনি এখানে হোটেল ব্যবসা ফেঁদেছেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবসা বেশ জমিয়ে তুলেছেন। সে জন্য সারাক্ষণই ভিড় লেগে থাকে ফ্রেন্ডস গ্রিলে।

শুভদের অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা ফিরে এল গরম কাটলেটের ঠোঙা হাতে নিয়ে ঘ্রাণ টানতে টানতে। ইতিমধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু পালটে গিয়েছে। পরীক্ষার বদলে বাংলা বনাম সাও পাওলোর খেলা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ব্রাজিলের ঘরোয়ানায় সাও পাওলোর ক্রীড়ানৈপুণ্য নিয়ে যখন তর্ক তুঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্তে স্যালাড্‌ সহ কাটলেট পরিবেশন করা হল উপস্থিত সকলকে। ব্রেস্ট কাটলেটের সুগন্ধে রুম নম্বর ফরটিনাইন ম-ম করে উঠল।

কলেজ ফেরত সকলেই। খুবই খিদে পেয়েছিল। কাটলেট হাতে পাওয়া মাত্র সকলেই প্রায় এক সঙ্গেই চোখ বুজিযে তার ওপর কামড় বসাল।

কাটলেটের রসাস্বাদনে যখন সকলেই পুলকিত হঠাৎ ভেজানো কপাট জোড়া খুট করে খুলে গেল। মুখ বাড়াল হস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আশু সরকারের ছেলে শিবু। সত্যজিতের দিকে তাকিযে বলল, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। বিশেষ দরকার।

ঘটনাটা প্রত্যাশিত নয। হস্টেলে কোনও অঘটন ঘটলে মিঃ সরকার অনেক সময সত্যজিৎকে ডেকে পাঠান। চুরি চামাবিতে তো বটেই।

কিন্তু সেদিন তেমন কিছু না ঘটা সত্ত্বেও হঠাৎ ডেকে পাঠানোটা তাব কাছে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর ঠেকল। তবে সত্যজিৎ যে-কাবণেই হোক বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিল না। পুনরায সে খেলার আলোচনায মনোনিবেশ করল। শুভ সবব হল। বললে, সাও পাওলো টিম ব্রেজিলের ঘরোযানা বলেই প্রত্যাশাটা আমাদের আকাশ ছোঁওযা ছিল। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটাও মনে রাখা দরকার তাদের খেলোয়াড়েরা সকলে কুড়ি ছোঁওয়া ছিল। অনেক কিছু শেখা এখনও বাকি তাদের। পরিণত বযসে এরাও কমতি যাবে না। সমবজিৎ তাকে সমর্থন জানিযে বলল, তা ঠিক! পেলেও তো একদিনে পেলে হযনি। সেজন্য তাকেও দীর্ঘদিন সাধনা করতে হয়েছিল। সাও পাওলোর ব্যর্থতার বিপক্ষে ও স্বপক্ষে যখন বিতর্ক জমজমাট, সত্যজিৎ হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিল। জামায মুন্ডুটা গলিযে নিযে 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিঃ সরকার খুব মনোযোগ সহকারে প্যাডের ওপর কী যেন লিখছিলেন। সত্যজিৎ বেল টিপতেই তিনি বলে উঠলেন, ইযেস, কাম ইন।

সত্যজিৎ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই ঘরে ঢুকল। মিঃ সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, গুড মর্নিং স্যার—

মিঃ সরকার ইশারায় সত্যজিৎকে একমিনিট অপেক্ষা করতে বলে, লেখাটা শেষ করায় মন দিলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিঃ সরকার খুব তাড়াতাড়িই লেখাটা শেষ করলেন। সত্যজিৎ অবশ্য তার মধ্যেই ঘরের সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লিয়ে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে বুক-কেস্ থেকে কিছু বই চুরি গিয়েছে আপনার। মিঃ সরকার প্রায় সাপের গায়ে পা পড়ার মতোই চমকে উঠলেন। স্ট্রেঞ্জ! কাকপক্ষীও এখনও টের পায়নি, অথচ তুমি জানলে কী করে?

সত্যজিৎ মুচকি হাসল। চোখ থাকলে সবই জানা যায়। অবশ্য জানার ইচ্ছেও থাকা চাই।

মিঃ সরকার মৃদু হেসে বললেন, কীভাবে?

সত্যজিৎ তাঁর চেয়ারের পিছনের বুক-কেসটার দিকে অঙুলি-নির্দেশ করে বলল, আপনার বুক-কেসের দু নম্বর তাকে রবীন্দ্ররচনাবলীর যে সেটটা রয়েছে, তার মাঝখানে আনুমানিক চার খানার মতো বই নেই। আপনার টেবিলেও দেখতে পাচ্ছিনা। অথচ এটাই তো আপনার স্টাডি রুম। আপনার পুত্রেরও এখন রবীন্দ্ররচনাবলী পড়ার মতো মানসিকতা তৈরি হয়নি। এ থেকেই মোটামুটি ধরে নিতে পারি বই কখানা আপাতত বেহাত হয়েছে। আপনিই বলুন আমার অনুমান ঠিক কিনা।

মিঃ সরকার মাথা নেড়ে বললেন, সেন্ট পার্সেন্ট। এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত এই রবীন্দ্ররচনাবলীর সেটটা পঁচাত্তর টাকায় কিনেছিলাম। অবসর মুহূর্তে একটু নাড়াচাড়া করতাম আর-কি। কিছুটা একঘেয়েমি কাটানো বলতে পারো।

কিন্তু সেদিন সকালে এক রিলেটিভ এসেছিল। ঘরের দরজা খোলা রেখেই তাকে বাসে তুলে দিতে গেছিলাম। বাস এসেছিল অনেক দেরি করে। তা প্রায় আধঘন্টা হবে। বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসে দেখি বুক-কেসের পাল্লা খোলা। সাত থেকে দশ এই চার খণ্ড বইও উধাও। আমার পরিবারে চার খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী একসঙ্গে নিয়ে বসে পডার মতো অবসর কারুর নেই। নিলেও আমাকে জানিয়ে নেবে।

—তাহলে আর কে নিতে পারে?

—তোমার জ্ঞাতার্থে জানাই, সাধারণত দুই ধরনের আউটসাইডার এখানে আসে। এক ছাত্ররা। দুই হস্টেলের পিওনরা। ছাত্ররা আসে এখানে বসবাস সম্পর্কিত নানা অভিযোগ নিয়ে। আর পিওনরা আসে হস্টেলের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি সই করাতে। আমার বিশ্বাস এদের মধ্যেই কারুর কীর্তি এটা। রাস্তার লোকের নিশ্চয়ই এতখানি সাহস হবে না হস্টেলের মধ্যে ঢুকে, আমার ঘর থেকে চার খণ্ড বই নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যাবে। এখন সমস্যা হল স্বচক্ষে দেখিনি যখন তখন কাউকেই সরাসরি দোষারোপ করতে পারছি না। অযথা শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি বল। অথচ আমিও আশঙ্কিত এই চোরটি সম্পর্কে। একবার সে হাত বাড়িয়েছে যখন, ভবিষ্যতেও কি আর না বাড়াবে? তাই চোরটিকে আমি দেখতে চাই। কিন্তু সেটা তো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। পুলিশে খবর দিলে এখুনি একটা হইচই হবে। সন্দেহক্রমে পুলিশ কাকে যে লক-আপে পুরবে, কিচ্ছু বলা যায় না। সে আর এক অশান্তি, যা আমি একেবারেই পছন্দ করিনি। তাই তোমাকে স্মরণ করেছি। ইতিমধ্যে তুমি গোয়েন্দাগিরিতে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ তাতে ভবিষ্যতে তোমার নাম করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এখন এই ব্যাপারেও যদি তুমি একটু মাথা ঘামাও—এই আর-কি!

সত্যজিৎ নীরবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত বুক-কেসটার দিকে। তারপর হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল সেদিকে।

খুবই নিবিষ্ট মনে সে বইয়ের তাকটা পরীক্ষা করল এবং তার ডায়েরিতে কিছু কিছু টুকতে লাগল। প্রায় মিনিট কুড়ির মতো সেখানে কাটিয়ে সে ফিরে এল তার চেয়ারে।

ডায়েরিটা পকেটস্থ করে বলল, কেস টেক-আপ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে কয়েকটা শর্ত সাপেক্ষে।

মিঃ সরকার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সব শর্তেই রাজি। বল আমায় কি করতে হবে।

সত্যজিৎ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে সোজা-আঙুলে ঘি ওঠার নয়। সেজন্যই আপনার সাহায্য চাই। এই চুরির কথা আপনি ঘুণাক্ষরেও কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না—এক। দুই—চুরি যাওয়ার ফলে তাকে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে ওখানটা অবিকল ওইরকমই থাকবে। ফাঁক-ফোকর অন্য কোনও বই দিয়ে ভরানো চলবে না। তবে একরাতের জন্য অবশিষ্ট রবীন্দ্ররচনাবলীগুলো আমি চাই। কাল সকালে ফেরত দিয়ে দেব। বই পেলে আপনি যেভাবে এখন সাজানো আছে, ঠিক সেইভাবেই সাজিয়ে রেখে দেবেন। কোনও রকম নড়চড় যেন না হয়। অর্থাৎ চোর পুনরায় ঘরে ঢুকলে যেন তার ধারণা হয় এই চুরি আপনার লক্ষ্যেই পড়েনি বা আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি।

মিঃ সরকার খুব নিবিষ্ট মনেই সত্যজিতের শর্তগুলো শুনছিলেন। চুরির ব্যাপারে এই কৃত্রিম ঔদাসীন্য দেখানো তাঁর একেবারেই মনঃপূত হল না। কিন্তু যেহেতু তিনি পূর্বেই তার শর্ত মেনে নিয়েছেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে তাঁকে সায় জানাতে হল।

মিঃ সরকার নিজেই পাড়লেন বইগুলো এক এক করে। ন'টা বইয়ের ওজন নেহাৎ কম নয়। কাগজে মুড়ে, শক্ত করে বাঁধলেন তিনি। সত্যজিতের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নিয়ে যেতে পারবে, নাকি পিওনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব?

শেষোক্ত প্রস্তাবে সত্যজিৎ প্রায় আচমকা বাঘ সিংহ দেখার মতোই হাঁ-হাঁ করে উঠল। বললে, আপনি আমায় ডোবাবেন দেখছি। বললাম, সবকিছুই গোপন রাখতে হবে। আর আপনি কিনা পিওনকে ডাকছেন। যে পিওনকে ডাকছেন সেই যে চোর নয় এমন কোনও প্রমাণ কি আপনি দিতে পারবেন?

কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে মিঃ সরকার বললেন, আই অ্যাম স্যরি সত্যজিৎ।

ওদিকে সত্যজিৎ ঘর ছেড়ে গেলেও আড্ডা বন্ধ হয়নি। চলছিল যথারীতি। তারপর একে একে সবাই চলে গিয়েছে। শুভ আর সমরজিৎ মুখোমুখি বসে গল্প করছিল। খেলার গল্প পেলে ওরা আর কিছু চায়না।

সত্যজিৎকে হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে ওরা কিছুটা বিস্মিতই হল। সেটা লক্ষ করে সত্যজিৎ মুচকি হেসে বললে, রসদ এনেছি। তৈরি হ। আবার অগ্নিপরীক্ষা সামনে।

মিঃ সরকার যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেটা তাদের অজানা নয়। কিন্তু প্যাকেটের মধ্যে রসদ আনাটা তাদের কাছে কিঞ্চিৎ কৌতূহল সৃষ্টি করল। রসদের নামে কী জিনিস হতে পারে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল তাদের দুজনের মধ্যে।

সত্যজিৎ দরজায় হুড়কো দিতে দিতে হেসে বললে—রসদ এবারে রবীন্দ্ররচনাবলী। কাগজের প্যাকেটটা খুলে সে মেলে ধরল তাদের চোখের সামনে। বই দেখে তাদের কৌতূহল একটুও কমল না, বরং বেড়েই গেল। দুজনে একসঙ্গে সত্যজিৎকে ধরল প্রকৃত ঘটনাটা বলার জন্য।

ইতিমধ্যেই মোটামুটি কিভাবে এগুবে সত্যজিৎ মনেমনে তার একটা ছক্ তৈরি করে ফেলেছিল। ওদের কাছে পুরো ঘটনাটা বলে বলল, সামান্য চুরির ঘটনা বটে। কিন্তু যেহেতু গোপনে তদন্ত চালাতে হবে, আমাদেরও সাবধান হওয়া খুবই প্রয়োজন। একটা কথা মনে রাখিস। আমরা যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি তা যেন কোনক্রমেও ফাঁস না হয়ে যায়। আরও দু-বছর আমরা হস্টেলে থাকব। চোর হোক বা না হোক

যারা আমাদের সন্দেহভাজন হবে তারা নিশ্চয়ই আর আমাদের বন্ধু বলে গণ্য করবে না। সেটা আমাদের এই হস্টেলে থাকার পক্ষে ক্ষতিকরই বলতে পারো।

কথাগুলো প্রায় ঝড়ের গতিতেই উচ্চারণ করল সত্যজিৎ। তারপর একমিনিট নীরব থেকে বললে, এবার তাহলে কাজ শুরু করা যাক। কী বলিস? আমাদের ত্রিমুখী অভিযান চালাতে হবে। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন্।

শুভ দেখবে ছাত্রদের দিকটা। অর্থাৎ হস্টেলে যেসব রবীন্দ্র-ভক্ত ছাত্র আছে তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে তাদের ঘর এবং স্যুটকেসে তল্লাসি চালাতে হবে। যদি কারুর ঘরে বইগুলোর অস্তিত্ব মেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে আমাকে। তেমনি সমরের দায়িত্ব থাকবে যে-কজন পিওন মিঃ সরকারের ঘরে যাতায়াত করে তাদের চাল-চলনের ওপর নজর রাখা। কারুর আচরণে মাত্রাতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে আমাকে। যেমন ব্যয়াধিক্যের প্রবণতা। আমিও অবশ্য একটা নতুন ধরনের ফাঁদ পাতছি। তাতে যদি চোর ধরা পড়ে যায় তাহলে তো ভালোই। এখন দেখা যাক ঘুঘু সে ফাঁদে পা দেয় কিনা।

সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে দুজনের সঙ্গে করমর্দন করল। নতুন কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সে এইভাবেই করমর্দন করে।

যোগ্যতা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানোর জন্য শুভ আর সমরজিৎ দুজনেই খুবই আগ্রহী হয়ে উঠল। কিভাবে তারা তাদের কাজ শুরু করবে, তাই নিয়ে অনবরতই শলা পরামর্শ চালাতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

সত্যজিতের মধ্যে কিন্তু কোনওরকম উত্তেজনা ছিল না। রবীন্দ্ররচনাবলী ন'খণ্ড নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে চোখ বোলাল কিচুক্ষণ। প্যাডের কাগজে দুলাইন কী যেন লিখে নিজের মনেই হেসে স্বগতোক্তি করল, ''দেখি চারে মাছ পড়ে কিনা।''

মিঃ সরকার ঘরেই ছিলেন। সত্যজিৎ বইয়ের প্যাকেটটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি সাদর আহ্বান জানালেন তাকে। কোচে বসিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এখন আমায় কি করতে হবে বল।

সত্যজিৎ হাসল,—নতুন কিছু নয়। চুরি যাবার পর বইগুলো যেমন অবস্থায় ছিল সেইভাবেই রেখে দিন। বুক-কেসের পাল্লা বন্ধ করবেন না। আর যে সময় সেদিন চুরি হয়েছিল, সেই সময়টায় আপনি মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। অর্থাৎ ধরে নিন চোর আশেপাশেই আছে। সুযোগ পেলেই আবার যেন সে আপনার ঘরে ঢুকতে পারে এবং বাকি বইগুলো সরানোর ব্যাপারে সফল হতে পারে।

মিঃ সরকার ঘাড় নাড়লেও একটু বিরক্ত হলেন। চোরকে এভাবে ঘরে প্রবেশের সুযোগ দিতে তাঁর মন একেবারেই চাইছিল না। কিন্তু শর্তানুযায়ী তাঁকে সত্যজিতের ইচ্ছা পূরণের আবেদন মেনে নিতেই হল।

দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। সত্যজিৎ সেদিন নিবিষ্ট মনে তার ডায়েরিতে চোখ বোলাচ্ছে, হঠাৎ শুভ এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বসল তার সুমুখে। বলল, রুম নম্বর থারটিনাইনের দীপঙ্কর দে সাসপেক্টেড। তাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি।

সত্যজিৎ চোখ তুলে তাকাল তার মুখের দিকে,—গন্ধ কিছু পেয়েছিস নাকি?

শুভ ফিস্ ফিস্ করে বললে, ডেফিনিটলি। বই চুরি করার মতো মানসিকতা যাদের আছে আমি প্রত্যেকের বিছানা, পড়ার টেবিল এবং স্যুটকেস নানা কৌশলে অনুসন্ধান

করেছি, কিন্তু কোনওরকম সূত্র পাইনি। কিন্তু দীপঙ্কর স্যুটকেস দেখাতে রাজি হয়নি। অথচ ওর স্যুটকেসটা অসম্ভব রকম ভারী ছিল। নানা অজুহাতেই সে এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে ওর মধ্যেই ওই চার খণ্ড গ্রন্থাবলী থাকা কিছু মাত্র আশ্চর্য নয়। আর সেই কারণেই হয় তো দেখাতে চাইছে না সে স্যুটকেসটা।

সত্যজিৎ শুভর কথাগুলো সংক্ষেপে তার ডায়েরিতে লিখে নিল। গলার স্বর অনেক নীচে নামিয়ে বললে, দীপঙ্করের সঙ্গে আরও একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হ'। একটু বেশি নজর রাখ্। ওর স্যুটকেসের ভেতরটা যেভাবেই হোক দেখতেই হবে।

সমরজিৎও পিছপা নয়। তার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করতে আরও একদিন বেশি লাগল।

কলেজ হস্টেলের যে পাঁচজন পিওন ছিল, প্রত্যেকের বেতনের পাতায় চোখ বুলিয়েছে সে। চারজনই পুরো মাইনে পায়। কেবল একজনের কিছু ঋণ কাটা যায় বেতন থেকে। অভাবের জন্য যদি কেউ চুরি করে একমাত্র সে-ই করতে পারে।

এখন তার মনোভাব কিভাবে জানা যায়, সেই ব্যাপারেই সে কিছু পরামর্শ চাইল সত্যজিতের কাছে। সত্যজিৎ তাকেও নিরাশ করেনি। বললে,—ওর গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখা দরকার। বিশেষ করে পুরনো বইপাড়ায় ওর যাতায়াত আছে কিনা সেটা জানার জন্য।

দেখতে দেখতে আরও সাতদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে নতুন আর কোনও ঘটনা ঘটেনি।

সেদিন সত্যজিৎ সবেমাত্র কলেজ থেকে ফিরে জামা খুলছে, মিঃ সরকার স্বয়ং এসে হাজির তার ঘরে। সত্যজিৎকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, সকালে যখন মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিলাম ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বাকি ন'খানা বইও চুরি হয়ে গিয়েছে ঘর থেকে।

শুনে সত্যজিতের চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। বললে, তাহলে আমার অনুমানটা প্রায় মিলছে, কি বলেন! এখন দেখা যাক সবটুকু মেলাতে পারি কিনা।

মিঃ সরকার ম্লান হেসে বললেন, না মিললে কিন্তু অনেক লোকসান। অত সস্তায় রবীন্দ্ররচনাবলী এখন আর পাওয়া যাবে না কোত্থাও।

মিঃ সরকার চলে যাবার পর সত্যজিৎ একাকী ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তার মন বলছিল এবারেও তার চেষ্টা বিফল হবে না। সে সফল হবেই। পরের দিন সকালে যখন যে ক্লাবরুমে আড্ডা মেরে সবে ওপরে উঠেছে, হঠাৎ তারই সতীর্থ পলাশ তার নাম ধরে ডাকতে লাগল উঠোন থেকে।

প্রথম ডাকই তার কানে পৌঁছেছিল। নীচে নামতেই সে মুখোমুখি হল যাঁর সঙ্গে, তাঁকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। দীর্ঘকায় চেহারা। পরনে দামি বাদামি রংয়ের স্যুট। হাতে অ্যাটাচি কেস। জীবিকা অধ্যাপনা বলেই মনে হয়।

সত্যজিৎ তার নিজের পরিচয় দিতেই আগন্তুক হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। বললেন, আমি স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল রজত হালদার। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎপ্রার্থী।

সত্যজিৎ সাদরে তাঁকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল।

আগন্তুক অ্যাটাচি কেস খুলে একখানা রবীন্দ্ররচনাবলী বার করলেন। প্রচ্ছদ তুলেই প্রথম পৃষ্ঠায় দুলাইন লেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই হস্তাক্ষর কি আপনার, দেখুন তো ?

সত্যজিৎ ঘাড় নাড়ল। বইখানা হাতে তুলে নিয়ে সহাস্যে বললে, বইপড়ার অভ্যাস আমার ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু হস্টেলের ব্যাপার বোঝেনই তো। অনেক বাইরের লোক ঢোকে এখানে। সুযোগ পেলেই ঘর থেকে বই চুরি করে নিয়ে যায়। তাই আমি আমার সব বইতে এই রিওয়ার্ড আর আমার ঠিকানাটা লিখে রাখি। চোরেরা সাধারণত এই সব বই পুরোনো বইয়ের দোকানে বেচে। সেখান থেকে আবার যাঁরা কেনেন, তাঁরা যাতে আমার হদিস পান সেইজন্যই এই পরিকল্পনা। আর রিওয়ার্ড অঙ্গীকার করি এই কারণে বইটা কিনতে বা আমার ঠিকানা খুঁজে আসতে তো একটা খরচ আছে। সেটাই বা তাঁরা দেবেন কেন পকেট থেকে ?

আগন্তুক হা- হা করে হেসে উঠে বললেন, পরিকল্পনাটা যে আপনার অভিনব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ সমস্যা আমাদেরও আছে।

সত্যজিৎ আর এই প্রসঙ্গের জের টানতে চাইল না। বললে, বইটা আপনি কত টাকার বিনিময়ে কিনেছেন বলেন যদি বাধিত হব।

আগন্তুক আবার হাসলেন। মাত্র দশ। এই মূল্যটুকু দিলেই হবে। রিওয়ার্ডের কোন প্রয়োজন নেই।

সত্যজিৎ যে একটু পীড়াপীড়ি না করল তা নয়। কিন্তু আগন্তুক রাজি হলেন না। সৌজন্য রক্ষার জন্য সত্যজিৎ তাঁকে চা পানে আপ্যায়িত করল।

চা খেতে খেতেই আবার কথা শুরু হল।

সত্যজিৎ বলল, বইটা আপনি কোন্ বুক-শপ থেকে কিনেছেন কাইন্ডলি যদি বলেন—

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, নিশ্চয়ই। এতে লুকোচুরির কোনও প্রশ্নই নেই। স্টেশন রোডে বলরাম ওল্ড বুকস্ শপ বোধ হয় দেখেছেন। ওখান থেকেই কেনা। সেদিন আমার কাছে বেশি টাকাও ছিল না। ওই এক খণ্ডই এনেছিলাম। তবে ওরা সামনের সপ্তাহে কমপ্লিট সেট-টা দেবার চেষ্টা করবে বলেছিল।

—তাই নাকি ? সত্যজিৎও খানিকটা হা-হা করে হাসল। তাহলে সাবধান হওয়া খুবই প্রয়োজন বলছেন।

আগন্তুককে বিদায় দিয়ে সত্যজিৎ বইটা নিয়ে সোজা চলে এল নিজের ঘরে। শুভ বা সমরজিৎ কেউই তখন ঘরে ছিল না। ঘটনাটাও কেউ জানল না।

সন্ধ্যাবেলায় তিনজনে একত্রে বসল। শুভ পকেট থেকে একখণ্ড চিরকুট বার করে তার হাতে দিয়ে বলল, দীপঙ্করের স্যুটকেস সার্চ করার কোনও অবকাশ পাচ্ছিনা। তবে ওর স্যুটকেসের মাপটা দেখে নিয়েছি। মোটামুটি এইরকম।

সত্যজিৎ একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ইমপসিবল।

সমরজিৎও উপস্থিত ছিল সেখানে। সত্যজিৎ তাকে কিছু প্রশ্ন করার পূর্বেই সে বলল—তুই বললি বটে কিন্তু ওদের গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখা কি সোজা কথা ? অনবরতই তো ঢুকছে বেরুচ্ছে। তাহলেও চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি ওর এক খুড়তুতো ভাই স্টেশনে হুইলার বুকস্টলে কাজ করে।

সত্যজিৎ একমিনিট ভ্রূ কুঁচকে কি ভেবে বলল,—নো নো দ্যাট কানট্ বি।

তার এই গর্বোক্তির কারণ আর যাই হোক, বলরাম ওল্ড বুকস্ শপের ঠিকানা তার মুঠোয়, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। পরের দিনই বেলার দিকে সে দৌড়ল সেখানে।

বলরাম ওল্ড বুকস্ শপের মালিক ত্রিভুবন পাণ্ডার সঙ্গে প্রথমে একটু গায়ে পড়া আলাপ জমাল সে। বললে—আমার মামা আপনার দোকান থেকে এই রবীন্দ্ররচনাবলী-খানা কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি বাকিগুলোও দেবেন বলে মামাকে কথা দিয়েছেন। মামা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই আসতে পারছেন না। আপনাকে যে এই রচনাবলী বিক্রি করেছে তাকে যদি একবার মামার কাছে পাঠিয়ে দেন ভালো হয়। তিনি আরও কিছু বই কিনতে চান। সেগুলো তার পক্ষে জোগাড় করে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা তিনি কথা কইবেন।

প্রস্তাব শুনে ত্রিভুবন একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সত্যজিতের দিকে। কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, সরাসরি তার কাছ থেকে বই কিনলে আমার লাভ কী? আমি তো এখানে ব্যবসা করতে বসেছি, না কি?

সত্যজিৎ হেসে বললে, এ ব্যাপারে টাকা পয়সার যা কিছু লেনদেন সব আপনার মাধ্যমেই হবে। তবে ডেলিভারিটা ওখানেই দিতে হবে। এতে আপনার আপত্তির কী থাকতে পারে?

ত্রিভুবন এক মিনিট ভেবে বললে ঠিকানাটা দিয়ে যান। কাল বিকেলে আসবে। পাঠিয়ে দেব।

সত্যজিতেরই সতীর্থ কেশব দাসের মামার বাড়ি কাছেই। সেই ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল ত্রিভুবনকে। কথামতোই কেশবের বাইরের ঘরে মিঃ সরকার, সত্যজিৎ, শুভ, সমর ও কেশবের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিকেল তখন পাঁচটা হবে। কে যেন সদরের কড়া নাড়তে লাগল।

কেশব গিয়ে খিল খুলতেই আগন্তুক বললে—বড়বাবু আছেন? আমি বলরাম ওল্ড বুকস্ শপ থেকে আসছি।

কেশব অল্পবিস্তর ঘটনাটা জানত। তাকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজাই বসার ঘরে ঢুকে পড়ল।

মিঃ সরকার বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই আগন্তুক ওরফে হস্টেলের ঠাকুর চরণ চমকে উঠল। হাতে বইয়ের ব্যাগটা আড়াল করতে করতে বললে—বাবু, আপনি এখানে?

মিঃ সরকার এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—একই প্রশ্ন তো আমারও।

চরণ খুবই চতুর। একটা বোকাহাসি মুখে ছড়িয়ে 'আচ্ছা আসি' বলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল ঘর থেকে।

পথ আগলাল শুভ আর সমরজিৎ। চরণ চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিল ঘরের আবহাওয়া।

এবার সে বলপ্রয়োগ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওরা চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল তাকে। টেবিলের ওপরেই ফোন ছিল।

কেশব ফোন করল পুলিশ স্টেশনে। রবীন্দ্ররচনাবলীর বাকি খণ্ডগুলি সমেত হাতে-নাতে গ্রেপ্তার হল চরণদাস পাণ্ডা।

থানার ওসি বিশ্বপতি শতপতি পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন। তাকে প্রিজন ভ্যানে তোলার পর অপরাধী সম্পর্কে মিঃ সরকারের সঙ্গে আলোচনার অবকাশে সত্যজিৎকে ডেকে পাঠালেন।

মিঃ সরকার সত্যজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদেরই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র এই সেই তরুণ গোয়েন্দা সত্যজিৎ চৌধুরী। অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে যাবতীয় কৃতিত্ব এরই প্রাপ্য।

ওসি সত্যজিতের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, একজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হিসাবে এ প্রতিভা তোমার কম প্রশংসার যোগ্য নয়। তবে তুমি সত্যিই যদি বড় হতে চাও সাধনা করতে হবে। আশা করি সে সাধনা তোমার অব্যাহত থাকবে। অপরাধী ধরার ব্যাপারে মনে হচ্ছে তুমি কিছু অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছ। কী পরিপ্রেক্ষিতে সেটা নিলে যদি সংক্ষেপে বল খুবই খুশি হব।

সত্যজিৎ মনে মনে কিছুটা তৈরিই ছিল। তাই বিশেষ আর সময় নষ্ট না করেই বলতে শুরু করল।

মিঃ সরকার তাঁর চার খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী চুরির ঘটনাটা নিয়ে একেবারেই হৈ চৈ করতে চাননি। তাঁর ঘরে সাধারণত হস্টেলের ছাত্র এবং কলেজ-হস্টেলের কয়েকজন পিওনের যাতায়াত ছিল। তাঁর ধারণা ছিল তাদের মধ্যেই কেউ এতে চক্ষুদান করেছে। হাতে-নাতে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা তো সঙ্গত নয়। তাহলে এত দিনে সকলের সঙ্গে তাঁর যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সবই নস্যাৎ হয়ে যাবে। আর সেই কারণেই উনি আমার সাহায্য চাইলেন; অর্থাৎ কাকপক্ষী টের না পাইয়ে অপরাধী পাকড়াও করাতে চাইলেন আমাকে দিয়ে। চুপিসাড়ে অপরাধী ধরা খুবই কঠিন কাজ। আমার দুই সহকারীকেও সেইভাবে তালিম দিতে হল। বুক-কেসে অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমি প্রথম কাজ শুরু করি। লক্ষ করি বইয়ের গায়ে হালকা ধুলোর আস্তরণের ওপর কোনও হাতের ছাপ পড়েছে কিনা। না। চোর সে সূত্র রেখে যায়নি। এলোমেলো ভাবেই সে বই টেনে নিয়েছে। এ থেকে একটা ধারণা হল চোরের বাংলা বিদ্যেবুদ্ধি নেহাতই কম।

আমার সতীর্থ এবং সহকারী দুই বন্ধুকে ক্লু খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট সূত্রের রেশ ধরে এগুতে পারছিলাম না তাই শেষপর্যন্ত একটা সামগ্রিক পরিকল্পনারও আশ্রয় নিতে হল আমাকে। চোরকে বাকি বইগুলোও চুরি করার ব্যাপারে প্ররোচিত করতে আমি মিঃ সরকারকে ঘর ও বুক কেস খুলে রাখতে অনুরোধ জানালাম। এবং মাঝে মাঝে ঘরে অনুপস্থিত থাকতে উপদেশ দিলাম।

অবশ্য এর মধ্যেই আমাকে চার ডিয়ে রাখতে হল। চোর ওই বই বাজারে বেচে দেবে ধরে নিয়েই আমি পরবর্তী খণ্ডগুলোও তার নাগালের মধ্যে সাজিয়ে রাখলাম। যে দোকান বা যে ব্যক্তিই তার কাছ থেকে ওই বই কিনুক না কেন, বাকি খণ্ডগুলিও তার কাছ থেকে তারা পেতে চাইবে।

সেই দোকান বা সেই ব্যক্তির হদিস পেতেই আমি বাকি ন'খণ্ড বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হরফের মাধ্যমে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে লিখলাম, 'স্মৃতিবহুল এই বইটি আমি স্বেচ্ছায়

বিক্রি করিনি। অসাবধানতাবশত চুরি গিয়েছে। বইটি যদি আপনার হস্তগত হয় অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিন। আপনার ক্রয়মূল্য ছাড়াও অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত রইলাম।'

ওদিকে শুভ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না। শুধু দীপঙ্করের স্যুটকেসের অস্বাভাবিক ওজন তাকে ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু অনেক ছুতো করেও সে তার স্যুটকেস খোলাতে পারেনি। ও যখন একটা রিপোর্ট করল আমার কাছে, আমি ওকে ওই স্যুটকেসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ কতটা জানবার জন্য পরামর্শ দিই। এটা সংগ্রহে তার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। আমি তখন ওই তেরো খণ্ড গ্রন্থাবলী একত্রে রাখলে কমপক্ষে কতখানি জায়গা দরকার সেটা অঙ্ক কষে বার করলাম। মিলল না। ওর স্যুটকেসের যা ক্ষেত্রফল আট খণ্ডের বেশি বই তাতে ধরার কথা নয়। আমার অন্যতম সহকারী সমরজিৎ অভাবগ্রস্ত বলে যে পিওনটাকে সন্দেহ করল সে কিন্তু আদৌ অভাবগ্রস্ত ছিল না। তা ছাড়া তার এক খুড়তুতো ভাই স্টেশনে হুইলার স্টলে কাজ করলেও, রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী চুরি করে সেখানে বিক্রি করা অসম্ভব ব্যাপার। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার লটারি করেই বিক্রি করেছিল। আমি যখন মোটামুটি দ্বিধাগ্রস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তেই স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল রজত হালদার এসে হাজির। তিনি একখণ্ড কিনেছেন। বাকি খণ্ডগুলো কিনবেন বলে কথা দিয়ে এসেছেন। বইতে আমার লেখাটা পড়েই তিনি এসেছিলেন বই ফেরত দিতে।

বইয়ের দোকানের নামটা পেয়ে গেলাম তাঁর কাছ থেকে, যে-জন্যেই আমার এত তোড়জোড়। বইয়ের দোকানের মালিক ত্রিভুবন পাণ্ডাকে কিন্তু একেবারেই বুঝতে দিলাম না ব্যাপারটা। কারণ সে ব্যবসায়ী। যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে লাভের অঙ্ক বেশি সেইদিকেই সে ঝুঁকবে। তাই কিছুটা অভিনয় করলাম। চোরকে সরাসরি ধরা দেবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। অবশেষে চোর ধরা দিল। তবে হস্টেলের রান্নার ঠাকুর চরণ যে এই কীর্তির নায়ক এটা আমাদের কারুরই মাথায় আসেনি। আই অ্যাম্ স্যরি ফর দ্যাট।

সত্যজিৎ এক ঝলক মুচকি হাসল মাত্র।

ফটিকের কেরামতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পলকা। সে উঠে হ্যারিকেনের আলোটা উস্কে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়! চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে। কারণ, চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, ''কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?''

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, ''জানালা খোলো। দরকার আছে।''

''কী দরকার?''

''তোমার কিছু রোজগার হবে।''

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড় ভালোবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনের বেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতের বেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করে। কিন্তু দুটোর কোনওটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ চলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানালাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নিচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, ''ওটা একটা পিস্তল। গুলিভরা। সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।''

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, ''আজ্ঞে এ যে ভয়ঙ্কর জিনিস।''

''শুনতে ভয়ঙ্কর, ব্যবহার করা খুব সোজা।''

''কাজটা কী বলবেন?''

''বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হল, গোলেমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁ দিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, ব্যস।''

"ওরে বাবা!" ফটিক ঘামতে লাগল।

"কোনও ভয় নেই। সন্ধে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষ্যই করবে না। কাজ সেরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফেলবে। তাড়াহুড়ো না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরও পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।"

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, "তা বঙ্কুবাবুকেও কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না? আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।"

"আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।"

"আমি কি পারব আজ্ঞে?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা। খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তলটা দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখেনি আগে। বিদ্ঘুটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হল না। সারা রাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাতযশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাতের জোগাড় হলে সে কস্মিন্‌কালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে—কী সব্বোনেশে কথা! ঘনঘন জল খেতে-খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় বসে রইল ফটিক। তার বাটিভর্তি পান্তা পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না। কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাঁকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মেলা পয়সা। চার-পাঁচ রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গা ঘেঁষেই। রোজ দু'বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

এদিকে ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে যে কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনওটাই মনোমতো নয়। একবার মনে হল, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা তার পেছনে

লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছে যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই যে খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠাণ্ডা হল। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা? খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই বা খুনটা করাতে চায় কেন? বঙ্কুবাবুকে মেরে তার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাসতিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল। সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাটিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিঁড়ে আর গুড়। তবে বড় ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের কানে একটা কথা এসেছিল। বঙ্কুবাবু যেন কাকে বলছেন, "ওই গ্যাঁড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।"

এই গ্যাঁড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোষকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজল। তারপর গায়ে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলস্কর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে দরোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড়-বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, "এই যে!"

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "আজ্ঞে, আমি না। আমি কিছু করিনি।"

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি-হা মুখ করে বললেন, "তুই ফটিক না?"

"যে আজ্ঞে।"

বঙ্কুবাবু হাসি-হাসি মুখ করেই বলেন, "একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপুরি রাখা আছে। আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।"

ফটিক ধাতস্থ হল। আঁতকে ওঠার ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল তো এ লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। সে হঠাৎ বলে বসল, "লোক নেই কেন বঙ্কুবাবু? গ্যাঁড়াকেই তো পাঠাতে পাবেন।"

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "গ্যাঁড়া! গ্যাঁড়াটা আবার কে?"

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "ওই যে, আপনার কী যেন হয়!"

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধ হয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তো সাহস কম নয়! জামাইকে দিয়ে সুপুরি আনাতে বলছিস! আর আমার বড় জামাই কি তোর ইয়ার যে গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া করছিস?"

ফটিক হাতজোড় করে বলল, ‘‘আজ্ঞে আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কত ভুলভাল বলে ফেলি!’’

‘‘যা সুমুখ থেকে। সুপুরিটা নিয়ে আয়।’’

পথে হাঁটতে-হাঁটতে দুইয়ে-দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান। বড় জামাই গ্যাঁড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিশ দিলেন। তারপর হাসি মুখ করেই বললেন, ‘‘হঠাৎ গ্যাঁড়ার কথা বললি কেন বল দিকি!’’

‘‘আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।’’

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, ‘‘অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।’’

ফটিক বশংবদ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

‘‘কী শুনছিস দাঁড়িয়ে?’’

‘‘আজ্ঞে, গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে!’’

‘‘গালাগাল তোকে দিইনি।’’

‘‘তবে কাকে?’’

‘‘নিজের কপালকে। ওই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল।’’

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু তার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রঙ ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে-ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে।

‘‘বেশ জামাইটি আপনার বঙ্কুবাবু।’’

‘‘হ্যাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।’’

ফটিক লোকটিকে ভালো করে দেখে নিল, যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, ‘‘কে আজ্ঞে?’’

ভারী গলা বলল, ‘‘মনে আছে তো?’’

‘‘খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি?’’

‘‘কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গণ্ডগোল হয় তো মরবে।’’

‘‘আর বলতে হবে না।’’

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভালো করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হল বঙ্কুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আলোয়-আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও সব এসে গেল সন্ধের মুখেই। গোলাপজল ছিটোনো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে ‘‘আসুন, বসুন’’ করছেন। পাশে গ্যাঁড়া। সেও খুব সেজেছে।

বাজি পোড়ানো শুরু হল। বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ করল, গ্যাঁড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে-মনে হাসল। গ্যাঁড়া এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্কুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন শামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে উর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতশবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গ্যাঁড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু।"

গ্যাঁড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, "আমি বঙ্কুবাবু নাকি! আহাম্মক কোথাকার! ওই তো বঙ্কুবাবু।"

ফটিক মাথা চুলকে বলল, "ইশ, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো!"

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "গাধা কোথাকার! যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই।"

ফটিক একগাল হাসল, "বটে! তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো!"

গ্যাঁড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আছে।"

"ঠিক তো!"

গ্যাঁড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "বেয়াদপ কোথাকার!"

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, "এ কী! কী হয়েছে?"

ফটিক গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "হয়নি। তবে হবে।"

"কী হবে ফটিক?"

ফটিক গ্যাঁড়ার দিকে চেয়ে বলল, "বলব বাবু?"

গ্যাঁড়ার মুখটা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

"ফটিক, ব্যাপারখানা কী?"

ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী অপরাধী মুখ করে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, "ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শিগগিব।"

বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তাঁর হাত-উপুড় মানেই পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়সড় মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, "এটা আমারই জিনিস। গ্যাঁড়া গেঁড়িয়েছিল।"

তা কথাটা হল, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

সোমনাথের গোয়েন্দাগিরি

সুভদ্রকুমার সেন

শীতকাল। তার ওপর বিকেলের দিকে হঠাৎ জোর একপশলা ঝড়-জল হয়ে শহরের তাপমাত্রা এক লাফে ঝপ করে দশ ডিগ্রি নেমে গেছে।

রাত আন্দাজ সাড়ে-দশটা এগারোটা হবে। রাস্তায় যানবাহন ও পথচারীর সংখ্যা দুই-ই কম। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওপর নটরাজ হোটেলের পুরনো দোতলা বাড়ি। হোটেল থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা প্ল্যাস্টিকের থলি। রাস্তার দুদিকে একঝলক তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে পা চালালে।

যাদুগোপাল সামন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার বড়বাবু। তিনি সবেমাত্র গরম চায়ের কাপে আরাম করে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছেন আর তখুনি তাঁর সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

''হ্যালো। হ্যাঁ, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা।''

''....''

''কথা বলছি।''

''.....''

''কী বললেন? খুন? মার্ডার? ঠিক আছে, আমরা এখুনি যাচ্ছি। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত ডোন্ট টাচ এনিথিং।''

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যাদুগোপাল কলিং-বেল টিপে একজন কনস্টেবলকে ডেকে গাড়ি বের করবার নির্দেশ দিয়ে সোমনাথকে ফোন করলেন।

''কে, সোমনাথ? আমি যাদুগোপাল সামন্ত বলছি। এইমাত্র নটরাজ হোটেল থেকে খবর এসেছে যে একজন বোর্ডার খুন হয়েছে। আমি যাচ্ছি। যদি কোনও তেমন জরুরি কাজ হাতে না থাকে তো চলো না একবার ঘুরে আসবে। কী বললে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছ। বেশ। আমি এখুনি তোমার কাছে যাচ্ছি।''

সোমনাথকে তুলে নিয়ে যাদুগোপালবাবু যখন নটরাজ হোটেলে এসে পৌঁছলেন তখন হোটেলের আপিস-ঘরের সামনে বোর্ডারদের ভিড় জমে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় যে, সকলেই অল্প-বিস্তর উত্তেজিতভাবে যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে তার সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। ইউনিফর্ম-পরিহিত যাদুগোপালবাবুকে দেখে সমবেত জনতা যেন মন্ত্রবলে একদম চুপ হয়ে গেল। সোমনাথের বেশ মজা লাগল। তার মনে পড়ে গেল যে, তাদের ইস্কুলে মাস্টারমশাইকে আসতে দেখে ক্লাসের গোলমালরত ছাত্ররাও অমনি এক লহমায় চুপ করে

যেত।

"আসুন স্যার।"

"আপনি?"

"আমি স্যার কিশোরীমোহন চাটুজ্যে—এই হোটেলের মালিক।"

"বেশ। কী ব্যাপার বলুন তো কিশোরীবাবু।"

কিশোরীবাবু যা বললেন তার সারমর্ম মোটামুটি এই রকম: নিহত হরশঙ্কর সান্যাল এই হোটেলের প্রায় প্রথম দিককার বোর্ডার। তিনি নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। তাঁর নিজের লোক বলতে এক বৈমাত্রেয় ভাই মণিশঙ্কর। তিনি একটি নামী বিদেশি ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। আর এক ভাগ্নে মহিমারঞ্জন বাগচী, ট্যাংরা অঞ্চলে একটা স্টেশনারি দোকানের মালিক। হরশঙ্কর নিজেও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশ দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। ভদ্রলোক একটু নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই হোটেলের সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল, কথাবার্তাও বলতেন সকলের সঙ্গে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

অন্যদিনের মতো আজও হোটেলের বেয়ারা লালতাপ্রসাদ হরশঙ্করবাবুর ঘরে বেড-টি নিয়ে যায়। দরজা ভেজানো ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে লালতাপ্রসাদ চায়ের সরঞ্জাম ঘরের টেবিলে রেখে যখন বেরিয়ে আসছে, তখন তার নজর পড়ে বিছানার ওপর। সে ছুটে এসে কিশোরীবাবুকে খবর দেয়।

"আমি তো স্যার, লালতাপ্রসাদের কথা বিশ্বাসই করিনি। পরে ব্যাপার দেখে একেবারে চক্ষুস্থির। এ-লাইনে স্যার আমার ছত্রিশ বছর কেটে গেল, কিন্তু এরকম সাংঘাতিক ঘটনা কখনও শুনিনি। আপনারা স্যার আমাকে বাঁচান। হোটেলের একবার বদনাম হয়ে গেলে আর ব্যবসা চালানোই মুশকিল হবে।"

কিশোরীবাবুকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়ে যাদুগোপাল বললেন, "চলুন একবার হরশঙ্করবাবুর ঘরটা আগে দেখে আসি।" তারপর হোটেলের বোর্ডারদের লক্ষ করে বললেন, "আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা কেউ হোটেল ছেড়ে যাবেন না।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানহাতি প্রথম ঘরটা হরশঙ্কর সান্যালের। কিশোরীবাবুকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে যাদুগোপাল আর সোমনাথ ঘরের মধ্যে গেলেন।

ঘরে পা দিয়েই সোমনাথের মনে হল এই ঘরটি নিহত হরশঙ্কর সান্যালের গত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের আবাস। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ পড়ল খাটের দিকে। সোমনাথ এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল। মৃতের মাথায় খুব কাছ থেকে ভারী কোনও কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হয়েছে এবং আঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিছানায়-বালিশে চাপ-চাপ রক্ত। বিছানার সাদা চাদরের ওপরে কী-একটা পড়ে থাকতে দেখে সোমনাথের চোখ চকচক করে উঠল। সে সন্তর্পণে সেটি তুলে নিয়ে নিজের রুমালের ভাঁজে রেখে দিল।

মৃতদেহের কাছ থেকে সরে এসে সোমনাথ ঘরের দিকে মন দিল। ছোট ঘর। ঘরের একদিকে একটা মাঝারি সাইজের স্টিল আলমারি। আর একদিকে চেয়ার-টেবিল। টেবিলের ওপরে তখনও টি-সেট বসানো। টেবিলের পাশে একটা বুক-কেস। তাতে কিছু বই আর খবরের কাগজ বেশ পরিপাটি করে রাখা। আর একদিকের দেওয়ালে একটা কাঠের ব্র্যাকেটে নিত্যব্যবহার্য কিছু জিনিস। আর তার পাশে একটা আলনা, তাতে জামাকাপড় ঝোলানো। দেখলেই বোঝা যায়, হরশঙ্করবাবু অত্যন্ত পরিপাটি গোছানো মানুষ ছিলেন।

সোমনাথের নজর পড়ল পরিষ্কার মেঝের দিকে। বলা ভালো, সেই মেঝের দিকে চেয়ে তার যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিশোরীবাবুকে

বললে, ''আমাকে একটা ঝাঁটা এনে দিতে পারেন?''

কিশোরীবাবু তৎক্ষণাৎ ঝাঁটা আনিয়ে দিলেন। সোমনাথ উবু হয়ে বসে ঘরে ঝাঁটা দিতে লাগল।

সোমনাথকে ঝাঁট দিতে দেখে যাদুগোপাল বললে, ''ও কী করছ হে?''

''ঘরের ধুলো-ময়লা জড়ো করছি। কেন জানেন না ধুলো-বালি সিগ্রেটের ছাই থেকে আমরা গোয়েন্দারা বড় বড় খুনের কিনারা করে ফেলি।'' সোমনাথ মুচকি হেসে জবাব দিল।

যাদুগোপাল বুঝলেন সোমনাথের কোনও উদ্দেশ্য আছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন। সমস্ত ঘরটা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে ধুলোগুলো এক জায়গায় করে সোমনাথ তার থেকে বেছে-বেছে কী যেন তুলে তার রুমালের মধ্যে রেখে দিলে।

''কী হে, তোমার হল?''

''হ্যাঁ, চলুন যাওয়া যাক।''

হোটেলের আপিসঘরে এসে যাদুগোপালবাবু প্রথমে মণিশঙ্কর আর মহিমারঞ্জনের ঠিকানা জেনে নিলেন। তারপর সকলের এজাহার নিলেন। বিশেষ কিছুই জানা গেল না। শুধু লালতাপ্রসাদ বললে যে, দিন-চারেক আগে সন্ধেবেলায় সে যখন দোতলার বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তখন শুনতে পায় যে, ঘরের মধ্যে হরশঙ্করবাবু কার সঙ্গে যেন রাগারাগি করছিলেন। তবে কার সঙ্গে রাগারাগি হচ্ছিল সে বলতে পারলে না।

''আচ্ছা লালতাপ্রসাদ, কাল কখন হরশঙ্করবাবুর ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছিল?'' সোমনাথ জিজ্ঞেস করল।

''কেন বাবু, কুছ গলতি হুয়া?''

কিছু গলতি হয়নি বলাতে সে বললে, ''হোটেলের সব কামরাই সুবা-সাম দু-টাইম ঝাড়ু লাগানো হয়। কাল সাঁঝকো টাইম হামি হরশঙ্করবাবুর ঘর ঝাড়ু লাগিয়েছি।''

নটরাজ হোটেল থেকে বেরিয়ে সোমনাথ যাদুগোপালকে বললে, ''আমি এখন বাড়ি চললুম। আপনি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের আপিসে খবর নিন, কাল রাত্রে কোনও ট্যাক্সি নটরাজ হোটেল পর্যন্ত এসেছিল কি না। খবরটা বিশেষ জরুরি।''

বাড়ি ফিরেই সোমনাথ সোজা চলে গেল তার ল্যাবরেটরিতে। সেখান থেকে যখন সে বেরুল তখন তার মুখে সাফল্যের হাসি। তারপর চান-খাওয়া করে সে বেরিয়ে পড়ল। সমস্তদিন ঘোরাঘুরি করে যখন সন্ধের সময় সে বাড়ি ফিরল তখন যাদুগোপালবাবু তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

''কী হে, ছিলে কোথায়?''

''বলছি। আপনাকে যে খবর জোগাড় করতে বলেছি সেটা পেয়েছেন?''

''হ্যাঁ। কাল রাত সাড়ে-নটা পৌনে-দশটা নাগাদ এক পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন.....।''

''মোটামতো ভদ্রলোককে নটরাজ হোটেলের কাছে নামিয়ে দেয়'' —সোমনাথ যাদুগোপালবাবুকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল।

যাদুগোপাল খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ''হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?''

''সেইটেই তো আমার গোয়েন্দাগিরি।'' সোমনাথ মুচকি হেসে জবাব দিল।

তারপর একটু থেমে বললে, ''সে ভদ্রলোক আর কেউ নন, নিহত হরশঙ্কর সান্যালের বৈমাত্রেয় ভাই মণিশঙ্কর সান্যাল।''

''দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত হড়বড় কোরো না। ভালো করে বুঝিয়ে বলো।''

''বেশ, তবে শুনুন। আজ সকালে হরশঙ্করের ঘরে প্রথমে যে জিনিসটা আমার নজরে পড়ে তা হল ঘরের পরিষ্কার মেঝে। কাল বিকেলের ঝড়জলের পর রাস্তাঘাটে যেরকম কাদা হয়েছিল তাতে বাইরে থেকে কেউ এলে ঘরের মেঝেতে কিছু-না-কিছু কাদার চিহ্ন থাকতই। কিন্তু ঘরের মেঝেতে তা ছিল না। ঘর পরিষ্কার হয়েছে সন্ধেবেলায় আর হরশঙ্কর খুন হয়েছেন রাত্রের ডিনারের পর। আপনার সঙ্গের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে সাড়ে-দশটার পর। সুতরাং খুনি নিশ্চয়ই গাড়ি করে এসেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী গাড়ি? প্রাইভেট না ট্যাক্সি। প্রাইভেট গাড়ি অত রাত্রে পার্ক করে রাখার বিপদ আছে। কেউ হয় তো কৌতূহলী হয়ে নজর করতে পারে। তাই আমি সিদ্ধান্ত করি যে খুনি ট্যাক্সিতেই এসেছিল।''

''কিন্তু তুমি কেন ধরে নিচ্ছ যে খুনি বাইরে থেকে এসেছিল? সে তো হোটেলের বোর্ডারও হতে পারে?'' যাদুগোপাল প্রশ্ন করলেন।

''এটা অবশ্যই পরোক্ষ প্রমাণ। এ-ছাড়াও মস্তবড় একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুনি ঘরে ফেলে যায়। তা হল কয়েকগাছি চুল। হরশঙ্করের বিছানায় আমি একগাছি চুল পাই আর তারপর ঝাঁট দিয়ে আরও কয়েকগাছি চুল পাই। সে চুল হরশঙ্করের নয়। কেননা তাঁর মাথায় চুলই ছিল না। সুতরাং সেই চুল এমন কোনও লোকের যে মৃতদেহের বিছানার খুব কাছাকাছি এসেছিল। ওই চুলগুলো পরীক্ষা করে আমি কয়েকটি মূল্যবান সূত্র পাই। সেগুলো হল যে, চুলগুলো রুক্ষ আর গোড়ার দিকটা মোটা। একটা চুলকে ব্যবচ্ছেদ করে সেটা আমি জানতে পারি যে খুনি 'কলপ' করে। আর যে কলপ ব্যবহার করে সেটা খুব দামি বিদেশি কলপ। আর রুক্ষ চুলের মানে হল যে চুল দুর্বল হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

''ঘোড়ার দাঁত দেখে যেমন বয়েস আন্দাজ করা যায়, মানুষের চুল দেখেও তেমনি তার বয়েস আন্দাজ করা যায়। খুনির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর তার গায়ে যে জোর বেশ আছে সেটা মৃতের মাথার আঘাত দেখেই বোঝা যায়।

''এরপর আমি বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে গেলুম হরশঙ্করবাবুর ভাগ্নে মহিমারঞ্জনের কাছে। তার মাথার চুল আর শারীরিক গঠন দেখেই আমি তাকে আমার তালিকা থেকে বাদ দিই। তবে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলুম যে, লালতাপ্রসাদ যে বচসার কথা বলেছিল সেটা হয়েছিল মামা-ভাগ্নের মধ্যে ভাগ্নের বিবাহের পাত্রী নির্বাচন নিয়ে।

''সেখান থেকে গেলুম মণিশঙ্করের কাছে। তাকে দেখামাত্রই বুঝলুম যে, চুলের সাক্ষ্য অভ্রান্ত। তার সঙ্গে কোনও কথা না বলে আমি সরাসরি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, মণিশঙ্কর সই জাল করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন 'ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্ট' থেকে প্রচুর টাকা তুলেছে। সম্প্রতি ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, মণিশঙ্কর টাকা যদি ফেরত দেয় তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে মাত্র, নচেৎ তার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার অনুমান মণিশঙ্কর টাকার জন্যেই দাদাকে খুন করেছে।''

এতক্ষণ একটানা কথা বলে সোমনাথ চুপ করল।

''তোমার অনুমান খুবই সঙ্গত। আমি খোঁজখবর করে জেনেছি যে, হরশঙ্কর খুব পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন।''

তারপর একটু থেমে যাদুগোপাল বললেন, ''হুঁ, হুঁ, বাবা একেই বলে চুলচেরা বিশ্লেষণ।''

যে-মুহূর্তে মণিশঙ্কর ভাবছিলেন যে, খুন করাটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, ঠিক সেই সময়েই একটা কালো পুলিশ-জিপ তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হল।

অপহরণ সিরিজ

শেখর বসু

প্রখ্যাত শিল্পপতি গজেন্দ্রনাথ শীল নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনায় শহরের লোক আর নতুন করে আঁতকে উঠল না, কিন্তু দম প্রায় বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল পরের খবরটার জন্যে। পরের খবরটাও জানা গেল যথাসময়ে, আর সেটা জানার পরেও লোকে নতুন করে উত্তেজিত হল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। পাঁচজনের বিস্ময়ের কারণ শুধু টাকার অঙ্কটা। পঞ্চাশ লাখ টাকা। অপহরণ করা একটা লোককে ফিরিয়ে আনার জন্যে গুনে গুনে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে হল!

কিন্তু উত্তেজিত হলেন স্বয়ং গজেন্দ্রনাথ শীল। খবরের কাগজে তাঁর বিবৃতি বার হল। উদ্যোগী সাংবাদিকরা শীল পরিবারের প্রতিক্রিয়াও ফলাও করে ছাপল।

গজেনবাবু জানিয়েছেন, তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছিনতাই পার্টির হাতে পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলে দিয়ে তাঁর পরিবারের লোকরা চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় দিয়েছে। না হয় তাঁর প্রাণ যেত, কিন্তু তাই বলে গুন্ডা-বদমাইশদের সঙ্গে আপোস। প্রশাসন এবং পুলিশকেও গজেনবাবু একহাত নিয়েছেন। যা বলেছেন তা সরল করলে বোঝায়, পুলিশ এবং প্রশাসন অপদার্থ। কোনও একটা অপরাধের কিনারা করার ক্ষমতা নেই তাদের।

পুলিশদের গালাগালি দেওয়াটা শহরের লোকরা এক কথায় মেনে নিয়েছে, তবে তাদের মতে গজেনবাবুর পরিবারের লোকদের বোকা বলা যায় না কোনও মতেই। মুক্তিপণের টাকা না দিলে হয় তো পরদিনই গজেনবাবুর লাশ পড়ে থাকত শহরের মধ্যিখানে। যেমন হয়েছিল অরবিন্দ হালদারের বেলায়। মৃতদেহ পড়ে ছিল চৌরঙ্গির মোড়ে। মাত্র পনেরো দিন আগেকার ঘটনা, এই ঘটনার পরে আর কোনও পরিবারের লোক ঝুঁকি নিতে পারে না। বিশেষ করে গজেন্দ্রনাথ শীল যখন কোটি-কোটি টাকার মালিক।

অরবিন্দ হালদারের আগে আরও তিনজন বড় ব্যবসায়ী অপহৃত হয়েছিল। কিডন্যাপারদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে খালাস পেয়েছে তারাও। কিন্তু চোরা খুন, অপহরণ এখন আর শুধু বড়লোকদের মধ্যেই আটকে নেই, এই তো কদিন আগেই গরিব ঘরের আস্ত একটা পরিবারকে কে বা কারা নৃশংসভাবে খুন করে রেখে গেছে। শহরের সর্বত্র এখন চাপা আতঙ্ক। সন্ধেরাত্তির হতে-না হতেই ব্যস্ত রাস্তা ঘাটগুলো ফাঁকা হয়ে যায়।

গজেন্দ্রনাথ শীল পুলিশ এবং প্রসাশনকে গালাগালি দিয়েই থামলেন না, বেশ নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপহরণকারীদের ধরবেনই। তার জন্যে যত টাকা খরচ হয় হোক, সব টাকা তিনিই দেবেন। এই নাটকীয় ঘোষণাটা খবরের কাগজ-ওয়ালারা আরও নাটকীয়ভাবে ছাপল।

সেই সকালেই গজেনবাবুর মেরুন রঙের বিলিতি গাড়িটা গিয়ে থামল বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর তিলক চৌধুরীর বাড়ির সামনে। ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুললেন তিলক চৌধুরী। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ''আসুন মিস্টার শীল, আমি আপনাকেই আশা করছিলাম।''

তাই শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়ে গজেনবাবু বললেন, ''মানে?''

''মানেটা তো আজ সকালের খবরের কাগজগুলোই বলে দিয়েছে। কিন্তু আমি বলব স্টেটমেন্টটা কাগজে ছাপতে দিয়ে আপনি মস্ত ভুল করেছেন।''

সম্পূর্ণ অপরিচিত কারও বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যদি আসার উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলে যে-কেউই একটু চমকে যাবে। গজেনবাবুও চমকে গিয়েছিলেন, কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, ''যাক আমি তাহলে ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। আপনিই এ-কাজটা পারবেন। কিডন্যাপারদের এই দলটাকে ধরুন তো। টাকা-পয়সার কথা ভাববেন না। আপনি যা চান তাই দেব।''

সামনের সোফায় গজেনবাবুকে বসতে বলে আগের কথার জের টানলেন গোয়েন্দা। ''আপনি কিন্তু সত্যিই ভুল করেছেন। খবরের কাগজে আপনার ওই বিবৃতিটা ছাপতে দেওয়া উচিত হয়নি।''

''কেন?''

''কেন আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনি বুদ্ধিমান লোক। কিডন্যাপাররা আপনার মতো একজন শত্রুকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাইবে না। আপনার সঙ্গে গার্ড আছে?''

গজেনবাবু মাথা কাত করলেন এক পাশে।

''আমর্ড না আনআর্মড?'' জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা।

''আর্মড। পিস্তল আছে।''

''ক'জন গার্ড?''

''একজন।''

গোয়েন্দা দ্রুতগতিতে দু-দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ''একজনে হবে না। দু'জন নেবেন। ওরা গাড়ির পেছনের সিটে বসে দুই জানালায় চোখ রাখবে। আর আপনি বসবেন শোফারের পাশে।''

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বাধ্য ছেলের মতো একদিকে মাথা নাড়লেন গজেনবাবু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ''পুরো ঘটনাটা এবার আপনাকে বলি।''

''ঘটনা মানে আপনার কিডন্যাপিংয়ের?''

''হ্যাঁ।''

''না, তার এখন দরকার হবে না। সবকটা অপহরণের রিপোর্টই আমার ফাইলে আছে।'' কথাটা বলতে বলতে ওদিকের একটা ফাইলের দিকে আঙুল তুললেন গোয়েন্দা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পরে গজেনবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হাতের ছোট্ট অ্যাটাচিটা খুলে বললেন, ''আপনাকে এখন তা হলে হাজার-দশেক টাকা দিচ্ছি, কাজ শুরু করুন

আপনি।''

তিলক চৌধুরী শক্ত মুখে দু-দিকে মাথা নেড়ে বললেন, ''না, এখন টাকা লাগবে না। আপনি বরং আমাকে কিছুদিনের জন্যে একটা ভালো জিপ দিন। ড্রাইভার লাগবে না।''

''নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এ আর কী এমন কথা। আজকেই আপনার বাড়িতে আমি জিপ পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনার ফিজের অ্যাডভান্স...।''

গোয়েন্দা তিলক চৌধুরী গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, ''কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি টাকা নিই না।''

''আচ্ছা, এখন তাহলে আমি চলি। কোনও প্রয়োজন হলেই আমাকে কনট্যাক্ট করবেন। নমস্কার।''

''নমস্কার।'' বাড়ির সামনের ছোট্ট লনের গেট পর্যন্ত মিস্টার শীলকে এগিয়ে দিলেন তিলক চৌধুরী।

ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে নতুন একটা জিপ এসে দাঁড়াল গোয়েন্দার বাড়ির সামনে। পেছনে একটা সাদা অ্যামবাসাডর। অ্যামবাসাডর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার শীলের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাকেশ গুপ্ত। গুপ্ত তিলক চৌধুরীর হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললেন, ''মিস্টার শীল এই জিপটা আপনার ব্যবহারের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে একটা অনুরোধ, আপনি নিজের পয়সায় তেল কিনবেন না। আপনার বাড়ির সামনে ফিলিং স্টেশনে বলা আছে, যা তেল দরকার আপনি নেবেন, বিল যাবে আমাদের কোম্পানিতে। পেমেন্ট আমরা করব।''

একটু ইতস্তত করে তিলক চৌধুরী বললেন, ''আচ্ছা, ধন্যবাদ।''

দিন পাঁচেক বাদে খবরের কাগজে আর একটি অপহরণ ও মুক্তির খবর বার হল একসঙ্গে। মুক্তি অবশ্য মুক্তিপণের বিনিময়ে।

এবার অপহৃত হয়েছিলেন বিখ্যাত মিলমালিক মনোময় বেরা। অপহরণকারীরা তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করার পরে মনোময়বাবুকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সকালের কাগজে খবরটা দেখার পরেই গজেন্দ্রনাথ শীল ফোন করলেন গোয়েন্দা তিলক চৌধুরীকে। ফোনে গোয়েন্দার গলা পেতেই গজেনবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, ''কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার মশাই, আবার সেই কিডন্যাপিং! কোনও ক্লু পেলেন না কি?''

অস্বাভাবিক রকমের শান্ত গলায় জবাব দিলেন তিলক চৌধুরী, ''না, এখনও পাইনি।''

''আপনি একটু জোর চেষ্টা চালিয়ে যান মশাই। অ্যাঁ! এটা মগের মুল্লুক নাকি! ব্যাটারা যা খুশি তাই চালিয়ে যাবে দিনের পর দিন। আপনি একটু উঠে পড়ে লাগুন।''

এত সব উত্তেজিত কথাবার্তা শোনার পরেও আবার সেই অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন গোয়েন্দা, ''আচ্ছা ছাড়ি এখন।''

দিন গড়াতে লাগল। শহরের মানুষজনের আতঙ্ক এখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় সবারই ধারণা, যে-কোন ঘটনা যে-কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে।

কয়েকদিন বাদে অভাবিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। এবার আতঙ্কের বদলে উত্তেজনা। পথে-ঘাটে বাসে ট্রামে চায়ের দোকানে সখের গোয়েন্দা তিলক চৌধুরীর জয়জয়কার। প্রখ্যাত লোহার ব্যবসায়ী পরিমল কুণ্ডু তাঁর ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত হন। একটা বড় বাস ঘোরাবার ভান করে রাস্তা আটকাবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো কালো

রঙের গাড়ি পরিমল কুণ্ডুর গাড়ির দুদিকে এসে দাঁড়াল। তার পরের ব্যাপারটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের। ওই দুটো কালো গাড়ি থেকে মুখোশ পরা চারজন লোক পিস্তল হাতে লাফিয়ে পড়ে। পিস্তলের নল পরিমলবাবুর মাথায় ঠেকিয়ে ওই দুটো গাড়ির একটাতে তোলা হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে সামনের বাসটা রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে সরে গেছে। অপহরণকারীরা পরিমলবাবুকে নিয়ে পালাবার সময় গুলি করে ভদ্রলোকের গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়ে দেয়। এই পর্যন্ত নিখুঁত। কিন্তু অপহরণকারীরা চম্পট দেবার সময় কোত্থেকে একটা জিপ ছুটে আসে। তারপরেই জিপের সঙ্গে গাড়ি দুটোর বন্দুকের লড়াই শুরু হয়ে যায়। সারা এলাকা কাঁপিয়ে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছোটে। একটা কালো গাড়ি পালিয়ে যায়, আর একটা পারে না। গোয়েন্দা তিলক চৌধুরী পরিমলবাবুকেই শুধু উদ্ধার করেন না, দু'জন অপহরণকারীকে ধরেও ফেলেছেন। এই দু'জনের একজনের কাঁধে গুলি লেগেছে।

আহত অপহরণকারী পুলিশ হাসপাতালে, অপরজন লক আপে। শহরের লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দুটো যখন ধরা পড়েছে পুরো দলটাই ধরা পড়ে যাবে আস্তে আস্তে। কিন্তু আরও বড় একটা ঘটনা ঘটল পরদিনই। পুলিশ কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় কোর্ট কম্পাউন্ডে কে বা কারা ওই অপহরণকারীকে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে পালিয়ে গেছে। তার পরদিন আরও একটা খবর—আহত অপহরণকারীকে বাঁচানো যায় নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই নাকি মৃত্যুর কারণ।

শহরের মানুষজন নতুন করে হতাশার মধ্যে ডুবে গেল। গুণ্ডার দলটা দারুণ শক্তিশালী। পুলিশের জেরার মুখে দলের কথা যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেই জন্যেই নিজেদের লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছে। হাসপাতালের ওই মৃত্যুটাও অনেকের কাছে স্বাভাবিক ঠেকল না। এর পেছনেও নির্ঘাত কোনও ষড়যন্ত্র আছে। ওদিকে আবার তিলক চৌধুরীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেচারা! ডাক্তারের নির্দেশ তাঁকে অন্তত মাসখানেকের জন্য শয্যাশায়ী থাকতে হবে। বলা যায় না, এই সুযোগে গুণ্ডারা অসুস্থ গোয়েন্দাকেও শেষ করে দিতে পারে। অদ্ভুত একটা আতঙ্ক চেপে ধরল শহরের মানুষদের।

কিন্তু দিন পনেরো বাদে শহরের প্রায় সব মানুষ একসঙ্গে চমকে উঠল। অপহরণকারী দলের পাণ্ডা ধরা পড়েছে। পাণ্ডার নাম প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী গজেন্দ্রনাথ শীল। এটা কী করে সম্ভব?

তবে এক্ষেত্রে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কেননা গজেন্দ্রনাথ নিজের মুখে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন। অপরাধীকে ধরেছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা তিলক চৌধুরী। 'পূর্বাঞ্চল' পত্রিকায় এগারোই সেপ্টেম্বর এই ঘটনাটির সম্পূর্ণ রিপোর্ট বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে বেরিয়েছে গোয়েন্দা তিলক চৌধুরীর একটি তদন্ত সাক্ষাৎকার। এই গল্পের পাঠকদের অবগতির জন্যে সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে তুলে দেওয়া হল:

প্রঃ গজেন্দ্রনাথ শীলকে আপনি সন্দেহ করলেন কেন তিলকবাবু?

উঃ গজেনবাবু এ-দেশের বড় ব্যবসায়ীদের একজন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁর পক্ষে খবরের কাগজে ওই ধরনের একটা বিবৃতি ছাপানো খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। সন্দেহ করার প্রথম কারণ সেটাই।

প্রঃ আপনি কোন্ বিবৃতির কথা বলছেন?

উঃ ওই যে তিনি বলেছিলেন না, অপরাধীদের ধরতেই হবে, তার জন্য যত টাকা খরচ হয় তিনি দেবেন। তাঁর মতো বিচক্ষণ মানুষের বোঝা উচিত ছিল, এই বিবৃতি তাঁর বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিবৃতিটা পড়ে আমার বেশ খটকা লেগেছিল। পরে

খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সব কাগজে ওই বিবৃতিটা ছেপেছেন। এই ধরনের কাজের পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা কি? অপরাধীরা নিজেদের সাধু প্রমাণ করবার জন্যে অনেক সময় উঠে পড়ে লাগে। মনে হল, এটা কি সেরকম কোনও ব্যাপার?

প্রঃ তারপর?

উঃ অপরাধীদের ধরার জন্যে একটা জিপ চেয়েছিলাম গজেনবাবুর কাছে। তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই জিপ নিয়ে পথে বেরোলেই দেখেছি, অন্য গাড়ি আমাকে অনুসরণ করে। একবার একটা বড় গ্যারেজে ঢুকে কায়দা করে জিপের নাম্বারপ্লেট পালটে ফেললাম। সেদিন বাকি রাস্তা আর কোনও গাড়ি আমাকে অনুসরণ করেনি। গজেনবাবুকে সন্দেহ করার এটা হল দ্বিতীয় কারণ।

প্রঃ পরিমল কুণ্ডুকে অপহরণ করা হবে, এ খবর কি আপনি আগে থেকে জানতেন?

উঃ না, জানতাম না, তবে আন্দাজ করেছিলাম।

প্রঃ কী ভাবে?

উঃ অপহরণ করার ধরন দেখে। অর্থাৎ কেমন যেন অর্ডার মেনে বড়লোকদের কিডন্যাপ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রথমে দশ কোটি টাকার মালিককে, তারপর পাঁচকোটি টাকার মালিককে। তার মানে ডিগ্রি নামছে একটু-একটু করে। সেই হিসেবে আন্দাজ করেছিলাম, এবার বোধ হয় পরিমল কুণ্ডুর পালা। আমার অনুমানটা মিলে গেল।

প্রঃ আহত অপহরণকারীকে সরিয়ে ফেলে মৃত বলে ঘোষণা করলেন কেন?

উঃ ওই কৌশলটা না নিলে দলের লোকরা হাসপাতালে ঢুকে তাকেও মেরে ফেলত। কোর্টকম্পাউন্ডে পুলিশ এলার্ট থাকা সত্ত্বেও যারা একজনকে মেরে ফেলতে পারে তাদের পক্ষে সব সম্ভব। আহত লোকটাকে সরিয়ে ফেলে নিজে অসুস্থ হওয়ার ভান করে তদন্ত চালিয়েছিলাম।

প্রঃ আহত অপহরণকারীর স্বীকারোক্তি আদায় করলেন কী ভাবে?

উঃ আদায় করতে খুব কষ্ট হয়েছিল। কারণ আমি খবর পেয়েছিলাম, দলের কথা যারা ফাঁস করে কিংবা করতে চায়, দলের লোকেরা তার বাড়ির প্রত্যেককে খুন করে ফেলে নৃশংসভাবে। এই-রকম দু-একটা ঘটনা ঘটেছে এ-শহরে। লোকটা সুস্থ হবার পরে আমি ওকে বোঝালাম, দলের সবাই জানে তুমি মৃত। সুতরাং তুমি সবকিছু আমাকে স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারো। দলটা ধরা পড়লে তুমি আর তোমার বাড়ির লোকদের সব বিপদ কেটে যাবে।

প্রঃ আপনার বোঝানোতে কোনও কাজ হয়েছিল?

উঃ না, পুরোপুরি হয়নি।

প্রঃ আপনি কী করলেন তখন?

উঃ অন্য পথে গেলাম। লোকটা ওষুধের নেশা করত। আমি ওকে পরপর বেশ কয়েকদিন সেই নেশার ওষুধ যোগান দিলাম। নেশার সময় নেশা করতে পেরে লোকটা তো খুব খুশি। তারপর ঝপ করে একদিন নেশার ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করতেই ছটফট করতে লাগল লোকটা। তখন আমি বললাম, নেশার ওষুধ দেব যদি তুমি আমাকে

সত্যি কথা বলো।

প্রঃ কাজ হল তাতে?

উঃ হ্যাঁ হল, লোকটা তখন গড়গড় করে দলের সব নামধাম আর কাণ্ডকারখানা বলে দিল।

প্রঃ তারপর?

উঃ তারপর আর কী, পরেরটা তো জানেন। প্রমাণসমেত ধরে ফেললাম গজেন্দ্রনাথ শীলকে।

প্রঃ কিন্তু গজেনবাবু তো কোটি-কোটি টাকার মালিক। তিনি কেন এইরকম জঘন্য কাজ করতেন?

উঃ গজেনবাবুর ব্যবসার অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক খারাপ। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি খারাপ পথে নামেননি। কুখ্যাত একটা লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই লোকটা তাঁর কিছু দুর্বলতার কথা জানত। সে-সব ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে এই লোকটাই গজেনবাবুকে দিয়ে কিডন্যাপারদের দল তৈরি করায়। এই দলের কীর্তিকলাপ তো সবার জানা। পুরো দলটাই ধরা পড়ে গেছে। আশা করা যায়, কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা এখন আর এখানে ঘটবে না।

গোয়েন্দা তিলক চৌধুরীর এই সাক্ষাৎকারটি বার হওয়ার পরে প্রায় ছ-মাস কেটে গেছে। অপহরণ বা চোরা খুনের ঘটনা আর একটাও ঘটেনি। শহর এখন আবার আগের মতোই জমজমাট। ব্যস্ত রাস্তাঘাট আর চট করে ফাঁকা হয় না। রাতের শেষ বাস-ট্রামেও বেশ লোকজন থাকে। সেই সব যাত্রীর কেউ-কেউ মাঝেমধ্যে গলা ছেড়ে অপহরণ সিরিজের গল্প করে মজা করে এখন।

জুহু বিচে তদন্ত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পায়চারি করে যখন কেয়ারি-করা রঙ্গন গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই রাখহরি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতারণার খবর।

রাখহরি বলল, ''আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসব?''

আমি রাখহরির মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, ''নাঃ, থাক। আমিই ভেতরে যাচ্ছি।'' বলে ঘরে এসেই ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম। যেখানে ফোন করলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধরল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টের ওই ঘরটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি যখন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খবরের বিষয়বস্তুর ওপর মন রেখেছি, রাখহরি তখন চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। যে খবরটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা এইরকম, গতকাল দুপুরে বউবাজার অঞ্চলে একটি গয়নার দোকানে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার গয়না কেনেন। তারপর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য রসিদ না নিয়েই চলে যান। দোকানদারও টাকা গুনে সিন্দুক ভর্তি করে খদ্দেরকে বিদায় দেন। এইরকম খদ্দের যে এই প্রথম তা নয়, মাঝেমধ্যেই এইরকম দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারেও এইরকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকার সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিয়ে দলিল করা হয়। এতে অনেক টাকার স্ট্যাম্পপেপার বেঁচে যায়। সে যাক, রহস্য ঘনাল এর পরেই। ওই দম্পতি গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার পরই আরও দু'জন খদ্দের আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁরাও ওই একই দামের গয়না কিনে রসিদ নিয়ে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদার বিনীতভাবে বলেন, ''আমার টাকাটা?''

দম্পতি বলেন, ''টাকা তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।''

দোকানদারের চোখ কপালে উঠে যায়, ''সে কী মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন?''

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, ''ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী।'' সে এক মহা কেলেঙ্কারি। খদ্দের ও দোকানদারের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ

এসে দম্পতিকে বলে, ''আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?''

দম্পতি বলেন, ''আছে বইকী। প্রতিটি নোটের নম্বর আমাদের কাছে নোট করা আছে। এই দেখুন।'' পুলিশ তখন দোকানদারের সিন্দুক খুলিয়ে টাকা বের করে নোটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। প্রতারকরা সসম্মানে তাঁদের গয়না নিয়ে চলে যান। আর দোকানদার? মাথা হেঁট করে বসে থেকে জনসাধারণের ধিক্কার এবং বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ হজম করতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রতারণার ব্যাপার সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একই চক্রের হয়ে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে দোকানদার এই প্রতারণার বলি হয়েছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। নাম গুণধর পাইন। ফরসা রঙ। মাঝারি চেহারা। সব সময়ে মুখে পান আর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ হেন লোক যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিয়ে রেখে যখন বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি সেই সময় রাখহরি এসে বলল, ''এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।''

''উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন?''

''বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও আছে।''

''ওঁদের ভেতরে আসতে বলো। আর চা করো সকলের জন্য।''

একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। চেহারা না দেখেই বললাম, ''আসুন, গুণধরবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।''

গুণধরবাবু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, ''কী করে জানলে আমি এসেছি?''

''আজ সকালে আপনার গুণের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দেখেই অনুমান করেছি, এইবার আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে।''

গুণধরবাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ করলে বললাম, ''এই ছেলেটি কে?''

''আমার একজন কর্মচারি।''

রাখহরি চা দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভালো করে শুনলাম গুণধরবাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, ''এখন আমাকে আপনি কী করতে বলেন?''

গুণধরবাবু বললেন, ''শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়ার তা হয়েইছে। এই ব্যাপারে আইন আদালত করতে গেলে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহু কষ্টে পুলিশি ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদের তুমি খুঁজে বার করো।''

''তাতে লাভ? আপনার গয়না কি আপনি ফেরত পাবেন?''

''না। গয়নাও পাব না। টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপরাধী ধরা পড়ুক।''

আমি বললাম, ''এই ধরনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে রয়েছে তারা, কোন সূত্র ধরে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোরের কোনও কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?''

''তা হলে?''

"চেষ্টা অবশ্যই করব। করছিও।" বলেই আর একবার উঠে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।

এবারে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইন্‌সপেকটর ভদ্র? আমি অম্বর বলছি। অম্বর চ্যাটার্জি।"

"হ্যাঁ বলুন। কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম।"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে কেউ নেই? ফোন ধরল না কেন?"

"জানেন তো আমি ব্যাচিলর মানুষ। আর কাজের লোকটর আন্ত্রিক দেখা দেওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। একটা ব্যাপারে আমি আপনার একটু হেল্‌প চাইছি। কাল বউবাজারে একটি গয়নার দোকানে...।" লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনার গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিয়েই এসেছি আমি।"

"তা হলে ড্রাইভারকে বলুন, একবার সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের নিয়ে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলার স্বর্ণখনির কাছে নয়, এই কলকাতার মধ্যেই।"

রাখহরিকে আজকের জন্য একটু মাংস-ভাত করে রাখতে বলে গুণধরবাবুকে নিয়ে সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে এলাম।

ইনস্পেকটর ভি.কে. ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকরিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকের সত্যিই প্রয়োজন। খুব শান্ত প্রকৃতির কিন্তু রাগলে ভীষণ।

আমরা যেতে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের। তারপর ধীরেসুস্থে গুণধরবাবুর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বের হয়। তবে কলকাতা শহরের বুকে দিনদুপুরে এইরকম প্রতারণা সত্যিই নজিরবিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধরের হয়ে আমি বললাম, "দেখুন, কেসটা যেরকম তাতে দোকানদারকে যে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এটা কি আপনি বুঝতে পারেননি? ওই দম্পতিকে চলে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে আপনি যদি ওদের জেরা করতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন বা ওদের পেছনে ধাওয়া করে ডেরাটা দেখে আসতেন তা হলে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মারাত্মক তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু মুশকিল হল, গুণধরবাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন করলেন যে, মনে হয়েছিল উনিই আসলে খদ্দেরকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই আমরা ওঁকেই ভর্ৎসনা করছিলাম। ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পতি দু'জনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধরবাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধরবাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, ‘‘তোমার নাম কী ভাই?’’

‘‘আমার নাম নন্দ।’’

‘‘তোমার বাড়ি কোথায়?’’

নন্দর হয়ে গুণধরবাবুই বললেন, ‘‘ওর বাড়ি হরিপালের কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা মরা ছেলে। আমার কাছেই মানুষ।’’

নন্দকে বললাম, ‘‘ওই মুখগুলো আর একবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?’’

নন্দ বলল, ‘‘হ্যাঁ পারব।’’

‘‘আচ্ছা, ওঁদের কাউকে আর কখনও এই দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?’’

‘‘মনে হচ্ছে একবার যেন দেখেছিলাম। দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুরবেলা এসে আমার কাছ থেকে ডিজাইনের বইটা চেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।’’

‘‘ব্রজদা! ব্রজদা কে?’’

‘‘আগে কাজ করত আমাদের দোকানে।’’

‘‘এখন করে না?

‘‘না।’’

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, ‘‘সেদিন দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?’’

গুণধরবাবু বললেন, ‘‘আমি বরাবরই বিকেলের দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওয়ায় সব সময়ই আমাকে দোকানে থাকতে হয়।’’

‘‘আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায়?’’

‘‘ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিয়ে ও এখন বম্বের জাভেরি মার্কেটে ভালো রোজগার করছে।’’

‘‘ওর বাড়ি কোথায় জানেন?’’

‘‘ডোমজুড়ের কাছে নিবড়ে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজারেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভালো ছেলে। ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।’’

‘‘সন্দেহ করছি না তো। তবে একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাই একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।’’

ইন্‌সপেকটর ভদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বউবাজারে মেসে এসে ব্রজর বম্বের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওর দু-একটা চিঠিপত্তর যা বন্ধুদের লিখেছিল, তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওর দু-একটা ফোটোও সংগ্রহ করলাম বন্ধুদের কাছ থেকে। যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অর্থহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, ‘‘আপনি এত দেরি করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।’’

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত! সেই প্রেস ফোটোগ্রাফার ছেলেটি?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবার আসবেন সন্ধের সময়। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দরকার।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দরকার যে, এইভাবে থাকতে বলল?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ রেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন না করেই অশোকের রেখে যাওয়া কাগজের পাতায় চোখ বোলালাম। নতুন বেরিয়েছে কাগজটা। লোকের হাতে-হাতে না ঘুরলেও হকাররা রাখে। বিক্রিও হয়। সেই কাগজের প্রথম পাতায় বউবাজারের প্রতারণার বিবরণটা ফলাও করে ছাপা তো হয়েইছে, সেই সঙ্গে রয়েছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র। যাতে দেখা যাচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে সেই দম্পতি অপেক্ষমাণ একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে মনের আনন্দে স্নান-খাওয়া সেরে বারবার সেই ছবির মুখগুলো দেখতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়, অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয়। সবারই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকের কথামতো আমি সারাটা দিন ঘরে রইলাম। কিন্তু না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পার হয়ে গেল তবুও অশোক এল না। রাত্রিবেলা ওর কাগজের অফিসে ফোন করলাম। সেখান থেকেও ওর কোনও খোঁজখবর দিতে পারল না কেউ।

সে রাত্রে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে করে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালে কাগজেই খবর পেলাম, অশোকের মৃতদেহ মধ্যরাত্রে কে বা কারা যেন ওদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে গেছে।

শিউরে ওঠার মতো খবর। চক্রটি যে শুধু প্রতারণা করে, তাই নয়। খুন করতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিরীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা করতে পারে তারা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধারণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলাম গুণধর পাইনের ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ। এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না। সে ছিল প্রথমজন।"

তারপর সোজা চলে এলাম সদর দফতরে। সেখানেও পুলিশের সংগ্রহে থাকা অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব, তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে, তা নয়। সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। তবু...

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদিন অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। কাগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম। বেশি খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়াল পুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, ‘‘কী আশ্চর্য! এঁরা তো আমাদেরই অতিথি। প্রায়ই আসেন এখানে।’’

‘‘আমি একটু দেখা করতে চাই।’’

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘‘সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।’’

‘‘সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও ?’’

‘‘না। ঘর খালি আছে।’’

‘‘একবার দেখতে পারি ঘরটা ?’’

‘‘আপনার পরিচয় ?’’

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভি.টি. টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু’জনের। মিঃ পি কে সিনহা এবং মিসেস সিনহার। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস চাপরাশি কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি।

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি.আই.পি কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি। ইন্‌সপেকটর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম। তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল।

যথাসময় বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম. কে. নম্বরির দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, ‘‘ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা। পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।’’

‘‘কোথায় গেছেন উনি।’’

‘‘আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা ?’’

‘‘আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব। তাই।’’

‘‘এ কাজে দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি ?’’

‘‘আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।’’

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া থেকে নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। রেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকানা আমাদের দিয়েছে

সেটাও আন্ধেরির।

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয় ঘরে তালা দেওয়া। আমরা সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম। আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জুহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিনে-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বারবার সিগারেট ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, ‘‘একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র?’’

‘‘হ্যাঁ। ইনিই তো সেই ব্রজগোপাল।’’

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জ্বেলে ধরলাম সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, ‘‘থ্যাঙ্কস।’’

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, ‘‘আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।’’

‘‘ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।’’

‘‘বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি?’’

‘‘মাঝে-মাঝে গেছি হয় তো, সোনাদানা কিনতে।’’

‘‘বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায়? আপনি গুণধরের পাইনকে চেনেন?’’

আর চেনা। ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই দৌড় শুরু করল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধরেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ‘‘কে, কে, কে আপনারা? আপনারা কারা? আমি আপনাদের চিনি না।’’

আমি তখন ওর পেটের কাছে রিভলবার ধরে বললাম, ‘‘আমাদের তুমি নিশ্চয়ই চিনবে ব্রজদুলাল।’’

‘‘আমি ব্রজদুলাল নই। আপনারা ভুল করছেন। আমি ব্রজগোপাল।’’

‘‘এখানে কোথায় এসেছিলে? দিদির বাড়ি?’’

‘‘আমার কোনও দিদি-টিদি নেই।’’

আমি খবরের কাগজের কাটিংটা ওর দিকে মেলে ধরে বললাম, ‘‘এঁদের তুমি চেনো? এরা কারা? এখানকার সাউথপয়েন্ট ব্লকে ফিফ্‌থ ফ্লোরে কারা থাকে?’’

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, ‘‘সব বলব আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক?’’

‘‘হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমরা ওত পেতে আছি তোমাদের ধরবার জন্য। ওঁদের ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেছেন ওঁরা?’’

''আমরা সবাই গিয়েছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিরেছি।''

''তা হলে চলো। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করিয়ে দাও।''

জুহু বিচ ঘিরে তখন উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। আমরা হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিয়ে লোকাল থানায় একটা ফোন করলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপারটা। তারাই এখানকার ফোন নম্বর আমাদের দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হল না।

আমরা ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁরা। আমাদের দু'জনের হাতে রিভলবার আর ব্রজগোপালের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে, তা অনুমান করতে পারলেন।

একটু পরেই স্থানীয় পুলিশও এসে গেল।

জেরার মুখে অপরাধ স্বীকার করল অপরাধীরা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গয়না। ব্রজগোপাল স্বীকার করল, এরাই তার নিজের দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবু তাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতারণার পরিকল্পনা করে ওরা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ করে নিজেরা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্ক স্ট্রিটের শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতারণা ছাড়াও আরও অনেক বাজে কাজ তাঁরা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড়-বড় শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বামাল ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকেও পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি.টি-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবু এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।

লাখ টাকার পাথর

সমরেশ মজুমদার

এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি অমলেন্দু রায় পরলোকগমন করেছেন। খবরটা শুনে শহরের মানুষ খুবই দুঃখিত হয়েছিল। অমলেন্দুবাবুকে সবাই খুব ভালোবাসত। নিজের বিশাল ব্যবসায় তরুণদের চাকরি দেওয়া ছাড়াও জেলার বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ফুটবল তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। শহরের সবচেয়ে নামী ক্লাবের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন।

খবরটা অর্জুন পেয়েছিল কদমতলায় চায়ের দোকানে বসে। তখন রাত আটটা। অমলেন্দু রায়ের সঙ্গে তার সরাসরি আলাপ ছিল না। কিন্তু কেউ মারা গেছেন শুনলে মন ভালো থাকে না। বাড়ি ফেরার পর মা বললেন, তিনটে টেলিফোন এসেছিল। তারা আবার করবে। আধঘণ্টার মধ্যেই সেই টেলিফোন আবার এল। দু'জন মানুষ পৃথক-পৃথকভাবে টেলিফোন করছেন।

প্রথমজন অমলেন্দু রায়ের বড় ছেলে বিমলেন্দু। তিনি একটু ভূমিকা করে বললেন, আজই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে চান। অর্জুন তাঁকে আসতে বলল। কারও বাবা সন্ধেবেলায় মারা গেলে যে পরিস্থিতি হয়, তাতে টেলিফোন করে একজন অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া মানায় না। বেশ অবাক হয়েছিল অর্জুন। খুব সিরিয়াস কিছু ওই পরিবারের ঘটেছে বলে সে অনুমান করেছিল। দ্বিতীয় ফোনটি করেছিল অমলেন্দুবাবুর মেজোছেলে কমলেন্দু। সে কোনও ভূমিকা করেনি। বলল, "আপনি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে চেনেন। আমার বাবা আজ মারা গিয়েছেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি ভাবছি না। বাবার কোমরে একটা রুপোর চেনে দামি পাথর ছিল। শুনতাম পাথরটার দাম এক লাখ টাকা। হাসপাতাল থেকে যখন বাবাকে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা আমি দেখেছি। বাড়ি ফিরে এসে বাবার পোশাক পরিবর্তন করিয়ে দেওয়ার পর দেখি রুপোর চেনটা রয়ে গেছে, পাথরটা নেই। আপনি যদি রহস্য উদ্ধার করে দেন তা হলে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেব।"

"ভেবে দেখছি," বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল অর্জুন।

বিমলেন্দুবাবু এসেছিলেন দশটার মধ্যে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। শোকের ছাপ ওঁর চোখে-মুখে। বাইরের ঘরে বসে মোটামুটি একই কাহিনী শোনালেন।

অর্জুন তাঁকে বলল, "আপনারা মৃতদেহের পোশাক পরিবর্তনের পর পাথরটা পাচ্ছেন না। পোশাক পরিবর্তনের সময় কে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?"

'মা এবং আমার ছোট ভাই তপেন্দু। ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা চেঞ্জ করিয়ে

"স্বাভাবিক। তাঁরা কী বলেন?"

"মায়ের সঙ্গে তো কথা বলাই যাচ্ছে না। তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারাচ্ছেন।" তপেন্দু বলল, "বাবার মৃত শরীরে হাত পড়ায় সে এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, পাথরটার কথা খেয়ালই করেনি। অর্জুনবাবু, পাথরটা শুধু দামি নয়, এ আমাদের পরিবারে আছে কয়েক পুরুষ ধরে।"

"আপনি কি এখনও আছে বলে ভাবছেন?"

"আমার বিশ্বাস বাড়িতেই আছে।"

"আপনার কথা অনুযায়ী মা এবং তপেন্দুবাবুকে সন্দেহ করতে হয়।"

"আমি কী বলব? মা এমন কাজ করলে আমাকে বলতেন। তপেন্দু...না না, বিশ্বাস হয় না। ওর এসব অভ্যেস ছিল না। তা ছাড়াও ও পরেছিল পাজামা আর গেঞ্জি। ওই অবস্থায় কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। রাখতে গেলে মা দেখতে পেতেন।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"না। আমরা থানা-পুলিশ করতে চাই না। লোকে বলবে, বাবা মারা যাওয়ামাত্র গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমাদের পারিবারিক সম্মান কিছু থাকবে না।"

"আপনার মেজোভাইকে সন্দেহ হয়?"

"ঠিক সন্দেহ বলতে যা বোঝায়, তা হয় না। তবে ওর টাকা-পয়সার খুব টান। বাবা খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন ওর বাজে খরচের বহর দেখে। হাসপাতাল থেকে আসার সময় ও-ই দেখেছিল পাথরটা বাবার কোমরের চেনের সঙ্গে ঠিক আছে।"

"হাসপাতালে ভর্তি করার সময় শরীরের গয়না খুলে রাখার কথা। আপনারা অত দামি জিনিসসুদ্ধ ভর্তি করেছিলেন, ওখান থেকেও তো চুরি হয়ে যেতে পারত!"

"দুপুরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর ওসব ভাবার সময় ছিল না। হাসপাতাল থেকেও কিছু বলেনি। মেজোভাই না বললে এখনও আমার মনে পড়ত না।"

"আপনার মেজোভাই ছাড়া কেউ হাসপাতাল থেকে আসার সময় পাথরটাকে দেখেনি, তাই তো? একটু ভেবে বলুন!"

"হ্যাঁ, একমাত্র ওই দেখেছিল।"

"তা হলে তো এমনও হতে পারে ওটা হাসপাতাল থেকেই খোয়া গিয়েছে। আপনার মেজোভাই মিথ্যে বলছেন, যাতে লোকে ভাবে বাড়ি আসার পর কেউ সরিয়েছে।"

"অ্যাঁ, তা কি সম্ভব?"

"কিছুই অসম্ভব নয়, আবার ঠিক এইটেই ঘটেছে এমন কথাও আমি বলছি না। আমি সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরছি। আচ্ছা, পোশাক পালটে দেওয়ার পর ওই ঘরের ভেতর থেকে কে বেরিয়ে এসেছিল প্রথমে? আপনারা কোথায় ছিলেন?"

"বাড়িসুদ্ধ সবাই কাঁদছিল। কারও মাথা কাজ করছিল না। তপেন্দু ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। আমি ওকে কোনওমতে ছাড়িয়ে ঘরে গিয়ে দেখলাম মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক ডাকাডাকির পর ওঁর জ্ঞান এল।"

'তখন ঘরে কে কে ছিলেন?'

"তখন? তপেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই ঘরে মা ছিলেন এবং আমি ঢুকেছিলাম।"

"আপনার পর?"

"আমি চেঁচিয়ে মাকে ডাকাডাকি করার সময় সবাই এসে পড়ল।"

"ততক্ষণ আপনি একা আর আপনার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আধ মিনিটও নয়।"

"ওই সময়েই ইচ্ছে করলে আপনি পাথরটা সরাতে পারেন।"

বিমলেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, "এ আপনি কী বলছেন? আমি চোর? আমি চুরি করলে আপনার কাছে আসব কেন? ছি ছি ছি।"

"বিমলেন্দুবাবু, আমি আপনাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। আপনি চুরি করতেও পারেন আবার নাও পারেন। দেখা যাচ্ছে আপনাদের তিন ভাইয়ের কেউ সন্দেহের বাইরে থাকার মতো কাজ করেননি। কিন্তু এ-ব্যাপারে এখনই তদন্ত করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে!"

"না। শ্রাদ্ধের আগে ব্যাপারটাকে গোপন রাখতেই হবে।"

"তা হলে?"

"আপনি আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না?"

"গিয়ে কী করব? কাউকে জেরা করতে না পারলে," কথাটা বলেই মত পালটাল অর্জুন, "ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি।"

বিমলেন্দুবাবু ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল অর্জুন। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। কাউকে জেরা করা চলবে না, কেউ জানতে পারবে না, অথচ তদন্ত করে বের করতে হবে সেই মূল্যবান পাথরটা কোথায় গেল! এ কি সম্ভব? অমলেন্দুবাবুর তিন ছেলে এবং তিনজনের যে-কেউ ওটাকে সরাতে পারে এবং সেই সুযোগও তারা পেয়েছিল।

মোটরবাইক নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এল অর্জুন। খোঁজখবর নিয়ে সেই নার্সের সামনে উপস্থিত হল, যিনি অমলেন্দুবাবুর সেবায় ছিলেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, দেখেছি। রুপোর চেনে পাথরটা ছিল। ওঁর মেজোছেলে বারবার ওটার খবর নিচ্ছিলেন।"

"কখন? মারা যাওয়ার আগে না পরে?"

"ভর্তি হওয়ার পর বলেছিলেন একবার। মারা যাওয়ার পর কয়েক বার। আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম অতই যখন চিন্তা, খুলে নিজের কাছে রাখুন না। তাতে উনি জবাব দিয়েছিলেন, না, মা দুঃখ পাবে।"

"হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে যাওয়ার সময় ওটা ঠিক ছিল?"

"হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কেন বলুন তো এসব জিজ্ঞেস করছেন?"

"পরে বলব।" অর্জুন আর দাঁড়ায়নি। নার্সের বক্তব্য যদি সঠিক হয়। তা হলে মেজোভাই কমলেন্দু পাথরটা সরায়নি।

রায়বাড়িতে চলে এল অর্জুন। শোকের বাড়ি। এখনও লোকজন আসছে। খুঁজে-খুঁজে তপেন্দুকে বের করল সে। ছাদের ঘরে একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। পরনে এখনও পাজামা

আর গেঞ্জি। অর্জুনকে সে চেনার চেষ্টা করল। বয়স কুড়ি-একুশের মধ্যে।

অর্জুন বলল, ''আপনার বাবা আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ। খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। এখানে সবাই আমার গুরুজন। সিগারেট খেতে পারছি না ওঁদের সামনে। তাই চলে এলাম ওপরে। দেশলাই আছে?''

তপেন্দু বিরক্ত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে পাজামার দড়ির ভেতরে ওলটানো কাপড়ের মধ্যে থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে ধরল। সিগারেট ধরাল অর্জুন।

''এই দেশলাইটা কতক্ষণ কোমরে রেখেছেন?''

''দুপুর থেকে। কেন?''

''ওভাবে তো কেউ রাখে না।''

''আমার আজ পেট খারাপ। ক'বার বাথরুমে গিয়েছি। হাসপাতালেও যেতে পারিনি তাই। পাঞ্জাবি পরিনি, রাখব কোথায়?''

''পেট খারাপ অবস্থায় বাবার পোশাক পরিবর্তন করালেন?''

''মা আমাকে ডেকেছিলেন বলেই করতে হল। আপনি কেন এসব প্রশ্ন করছেন?''

''এমনি।'' অর্জুন হেসে নেমে এল। পাজামা পরে কোমরে দেশলাই গুঁজে রাখলে কেউ অন্য কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তপেন্দুর পকেটের বালাই নেই। হাতে করে নিশ্চয়ই পাথর নিয়ে বের হয়নি। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন দেখে যদিও সেই সুযোগ ছিল। এক যদি সে ডেডবডির নীচে ওটা লুকিয়ে রাখে তা হলে আলাদা কথা, না হলে ছোট ভাই তপেন্দু পাথর সরায়নি।

রাত এখন বারোটা। মৃতদেহ এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কি না এ-ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। বিমলেন্দু অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, ''বাবাকে দেখবেন?''

''হ্যাঁ।''

''আসুন।''

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কোণের দিকে খাটে অমলেন্দুবাবু শুয়ে আছেন। দরজা থেকে সেটা বেশ দূরে। তাঁর মাথার কাছে একজন মহিলা বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়েকজন। ঘরে ঢুকেই অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ''ভেতরে ঢোকার কত পরে আপনি মাকে ডেকেছিলেন?''

''বড় জোর আধ মিনিট। তাও হবে না হয় তো।''

''উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন?''

''হ্যাঁ। মাথার পাশে মা বসে আছেন।''

''ঠিক আছে। আপনি পায়ের কাছে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের একটু বাইরে নিয়ে যান।''

আধ মিনিটের মধ্যে এই ঘরে ঢুকে খাটের কাছে পৌঁছে কোমর থেকে চেন বের করে পাথর খুলে নেওয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বড় ছেলে বিমলেন্দু সেটা সরাতে পারেন না। অবশ্য সময়টা যদি আধ মিনিটের অনেক বেশি হয় তা হলে আলাদা কথা।

ঘরে এখন কেউ নেই, শুধু তারা দু'জন ছাড়া। অর্জুন বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বিনীত গলায় বলল, ''মাসিমা, মেসোমশাই আমাকে ভালোবাসতেন।''

বৃদ্ধা বললেন, ''তুমি কে বাবা?''

''আমি অর্জুন। সত্য অন্বেষণ করি। পাথরটা ঠিক জায়গায় রেখেছেন তো?''

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা। চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, ''ভস্ম হয়ে যাক, সব ভস্ম হয়ে যাক।''

অর্জুন অমলেন্দুবাবুর দিকে তাকাল। মনে হল গলার একটা দিক যেন সামান্য উঁচু, টিউমারের মতো।

অত রাত্রে শ্মশানে একা আসতে এখনও অস্বস্তি হয়। যে মানুষেরা মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব নেয়, তাদের একজনের নাম মহাদেব। এর সঙ্গে আলাপ ছিল অর্জুনের। মহাদেব তখন চুপচাপ বসেছিল। শ্মশানে ইতিমধ্যেই দুটো চিতা জ্বলছে। মহাদেবকে আলাদা ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল অর্জুন। তারপর পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে দিল।

অমলেন্দু রায়ের মৃতদেহ এসে গেল শ্মশানে। মফস্বল শহরের শ্মশানে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। দেহ চিতায় তুলতে সময় লাগল। আগুন জ্বলে গেলে দেখা গেল মহাদেবরা দাহের কাজে তদারকি করছে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। সব ছাই হয়ে যাবে। কাঠ, শরীর। শুধু অস্থিটুকু থেকে যাবে। আর...সন্দেহটা এখনও মনে আঁচড় কাটছে।

ক্রমশ চিতা ছাই হয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেল। মহাদেব আগুন নিভিয়ে মাটির সরায় চিমটি দিয়ে অস্থি তুলতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাত তুলে অর্জুনকে ডাকল। চিতার অনেক দূরে নদীর ধারে বসেছিল শ্মশানযাত্রীরা। ভোর হতে দেরি নেই।

অর্জুন এগিয়ে যেতেই মহাদেব নির্লিপ্তভাবে একটা পাথরের ছোট টুকরো তুলে ধরল, ''এইটে বডিতে ছিল, পোড়েনি।''

''দাও।'' রুমাল বের করে জিনিসটা নিয়ে নিল অর্জুন। মহাদেব গেল ছেলেদের হাতে অস্থি তুলে দিতে। অর্জুন উঠল মোটর বাইকে।

শূন্য বাড়ি। অমলেন্দুবাবুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে চুপচাপ বসেছিলেন ওঁর স্ত্রী। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। অর্জুন বলল, ''আবার বিরক্ত করছি।''

''কে তুমি?''

''আমি অর্জুন। রাত্রে কথা বলেছিলাম।''

''কী চাও?''

''আমি কিছু চাই না। আপনি বলেছিলেন সব ভস্ম হয়ে যাক। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা কিছুতেই ভস্ম হয়ে যায় না। আগুন পোড়াতে পারে না। একটা খালি প্রদীপের খোল নিয়ে রুমাল থেকে পাথরটা বের করে রাখল তাতে অর্জুন। তারপর খোলটা বসিয়ে দিল প্রদীপের পাশে।

''এটা আপনাদের পারিবারিক সম্পত্তি। মনে হয় আপনি ছোট ছেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর কোমর থেকে খুলে ওঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জিভের নীচে ওটার যাওয়ার কথা নয়। কী করে গলার ভেতরে গেল সেটা আপনি জানেন। বড় ছেলে ঘরে ঢোকার আগেই কাজটা করেছিলেন আপনি। আপনার একটাই স্বার্থ ছিল, জিনিসটা ছেলেদের হাতে পড়ুক আপনি চাননি। কিন্তু এটা ভস্ম হয়নি। এখন কী করবেন তা নতুন করে ভাবুন। ওরা দাহ শেষ করেছে, এখনই ফিরে আসবে। এলাম।''

সারারাত জাগার ক্লান্তি নিয়ে ভোরের রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন। এখন একটু ঘুমনো দরকার।

চুরির গন্ধ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ঠিক একেবারে কালবোশেখি ঝড় উঠবার আগের নিস্তব্ধতা। রাগে গোলাপি মুখখানা থমথম করছে নকুলেশ্বরদাদুর। নিপাট সাদা ভুরু সেই যে কুঁচকে উঠেছে, সোজা হবার নাম নেই। পাকানো গোঁফের নীচে ভারী মোটা ঠোঁট দুপুরের পুকুরের মতো নিথর। জুলফির নিচে চোয়াল শক্ত, চোখের দৃষ্টি স্থির। ধপধপে আদুল গায়ে বিশাল ভুঁড়িটি কেবল কেঁপে উঠছে মাঝে-মাঝে।

বোমাটা ফাটাল বলতে গেলে রাসুদাই। এতদিন ধরে রয়েছে মুখুজ্যে-বাড়িতে, পুরনো আমলের লোক, দাদুকে কি আর চেনে না! কী দরকার ছিল ওর মিনমিন করে বলতে যাবার, "তা হলে কত্তাবাবু, থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে একটা খবর..."

কথা শেষ করতে পারেনি রাসুদা, তার আগেই নকুলেশ্বরদাদুর বাজখাঁই গলা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়েছে। "চুপ কর হতভাগা! দারোগা! আমাকে তোরা দারোগা দেখাচ্ছিস! জটিলেশ্বর মুখুজ্যের নামে এখানে একদিন বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত, তারই ছেলে আমি, তিন পুরুষের জমিদার! আমাকে দেখাচ্ছে দারোগা! নিজের বংশের কলঙ্ক আমি বাইরে ছড়াতে যাব? কক্ষনো না। এক একটাকে ধরব আর জ্যান্ত পুঁতে ফেলব সুন্দরী-দিঘিতে, দেখি আমার জিনিস আমি পাই কি না।"

একটু আগেকার গোলাপি মুখখানায় এখন সিঁদুরে রঙ ধরেছে। চোখের দৃষ্টি জ্বলছে আগুনের গোলার মতো। শিবুর দিকে চোখ পড়তে এই অবস্থাতেও হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল আমার। বেচারির অবস্থা রীতিমত করুণ। এমনিতেই ও ভিতু ছেলে, প্রথমটা আসতেই চায়নি এরকম গণ্ডগ্রামে। আমিই অনেক কষ্টে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়ে যাবে, তা কে জানত!

ঘটনাটা একটু খুলেই বলা যাক তা হলে। বরাবর শুনে আসছি, মায়ের মামারা নাকি বর্ধমানের কোন এক গাঁয়ের ডাকসাইটে জমিদার। মামারা বলতে অবশ্য আমার ওই এক দাদুই এখন সম্বল ওই নকুলেশ্বর মুখুজ্যে, যাঁকে এই এবারই আমি প্রথম চোখে দেখলাম। জমিদারির রমরমা ব্যাপারটা অনেকখানি কেটে গেলেও প্রত্যেক বছর ঘটা করে দুর্গাপুজো হয় এখনও। নবমীর দিন পাঁঠাবলি হয়, সমস্ত গাঁয়ের লোকের নেমন্তন্ন থাকে সেদিন। প্রত্যেক পুজোর আগেই মায়ের মনে ছোটবেলার সেই স্মৃতি উথলে ওঠে, আর বলতে

থাকেন, ''যা না, একবার ঘুরে আয় না, জন্মে ভুলতে পারবি না।''

সত্যি কথা বলতে কী, এক-একবার যে ইচ্ছে হয়নি এমনও নয়! খুব ছোটবেলা থেকেই বাগান-টাগানের একটু শখ আমার রয়ে গেছে। সেটা মেটাতে হয় আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির পেছনে ওই এক চিলতে জমি নিয়ে। একদিকে ক'টা ফুলগাছ আর অন্যদিকে খেয়ালখুশিমতো কখনও উচ্ছে, কখনও ঢ্যাঁড়শ, কখনও টম্যাটো। একবার কয়েকটা ফুলকপিও ধরেছিল। অবশ্য তার ফুল দেখা যায় না, পাতাই সব। কী ভেবে এবার রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গী তো চাই! মায়ের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, বর্ধমান স্টেশন থেকে বাসে করে যতটা যাওয়া যায়, তারপরেও নাকি হাঁটতে হয়, আট-দশ কিলোমিটার। ভাগ্য ভালো থাকলে গোরুর গাড়ি মেলে, তবে মায়ের যা বাতের ব্যথা, কোনওটাতেই বিশেষ সুবিধে হবার নয়। ওই মোটা-শিবুই রাজি হয়েছিল শেষকালে, মানে আমি রাজি করিয়েছিলাম আর কি!

প্রথম ক'দিন কেটেও ছিল বেশ ভালো। গ্রাম মানে একেবারে সত্যিকারের গ্রাম। বিদ্যুৎ নেই, সিনেমা-হল নেই, মুদিখানা আর একটা মিষ্টির দোকান ছাড়া অন্য কোনও দোকান পর্যন্ত নেই। পুকুরে চান করে, প্রচুর দুধ-মাছ খেয়ে, মাঠে বেড়িয়ে খিদে করে শিবুর কুতকুতে চোখ খুশিতে আরও বুজে যাচ্ছিল ক্রমশ। এমন সময় এই অঘটন।

প্রত্যেকবার দুর্গা-ষষ্ঠীর দিন পুজোর উদ্বোধন হত একটি সোনার দুর্গামূর্তি দিয়ে। দাদুদের বনেদি পরিবারে এই প্রথা কবে থেকে চালু জানি না, মূর্তিটা কত পুরনো তাও জানি না, তবে কাল যখন দাদু নিজে বন্দুক নিয়ে মূর্তিটা গঞ্জের ব্যাঙ্কের লকার থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলেন, তখন মনে হয়েছিল, দেখতে ছোট হলেও ওজনে সেটা পঁচিশ-ছাব্বিশ ভরির কম নয়। মূর্তিটা পুজোর ক'দিন দাদুর পেল্লায় সিন্দুকে থাকে। পুজো মিটলে আবার তা রেখে আসা হয় ব্যাঙ্কের লকারে। এবারে ষষ্ঠীর সকালেই এই বিপত্তি।

রাতে পুজোর আয়োজন সেরে শুতে-শুতে বারোটা। সকাল ছটায় উঠেই দাদু সিন্দুক খুলেছেন, আর তখনই চোখে পড়েছে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সিন্দুক ফাঁকা, দুর্গামূর্তি নেই। অবিশ্বাস্য এই জন্যে যে, সিন্দুকের চাবি একটাই, আর সেটা থাকে দাদুর বালিশের তলায়। সেখান থেকে ওই চাবি সরানো মানে বাঘের গুহায় মাথা গলানো।

অথচ সেই ব্যাপারটাই হয়েছে। সকালবেলা উঠে বাড়ির সামনে সবজিবাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কী কী গাছ আছে দেখছিলাম। শিবু বাইরের বারান্দায় বসে ঢুলছিল। এ-বাড়িতে চায়ের পাট নেই, ভাবছিলাম একটু চা পেলে মন্দ হত না। এমনি সময়ে এই কাণ্ড।

একবার বোমাবর্ষণ করে দাদু তখন আবার গুম হয়ে গেছেন। রাগে ফুলছে সারা মুখ। শুধু রাগই বা বলছি কেন, একটু পরেই পুরোহিতমশাই এসে পড়বেন। পুজোর সমস্ত আয়োজন তৈরি, এখন যদি প্রতিমা পাওয়া না যায়...।

ঘরের অবস্থা এখন যা, একটা ছুঁচ পড়লে শোনা যায়। রাসুদার চেঁচামেচি শুনে আমাদের মতো সকলেই এসে জড়ো হয়েছেন ঘরে, বাড়ির লোক, বাইরের লোক, সব। বাড়ির লোক বলতে অবশ্য রাসুদার মতো কর্মচারির সংখ্যাই বেশি। ঠিক এ-বাড়ির লোক বলতে দাদু একাই আছেন। একমাত্র ছেলে বোম্বে না বরোদা কোথায় থাকেন যেন। অন্য দাদুদের ছেলেমেয়েরাও কেউ এখানে থাকেন না, কেবল মায়ের এক বিধবা বোনঝি আছেন তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে। তারা এখানকার পাঠশালায় পড়ে আর দাদুর জমিজমার কাজে যেটুকু

পারে সাহায্য করে। পুজো উপলক্ষে আমরা যারা এসেছি, তাদের সংখ্যাও অবশ্য খুব বেশি নয়। আমি আর শিবু ছাড়া আছি মোট পাঁচজন। বহরমপুরের মেজোমামা এসেছেন ছোট মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে, এ বছরই বিয়ে হয়েছে। আর এসেছে বড়মামার এক বাউণ্ডুলে ছেলে বিপুদা। ও টেনে নিয়ে এসেছে ওর এক রুগ্ণ বন্ধুকে। বিপুদা নাকি স্বপ্নে দেখেছে, এখানকার পুজোর প্রসাদী ফুল পেলেই সে ভালো হয়ে যাবে। বিপুদা অবশ্য এ-বাড়িতে নতুন নয়, টানা দু'বছর একসময় ছিল এখানে, বড়মামাই একবার আমাদের বাড়ি এসে বলেছিলেন।

দাদুর চোখ তখনও জ্বলছে। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ''আমি জানি, আমাদের বংশের প্রতিমা আমি পাবই। যেই নিয়ে থাক, রাতের অন্ধকারে পাঁচ-পাঁচ দশ মাইল রাস্তা হেঁটে সেটা কোথাও রেখে আসা অসম্ভব। লোক লাগিয়ে সব বাগান আমি সাফ করে ফেলব, সব পুকুরে জাল ফেলব। জিনিস আমি পাবই। তবে তাতে সময় লাগবে, সারা গাঁয়ে জানাজানি হবে, আমার সম্মান যেমন তাতে বাড়বে না, তোমরাও এই বংশেরই ছেলে, তোমাদের সম্মানও তাতে নষ্ট হবে। তাই আমি সবাইকে বলছি, লোভে পড়ে যে নিয়েছ, এখনও ফেরত দিয়ে দাও। আমরা জানছি, আমরাই জানব, আর কেউ জানতে পারবে না।''

শিবুর দিকে আর-একবার চাইলাম। মুখ শুকিয়ে আমসি। মেজোমামা বেশ বিরক্ত, নতুন জামাইয়ের সামনে যে-সব ব্যাপার চলছে তাতে অবশ্য বিশেষ খুশি হওয়া যায় না। বংশের সম্মান-টম্মান শুনে আমার ভেতরটা একটু চনমন করছিল। বিপুদা দেখলাম মাথা নিচু করে নখ খুঁটছে আর মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে দাদুর দিকে। ওর সেই রুগ্ণ বন্ধু ফ্যাকাসে মুখে ঢোক গিলছে মাঝে মাঝে।

''তা হলে আরও স্পষ্ট করে বলি,'' নকুলেশ্বরদাদু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন আবার, ''এ বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদের কারও এ সাহস হবে না, আমি ভালো করেই জানি। তোমরাই কেউ লোভে পড়ে প্রতিমা সরিয়েছ। এই শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি, আমার সম্মান যদি নষ্ট হয়, যে করেছে, তাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

ঘরের অবস্থা এখন একেবারে অসহ্য। দাদু চুপ, অন্য সকলেও চুপ। একটা হাঁচি-কাশির শব্দ পর্যন্ত নেই কোথাও। এই দমবন্ধ-করা পরিবেশে কয়েক মুহূর্ত থাকবার পর একরকম হঠাৎই গন্ধটা নাকে এসে লাগল আমার। আর তারপরই মনে হল, আশ্চর্য তো, এ-গন্ধ এই ঘরে আসবে কী করে।

নাক উঁচু করে দু'বার আমি গন্ধটা ভালো করে নেবার চেষ্টা করলাম। ঠিক, কোনও ভুল নেই। এ-গন্ধ আমার চেনা। টম্যাটো গাছের এই উগ্র গন্ধটা বাগানে কাজ করলে অনেকক্ষণ হাতে লেগে থাকে, সাবান দিয়ে হাত ধুলেও যেতে চায় না। কিন্তু সবজিবাগানে তো এতক্ষণ আমিই ঘুরছিলাম, আমার হাতে গন্ধ নেই, অথচ ঘরে সেই গন্ধ।

ভাবতে-ভাবতেই হঠাৎ একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক জায়গায় দুটো টম্যাটো গাছ কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে মনে হয়েছিল আমার। তখন ভালো খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন যেন মাথায় একটা সম্ভাবনার কথা এই গন্ধটা জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বাগানে ঠিক জায়গায় হাজির হয়ে গাছ দুটো দু'হাতে ধরে মারলাম টান। আলগা মাটি থেকে সহজেই উঠে এল গাছ দুটো। হাত দিয়ে দু-চার বার মাটি সরাতেই...

হ্যাঁ, হাতে যেটা ঠেকেছে সেটা আমি বার করে এনেছি।

মাটি সরাতেই সোনার দুর্গাপ্রতিমা ঝকঝক করে উঠল।

এক মুহূর্ত দেরি না করে সেটা নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি আমি তুলে দিয়েছি সেটা দাদুর হাতে।

কয়েক সেকেন্ড মুখে কোনও কথা নেই, দেহেও যেন কোনও সাড়া নেই। তারপরই উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রতিমাটা বুকে চেপে ধরলেন দাদু। সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সারা মুখে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, ''আহা-হা, তুই আমায় বাঁচালি রে! কেবল আমায় নয়, সমস্ত মুখুজ্যে-বংশের সম্মান তুই বাঁচালি। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, কিন্তু এরকম ভেলকি তুই কেমন করে দেখালি বল তো।''

দাদুর কোনও কথাই তখন আমার কানে যাচ্ছিল না, আমি যেন তখনও একটা ঘোরের মধ্যেই ছিলাম। গন্ধটা কার কাছ থেকে আসছে খুঁজে বার করবার জন্যে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম একে একে সকলের দিকে। বিপুদার রুগ্‌ণ বন্ধুর কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। ভুল করবার কোনও সুযোগ নেই, গন্ধটা এখানেই সবচেয়ে তীব্র।

তাকালাম ওর মুখের দিকে। এক ফোঁটা রক্ত নেই তখন সেই মুখে। বিপুদার দিকে না তাকিয়েও তার মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মতলবটা যে বিপুদার, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই, সেই কাজে সহযোগিতা করবার জন্যে একজনকে বন্ধু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। তবু, বিপুদার দিকে না তাকিয়েও আমার কী জানি কেন তার জন্যে কেমন মায়া হচ্ছিল। তাই দাদু ফের যখন আমায় ওই কথা বলেছেন, আমি দাদুর দিকে ফিরে বললাম, ''এখন চটপট পুজোর ব্যবস্থা করো দাদু, ভেলকির ব্যাপারটা না হয় রাত্তিরেই ভালো করে গল্প করা যাবে।''

বিপুদা নিশ্চয়ই তার বন্ধুকে নিয়ে এর মধ্যে পালাবার অনেক সময় পাবে!

পুরস্কার পাঁচ হাজার ডলার

সুজন দাশগুপ্ত

সকালে আড্ডা দিতে নীচে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে যেতেই একেনবাবু একগাল হেসে বললেন, ''ভালোই হল স্যার, আপনি এসেছেন। মিস্টার রাজ সিং একটু আগে ফোন করেছিলেন, উনিও আসছেন।''

''রাজ সিং, মানে দ্য গ্রেট ডিটেকটিভ রাজ সিং ?'' আমি একটু ঠাট্টা করেই প্রশ্নটা করলাম।

''হ্যাঁ স্যার। ওঁর হাতে নাকি একটা কমপ্লিকেটেড কেস এসেছে। আমাদের কাছে একটু পরামর্শ চান।''

'আমাদের' কথাটা অবশ্য একেনবাবু ব্যবহার করলেন সম্মানার্থে বহুবচন হিসেবে। কারণ, আমি এবং প্রমথ একেনবাবুর অ্যাসেট না লায়েবিলিটি, সে-সম্পর্কে আমি এখনও খুব একটা শিওর নই! যাই হোক, এই ফাঁকে রাজ সিং সম্পর্কে একটু বলে নিই। উনি হলেন ম্যানহ্যাটানের সবেধন নীলমণি ভারতীয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সবেধন নীলমণি বলছি এইজন্য যে, যদিও একেনবাবু পেশায় একজন ডিটেকটিভ, এবং আপাতত প্রমথর সঙ্গে ম্যানহ্যাটানেই থাকেন, কিন্তু উনি কলকাতা পুলিশের লোক। ছুটি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন ক্রিমিনোলজি বিষয়ে রিসার্চ করতে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ মাঝেমধ্যে ওঁর সাহায্য নিলেও, ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাবার লাইসেন্স ওঁর নেই। ম্যানহ্যাটানে লাইসেন্সধারী ডিটেকটিভ বলতে একমাত্র রাজ সিং-ই।

পেশা এক হলেও, চেহারা ও হাবভাবে রাজ সিং হচ্ছেন একেনবাবুর কনট্রাস্ট। একেনবাবু হলেন পাতলা টিংটিঙে, বেঁটে দি গ্রেট! শুধু চেহারা নয়, ওঁর কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই অত্যন্ত আন-ইম্প্রেসিভ! আর রাজ সিং ছ' ফুট লম্বা, চওড়া-কাঁধ, ফুরফুরে, চুলে ফিটফাট। দেখলেই মনে হয়, হ্যাঁ, এ না হলে আর নিউ ইয়র্কের গোয়েন্দা! তবে এই রাজ সিং-এর আবার একেনবাবুর ওপর অগাধ ভক্তি! কমপ্লিকেটেড কোনও সমস্যা এলেই উপদেশ নিতে ছুটে আসেন। আমি আর প্রমথ মাঝে-মাঝে একেনবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করি, অ্যাডভাইস শুড নট বি ফ্রি, ফেলো কড়ি মাখো তেল! কিন্তু কে কাকে বোঝায়! খুব চাপাচাপি করলে একেনবাবু বলেন, ''কী করি স্যার, ইন্ডিয়ান ব্রাদার যে!''

আসলে রাজ সিংয়ের চেহারা আর বোলচালই সব। বাইরের গ্ল্যামারটা কেটে যেতেই ধরা পড়ে যে, হি ইজ নট ওভার বার্ডন্ড্ উইথ ব্রেন। আর বোকাসোকা বলেই আমার

ধারণা, একেনবাবু ওঁকে খানিকটা স্নেহ করেন।

রাজ সিংয়ের অফিস যদিও ম্যানহ্যাটানে, উনি থাকেন নিউ ইয়র্কের পূর্ব প্রান্তে, লং আইল্যান্ডে। তাই আসতে-আসতে প্রায় এক ঘন্টা হল। মুখ দেখেই বুঝলাম ভারি চিন্তিত। সঙ্গে একটা ভিডিও টেপ এনেছিলেন। সেটা টেবিলের ওপর রেখে ঘোষণা করলেন, লাইফ ইজ টাফ!

প্রমথ যথারীতি ইয়ার্কি করল। বলল, ''কী সিংজি, মনে হচ্ছে আপনি একটা গ্রেট ভিডিও মিস্ট্রি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন?''

রাজ সিং প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হলেও ওঁকে কেউ বড় কোনও ব্যাপারে ডাকে না। নর্মালি উনি যেসব কাজ করেন, সেগুলো নিতান্তই সাদামাঠা। যেমন, কাউকে ফলো করে সে কী করছে না-করছে তার রিপোর্ট দেওয়া, সুপার মার্কেটে কেউ শপ লিফ্‌ট, অর্থাৎ জিনিস চুরি করছে কি না দেখা, ইনসিওরেন্সের দাবিদাওয়া নিয়ে তদন্ত করা, এইসব। প্রমথর 'গ্রেট ভিডিও মিস্ট্রি' কথাটার মধ্যে যে একটা খোঁচা ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য। রাজ সিং কিন্তু কথাটা গায়ে মাখলেন না। একেনবাবুকে বললেন, ''মিস্টার সেন, আই অ্যাম ইন ট্রাবল, মাই রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক।''

প্রমথ ফিসফিসিয়ে বাংলায় আমাকে বলল, ''শুনছিস, রেপুটেশন ইজ অ্যাট স্টেক! করিস তো দারোয়ানগিরি!''

''চুপ কর ছোটলোক?'' আমি চাপা স্বরে প্রমথকে ধমক লাগালাম।

একেনবাবু এদিকে অমায়িকভাবে বলছেন, ''কী যে বলেন স্যার, কে আপনার রেপুটেশন কেড়ে নেবে!''

''না, মিস্টার সেন। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। আই গট দ্য বিগেস্ট ব্রেক অব মাই কেরিয়ার অ্যান্ড আই অ্যাম সিম্‌প্লি রুইনিং ইট! সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আমাকে বিরাট একটা ক্রাইম সল্‌ভ করতে ডেকেছে। ইট ইজ অ্যা ফাইভ ডে কনট্রাক্ট—আউট অব হুইচ থ্রি ডেজ আর অলরেডি গন অ্যান্ড আই অ্যাম নো হোয়ের নিয়ার দ্য সলিউশন। দ্য ওয়ার্স্ট অব অল, প্রত্যেকদিন আমার চোখের সামনে দ্য ক্রাইম ইজ গেটিং কমিটেড।''

''দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান। আগে এককাপ চা খান।'' টি-পট থেকে চা ঢালতে-ঢালতে একেনবাবু বললেন, ''তারপর একটু গুছিয়ে সহজ করে ব্যাপারটা বলুন।''

রাজ সিংয়ের কাছ থেকে যেটা উদ্ধার করা গেল, সেটা হচ্ছে এই যে, গত সপ্তাহে রাজ সিং হঠাৎ একটা ফোন কল পান সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার ক্লিফোর্ড জনসনের কাছ থেকে। মিস্টার জনসন ওঁকে বলেন যে, উনি সন্দেহ করছেন যে, ওঁর অফিসের এক টেলার কোনও একটা লোকাল ক্রাইম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, আর এ-ব্যাপারে উনি রাজ সিংয়ের সাহায্য চান। মিস্টার জনসন এর বেশি ফোনে কিছু বলতে চাননি। ঠিক হয় যে, পরদিন ন'টার সময় রাজ সিং মিস্টার জনসনের অফিসে গিয়ে দেখা করবেন।

পরদিন ন'টায় যখন রাজ সিং জনসনের অফিসে গিয়ে পৌঁছন, তখন দেখেন মিস্টার জনসন ছাড়াও ব্যাঙ্কের সিকিউরিটির হেড জ্যাক সাইপ্রাস ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। অফিসের দরজাটা বন্ধ করে মিস্টার জনসন বললেন, ''ইসুটা একটু সেন্সেটিভ। তাই আমি ফোনে আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে চাইনি। জ্যাক এটা নিয়ে প্রায় এক মাস হল ইনভেস্টিগেট করছে। কিন্তু ওর ওপর সিটি সেন্ট্রালের সবকটা ব্রাঞ্চের সিকিউরিটির

দায়িত্ব। ওর পক্ষে ফুল টাইম এতে দেওয়া সম্ভব নয়। ফর দিস রিজ্‌ন, আই ওয়ান্ট ইউ টু কমপ্লিট দ্য ইনভেস্টিগেশন।''

রাজ সিং বললেন, ''প্রব্লেমটা কী?''

''প্রব্লেম হল, প্রায় মাসখানেক ধরে এই অঞ্চলে মাগিংটা খুব বেড়ে গেছে।'' উত্তরটা দিলেন জ্যাক সাইপ্রাস।

এ-দেশের 'মাগিং' হচ্ছে আমাদের দেশের 'ছিনতাই'। আচমকা আক্রমণ করে বা ভয় দেখিয়ে পয়সা ও দামি জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া। যাই হোক, জ্যাক সাইপ্রাসের কথাটার তাৎপর্য রাজ সিং ঠিক ধরতে পারলেন না। বললেন, ''নিউ ইয়র্কের সব জায়গাতেই তো মাগিং বেড়েছে।''

''দ্যাটস ট্রু। কিন্তু এখানে সমস্যাটা একটু অন্য। আমরা কমপ্লেন পেয়েছি এবং পুলিশের কাছেও বেশ কিছু কেস এসেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, মাগিং ভিকটিমের অনেকেই হচ্ছে এই ব্যাঙ্কের কাস্টমার। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বেরোবার একটু পরেই তারা রাস্তায় মাগ্‌ড হচ্ছে!''

এটা শুনেও রাজ সিং বিস্মিত হননি, কারণ মাগাররা ব্যাঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখতে পাবে কারা ব্যাঙ্ক থেকে বেরোচ্ছে। যারা বেরোচ্ছে, মোস্ট লাইকলি তাদের কাছে টাকা আছে, নইলে তারা ব্যাঙ্কে আসবে কেন! কিন্তু জ্যাকের পরের কথাটা শুনে উনি বুঝতে পারলেন সমস্যাটা কোথায়।

আমরা যখন তদন্ত শুরু করলাম, জ্যাক সাইপ্রাস বললেন, ''তখন দেখলাম শুধু তারাই মাগ্‌ড হচ্ছে, যারা অনেক টাকা সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ভিকটিমই টাকা তুলেছে মিস সিলভিয়া জোন্‌স বলে একজন টেলারের কাছ থেকে। কিন্তু প্রব্লেম হল যে, আমাদের কোনও ধারণাই নেই, কেন এটা ঘটছে! আই পার্সোনালি অবজার্ভ্‌ড হার ফর অ্যা ফুল ডে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই লক্ষ করিনি।''

মিস্টার জনসন বললেন, ''বাট উই আর শিওর যে, সামহাউ সিলভিয়া গুন্ডাগুলোকে জানাচ্ছে কে মোটারকমের ক্যাশ উইথড্র করছে। দ্যাট্‌স দ্য ওনলি এক্সপ্লানেশন। এখন আপনাকে মিস্টার সিং খুঁজে বের করতে হবে যে, কী করে সিলভিয়া গুন্ডাদের ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছে! হাউ ইজ শি কম্যুনিকেটিং উইথ দেম? বাট ইউ মাস্ট হারি। কারণ, একবার যদি খবরের কাগজের লোকেরা জানতে পারে যে, আমাদের কাস্টমাররা মাগারদের টার্গেট, তা হলে আমাদের বিজনেসের কী অবস্থা হবে—সেটা তো বুঝতেই পারছেন!''

''তা পারছি,'' রাজ সিং উত্তর দিলেন, ''কিন্তু কাজটা নেওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে।''

''কী প্রশ্ন?''

''নিউ ইয়র্কে এত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর থাকা সত্ত্বেও আমাকে আপনি সিলেক্ট করলেন কেন?''

''ভেরি সিম্পল। যেহেতু আপনি একজন ইন্ডিয়ান, সিলভিয়া বা ওর গুন্ডাবন্ধুরা কল্পনাও করবে না যে, আপনি ডিটেকটিভ। বিকজ্‌ ইট ইজ র‍্যাদার অ্যান আনইউজুয়াল প্রোফেশন ফর অ্যান ইন্ডিয়ান। দ্যাট, আই বিলিভ, উইল মেক ইয়োর জব সিম্প্‌লার। তাই না?''

''মে বি,'' রাজ সিং বললেন, ''তবে আমার চার্জ কিন্তু দিনে পাঁচশো ডলার, প্লাস এক্সপেন্স। আর কাজটা কমপ্লিট করতে পাঁচ দিনও লেগে যেতে পারে।''

রাজ সিং নর্মালি এত চার্জ করেন না। কিন্তু শাঁসালো মক্কেল, ট্রাই করতে দোষ কী!

"দ্যাট্স ফাইন উইথ আস।" ক্লিফোর্ড জনসন উত্তর দিলেন। এই হল মোটামুটি ঘটনা।

রাজ সিং একেনবাবুকে বললেন, "এবার বুঝতে পারছেন তো আমার সমস্যাটা।"

"হ্যাঁ স্যার, মনে হচ্ছে বুঝেছি। অর্থাৎ, গত তিনদিনে ইউ হ্যাভ ফাউন্ড নো ক্লু।"

"এগজ্যাক্টলি। আমি সিলভিয়াকে খুব ক্লোজলি ওয়াচ করেছি। ইনফ্যাক্ট, যদি কখনও অন্যমনস্ক হয়ে কোনও কিছু মিস করে থাকি, সেইজন্য জ্যাক সাইপ্রাসের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা ভিডিওগুলোও স্টাডি করেছি।"

"সেটা কী স্যার?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"কীসের কথা বলছেন, সিকিউরিটি ভিডিও?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আপনি জানেন না বুঝি!" রাজ সিং একটু অবাক হলেন। নিউ ইয়র্কে সব ব্যাঙ্কে ভিডিও ক্যামেরা লাগানো থাকে। যারা টেলারদের কাছে গিয়ে টাকা নিচ্ছে, তাদের সবার ছবি ক্যামেরাতে ওঠে। এইজন্যই ব্যাঙ্ক-ডাকাতি আজকাল অনেক কমে গেছে।"

"অ্যামেজিং কান্ট্রি স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং।" একেনবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন।

"এনি ওয়ে," রাজ সিং পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। "নাউ আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু নেক্সট!"

প্রমথ বলল, "এটাই বুঝি আপনার সিকিউরিটি ভিডিও?"

"রাইট। দেখবেন?" রাজ সিং একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন। কী জানি স্যার, একেনবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, "ভিডিও দেখে কি আর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব!"

"তা বলে দেখতে ক্ষতি কী," বলে প্রমথ টেবিল থেকে টেপটা তুলে ভিডিও প্লেয়ারে ঢোকাল।

ছবির কোয়ালিটি বিশেষ ভালো নয়। তবে মোটামুটি চেহারাগুলো বোঝা যাচ্ছে। রাজ সিং এক্সপ্লেন করে বললেন, "ওরিজিনালি অন্য ফরম্যাটে তোলা। ভি এইচেস-এ কনভার্ট করতে গিয়ে ডেফিনেশনটা একটু লুজ করেছে।"

একেনবাবু আবার এসব টেকনিক্যাল টার্মগুলো বোঝেন না। বললেন, "হোক না ডিফরমেশন, তবু দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সিচুয়েশনটা আমায় একটু বুঝিয়ে দিন স্যার।"

"শিওরলি," রাজ সিং বললেন। "টেলারদের দেখতে পাচ্ছেন তো, ওই যে চারজন, যারা কাউন্টারের উলটো দিকে পাশাপাশি বসে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি।"

"বাঁ দিক থেকে কাউন্ট করে থার্ড পার্সন হল সিলভিয়া জোন্‌স। আই সি স্যার," টিভি স্ক্রিনের দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, "যার চুলগুলো লাল মতো?"

"ইয়েস।"

"জায়গাটা এত ফাঁকা কেন স্যার, প্রত্যেক টেলারের সামনে মাত্র একজন করে কাস্টমার?"

''ফাঁকা নয়, প্রচণ্ডই ভিড়, কিন্তু ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের জন্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,'' রাজ সিং উত্তর দিলেন। ''নর্মালি, ভিড় হলে কাস্টমাররা কাউন্টার থেকে একটু দূরে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে। টেলারদের সঙ্গে একজন কাস্টমারের কাজ শেষ হলে লাইনের প্রথমে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার জায়গায় যায়। ফলে টেলারদের সামনে ধাক্কাধাক্কি হয় না। কাস্টমারদের ওই লাইনটা ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের বাইরে পড়ে গেছে।''

''আপনি কোথায় ছিলেন স্যার?''

''কাস্টমারদের লাইনের অন্য সাইডে একটা পাটাতনের মতো আছে। সেখানে সিকিউরিটি গার্ড ও কয়েকজন কর্মচারি বসে। প্রথম দু'দিন সেখানে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। গতকাল মিস জোন্‌সের ঠিক পেছনে বুক কিপারদের একটা টেবিল আছে, সেখানে ছিলাম।''

''তার মানে স্যার, আপনি চারজন টেলারকেই ভালো করে দেখতে পারছিলেন।''

''অ্যাবসলিউটলি। শুধু দেখা নয়, সবার কথাও শুনতে পারছিলাম।''

একেনবাবু বোধ হয় আর-একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রমথ বলে উঠল, ''আরে, ওটা কী হল?''

আমিও ব্যাপারটা লক্ষ করছিলাম। একজন কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সিলভিয়া হঠাৎ কানে হাত দিলেন।

রাজ সিং বললেন, ''কানে হাত দেওয়াটা তো? ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ। আমারও প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু প্রতিদিন কতবার যে উনি কানে হাত দিয়ে দুল ঠিক করেন, তার ইয়ত্তা নেই!''

''দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজে ব্যাপারটা নাকচ করবেন না,'' প্রমথ বলল। ''দেয়ার মে বি সাম সিক্রেট কোড। ধরুন, গুন্ডাদের সঙ্গে ওঁর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে, প্রত্যেকবার নয়, শুধু তিনবারের বার কানে হাত দেওয়াই হল আসল সিগন্যাল। সে ক্ষেত্রে যেই উনি থার্ড টাইম্‌স কানে হাত দেবেন সঙ্গে-সঙ্গে গুন্ডারা সেই কাস্টমারকে ফলো করবে।''

রাজ সিং এ নিয়ে বোধ হয় খুব একটা চিন্তা করেননি। তাই একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, ''না, না, জ্যাক সাইপ্রাসও বলেছিলেন যে, দুল ঠিক করার সঙ্গে মাগিং ভিক্টিমের কোনও সম্পর্ক নেই।''

একেনবাবু বললেন, ''স্যার, মিস জোন্‌স কি শুধু বাঁ হাত দিয়েই কানের দুল ঠিক করেন, না মাঝে-মাঝে ডান হাতও ব্যবহার করেন?''

রাজ সিং কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, ''ইয়েস, দুটো হাতই ব্যবহার করতে দেখেছি।''

''দেন দেয়ার আর মোর কোডিং পসিবিলিটি,'' প্রমথ বলল। যেমন ধরুন, ''যে মুহূর্তে উনি হাত চেঞ্জ করবেন, সেটাই হবে ইন্ডিকেশন! ফর এগজাম্পল, উনি বারবার বাঁ হাত দিয়ে দুল ঠিক করছেন। একবার হঠাৎ ডান হাত দিয়ে করলেন, সেটাই হবে গুন্ডাদের ক্লু!''

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, ''এই পসিবিলিটিগুলো রাজ সিংয়ের মাথায় খেলেনি। কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বলে, সেগুলো ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছেন না! হাজার হোক, প্রমথর কী ক্রেডেনশিয়াল? এদিকে উনি হচ্ছেন একজন লাইসেন্সধারী ইনভেস্টিগেটর!''

এমন সময় একজন মোটাসোটা কাস্টমার সিলভিয়া জোন্সের কাছে এসে দাঁড়াতেই রাজ সিং বলে উঠলেন, ''এই যে লোকটাকে দেখছেন মিস্টার সেন, এ হচ্ছে একজন মাগিং ভিকটিম!''

শোনামাত্র আমরা সবাই নিঃশব্দে মিস জোন্সের মুভমেন্ট স্টাডি করতে শুরু করলাম। লেনদেন শেষ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাস্টমার চলে গেলেন। দেয়ার ইজ নাথিং, অ্যাবসলিউটলি নাথিং, যেটা আমার মনে হল সাসপিশাস! সিলভিয়া কানের দুল ঠিক করলেন না, কোনও স্পেশাল মুভ লক্ষ করলাম না, এভরিথিং ইজ কমপ্লিটলি নর্মাল!''

''দেয়ার গোজ ইয়োর কোডিং থিয়োরি, আমি প্রমথকে খোঁচা দিলাম। নট সো ফাস্ট'', প্রমথ বলল, ''হয়তো কানে হাত না দেওয়াটাই হল আসল সিগন্যাল।''

''কিন্তু সেটাও সত্যি নয়। কারণ, ঠিক পরের জনের বেলাতেও, সিলভিয়া ওয়াজ অ্যাজ নর্মাল বিফোর!''

''নাউ মাই থিয়োরি ইজ গন,'' প্রমথ স্বীকার করল। ''আনলেস দ্য কোড ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড।''

''আমি তো আগেই বলছিলাম,'' রাজ সিং বললেন।

''মুশকিল হল স্যার, ভিডিওটা টকি নয়, মানে নো সাউন্ড,'' একেনবাবু বললেন।

''দ্যাট্স ট্রু। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিস্টার সেন, আই ডিড নট ফাইন্ড এনিথিং ইন হার ভয়েস হুইচ ইজ সাসপিশাস।''

''উনি কি স্যার নর্মাল ভাবেই সবার সঙ্গে কথা বলছিলেন?''

''ইয়েস। ইনফ্যাক্ট শি সাউন্ডেড মোর নর্মাল দ্যান আদার্স।''

একেনবাবু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন,''মোর নর্মাল মানে কী স্যার?''

''হোয়াট আই মিন, অন্যান্য টেলারের মতো উনিও, কাস্টমার সামনে এসে দাঁড়ালে বলছিলেন, মে আই হেল্প ইউ, এবং কাজ শেষ হওয়ার পর, থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান্ড হ্যাভ অ্যা প্লেজেন্ট ডে। কিন্তু সেটা মোটেই আর সবার মতো যান্ত্রিকভাবে নয়। ওঁর কথার মধ্যে একটা ফ্রেণ্ডলিনেস ছিল। এমনকী কাজের ফাঁকে-ফাঁকে উনি হাসিমুখে কাস্টমারদের সঙ্গে গল্পও করছিলেন।''

''একটু ভাবুন স্যার, উনি কি কথার ফাঁকে এমন কিছু কাউকে বলেছিলেন, যেটা অন্য কাউকে বলেননি? অনেক সময় যেগুলো আমাদের খেয়ালও হয় না স্যার, যেমন, সবাইকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে শুধু একজনকে 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলা? বা ওই জাতীয় কিছু?''

''নো। আই অ্যাম শিওর। আমি খুব মন দিয়ে ওঁর প্রত্যেকটা কথা শুনেছি। দেয়ার গোজ অ্যানাদার ওয়ান,'' রাজ সিং বলে উঠলেন, ''আর-একজন মাগিং ভিকটিম!''

''নাঃ, রাজ সিং ইজ অ্যাব্সলিউটলি রাইট, দেয়ার ইজ নো ক্লু! আর তখনই আমার মাথায় সম্ভাবনাটা ঝিলিক দিল, হোয়াট অ্যাবাউট এ ট্রান্সমিটার? যদি মেয়েটা একটা সিম্পল রেডিয়ো ট্রান্সমিটার কোমরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, আর তাতে একটা পুশ বাটন থাকে, যেটা অতি সহজে টাকা গুনতে-গুনতে কনুই দিয়ে প্রেস করা যায়। দ্যাট্স অল হোয়াট ইজ নিডেড! গুন্ডাদের একজনের কাছে নিশ্চয় একটা হ্যান্ড হেল্ড রিসিভার আছে। মেয়েটা পুশ বাটন টিপলেই রিসিভারের ইন্ডিকেটর লাইটটা ব্লিঙ্ক করবে আর সঙ্গে সঙ্গে গুন্ডাটা দেখতে পাবে, কে বড় অঙ্কের ক্যাশ উইথড্র করছে!''

আমি আমার থিয়োরিটা বলতেই রাজ সিং বললেন, ‘‘সেটাই জ্যাক সাইপ্রাস প্রথমে ভেবেছিলেন। তাই উনি একটা ছুতো করে বেরোবার আগে টেলারদের একটা সারপ্রাইজ সিকিউরিটি সার্চ করেন। কিন্তু কারও কাছে কিছু পাওয়া যায়নি!’’

প্রমথ আমায় খোঁচা দিল, ‘‘দেয়ার গোজ ইয়োর থিয়োরি, ডাউন দ্য ড্রেন!’’

‘‘মিস জোন্‌স কতদিন হল কাজ করছেন স্যার?’’ একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘‘মাসতিনেক। চারজনের মধ্যে মিস জোন্‌স আর আর-একজন হল নতুন। বাকি দু’জন দু’বছর ধরে কাজ করছে।’’

‘‘হু ইজ দ্য আদার ওয়ান স্যার?’’

‘‘আই অ্যাম নট শিওর’’ রাজ সিং উত্তর দিলেন।

একেনবাবু দেখলাম ঘন-ঘন পা নাচাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘কী, কিছু বুঝলেন?’’

‘‘আই হ্যাভ এ সাসপিশান স্যার।’’

‘‘হোয়াট ইজ দ্যাট?’’ রাজ সিং খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘‘আই সাসপেক্ট দ্যাট উই আর লুকিং অ্যাট অ্যা রং পার্সন।’’

‘‘তার মানে?’’ আমি আর রাজ সিং প্রায় একসঙ্গে প্রশ্নটা করলাম।

‘‘ধরুন স্যার, একজন নয়, এই কন্‌স্পিরেসিতে দু’জন টেলার ইনভলভ্‌ড। একজন হচ্ছেন মিস জোন্‌স, আর দ্বিতীয়জন হলেন, মিস জোন্‌সের পাশে যে দু’জন বসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন। যখনই কেউ এসে অনেক টাকা তুলেছে, মিস জোন্‌স ওঁর পার্টনারকে হয় কাগজ পাস করে, নয় পায়ে একটা খোঁচা দিয়ে সেটা জানাচ্ছেন। দ্যাট্‌স নট ডিফিকাল্ট, কারণ সবাই একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন! কিন্তু ভেবে দেখুন স্যার, কী দারুণ স্ট্র্যাটেজি! আমরা সন্দেহবশত শুধু মিস জোন্‌সকেই দেখছি। আর সেই ফাঁকে আর-একজন নিশ্চিন্তমনে সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছেন!’’

‘‘মাই গড!’’ রাজ সিং মুগ্ধ হয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, ‘‘হোয়াট অ্যা ক্লেভার প্ল্যান! তার মানে, উই শুড লুক অ্যাট আদার্স ফর শোইং সাইনস।’’

‘‘আই থিঙ্ক সো স্যার।’’

‘‘এক্সেলেন্ট, আই অ্যাম গোইং টু ডু দ্যাট।’’ রাজ সিং দারুণ খুশি হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ‘‘আমি জানতাম আপনার কাছে এলে একটা হদিস হয়ে যাবে! ভালো কথা মিস্টার সেন, আপনাদের সকলকে একদিন লাঞ্চে নিয়ে যেতে চাই। ইউ আর অলওয়েজ সো কাইন্ড অ্যান্ড হেল্পফুল।’’

একেনবাবু অ্যাজ ইউজুয়াল, ‘আরে ছি ছি, না,’ বলতে যাচ্ছিলেন। প্রমথ বলল, ‘‘ফাইন, হাউ অ্যাবাউট মানডে।’’

‘‘বেশ তো, আসুন না। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে কয়েকটা ভালো খাবার জায়গা আছে, তার একটাতে যাওয়া যাবে’খন।’’ ‘ই বলে রাজ সিং বিদায় নিলেন। চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল, উনি ভিডিওটা ফেলে গেছেন। যাক, সোমবার নিয়ে গেলেই চলবে!

সোমবার দিন সকালে আমার ক্লাস ছিল। ক্লাসের পর অনেক সময়েই ছাত্রদের অনেক প্রশ্ন থাকে। সেটা শেষ করে সময়মতো আমি লাঞ্চে পৌঁছতে পারব কি না বুঝতে পারছিলাম না। তাই স্কুলে যাওয়ার আগে আমি একেনবাবুকে বলে গেলাম, আমার জন্য সাড়ে এগারোটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পোর্ট অথরিটি টার্মিনালের সামনে অপেক্ষা

করতে। তার মধ্যে যদি না যাই, তা হলে যেন আমাকে ছাড়াই ওঁরা লাঞ্চে যান। একেনবাবু অবশ্য একটু ঘ্যানঘ্যান করলেন, কিন্তু শেষমেশ মেনে নিলেন। আগে থেকে ব্যাপারটা ঠিক করে রেখে ভালোই হয়েছিল, কারণ সেদিনই পিলপিল করে ছেলেমেয়েগুলো ঘরে এল। সকলের হাজারগণ্ডা প্রশ্ন। ফ্রি লাঞ্চ তো মিস করলামই, সব কিছু চুকোতে-চুকোতে প্রায় একটা! আমি বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে প্রমথর কাছে শুনলাম রাজ সিং নাকি ভীষণ আপসেট, কারণ একেনবাবুর থিয়োরি টোটালি ফেল মেরেছে! প্রমথ অবশ্য যোগ করল যে, রাজ সিংয়ের যা বিদ্যেবুদ্ধি ও অবজারভেশন পাওয়ার—সেটা সত্যি নাও হতে পারে। যাই হোক, একেনবাবু আসেননি। রাজ সিংকে অত্যন্ত বিচলিত ও আশাহত দেখে মরাল সাপোর্ট দিতে সিটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে গেছেন।

একেনবাবু সন্ধেবেলা যখন ফিরলেন, তখন আমি আর প্রমথ নিউজ শুনতে বসেছি। সিকিউরিটি ভিডিওটা টেবিল থেকে তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''স্যার, আপনার ভিডিও প্লেয়ারটা একটু চালাব?''

''শিওর। কিন্তু কী ব্যাপার, নিউজ শুনবেন না?''

''শুনব স্যার, একটা জিনিস চেক করে এক্ষুনি আসছি।'' বলে ওপরের তলায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেলেন। যখন নেমে এলেন, তখন লোক্যাল, ন্যাশনাল—দুটো নিউজই শেষ, মানে, প্রায় এক ঘণ্টা পরে!

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, ''কী মশাই, কী করছিলেন এতক্ষণ ধরে!''

''কিছু না স্যার, আসলে মিস্টার সিং এত ঝামেলায় পড়েছেন! তাই ভিডিওটা আবার একটু দেখছিলাম স্যার, যদি কোনও ক্লু বেরিয়ে যায়!''

''ধন্য আপনার বন্ধুপ্রীতি!'' প্রমথ ধমকের সুরে বলল, ''জানেন, আপনার এই রাজ সিং গত চারদিনে কম-সে-কম দু' হাজার ডলার পকেটে পুরেছে! ফর গড্‌স সেক, লেট হিম আর্ন হিজ ওন মানি!''

''তা তো বটেই স্যার,'' একেনবাবু অপরাধী মুখ করে বললেন।

আমি প্রমথকে বললাম, ''কেন ওঁকে জ্বালাচ্ছিস? উনি হচ্ছেন কর্মযোগী! নিজের কাজ উনি করে যাবেন, অর্থপ্রাপ্তি হোক বা না হোক। কী বলেন একেনবাবু, ঠিক কিনা?''

''কী যে বলেন স্যার। সামান্য একটু সাহায্য...।''

''যাক, ওসব কথা'', আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''মিস্ট্রি সল্‌ভ হয়েছে? শুনলাম আপনার থিয়োরিও নাকি ফেল?''

''হ্যাঁ স্যার, কালকেরটা ফেল। তবে এবার আর-একটা থিয়োরি ট্রাই করছি।''

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রাজ সিংয়ের ফোন। একেনবাবুর খোঁজ করছেন। একেনবাবু ফোন ধরবার জন্য উঠতেই খেয়াল করলাম যে, ওঁর চেয়ারে একটা কাগজ, আর তাতে ২০,১০০,৫৫,১২০,৪০,১১০,৫৩,১৩০,....ইত্যাদি অনেক সংখ্যা লেখা! তাদের মধ্যে আবার ৫৫ আর ৫৩-র চারদিকে একটা করে গোল আঁকা! কী হাবিজাবি লিখেছেন কে জানে! একেনবাবু ওদিকে ফোন তুলে বললেন, ''আই গট দ্য টাইম স্যার ফ্রম ফিফটি সেকেন্ডস টু ওয়ান মিনিট। তবে সাউন্ড নেই বলে কিছুটা স্যার গেস ওয়ার্ক করেছি।''

রাজ সিং কী বললেন শুনতে পেলাম না, কিন্তু একেনবাবু উত্তরে বললেন, ''দ্যাট্‌স ইট স্যার, উই গট ইট! সিম্পল, বাট অ্যা ক্লেভার প্ল্যান।''

রাজ সিং বোধ হয় আবার কিছু একটা বললেন। উত্তরে একেনবাবু বললেন, ''ইউ শুড থ্যাঙ্ক বাপিবাবু। উনি কথাটা না তুললে আমার ব্যাপারটা স্ট্রাইক করত না। ঠিক আছে স্যার, কাল বিকেলে তা হলে দেখা হবে। বাই স্যার।''

একেনবাবু ফোন নামিয়ে রাখতেই প্রমথ প্রশ্ন করল, ''কী ব্যাপার বলুন তো? বাপিটা এত থ্যাঙ্ক ইউ' পাচ্ছে কেন, হোয়াটস গোইং অন?''

''আমাদের থিয়োরিটা কনফার্মড হয়ে গেল স্যার?''

''ওয়েট অ্যা মিনিট, আমাদের থিয়োরি বলতে কোনটা?'' আমি বলে উঠলাম, ''কালকের থিয়োরিগুলো তো সব ফেল মেরেছে বললেন, তার মানে...।''

''বলছি স্যার বলছি, একটু সবুর করুন। আপনিও স্যার একেবারে প্রমথবাবুর মতো অবুঝ হয়ে পড়ছেন। মনে আছে স্যার, সকালে আপনি বলেছিলেন সাড়ে এগারোটা থেকে এগারোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে যদি আপনি না আসেন, তা হলে আমরা যেন চলে যাই।''

''তা বলেছিলাম।''

''সেটা শোনামাত্রই আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টাইম স্যার, টাইম হচ্ছে সিমপ্লেস্ট ওয়ে টু পাস ইনফরমেশন। আপনি বললেন, ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যে না এলে আমি আর আসব না। ইট ইস অ্যা পারফেক্ট মোড অব কমিউনিকেশন, বিকজ উই অল হ্যাভ আওয়ার ওয়াচ। বুঝতে পারছেন তো স্যার? সত্যি কথা বলতে কী, এর সঙ্গে মাগিং-এর কী সম্পর্ক, আমার কাছে তখনও ক্লিয়ার নয়।''

একেনবাবু বলে চললেন, ''এবার খেয়াল করুন স্যার, কাস্টমার এলে মিস জোন্‌স বলছেন, মে আই হেল্প ইউ। তারপর কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলছেন, থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান্ড হ্যাভ ও প্লেজেন্ট ডে। প্রশ্ন হচ্ছে, 'মে আই হেল্প ইউ' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ'-এর মধ্যে যে সময়টা, কুড দ্যাট বি ইউজ্‌ড টু সেন্ড এ মেসেজ? আই ফাউন্ড দ্যাট হোয়াট প্রিসাইজলি ওয়াজ ডান! টাইম-গ্যাপটা যদি পঞ্চাশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিটের মধ্যে হয়, তা হলে কাস্টমার অনেক টাকা তুলেছে। সেটা না হলে জাস্ট ইগনোর ম্যান। বুঝতে পারছেন স্যার?''

''ও বুঝুক না-বুঝুক, আমি বুঝেছি.'' প্রমথ বলল।

''জলবৎ তরলম্!'' কাগজের নম্বরগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি কি সেটাই ভিডিও থেকে চেক করছিলেন নাকি?''

''ইয়েস স্যার, যে-দুটো কেস মিস্টার সিং বলেছিলেন, সে-দুটোই এক মিনিটের খুব কাছাকাছি। তবে শব্দ ছিল না বলে এগজাক্ট টাইমটা বের করা অসম্ভব। কিন্তু অন্য কাস্টমারদের ক্ষেত্রে সময়গুলো বেশ কিছুটা বেশি বা কম। মিস্টার সিং বলেছিলেন না যে, মিস জোন্‌স কাস্টমারদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গল্পগুজব করতেন। আমার ধারণা স্যার, গল্পগুজব করেই উনি টাইমিংগুলো ঠিক-ঠিক রাখতেন। এনিওয়ে স্যার, আজকের মাগিং রিপোর্ট থেকে মিস্টার সিংও থিয়োরিটা কনফার্ম করলেন! পরদিন রাজ সিং এসে পুরো রিপোর্ট দিলেন। ছদ্মবেশী পুলিশ রাজ সিংয়ের কাছ থেকে ক্লু নিয়ে প্রসপেকটিভ মাগিং ভিকটিমদের ফলো করে দু'জন মাগারকে গ্রেফতার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তি থেকে মিস জোন্‌সকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ সিং আমাদের না বললেও পরে শুনেছি, ম্যানহ্যাটানের মাগিং মিস্ট্রি সল্‌ভ করার জন্য ক্লিফোর্ড জনসন নাকি রাজ সিংকে ওঁর প্রাপ্য টাকা ছাড়াও আরও পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার হিসেবে দিয়েছেন!

গোয়েন্দা হলেন যন্ত্রভূষণ

সিদ্ধার্থ ঘোষ

চক্ষুস্থির। এটা কার নাম? যতদূর জানি এই ৫৬ নম্বর বিভূতি বড়াল স্ট্রিটের বাড়িটা আমার ঠাকুর্দার আমলে তৈরি। কখনও কোনও ভাড়াটেও ছিল না। সকালে বেরোই যখন, স্পষ্ট মনে আছে যে লেটার বক্সের সামনে আমার নামটাই শুধু লেখা ছিল। তার মানে, আট ঘন্টার মধ্যে আমার বাড়িতে এক অতিথি এসেছেন এবং এসেই আমার নামের নীচে গোটা-গোটা ইংরেজি হরফে নিজের নামটি লিখে ফেলেছেন। জে. বি. বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ ছেড়ে বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ কি বিদ্যাশিরোমণি—বিদ্যা-বিভূষিত পদবিধারী একটাও চেনাজানা লোকের কথা মনে পড়ছে না। জবরদখল হয়ে গেল নাকি বাড়িটা? চাবিটা লকে গুঁজেও, এখন ঘোরাতে ভয় হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে সাড়ে ছ'টা। তা হলে যুধো ফিরে এসেছে। কলিং বেলটাই আগে টেপা যাক।

যুধোর পায়ের আওয়াজ পেয়ে হাঁফ ছাড়লাম।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে যুধো বলল, ''আবার চাবি হারিয়েছ বুঝি?''

''মোটেই না। কিন্তু লেটার বক্সের গায়ে এসব কী? কে এসেছে?''

''কে আবার আসবে! ওটা আমার ছদ্মনাম। আজই লিখেছি।''

পরশুদিনের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। এবার নির্ভয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করা যেতে পারে।

যুধোর মগজে দিন-দিন শয়তানি বুদ্ধি গজাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেছি আগেই, কিন্তু এতটা আশা করিনি। অভ্যাসবশত, 'যুধো' 'যুধো' বলেই হাঁক পেড়েছিলাম পরশুদিন। যুধো সাড়া দিতে দেরি করেনি, কিন্তু আপত্তি জানিয়েছিল, ''কেন যে যুধো নাম রেখেছিলে জানি না। যুধিষ্ঠিরের অপভ্রংশ ছাড়া তো কিছুই না। টিভি সিরিয়ালের পর থেকে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির কোনও চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে ইচ্ছে করে না।''

যুধোর চোখে চোখ রেখে চাপা বিরক্তির স্বরে বললাম, ''ছদ্মনাম নেওয়ার ব্যাপারটা কি আগে থেকে আমাকে জানিয়ে রাখলে ভালো হত না?''

''সুযোগ পেলাম কোথায়! আজই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে ছদ্মনামটা গ্রহণ করেছি। নিজের নাম লিখে একটা চিঠিও পোস্ট করে দিয়েছি। দেখা দরকার, আমার নামে চিঠিপত্র এলে ঠিকমতো ডেলিভারি হয় কি না।''

''ঠিক বোঝা গেল না।''

''অতি সরল। দু'সপ্তাহের মধ্যে আমার একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠাব 'প্রভা' বা 'অনুপম' পত্রিকার দফতরে। সম্পাদকরা হয় তো তারপরে লেখকের সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা করবেন। এরকম জরুরি চিঠি সময়মতো আমার হাতে না পৌঁছলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।''

''বেশ, বেশ। তা বিদ্যাভূষণ মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? নামের আগে ওই জে. বি. অক্ষর দুটি...''

''যন্ত্রভূষণ। যন্ত্রভূষণ বিদ্যাবাগীশ। ভালো হয়নি?''

এখন বুঝতে পারছি সব ঝঞ্ঝাটের মূলে আমি। যুধো অথবা যুধিষ্ঠির আমার হাতে গড়া যন্ত্রমানব। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। ভুল হয়েছে যুধোকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে। নিজের গবেষণার কাজে যুধোকে ব্যবহার করতে গিয়ে।

এটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, যুধো, বলতে গেলে প্রায় লড়াই করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিডিং-রুম কার্ড আদায় করার আগে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। লেখক বা বইয়ের নাম ধরিয়ে দিলে, পুস্তক-তালিকার কার্ড ঘেঁটে ঠিকমতো কল-নম্বর বের করা, রিকুইজিশন স্লিপ ভরা এবং শেষপর্যন্ত কাউন্টার থেকে বই সংগ্রহ করা। নানাভাবে বাজিয়ে নিয়ে তবেই জাতীয় গ্রন্থাগার প্রথম যন্ত্রমানবকে সভ্যপত্র দিয়েছে। মাসছয়েক তাকে দুষ্প্রাপ্য বা জীর্ণ বইপত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু বই নাড়াচাড়া বা পাতা ওলটানোর ব্যাপারে যুধোর দক্ষতা মানুষ পড়ুয়াদের চেয়ে ঢের বেশি। অসতর্কতার জন্য তার হাতে বইয়ের পাতার একটি কোণা অবধি ভাঙার অবকাশ নেই। এখন যুধোর অবাধ গতি। রেয়ার বুক, মাইক্রোফিল্ম, এমনকী এস্‌প্ল্যানেডের সংবাদপত্র পাঠকক্ষেও প্রয়োজনমতো কাজ করছে।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের কয়েকটা খবরের কাগজের পাঁপড় ভাজার মতো হলদেটে পাতা ওলটাতে-ওলটাতেই আমার ধারণা যুধোর মনে প্রথম স্বাধীন চেতনা জেগে উঠেছিল। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বছরটার কিছু খবরাখবর সংগ্রহের জন্য একদিন নির্দেশ দিয়েছিলাম যুধোকে। সেদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখি তার চোখ-মুখের চেহারাই অন্যরকম। বেজায় উত্তেজিত। এর আগে একবারই যুধোর এরকম চেহারা দেখেছি। যেদিন ও সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রথম দুটি গল্প উদ্ধার করে এনেছিল অমৃতবাজার থেকে। নিশ্চয় আজও চমকে দেওয়ার মতো কিছু সংগ্রহ করেছে।

যুধো চমকে দিয়েছিল ঠিকই, তবে তার সঙ্গে আমার গবেষণার কোনও সংশ্রব নেই। ১৮৫৭-র বিভিন্ন সংবাদপত্র উলটেপালটে দেখার চেষ্টা করেছিল যুধো। অধিকাংশেরই অবস্থা শোচনীয়, প্রায় চুরচুর। পত্রিকার ফাইল হাতে পেয়েও মলাট বন্ধ করে ফেরত দিতে হয়েছে। পাতা ওলটানোর বিশেষ সুযোগ ছিল না। যুধোর মতে, এক বা একাধিক গবেষকের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের জন্যই এই বছরের কাগজগুলির এই হাল। সন্দেহ নিরসনের জন্য সে ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ সালের বিভিন্ন সংবাদপত্রও নেড়েচেড়ে দেখেছে। তাদের অবস্থা কিন্তু বেশ ভালো। প্রায় যুদ্ধঘোষণার মতো চেঁচিয়ে উঠেছিল যুধো, ''তুমি অনুমতি দিলে দিনতিনেকের মধ্যেই অপরাধীদের আমি শনাক্ত করতে পারি।''

''কীভাবে?''

''প্রথম দেখতে হবে সিপাই অভ্যুত্থান নিয়ে এ-অবধি কারা গবেষণা করেছেন, আর তারপরে খোঁজ নিতে হবে, তাঁদের মধ্যে কে কে এস্‌প্ল্যানেড রিডিংরুম ব্যবহার করেছেন।

এলিমেন্টারি।''

আমি জানি, যুধো শার্লক হোমসের ফ্যান। কিন্তু তা বলে সে নিজেকে হোমসের আসনে বসিয়ে আমায় ওয়াটসন বানাবে? বেজায় বাড়াবাড়ি।

''দ্যাখ যুধো, ভুলে যাসনি, তুই সামান্য এক জুনিয়ার রিসার্চ স্কলার। গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তোকে...''

''সরি। আমারই ভুল হয়েছে। আসলে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর অন্যদিকে, গবেষণার কাজের মধ্যেও একটা গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার আছে। অনুসন্ধান। ক্লু। ঠিক আছে, বলছ যখন, অপরাধী খুঁজে বের করার জন্য আর সময় নষ্ট করব না। কিন্তু একটা কথা এখনই জানিয়ে রাখি। পরে তুমি আপত্তি করতে পারবে না। তোমার কাজ করার ফাঁকে, আমি যদি নতুন কোনও তথ্য বা তত্ত্বের সন্ধান পাই, তা হলে কিন্তু সেই অজানা বিষয় নিয়ে আমি নিজেই লিখব। সারাজীবন শুধু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে কাটাতে হবে ভাবলেই...তা ছাড়া তোমারও তাতে বদনামই হবে।''

যুধোর কথাগুলো তখন এককান দিয়ে ঢুকে আর-একটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রমানুষ হিসেবে ওর মনটা সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশি যুক্তিনির্ভর পথে চলাফেরা করে। স্বাভাবিক ভাবেই পরনির্ভরতাকে সে কখনই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করবে না। যাইহোক, এখন বুঝতে পারছি বেশ কিছু দিন ধরে ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে যুধো।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে রুমালি রুটি ও কষা মাংসও বিস্বাদ ঠেকল। যুধো নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘুম বললাম না, কারণ যন্ত্রমানুষ স্বপ্ন দেখে না। অনেক কষ্টে নিজেকে ঠেকিয়েছি। ইচ্ছে করলে, বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে যুধোকে এমন নির্দেশ দিতে পারি, যাতে ও গড়গড় করে সব কবুল করে দেবে। আমাকে না-জানিয়ে কী খবর সংগ্রহ করেছে, কী লিখেছে বা লিখবে বলে ভাবছে, সব জেনে নিতে পারি। কিন্তু বিবেক বাধা দিচ্ছে। যতই হোক, আমার হাতেই তো তার জন্ম।

বারান্দায় বসে তৃতীয় সিগারেটটা ধরানোর পর বুদ্ধিটা এল। 'প্রভা' ও 'অনুপম' পত্রিকার সম্পাদকরা আমার অচেনা নয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ জমা পড়লে, অনেক সময় আমার মতামতও চেয়ে পাঠায়। বিশেষ করে অচেনা বা নবীন লেখকের লেখা হলে। আর এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যুধো ওরফে জে. বি. বিদ্যাবাগীশ, বঙ্গভঙ্গবিরোধী পর্বেরই কোনও দুর্লভ মণিমুক্তোর হদিস পেয়েছে। কারণ গত তিন মাস ওকে দিয়ে আমি ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের খবরের কাগজগুলো পড়াচ্ছিলাম।

ভাগ্য প্রসন্ন। লাইন পেতে অসুবিধে হয়নি। দুই সম্পাদকের কাছে একই আর্জি পেশ করেছি। যন্ত্রভূষণ নামে একজন গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠাতে পারে। অপরিচিত নাম ও লেখার স্টাইলের দুর্বলতা দেখে সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদকরা যেন বাতিল কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে কর্তব্য সম্পাদন না করেন। আমার কাছে পাঠালে, লেখাটা মেরামত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি। 'অনুপম' পত্রিকার সম্পাদক কোনও প্রশ্ন করেননি, কিন্তু 'প্রভা'র কর্ণধার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অগত্যা তার ন্যায্য প্রশ্নের উত্তরে জানাতেই হল, যন্ত্রভূষণ অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের তরুণ। আমার কাছে বছরকয়েক শিক্ষানবিশি করেছে। দোষের মধ্যে একটি। টনটনে আত্মসম্মান বোধ। প্রথম লেখা জমা দিচ্ছে, তাও আমাকে দেখিয়ে নিতে আপত্তি।

'প্রভা'র শারদীয় সংখ্যায় যন্ত্রভূষণের লেখা ছাপা হয়েছে। নাম সই করে রেজিস্টার্ড পোস্ট ছাড়িয়ে নিল যন্ত্রভূষণ। প্যাকেট খোলার আগেই ছুটে এল আমার ঘরে। ওর চোখে-মুখে শিশুর উচ্ছ্বাস।

অস্বস্তি লাগছে। গম্ভীর মুখে বললাম, 'প্রভা'র শারদীয় সংখ্যা ? আমি আগেই দেখেছি।''

''লেখা নেই? আমার লেখা ছাপা হয়নি? তা হলে কপি ফেরত পাঠাল কেন?''

''ছাপা হয়েছে।''

প্যাকেট খুলে সূচিপত্রের পাতায় চোখ রেখেই যন্ত্রভূষণের ভুরু কুঁচকে গেল, ''তুমিও লিখেছ?''

পাতা ওলটাচ্ছে যন্ত্রভূষণ। শুধু লিখেছি বলা ঠিক হবে না। একই বিষয় নিয়ে লিখেছি। আমার প্রবন্ধের নাম, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পর্বের স্বদেশি গুপ্তচর' আর তারই সংযোজন হিসেবে ছাপা হয়েছে যন্ত্রভূষণের প্রবন্ধের অংশবিশেষ, টীকা রূপে। অবশ্য বিনা স্বীকৃতিতে নয়।

পত্রিকা হাতে নিয়ে যন্ত্রভূষণ চেয়ারে বসে পড়ল। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। আমি ওর দৃষ্টি পড়তে পারি। চরম অবিশ্বাস। ওর কৃতিত্ব আত্মসাৎ করেছি, এমন একটা ভাব। কিন্তু আমি জানি, আর কয়েক পাতা পড়ার পরে ওর মনোভাবের পরিবর্তন হবে। কালীচরণ সমাদ্দার সম্বন্ধে ও শুধু তথ্য আহরণ করেছে খবরের কাগজের প্রতিবেদন থেকে, আর ওর লেখা পড়ার পর আমি সশরীরে হানা দিয়েছি সমাদ্দারের বাড়িতে। বংশধরদের সিন্দুক ঘেঁটে উদ্ধার করেছি অপ্রকাশিত ডায়েরি ও চিঠির গোছা। যন্ত্রভূষণের অভিযোগ করার কোনও উপায় নেই।

পুরো লেখাটা পড়ার পরে পাশের টেবিলে পত্রিকাটি নামিয়ে রেখে, চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল যন্ত্রভূষণ। হেসে বলল, ''গুরু হিসেবে ছাত্রের কাছে ঋণস্বীকার না করলেও চলে। কিন্তু করলেই যখন, আসল কথাটা চেপে গেলে কেন? সমাদ্দারের তো নামও শোনোনি কস্মিনকালে। তার বাড়ির ঠিকানার হদিসও তো আমার লেখাতেই পেয়েছ? তাই না?''

ব্যাপারটাকে ও হালকাভাবে নিতে পেরেছে দেখে হাঁফ ছেড়েছি। ঘাড় নেড়ে বললাম, ''সে তো সত্যিই। পেয়েছিই তো। তোর মাথায় কিন্তু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে অনুসন্ধানের ব্যাপারটা..''

''দাঁড়াও। দাঁড়াও!'' উত্তেজিতভাবে যন্ত্রভূষণ আমাকে থামিয়ে দিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে বলল, ''একেই বলে স্বীকারোক্তি। সেল্‌ফ কন্‌ফেশন। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ যে, আমার পাণ্ডুলিপিটা তুমি 'প্রভা'র দফতর থেকে হাতিয়েছিলে। না হলে, আমার লেখা ছাপা হওয়ার আগে এই কেরামতি দেখানোর সুযোগ পেতে না।''

গবেষক যন্ত্রভূষণ কিঞ্চিৎ নাকাল হলেও গোয়েন্দা হিসেবে সে শোধ তুলে নিয়েছে।

পাখি ধরা

অনীশ দেব

পরনের সাদা ধবধবে পাঞ্জাবির সঙ্গে এক মাথা সাদা ধবধবে চুল একেবারে মিশে গিয়েছিল। বৃদ্ধের শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে অতি-আধুনিক একটা টেপরেকর্ডারের ওপরে। টেপ চলছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম শিসের শব্দ, মিষ্টি এবং কর্কশ সুর। পাখি ডাকছে।

বৃদ্ধ তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। হাতে খাতা-পেনসিল। নোট নিচ্ছেন। কখনও কখনও ঘাড় নাড়ছেন। আবার কোনও এক ফাঁকে পেনসিল-ধরা হাতে টান মারছেন শুভ্র চুলের গোছায়। চশমার কালো ফ্রেম ঠিকঠাক করছেন।

'গুড মর্নিং, সমাদ্দারসাব। সক্কাল বেলায নক্‌লি চিড়িয়ার ডাকে কোনও মওজ নেই।'

ফিরে তাকালেন চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার। হাসলেন। সাত সকালে তাঁর এই চিরকুমার-আস্তানায় হুটহাট ঢুকে পড়ে এরকম দোআঁশলা ভাষায় মন্তব্য করতে পারে মাত্র একজনই। ইন্‌সপেকটার বিকাশ রাজানি। মুখের রেখা কাঠ-কাঠ, চোয়াড়ে, গায়ের রঙ রোদে পোড়া, চোখ শরীরে বিঁধে যায় যেন, আর পুরুষালি মোটা গোঁফ।

দেখে রাজানিকে যতই অপ্রিয় মনে হোক চ-হ-স ওকে ভীষণ ভালোবাসেন। কথাবার্তায় রুক্ষ হলে কী হবে, মনটা বড় ভালো। আর কাজপাগল। মনে পড়ে, একবার একটা নির্বোধ রাজানিকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল। রাজানি হাসতে হাসতে যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে তার ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যার সব কাজই বাঁ-হাতের তার আবার ডাঁয়ে হাথের জরুরত কী?'

খোলা জানালার পাশেই টেবিলে ছোট্ট কোকিল-ঘড়ি। ন'টা এখনও বাজেনি। ঘড়ির পাশেই স্টেইনলেস স্টিলের 'মোনালিসা' ফ্লাস্ক। রাজানি জানে, ভোরবেলায় উঠেই চ-হ-স নিজের হাতে ফ্লাস্কভর্তি কফি করে রাখেন। কারণ এখানে পরের হাত বলে কিছু নেই।

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে খাতা-পেনসিল গুছিয়ে রাখলেন তার পাশে। হাসতে হাসতে বললেন, 'বোসো, রাজানি। নক্‌লি চিড়িয়ার ডাকে মওজ না থাকলে কী হবে, আমার ফ্লাস্কের কফিতে থাকতে পারে। আজ্‌মাকে দেখো।'

ছাপা কাপড়ে আবৃত বেতের চেয়ারে বসল রাজানি। গা হেলিয়ে দিল শোয়ার ভঙ্গিতে। হেসে বলল, 'সমাদ্দারসাব, পাখিতে কী মজা পান বুঝি না। মাঝে মাঝে ডাক শুনতে ভালো লাগে। তা বলে দিনভর কিচিরমিচির?'

চ-হ-স কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলেন রাজানিকে। তারপর ঘরের মেঝেতে সাজিয়ে বইয়ের কয়েকটা স্তূপকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে আর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। সাদা পাজামা টেনে ঠিক করে বললেন, 'রাজানি সাহেব, তুমিই বা চোর-ডাকাত-খুনে-বদমাসের মধ্যে কী মজা পাও বুঝি না। পাখিরা তার চেয়ে ভালো।'

বিকাশ রাজানি কফিতে চুমুক দিল কয়েকবার। তারপর সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'সমাদ্দারসাব, জরুরি কাজে বোধহয় ডিসটার্ব করলাম—'

চ-হ-স ঝুঁকে পড়ে রাজানির কাঁধ চাপড়ে দিলেন আলতো করে। বললেন, 'যা শুরু করেছি তা এক-আধ দিনের ব্যাপার নয়। অন্তত দু'বছর লাগবে।'

'কী কাজ?' রাজানির কৌতূহল হয়। কপালে ভাঁজ পড়ে।

চ-হ-স মাথার চুল টানলেন একবার। তারপর ঘরের ছাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'বার্ড কমিউনিকেশন। পাখিদের ভাষা। কোন কোন পাখি কীরকম ভাষায় কথা বলে তাই বোঝার চেষ্টা করছি। যে-টেপটা বাজাচ্ছিলাম সেটা গত সপ্তাহে সুন্দরবনের জঙ্গলে টেপ করা। এর মধ্যে রাডি কিংফিশারের আওয়াজ শুনতে পেলে?'

'রাডি কিংফিশার?' রাজানি জলদি চুমুক দিয়ে ফেলে কফির কাপে। তারপরই 'উঃ' করে ওঠে। একটু সময় নিয়ে তারপর বলল, 'সমাদ্দারসাব, আমি এদিকে এক ব্লাডি কিংফিশারকে নিয়ে ফেঁসেছি। গত কয়েকবছর ধরে প্রীতম দাস চৌধুরি বহু মছলি পাকড়েছে। কিন্তু আমরা ওকে ফাঁদে ফেলতে পারিনি। শালা পাকড়েছে আর শটকেছে। সোজা ন' দো গিয়ারা।'

চন্দ্রগুপ্ত বাধা দিলেন: 'রাজানি, জিভে আগল দাও। বোঝাই যাচ্ছে, তুমি ডিসটার্বড় না হলে আমাকে ডিসটার্ব করতে আসতে না। তা এই প্রীতম দাস চৌধুরি লোকটা করেছে কী? খুন করেছে?'

রাজানির কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাশের ছোট্ট টেবিলে কাপটা নামিয়ে রেখে বলল, 'এতদিন শুধু ওর খুন করাটাই বাকি ছিল। পরশু সেটা সেরে ফেলেছে।' একটু থেমে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি, খুনটা দাস চৌধুরিই করেছে। কিন্তু কী করে করেছে ধরতে পারছি না। লোকটা গহেরা পানি কা মছলি, সমাদ্দারসাব।'

বিকাশ রাজানির মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার ওর অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তাটা অনুভব করতে পারছিলেন। ছেলেটা সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ওর চাকরিকে। লালবাজার ওর কাছে মন্দির। আর পুলিশি উর্দি ওর গর্ব। কিন্তু প্রীতম দাস চৌধুরি ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

চ-হ-স কাশলেন। মাথার এক গোছা চুল ধরে টানলেন বার দুয়েক। তারপর বললেন, 'প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থেকো না, রাজানি। আমি এখনও মরে যাইনি। আই নো, হাউ টু ক্যাচ অ্যা রেয়ার বার্ড।' হাসলেন চ-হ-স। বললেন, 'একটা কথা তোমাকে তো সবসময় বলি। চেহারা আমার শার্লক হোমসের মতো নয়, সে রকম করে পাইপ টানতেও পারি না। এরকুল পোয়ারোর মতো মোমের পালিশ দেওয়া গোঁফও আমার নেই। এছাড়া দেবেন্দ্রবিজয়, হুকাকাশি, রবার্ট ব্লেক বা ব্যোমকেশের ছিটেফোঁটা গুণও নেই আমার মধ্যে। তবে আমি, সাধারণ একজন গোয়েন্দা, মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিই। সুতরাং মনে হয়, প্রীতম দাস চৌধুরির ধাঁধা আমি বোধহয় সলভ্ করতে পারব।'

কোকিল-ঘড়িতে সুরেলা শব্দে ন'টা বাজল।

বিকাশ রাজানি দেখল চ-হ-স'র দিকে। জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে বৃদ্ধের মাথায়। সাদা চুলের গুচ্ছ চকচক করছে রুপোর মতো। পাখি-পাগল এই মানুষটা এক সময়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করত। এখন পাখি আর অপরাধী নিয়ে গবেষণা করে। বলে, বার্ড ওয়াচিং আর ম্যান ওয়াচিং-এ নাকি অনেকটাই মিল। ঈশ্বর জানেন!

রাজানি একটু সময় নিয়ে মনে মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল। তারপর শুরু করল: 'দাস চৌধুরির নাম আপনি হয় তো শোনেননি, তবে লোকটা বহত সাল ধরেই দু'নম্বরি কারোবার চালাচ্ছে। যেমন, প্রথমে করত কালোয়ারি, চোরাই মাল-টাল খরিদ করত। তারপর ধরমতল্লায় একটা হোটেল খুলে বসল। ছোট, কিন্তু টিপটপ হোটেল। নাম, মুসাফির। তো হোটেল খোলার পর লোকটা স্মাগলিং-এর বেওসায় নেমে পড়ল। তারপর শুনেছি গতবছর নাকি ড্রাগের লাইনে পা দিয়েছে।'

একটু ফাঁক পেতেই চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার হাত তুললেন, বললেন, 'রাজানি, ডিয়ার বয়, তোমার রাজধানী এক্সপ্রেসের গতি কিছুটা কমাতে পারলে ভালো হয়। তোমাদের রেকর্ডে দাস চৌধুরির নাম নেই?'

রাজানি বলল, 'আছে। তবে সে সবই ছোটামোটা লাফড়া। সব ক'টা কেসেই জামিনে ছুট হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রীতম পয়সাওয়ালা রইস—সব সময় এক নম্বর ল'ইয়ার দাঁড় করায়।'

চ-হ-স চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন কফির ফ্লাস্কের দিকে। নিজের জন্য এক কাপ ঢাললেন। রাজানির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করতে রাজানি মাথা নাড়ল। বিরক্তভাবে বলল, 'সমাদ্দারসাব, আমি দু'রাত্তির ধরে ঘুমোতে পারছি না। আমার জান জ্বলে যাচ্ছে। প্রীতমকে ধরার এটাই সুন্হরি মওকা, কিন্তু যদি এবারেও পিছলে বেরিয়ে যায় তাহলে—'

'টেক ইট ইজি, রাজানি' কফির কাপ হাতে করে চ-হ-স ফিরে এলেন চেয়ারে। গুছিয়ে বসে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মাথা গরম না করে গল্পটা ধীরে ধীরে বলো। গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাও, বলো—'

'মুসাফিরের চারতলাটা প্রীতম নিজে ব্যবহার করে। তিনটে ঘর আছে সেখানে। গত পরশু সকালে ওর দু'দোস্ত মুকেশ আর সুদেশ তেওয়ারি হোটেলে আসে। মুকেশ আর সুদেশ দু'ভাই। তবে ওরা দু'জনেই প্রীতমের বিজনেস পার্টনার। কিসের বিজনেস তা বলতে পারব না! তবে পাঁচ-ছ'রকম তো হবেই। তার মধ্যে কয়েকটা ন্যাচারালি কালা ধান্দা।'

চ-হ-স চোখ বুজে শরীর এলিয়ে ছিলেন। হাতের কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। হঠাৎই চোখ খুলে বললেন, 'লোকগুলোর ছবি এনেছ?'

পাশেই একটা খালি চেয়ারে একটা মোটা ফোল্ডার পড়ে ছিল। সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রাজানি। চ-হ-স'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'শুধু ফোটো কেন, এখানে ওই তিনজনের পুরা দাস্তান পেয়ে যাবেন । এছাড়া স্পটের নানান ফোটোগ্রাফ আর রিপোর্টও আছে।'

চ-হ-স ফোল্ডারটা নিলেন। তাঁর চোখ সজাগ হল। শীর্ণ শরীর ঋজু হল। কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন। তারপর পাখি-দেখা তীক্ষ্ণ চোখে ফোল্ডারের

কাগজপত্র উলটে পালটে দেখতে শুরু করলেন। তাঁর চশমার কাচ চকচক করছিল।

প্রথমেই প্রীতম দাস চৌধুরির ছবি। বছর পঁয়তাল্লিশের মোটাসোটা মানুষ। গায়ের রঙ কালো। কপাল মাথার দিকে উঠে গেছে অনেকটা। চোখ দুটো কুতকুতে, শয়তানের নজর যেন তাতে। চোখের নীচে চর্বির থাক। বেপরোয়া অত্যাচারের চিহ্ন। গলায় সোনার সরু চেন।

ছবির নীচেই রয়েছে প্রীতমের দাস্তান বা জীবনী। সেটা খুঁটিয়ে পড়লেন চ-হ্-স। তারপর পাতা ওলটালেন।

মুকেশ তেওয়ারি। বয়েস বোধহয় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। রোগা ফর্সা চেহারা। চোখেমুখে ভীষণ পরিশ্রমের ছাপ। আর দৃষ্টিতে যেন একটা চাপা জেদ ফুটে বেরোচ্ছে। ফোটোর ওপরে একটা সিলমোহরে ছাপ দেখা যাচ্ছিল। সেটার কথা রাজানিকে জিজ্ঞেস করতেই ও বলল, 'মুকেশ তেওয়ারিই মারা গেছে গত পরশু। পাতা ওলটালেই ওর ডেডবডির ফোটো দেখতে পাবেন। এই তসবিরটা আমরা ওর পাসপোর্ট থেকে কপি করেছি।'

এরপর সুদেশ তেওয়ারি। বয়েসে দাদার চেয়ে অন্তত বছর আট-দশের ছোট। চুল খাটো করে ছাঁটা। সরু গোঁফ। চোয়ালের রেখা উদ্ধত। চোখের নজর দাদার মতোই।

ফোটো দেখা শেষ করে চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার বাকি রিপোর্টগুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎই চোখ তুলে রাজানির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাঃ, তোমার ধৈর্য দেখছি নিতান্ত পলকা।'

বিকাশ রাজানি উসখুস করছিল। একটু অস্বস্তি পেল। সেটা লক্ষ করে চ-হ্-স বললেন, 'ও কে, রাজানি। তুমি গল্পটা বলে যাও। আমার কান মনোযোগ দিয়ে শুনছে।'

রাজানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আগের চেয়ে অনেক নরম গলায় এবং ধীরে বলতে শুরু করল: খোঁজ খবর নিয়ে যা জেনেছি, বেওসার ব্যাপারে মাথা বলতে ছিল মুকেশ তেওয়ারিই। সুদেশ প্রীতমের প্রায় সমান উমরের হওয়ার জন্যে দু'জনে বেশিরভাগ সময়টাই ফুর্তিফার্তা করে কাটিয়ে দিত। এবারে বেওসার কোনও কনট্র্যাক্ট নিয়ে বোধ হয় লাফড়া হয়েছিল। তাতে হোটেলের চাকর বেয়ারারা বহত হল্লাগুল্লা শুনেছে। মুকেশ তেওয়ারিই চিৎকার চেঁচামেচি করছিল বেশি। মাঝে মাঝে প্রীতম দাস চৌধুরি ওর গুস্‌সা ঠান্ডা করার কোশিশ করছিল—

চ-হ্-স ফোল্ডারের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'ঝগড়াটা হয় সন্ধে সাড়ে ছ'টায়?'

রাজানি বুঝল সমাদ্দারসাব রিপোর্টটা ধেয়ান দিয়েই পড়ছেন। ও শুধু ঘাড় হেলাল। তারপর বলল, 'সে যাই হোক, মুকেশ তেওয়ারি অনেক মেহনতের পর ঠান্ডা হয়। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার সময় সে মারা যায়। তখন ওর পাশের ঘরে বসে প্রীতম আর সুদেশ গল্প করছিল, আর ভিডিওতে কী-একটা সিনেমা দেখছিল। হঠাৎই প্রীতম একটা শব্দ শুনতে পায়—অন্তত স্টেটমেন্টে সেরকমই বলেছে। শব্দটা অনেকটা নাকি ধমকির মতো—এই পটকা-ফটকা যেমন হয়। সুদেশ বলেছে সে কিছু শুনতে পায়নি। অবশ্য বুঝতেই পারছেন, সে হয়তো ঠিক বহাল তবিয়তে ছিল না—চোখে রঙ ধরে গিয়েছিল। তা আওয়াজটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দু'জনে ছুটে যায় পাশের ঘরে। দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু দরজা কেউ খোলে না। তখন প্রীতম চাবির ফুটোয় নজর দিয়ে দেখে। সুদেশকেও দেখায়। তারপর সুদেশকে বলে, চাবিটা ভেতর থেকে তালার গর্তে ঢোকানো রয়েছে।

ইয়ানি কি অন্দর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিয়েছে। তারপর চাবিটা আর খুলে নেয়নি—'

চ-হ্-স শব্দ করে ফোল্ডার বন্ধ করলেন। রেখে দিলেন পাশের টেবিলে। তাঁর মুখে চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। কপালে চার-পাঁচটা ভাঁজ ফেলে বলে উঠলে, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তারপর—তারপর—?'

বিকাশ রাজানি গালে হাত ঘষল। ঠোঁট উলটে বলল, 'তারপর আর কী, ধাক্কাধাক্কি করে সুদেশ দরজা ভাঙতে যাবে তখন প্রীতম ওকে থামায়। একটা দারুণ মতলব দেয়। কোথা থেকে একটা আখবারের পাতা এনে তার অর্ধেকটা দরজার নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর একটা কাঠি দিয়ে চাবির ফুটোর ভেতরে খোঁচা দেয়। ভেতরের চাবিটা শব্দ করে পড়ে যায় নীচে। তখন আখ্‌বারের পাতাটা টেনে নিতেই চাবিটা বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। সেটা নিয়ে প্রীতম নিজেই দরজার তালা খোলে। তারপর হুড়মুড় করে দু'মক্কেল একসাথে ঢুকে যায় ঘরের ভেতরে—'

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার হাসলেন। কফির কাপ নিয়ে চলে গেলেন ফ্লাস্কের কাছে। কফি ঢালতে ঢালতে শিস দিয়ে উঠলেন। যেন কোনও পাখি ডাকছে। তারপর আবার ফিরে এলেন চেয়ারে। পর পর তিন-চার চুমুক দিলেন কাপে।

বিকাশ রাজানি থেমে গিয়েছিল চ-হ্-স'র আচরণ দেখে। চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, 'সমাদ্দারসাব, ম্যায়নে কোই খুশিকি বাত সুনায়ি কেয়া?'

'বেশক ইন্‌সপেকটারসাব, বেশক। তবে তুমি থেমো না, প্লিজ কন্‌টিনিউ।' চ-হ্-স'র চোখে চাপা কৌতুক।

রাজানি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাম কি লীলা রামহি জানে। তো যাই হোক, ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকে দেখে মুকেশ তেওয়ারি বিছানার কাছে একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছে। ডাঁয়ে হাথে রিভলভার ঝুলছে। আর বুকের বাঁ দিকে গোলি কি নিশান। খতম। ব্যাস। তখন প্রীতম দাস চৌধুরি তার দোস্ত সুদেশকে বলে মুকেশ তেওয়ারি সুইসাইড করেছে। বড়ি আফশোশ কি বাত। তাতে সুদেশ তেওয়ারি হঠাৎই ক্ষেপে যায়। ও বলে, না, ওর দাদা খুন হয়েছে। তারপর ও ঘরের সব ক'টা দরজা আর খিড়কি ভালো করে দেখে। লেকিন সব অন্দর সে বন্‌ধ্। একদম ছিটকিনি লাগানো, সমাদ্দার সাব। অন্য কোনও লোক যে মুকেশকে খুন করে হাতে রিভলবার সাজিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। কামরার দরজা-খিড়কি সব অন্দর থেকে পাক্কা বন্ধ ছিল। কিন্তু ফিরভি সুদেশ তেওয়ারি না-সমঝ্। ও খালি বলে, আমার বড়াভাইকে কেউ সাজিশ করে খুন করেছে। সুইসাইড না-মুমকিন।' রাজানি একটু থামল। চ-হ্-স কফি শেষ করে ফেলেছিলেন। কাপটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা খুন হয়েছে বলে সুদেশ তেওয়ারি গোঁ ধরে বসে আছে কেন?'

রাজানি হেসে বলল, 'এইখানেই মজা, সমাদ্দারসাব। সেদিন বিকেলে মুকেশ তেওয়ারি নাকি ভাইকে বলেছিল আগামীকাল—অর্থাৎ, গতকাল—বেওসার কীসব হিসেবপত্তর নিয়ে বসবে। আজকাল হিসেবপত্তরে নাকি উলটা-সিধা গড়বড় দেখা যাচ্ছে। এর জন্য মুকেশ পুরোপুরি প্রীতমকেই দায়ী করেছে। এছাড়া দু'ভাইয়ে মিলে কাল সকালে ওদের এক বুড়্‌টি মওসিকে বড়বাজারে দেখতে যাবে বলে প্ল্যান করেছিল। তারপর তো সাড়ে ছ'টায় কাজিয়া। আর সাড়ে বারোটায় মুকেশ তেওয়ারির খেল খতম। এই সব কারণেই সুদেশ কিছুতেই মানতে পারছে না ওর দাদা খুদকুশি করেছে।'

রাজানি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙল।

একটু চুপ করে থেকে চ-হ-স জিজ্ঞেস করলেন, 'রিভলবারটা কার?'

রাজানি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধকে। বলল, 'কার আবার, মুকেশ তেওয়ারির! রিপোর্টে লেখা আছে।'

'গুলি কি ক্লোজ রেঞ্জ থেকে করা হয়েছিল? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট কী বলছে?'

'ক্লোজ রেঞ্জ। কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু সুদেশ তেওয়ারি হই-চই শুরু করে দিয়েছে। আর প্রীতম দাস চৌধুরির দাঁত বের করা হাসি আমি সইতে পারছি না। ষোলোআনা মোটিভ রয়েছে, কিন্তু কোনও সবুত নেই।' বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতে ঘুষি মারল বিকাশ রাজানি। বলল, 'শয়তানটাকে অন্দর করতে পারলে—'

'আঃ, রাজানি।' চ-হ-স স্নেহের সুরে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠান্ডা হয়ে বসো দেখি। তোমাকে আমি প্রমাণ-টমান সব জোগাড় করার মতলব বাতলে দিচ্ছি।'

রাজানি চেয়ারে বসল বটে কিন্তু মুখে অসন্তোষের ছোঁয়া লেগে রইল।

চ-হ-স বললেন, 'সুদেশ কি গুলির আওয়াজ শুনেছিল?'

'ও তো বলছে, শোনেনি।'

'হোটেলের আর কেউ কিছু শুনেছে?'

একটু ভেবে রাজানি বলল, 'সুলেমান নামে—কে এক বেয়ারা কসম খেয়ে বলছে রাত বারোটা নাগাদ ও একটা ধমাকার শব্দ শুনেছে। কিন্তু সন্ধের পর সুলেমান একটু-আধটু নেশা-টেশা করে। তো কে জানে আস্‌লি নক্‌শা কী!'

চ-হ-স নড়েচড়ে বসলেন। সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন দু'বার। বললেন, 'রাজানি, তুমি ঠিকই বলেছ। মুকেশ তেওয়ারি খুন হয়েছে—আর, ওকে খুন করেছে প্রীতম দাস চৌধুরি।'

রাজানি শিরদাঁড়া টানটান করে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'লেকিন ক্যায়সে, সমাদ্দার-সাব? দরজা-খিড়কি তো সব অন্দরসে বন্ধ ছিল!'

চ-হ-স হাসলেন: 'সেটাই তো বন্ধ ঘরের রহস্যের মজা, রাজানি। তবে এটুকু তোমাকে বলে রাখি, মুকেশ তেওয়ারিকে গুলি করা হয়েছে বারোটা নাগাদ। তোমার সুলেমানের কথাই বোধ-হয় ঠিক। খোঁজ করে দেখো, ওই সময়ে প্রীতম দাস চৌধুরি বন্ধুবর সুদেশকে ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়েছিল কিনা। তাছাড়া আমার ধারণা, গুলি করার সময়ে সে হয় তো রিভলবারের মুখে চাদর-টাদর কিছু চাপা দিয়ে থাকবে। তাতে গুলির আওয়াজটা অনেক ভোঁতা শোনাবে। তোমার কাজটা হবে সেই দাগী চাদরটা উদ্ধার করা। হয় এটা হোটেলের স্টোর রুমে আছে, নইলে প্রীতম গুঁজে দিয়েছে কোনও উনুনে।'

রাজানি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'খুন করার পরে কী করল তাই বলুন—'

'বলছি।' চ-হ-স একটু দম নিয়ে বললেন, 'ঘরের জানালাগুলো ঝটপট বন্ধ করে দিল প্রীতম। তারপর দরজার ভেতর দিকের চাবির গর্তে এমন একটা চাবি ঢুকিয়ে দিল যার মাথাটাই কাটা। অর্থাৎ, তালা খোলার জন্য চাবির যে-অংশটা সবচেয়ে জরুরি সেই টুকুই কেটে বাদ দেওয়া। এই অকেজো চাবিটা দরজার ভেতর দিকে লাগিয়ে প্রীতম বাইরে এসে দরজা টেনে দেয় এবং আসল চাবি ব্যবহার করে দরজাটা তালা দিয়ে দেয় বাইরে থেকেই। হোটেলের মালিক হওয়ার সুবাদে প্রীতমের কাছে মুকেশের ঘরের চাবি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

'সে যাই হোক, জলদি কাজ সেরে প্রীতম ফিরে এল সুদেশের কাছে। এসে এতক্ষণ গরহাজির থাকার জন্য যা হোক একটা বাহানা শোনাল। তারপর সাড়ে বারোটা নাগাদ

মিথ্যে করে বলল যে সে একটা—তোমার ভাষায়, ধমাকার শব্দ শুনতে পেয়েছে। তখন সে জোর করেই সুদেশকে সঙ্গে নিয়ে মুকেশের ঘরের দরজায় হাজির হয়। ওকে সাক্ষী মানার জন্য ভেতর দিকে লাগানো অকেজো চাবিটা ওকে দেখায়। এমনিতে ওরকম ভাবে তালায় চাবি ঢোকানো থাকলে বাইরে থেকে চাবি ঢুকিয়ে দরজা খোলা মুশকিল। তাই প্রীতম খবরের কাগজ পেতে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে অত সব কাণ্ড করেছে।'

চ-হ-স থামতেই রাজানি বলল, 'কিন্তু যে-চাবিটা আখ্‌বারের পাতা দিয়ে প্রীতম বাইরে বের করে নিয়ে এল সেটা তো ফালতু। তা হলে ওই চাবি দিয়ে দরজাখুলে গেল কী করে, সমাদ্দার সাব?

হাসলেন চ-হ-স। বললেন, 'একে বাংলায় বলে হাত সাফাই, রাজানি। সুদেশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে অত কষ্ট করে বের করে আনা অকেজো চাবিটা বোধ হয় আসল চাবির সঙ্গে পালটে নিয়েছিল প্রীতম। আসল চাবিটা ওর পকেটেই ছিল হয় তো। ব্যস্, তারপর আর কী!'

রাজানি উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে ফোল্ডারটা তুলে নিল টেবিল থেকে।

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার উঠে দাঁড়ালেন। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'রাজানি, এবারে কী কী জিনিস খুঁজে বের করতে হবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তার মধ্যে আসল হচ্ছে ওই মাথা কাটা চাবিটা। আর খোঁজ করে দেখো, কোনও চাবিওয়ালা সেই সন্ধেবেলা মুসাফির হোটেলে এসেছিল কি না। অবশ্য চাবি কাটাকাটির কাজটা প্রীতম দাস চৌধুরি নিজেও করে থাকতে পারে। সাড়ে ছ'টা থেকে বারোটা—অন্তত সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় পেয়েছিল লোকটা।'

'থ্যাংক য়ু, সমাদ্দার সাব', বলে বড় বড় পা ফেলে চলে যাচ্ছিল রাজানি, চ-হ-স ওকে ডেকে থামালেন।

'একটা কথা, রাজানি। আমি তো শুধু থিওরি বাতলে দিলাম। বাস্তবে সেটা কতটা মিলবে জানি না। কে জানে, প্রীতম দাস চৌধুরি হয়তো সত্যিই মুকেশ তেওয়ারিকে খুন করেনি—'

রাজানি হেসে বলল, 'সে ভার আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। কালই আপনাকে ফোন করে থিওরির রেজাল্ট জানিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। লেকিন, সমাদ্দারসাব, কী করে আপনি এই থিওরির আইডিয়া পেলেন? ইট ইজ একসেলেন্ট।'

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার চুলের গোছায় টান মারলেন। হেসে বললেন, 'জন ডিকসন কার, রাজানি, জন ডিকসন কার। এই ভদ্রলোক জন ডিকসন কার আর কার্টার ডিকসন, এই দুটো নামে সারাটা জীবন শুধু বন্ধ ঘরের রহস্য আর অসম্ভব সমস্যা নিয়ে কিতাব লিখে গেছেন। সুতরাং যখনই আমি কোনও ক্লোজড্ রুম প্রবলেম পাই তখনই জন ডিকসন কারের মতো করে ভাবতে চেষ্টা করি। তবে সব সময়ে যে পারি তা নয়—'

রাজানি হেসে বলল, 'আপনাকে বিনয় মানায় না। জন ডিকসন কারের চেয়েও আপনি জাদা অকলমন্দ্। এগেইন অ্যা বিগ থ্যাংক্স্, সমাদ্দারসাব। গুড বাই।'

বিকাশ রাজানি চলে গেল হনহনিয়ে। চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার আবার টেপ রেকর্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপ চালু করলেন। নাম-না-জানা পাখিরা আবার মিষ্টি সুরে ডাকতে শুরু করল। চ-হ-স তখন জানালা দিয়ে বাইরের রোদ দেখছিলেন।

একটি টিকিটের সূত্রে

শিবায়ন ঘোষ

শেষ পর্যন্ত রবি পুলিশে চাকরি পেল। অথচ চাকরির আগে পর্যন্ত ও বলত, ''পুলিশের চাকরিতে আমি নেই, ভাই। দরকার হলে কালুমুদির দোকানের দাঁড়িপাল্লায় বসে তেল, নুন, ডাল, পোস্ত, চিনি মাপতেও রাজি আছি।''

এই বাল্যবন্ধুটার স্বভাবচরিত্র আমাদের আদ্যোপান্ত জানা। একে খুব নরম মনের ছেলে, মজবুত শরীর স্বাস্থ্য নিয়েও কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে, তার ওপর ওর বাবা স্কুলের শিক্ষক। কাজেই ওর স্বপ্ন থাকতেই পারে অধ্যাপনা করার। অথচ হল উলটো। দেখা গেল, এক ঝকঝকে শরতের সকালে রবি হুট করে কলকাতায় চলল পুলিশের চাকরি করতে।

আমরা তো, যাকে বলে, একদম হাঁ হয়ে গেলাম।

বছর ছয়েক পরে ফিরে এসে রবি অন্যরকম ভাষায় বলতে শুরু করল, ''আসলে কী জানিস, বাঁচার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই, একটু তো লেখাপড়া শিখেছি। নিছক কালুমুদির দোকানে তো আর বসতে পারি না তাই।''

আমরা মজা করে বলতাম, ''শেষে না আবার খুন দেখে মূর্ছা যাস, দেখিস। তুই তো আবার ভয় পেয়ে কুঁকড়ে কেন্নো হয়ে যাস।''

কথাটা বোধ হয় রবির গায়ে লাগল। ও বলল, ''এখন আর আমি আগের রবি নেই। যে চাকরির যা শর্ত। আসলে আমাদের ট্রেনিংটা বড্ড কড়া। সাধারণ লোককেও পুলিশ করে দেয়। আর তা ছাড়া, খাকি পোশাকটার একটা মন্ত্রশক্তি আছে।''

''গায়ে চড়ালেই মেজাজ চড়ে, তাই না?''

বড় ভালো বলল কথাটা শিশির।

নৌকোর পাটাতনে বসে প্রতিদিনের মতো বিকেলের আড্ডা চলছিল আমাদের। সবাই তো গ্রামছুট। পুজোর ছুটিতে এই যা কয়েকদিনের জন্য বন্ধুদের দেখাসাক্ষাৎ। তাও পুজোর ছুটির অনেক আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে চিঠি-চালাচালি হয়। শেষ অবধি দেখা যায় তবুও দু-একজন এসে পৌঁছয় না। যেমন, এবারে অনিমেষ এল না। গত বছর আমিও আসিনি।

তো পুজোয় এসে যে ক'দিন থাকি আমরা, রোজ বিকেলটা এই নদীর ধারে ছিপ নৌকোগুলির ওপরে বসে গল্পে-গানে কাটাই। সুখ, দুঃখ, চাকরিবাকরি নিয়ে কথাবার্তা হয়।

একমাত্র রবি ছাড়া আমরা বিশাল কেরানিকুলের এক-একজন। সেদিক থেকে আমাদের চোখে ওর চাকরির একটা আলাদা মেজাজ, তেজ, গাম্ভীর্য ও রহস্য আছে।

কথাটা আমিই তুললাম। বললাম, ''আচ্ছা রবি, তোদের চাকরিতে তো অনেক রহস্য, রোমাঞ্চ, খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ, ডাকাতি আছে?''

রবি চট করে কথাটা গায়ে মেখে নিয়ে বলল, ''অনেক, অনেক। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি। এখন চাকরিটায় আমি বেশ মজা পাই। এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, শুনলে তোদের দমবন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা অদ্ভুত খুনের তদন্ত করলাম।''

রবিকে এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে আমি নিজেকে নিজেই বাহ্বা দিচ্ছি। শিশির গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ নাচাল। পরিতোষ ও গৌতম টানটান হয়ে উঠে বসল।

রবি এখন চায়ের বদলে কফি খায়। সবাই চা আর কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। রবি বলল, ''পুলিশকে ছোট ভাববি না!''

''উঁহু, কাগজে লেখে বটে একটু আধটু—''

সেই মুখফোঁড় শিশির। আমার হাতের কড়া একটা চিমটি খেয়ে বলল, ''দুঃখিত! সরি ফর ইন্টারাপশন!''

গৌতম উৎসাহ দিতে রবি বলল, ''পুলিশ পারে না এমন কাজ নেই। হঠাৎ একটা তদন্তের ভার মাথায় চেপে বসলে প্রথমে একটু বিরক্তির বোঝা মনে হয়, কিন্তু এগোতে-এগোতে যখন অদ্ভুত একটা কিনারা পাওয়া যায়, তখন যে কত আনন্দ! শোন, আমার এই ছোট্ট চাকরিজীবনের সেরা একটা তদন্তের কথা বলি।

''এটা ধর অক্টোবর, সেটা হচ্ছে চোদ্দোই অগস্ট। সারারাত ডিউটি করে ক্লান্ত, চোখ টেনে আসছে ঘুমে। থানায় ফিরে ভাবছি, কোয়ার্টারে গিয়ে স্নানটান করে একপ্রস্থ নাক ডাকিয়ে ঘুম দেব। ঠিক এমনই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার কানে দিয়ে চমকে উঠলাম।

''হ্যালো? হ্যাঁ, কী বলছেন? বুবু সেন? বুবু সেন খুন হয়েছেন? আশ্চর্য? কী নাম বললেন? হ্যাঁ, আপনার নাম? হ্যাঁ, ক্ষুর দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে?''

''নামটা বলল না।''

''চটপট বেরোতে হল। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে জিপ ছুটল বুবু সেনের বাড়ি। কাছেই। ভালো কথা, বুবু সেন সম্বন্ধে তোদের দু-চার কথা বলা দরকার।

''বুবু সেন হচ্ছেন ওখানকার নামী ক্লাবের সেক্রেটারি, তার ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী যুবক। বুঝতেই পারছিস, কী কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ল হুড়মুড় করে, কাঁধের ওপরে। আমি ঠিক তাল পাচ্ছি না।''

পরিতোষের মধ্যে চাঞ্চল্য, পরের রহস্যের জন্য। গল্পের গন্ধ পেয়ে শিশির, গৌতম নড়েচড়ে বসল, আর আমি তো বলতে গেলে উদ্যোক্তা। বললাম, ''তারপর?''

''হুঁ, তারপরটাই আসল।''

বলে, রবি যেন এই এখনই তদন্তে এসেছে এমনভাবে বলল, ''বুবু সেনের ঘরের বাইরে অনেক লোক। কলেজ, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে আছে। জোর স্লোগান চলছে, ''বুবু সেনের খুনি। পাকড়াও এক্ষুনি'' ইত্যাদি।

''এই সময় পুলিশের নুয়ে পড়লে চলে না। আমি বেশ কঠিন হয়ে আছি। ভিড় কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে পড়ে আছেন বুবু সেন। উপুড় হয়ে, গায়ে কোনও জামা

নেই, পরনে পাজামা। হাত দুটি দু'দিকে ছড়ানো। আমার নির্দেশে এক কনস্টেবল দেহটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে চিত করে দিতেই, বুকটা, কী বলব, ছ্যাঁত করে উঠল। ভীষণ, মর্মন্তুদ দৃশ্য। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। ইঞ্চি আটেক তো হবেই। ধারালো ছুরি দিয়ে আড়াআড়ি পেটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিয়েছে। কী নির্মম! মুখে বাঁধা বুবু সেনের পাশবালিশের ওয়াড়। বোঝা যায়, ছুরি মারার পরেও খুনি ওর ওপর প্রাণপণ শক্তিতে চেপে বসে ছিল, তেমন নড়াচড়া করতে দেয়নি। নইলে রক্তটা মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কাজ শেষ করে তবেই খুনি পালিয়েছে।''

''বলিসনি, বলিসনি, আমার কেমন বমি-বমি পাচ্ছে, রক্ত আমি একদম চোখে দেখতে পারি না।''

গৌতম কথাটা বলামাত্র, পরিতোষ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, ''উঠে যা, তোর থেকে কাজ নেই! তবু তো গল্প শুনছিস, সত্যি-সত্যি হলে যে কী করতিস!''

খোঁচা খেয়ে গৌতম চুপ হয়ে গেল।

রবি বলতে শুরু করল, ''অর্থাৎ, একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের সন্দেহ রইল না। এটা বোঝা গেল যে, পরিষ্কার একটা খুন, এটা কোনও আত্মহত্যা নয়। তারপর তো যা হয়ে থাকে। ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যে অনেক কিছু নেওয়া হল। লাশটা পাঠানো হল মর্গে! মর্গের গুমোটে মর্গের আর কী!''

রবির মধ্যে এখনও কবিতার চোরা ঢেউটা একটু-আধটু আছে, তা বোঝা গেল!

রবি খুব বেশি কফি খায় এখন। বোধ হয় টেনশনে থাকলেই বেশি খায়। ও কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, ''শেষে মুশকিল হল তদন্তে। কোনওভাবেই খুনের কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর থেকে বারবার ফোন আসছে তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়ে। আর ওখানকার আর এক যুবক পলু মিত্তিরের নেতৃত্বে প্রায়, রোজ রুটিনমাফিক থানা ঘেরাও হচ্ছে, বুবু সেনের হত্যাকারীকে ধরার জন্যে চাপ দিয়ে। চিন্তা কর, পুলিশের চাকরির কী সাঙ্ঘাতিক হ্যাপা!''

বর্ষায় তখন নদীতে ইলিশ ধরা চলছে। আমাদের খুব কাছেই ইলিশের জালে অনেক ইলিশ আটকেছে দেখে, শিশির বলল, ''দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর সব ইলিশ, আঃ, ডিম আর তেল খেতে যা লাগবে না?''

শিশির কথার মধ্যে বড্ড কথা বলে। একটা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, ও হঠাৎ করে আর-একটা প্রসঙ্গ এনে মূল সুরটাই কেটে দেয়।

রবিও হয়েছে তেমন! কোথায় হবে বাংলার অধ্যাপক, হয়ে বসল পুলিশ। সেও শিশিরের কথায় তাল দিয়ে বলল, ''জলের রুপোলি আকাঙ্ক্ষা।''

আমি আর পরিতোষ আবার রবিকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে তদন্তের রাজ্যে টেনে নামালাম।

আমি বললাম, ''তারপর কী হল, সেইটে বল। শেষপর্যন্ত ধরতে পারলি?''

''না ধরে উপায় আছে? তবে ভাগ্যের জোরে।''

''তোরা ভাগ্যটাগ্য মানিস?''

এটি পরিতোষের গলা। গলাটা আমারও হতে পারত। আসলে রবি একটু নাস্তিক গোছের। বন্ধুরা মজা করে বলি 'হাফ-নাস্তিক', 'ওয়ান-থার্ড আস্তিক'—এইরকম। এমনিতে ভূত, ভগবান, ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সেরকম মানে না, কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়লে বা আশঙ্কা

করলে চুপিচুপি মন্দিরে গিয়ে গড় হয়ে আসে। পরীক্ষা দিতে যাবার আগে শ্বেতবেড়েলার মূল-শেকড় ডান হাতের অনামিকায় পরে নেয়। স্বভাবতই যে বন্ধুর নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের জানা আছে, তার সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

রবি কথাটার পাশ কাটাল। বলল, ''ভাগ্য মানে ঠিক তোরা যে-ভাগ্য ভাবছিস, সেরকম নয়। তোদের বোঝার সুবিধে হবে বলে ভাগ্য কথাটা ব্যবহার করলাম।''

বলে, বেশ উত্তর দিতে পারা গেছে ভেবে নিজে একটু মুচকি-মুচকি হেসে নিল। এবং তারপর বলতে শুরু করল বাকি ঘটনাটা।

অনেক খুনের ঘটনা বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এটি হচ্ছে একদম নতুন।

বুবু সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পলু মিত্তির। বুবু সেন সেক্রেটারি, তো পলু মিত্তির ক্যাশিয়ার। একজনকে ছাড়া অন্যের চলে না। দু'জনেই বেকার। দু'জনের মধ্যেই অদ্ভুত বনিবনা। বললে কিংবদন্তি মনে হবে।

দু'জনে হঠাৎ কী খেয়ালে লটারির টিকিট কাটল। কথা রইল, যার টিকিটেই লাগুক দু'জনে আধাআধি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

বিড়ালের ভাগ্যেও শিকে তো ছেঁড়ে, অতীতে কখনও নিশ্চয়ই ছিঁড়েছিল, অন্তত একবারও, নইলে কথাটা চালু হত না। তো সেরকম কতকটা কাকতালীয় ভাবে দেখা গেল, পলু মিত্তিরের টিকিটে লটারির প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা লেগে গেল। ট্যাক্স ফ্যাক্স বাদ দিলেও লাখতিনেক থাকবে। অর্থাৎ পলু দেড় লাখ, বুবু সেন দেড় লাখ।

কী আনন্দ তখন দু'জনের। এতদিনের দীর্ঘ বেকারত্ব ঘুচল। দিনে অন্তত বার দশ-বারো শলাপরামর্শ হচ্ছে, কী করবে টাকা দিয়ে! পলু মিত্তির প্রস্তাব দিল, ''স্রেফ ব্যবসা! ভাবছি, শিলিগুড়ির দিকে একটা কাপড়ের দোকান খুলব, পাইকারি। ওখানে আমার বড় মেসো থাকে। দোকান-টোকান পাওয়া কঠিন হবে না।''

''এই কয়টা টাকায় পাইকারি ব্যবসা? তোর মাথা খারাপ?''

বুবু সেন উৎসাহ দিচ্ছে না।

''আরে বাবা, মাথা আমার খুব সাফ। তিন লাখ টাকা মূলধন হিসেবে লগ্নি করলে, বড়বাজারে এমন ব্যবসায়ী আছে, তোকে দশ লাখ টাকার কাপড় দেবে। তিন লাখ ক্যাশ থাকলে, আরও সাত লাখ বিশ্বাস কেনা যায়?''

চোখেমুখে আনন্দ ফুটে উঠল বুবু সেনের। বলল, ''বেশ তো, তুই কাল-পরশুর মধ্যে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে যা, আমি বড়বাজারে যোগাযোগ করছি।''

যেদিন এ-কথা হল, তার দিন দুয়েকের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন বুবু সেন, অর্থাৎ, ওদের দুই প্রাণের বন্ধুর স্বপ্ন সত্যি হল না।

এমনকী কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের পোস্ট অফিসের সিলমোহর নিয়ে বুবু সেনের নামে একটা চিঠিও এল। তাতে লেখা:

প্রিয় বুবু,

তোর কথামতো শিলিগুড়ির এদিকে এসে একটা ভালো দোকানের খোঁজ পেয়েছি, বড় মেসো খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। দোকানটা চলবে বলেই বিশ্বাস। তুই কথাবার্তা বলে পাকা ব্যবস্থা করে রাখিস। আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরছি। ভালো থাকিস। ব্যস্ত আছি। শুভেচ্ছা।

পুলিশ যে পুলিশ, সেও আফশোশ করল চিঠিটা পেয়ে। ইশ্, দুটো বন্ধুর এত সুন্দর একটা স্বপ্ন এভাবে মাটি হয়ে গেল!

বাকি কথা শোনা যাক রবির নিজের মুখে, নিজের ভাষায়।

''আমি তখন উঠেপড়ে লেগেছি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই। আর-সব ফাইল একপাশে করে বুবু সেনের কেস নিয়ে সময় কাটছে। একটিই প্রশ্ন। কে খুন করল? কে আততায়ী? উদ্দেশ্যই বা কী? বিশেষ করে পৃথিবীতে যার এখনও ভালোমতো শত্রু তৈরি হওয়ারই বয়স হয়নি?

''সঞ্জয় বসুকে ধরে আনা হল। গত বছর ক্লাবের নির্বাচনে বুবু সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ-বছর নির্বাচনের আগেই তাঁর পথের কাঁটা সাফ করতে তাঁর ছোরা নিয়ে ফুঁসে উঠতেই পারে।

...কিন্তু লাভ হল না। সঞ্জয় বসু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, 'এসব ভুল সন্দেহ দারোগাবাবু, হাজার হোক, বুবু তো আমারও বন্ধু, ক্লাস নাইন পর্যন্ত একই স্কুলে পড়েছি। ভেতরে আমাদের কখনও অমিল নেই। ওর জন্ডিস হলে আমিই বিছানার কাছে কাটিয়েছি।''

''টেলিফোন করেছিলেন কেন?''

''কাকে দারোগাবাবু?''

''চোপ! গলা চিনতে পারিনি ভাবছেন?'

''আমি টেলিফোন করিনি! নেভার। টেলিফোন—**টেলিফোন**— এসব কী বলছেন?'

''সঞ্জয় বসু প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ছলছল **চোখ, কাঁদো**-কাঁদো মুখ। এমনকী, বুবু সেনের মা এবং বাবাও একযোগে জানালেন, স**ঞ্জু আমাদের ছেলের** মতন, ওকে অপদস্থ করবেন না।

''বেশ, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?''

সঞ্জয় বসু চুপ করে থাকলেন।

''বলুন শিগগির?''

''কাউকেই না।' সঞ্জয় বসু খুব স্পষ্ট করে উত্তর দিলেন।

''মাথায় অবশ্য আমাদের অনেক নাম ছিল। তাদের প্রত্যেককেই জেরা করা হল। বিশেষ করে, নটরাজ টোবাকো ফ্যাক্টরির মালিক নিত্যগোপাল পালকে পাকড়ে আনা হল। লোকটার নাকি অনেক কাঁচা টাকা আছে। লোকমুখে প্রকাশ, পলু মিত্তির টিকিটে টাকা পাওয়ার পর কালো টাকাটাকে সাদা করার জন্যে প্রিমিয়াম দিয়ে টিকিটটা কিনতে চেয়েছিল। পলু রাজি ছিল, কিন্তু বুবু সেন আদর্শের প্রশ্ন তুলে নাকচ করে দেয়। তার পক্ষে রাগবশত কিছু করে থাকা সম্ভব।

''কিন্তু সেটিও মিস-ফায়ার। সেও শোনামাত্র ভয়ে যাকে বলে হকচকিয়ে গেল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'এ অধমের কাজ আমাকে দিয়ে হতে পারবে না দারোগাবাবু। বুবু সেন আমাকে যে কাকাবাবু বলে ডাকত!'

''অর্থাৎ সুবিধে হল না।

ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্ট এল, জানা কথা, কী থাকতে পারে। চেনা পরিচিত কারও সম্বন্ধে কোনও হদিস মিলছে না।

''চোখে তখন আমার ঘুম নেই। রাতগুলি কাটছে যেন দিন।

''হঠাৎ একদিন দুপুরের পর, মানে খুনের দিন ছয়েকের মাথায় জেল সদর থেকে খবর এল, শিলিগুড়ি থেকে নাকি রেডিয়োগ্রামে বার্তা এসেছে, পলু মিত্তির সম্বন্ধে বিস্তারি খোঁজখবর নিতে। প্রয়োজনে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, ওর বাড়ি সার্চ করতে।

''দ্যাখ, ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। সার্চ করা হল প্রায় তখনই। কিন্তু কিছু নেই। নো ক্লু!''

''কিন্তু পলু মিত্তিরকে সার্চ করা হল কী ব্যাপারে?''

শিশির উৎসাহিত, আমিও। আমরা সবাই।

রবি রহস্য খেলিয়ে বলল, ''আছে, আছে। রিজন হ্যাজ।''

বলেই ফের জানাল, ''প্রথমেই যা করলাম, শুনলে অবাক হয়ে যাবি? হঠাৎ আমার মাথায় একটা খটকা লাগল। তখুনিই শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানালাম, 'হ্যালো, সার্চ তো বিফল হয়ে গেল। নো রেজাল্ট! আমাকে নিশিকান্তের ঠিকানাটা দিন।'

''লিখুন, কেয়ার অব সম্রাট সেলুন।'

''সম্রাট সেলুন?'

''ভালো শোনা যাচ্ছিল না, আমি আবার প্রশ্ন করলাম। সেলুন? মানে...''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুল-দাড়ি কাটে যে সেলুনে!'

ও-প্রান্তের উত্তর পাওয়ার পর, বাকি আর কিছু শুনিনি পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে একাই জিপ হাঁকড়ে হাজির হলাম সম্রাট সেলুনে। নিশিকান্ত ধাড়া ওখানকার বয়স্ক কর্মচারি। কথামতো মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে দিন কয়েক ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে।

''সেলুনের মালিককে জেরা করলাম। বললাম, 'বলতে পারেন, শিশিকান্ত ক'টা ক্ষুর ব্যবহার করত?''

সেলুনের মালিক চোখ বড় করে বলল, 'দাঁড়ান দারোগাবাবু, এক মিনিট।'

বলে, সেলুনের মালিক নয়ন পাত্র ডাক দিল, মদনা আছিস? হেই মদনা?'

''রোগামতো কমবয়সী একটা ছেলে এসে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার করে দাঁড়াল।

''আমাকে কিছুই বলতে হল না, নয়ন পাত্রই বলল, 'নিশিকান্তর ক'টা ক্ষুর পাওযা যাচ্ছে না?''

''নতুনটা।''

''আমি উঠছি নয়নবাবু। একটু কষ্ট দিলাম। পরে আপনাকে দরকার হতে পাবে, আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটিকে থাকতে বলবেন।''

''তা হলে তুই বলছিস, খুনটা নিশিকান্তই করেছে?''

''হান্ড্রেড পারসেন্ট। তোদের বোধ হয় মনে আছে, প্রথম যখন টেলিফোনে বুবু সেনের খুনের খবর পাই, তখন ও-প্রান্তের লোকটি 'ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে' বলে সন্দেহ করেছিল।''

''হুঁ তাই তো।''

গৌতম এতক্ষণে একটা কথা বলল।

পরিতোষ মজা করল, ''বোবা কথা বলছে, আহা রে!''

শিশির পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে বলল ''কিন্তু নিশিকান্ত যে খুন করেছে, কারণ কী?''

''দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে। বলছি, অধৈর্য হোয়ো না।''

''নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সেদিন টিকিটের জোর চেকিং হচ্ছে দুর্নীতির নানা অভিযোগে।''

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে প্রায় গেট পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সম্রাট সেলুনের বয়স্ক কর্মচারি নিশিকান্ত ধাড়া, কিন্তু টিকিটের দিকে এক পলক দেখেই চেকার খপ করে ওর হাত পাকড়ে ধরল। শুধু তাই নয়, সোজা শ্রীঘরে। টিকিটে বয়স লেখা ছাব্বিশ, অথচ নিশিকান্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

''জেরার উত্তরে ফাঁস করে দেয়, সে আসলে পলু মিত্তিরের কাছ থেকে টিকিটটা নিয়েছিল।''

''শিলিগুড়ি পুলিশের তখন আনন্দ অনেক। এই বুঝি জাল টিকিট-চক্রের খোঁজ পেয়েছে তারা। আর তখনই তো জেলা সদরে রেডিয়োগ্রামে খবর পাঠিয়ে পলু মিত্তিরের বাড়ি রেইড করতে বলল।''

রবি একটু থামতেই আমরা চারজন প্রায় সমস্বরে বললাম, ''তারপর কী হল? খুনটা কে করেছে? পলু মিত্তির, না নিশিকান্ত?''

''ধীরে বৎস, ধীরে।''

একটু থেমে বলল রবি, ''পলু মিত্তিরও তো প্রভাবশালী। তাকে গ্রেফতার করতে হলে পুলিশের নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। টিকিটটা একটা বড় সূত্র, কিন্তু একমাত্র নয়।''

''কেন, কেন?''

''পলু মিত্তির যে চিঠিটা লিখেছে শিলিগুড়ি থেকে। সেটিও একটা রেলেভেন্ট ডকুমেন্ট। একজন লোক মেটেরিয়াল টাইমে এখানে এবং শিলিগুড়িতে তো আর থাকতে পারে না!''

সবাই আমরা হকচকিয়ে গেলাম, তাও তো বটে! এটা একটা কথা।

শেষে রবিই বলল, ''তো হ্যাঁ, পালটা রেডিয়োগ্রাম করে শিলিগুড়িতে খোঁজ নিয়ে গেল, পলু মিত্তিরের মেসোর সঙ্গে পলু মিত্তিরের দেখাই হয়নি। অর্থাৎ পলু মিত্তির কাছি কোথাও আত্মগোপন করে ছিল। ''আমি তখন সময় নষ্ট না করে, একদম কাছে রিভলভার তাক করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'হুঁ, এতদিনে একজন আসল চেনা গেল।''

পলু মিত্তিরও খুব জনপ্রিয়। সেও অনেক লোককে ঘোল খাইয়েছে এ-পর্যন্ত। একটুও টলল না, বাজের শব্দ বলে বোমার শব্দ উড়িয়ে দিতে পারে। পালটা ধমক দিয়ে বলল, 'এটা অন্যায়, নিছক সন্দেহবশত কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ তার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। নো মিস্টার দারোগা, কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ফিরে এলে. ফলটা টের পাবেন।''

''ইয়েস, আই নো দ্যাট। আপাতত...।''

''রিভলভার তো নেই তাক করা, আমি চোখের মুদ্রায় জিপটা দেখালাম।''

''সত্যি চমকপ্রদ ব্যাপার।''

আবার সেই শিশিরের মন্তব্য। পরিতোষ ওকে একটু ধমকের সুরে বলল, ''ফুট কাটবি না।''

রবি বেশ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, ''আরও কী আশ্চর্য দ্যাখ, নিশিকান্তকে সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেল, তার তালিকাও করা হল। পুলিশ ওকে ডাকাতও ভেবেছিল।''

আমাদের প্রশ্ন করার আগেই বলল, ''ঝকঝকে তাজা কারখানার গন্ধে ভরপুর হাজার চব্বিশ টাকা পাওয়া গেল নিশিকান্তের কাছ থেকে।''

''রিয়েলি ?''

এবার কিন্তু আমিই বলে ফেললাম।

''কোথাকার টাকা জানিস ?''

''ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ?''

''সত্যি? তোরা হতাশ করলি, তোরা ওই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লসাগু, গসাগু করগে যা। একটুও যদি খুপরিতে কিছু থাকে ?''

রবি কার্যত আমাদের সবাইকে এক পাল্লায় ওজন করে ফেলল। তারপর বলল, ''লটারির টাকা। পলু মিত্তিরের টাকার সিরিয়াল নম্বর আর নিশিকান্তের কাছে পাওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর ক্রম-অনুযায়ী। ব্যস, গ্রেট সাকসেস। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যে নিজের নামের টিকিটটা দিয়ে নিশিকান্তের মতো গবেটকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছে, আবার একটা চিঠিও লিখে দিয়েছে বুবু সেনের নামে। বেচারা নিশিকান্ত! কথামতো ট্রেন থেকে নেমেই চিঠিটা পোস্টও করেছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে বিপদ ঘটাল।''

''তুই হলে কী করতিস ?''

শিশির নয়, এবারে মৌনমুখর সেই গৌতম বলল।

''আমি হলে টিকিট না দিয়ে অন্য একটা ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়াতাম, পকেটে টাকা আছেই। কোনও এক কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার গিয়ে নামতাম।''

''চমৎকার ফন্দি করেছিল, যা হোক!''

''হুঁ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বটে! ভালো পথে লাগালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত!''

যথাক্রমে শিশিরের এবং আমার কথা দুটোকে টেনে নিয়ে রবি বলল, ''এমনি-এমনি কি আর হয়? গাড্ডায় পড়লে হয়। তখন মগজের কোষগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে আবার কী জানিস, কয়েকদিন আগে পলু মিত্তির বেশ আচ্ছা করে বাবু-ছাঁট দিয়ে এসেছে চুলে। কেটেছে ওই নিশিকান্ত। বেচারার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, হাজার হোক বাবা তো!''

নদীর জল ভাটার টানে অনেক নীচে নেমে গেছে। নৌকো আটকে গেছে পলিতে চাঁদের হালকা আলো পড়েছে জলে। এখন ডাঙায় উঠতে আমাদের চটিজুতো হাতে নিতে হবে।

যে-যার মতন পাড়ে উঠেছি, পরিতোষ প্রশ্ন করল, ''সত্যি, এখন বল, চাকরিটা কেমন লাগছে ?''

''ভেরি থ্রিলিং। কালকে আর-একটা ঘটনা বলব, সেটাও প্রায় এরই কাছাকাছি জটিল পুলিশে ঢুকে এখন বুঝছি, এ-চাকরিতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। একজন ক্রিমিন্যালের সন্ধান পেলে যে কেমন আনন্দ হয়, কী বলব? এখন তো আমি কোনও কঠিন তদন্ত পেলে খুব খুশি হই, বেশ খোরাক হয়। আগ বাড়িয়ে টেনে নিই হাতে। চাকরি বলিস, জীবন বলিস, চ্যালেঞ্জ, শুধু চ্যালেঞ্জ।''